বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-101

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি

২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর — বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০২১

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Manas Kumar Sanyal Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান- ১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) এম.এ
প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-101

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ১ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও তার প্রাসিঙ্গকতা
একক - ২ বাংলাদেশ - বাঙালি ও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্পর্ব
একক - ৩ চর্যাগীতি
একক - ৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ৫ মঙ্গলকাব্যের প্রাগ্‌ভাষ
একক - ৬ মনসামঙ্গল কাব্য ও কবিগণ
একক - ৭ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ
একক - ৮ ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় ৫ ঘণ্টা)

একক - ৯ অনুবাদ সাহিত্য
একক - ১০ সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব
একক - ১১ চৈতন্যজীবনী সাহিত্য
একক - ১২ বৈষ্ণব পদাবলী
একক - ১৩ বৈষ্ণব পদকর্তা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় ৩ ঘণ্টা)

একক - ১৪ ইসলামী সাহিত্য (১৫-১৮ শতক)
একক - ১৫ গীতিকা (গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য)
একক - ১৬ লোকসাহিত্য (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন)

সূচিপত্র

B-CORE-101

<table>
<tr><th>প্রথম পত্র</th><th>একক</th><th>পাঠ প্রণেতা</th><th>শিরোনাম</th><th>পৃষ্ঠা</th></tr>
<tr><td rowspan="4">পর্যায় গ্রন্থ-১</td><td>১</td><td>ড. তুষার পটুয়া</td><td>বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও তার প্রাসিঙ্গকতা</td><td>১-৪</td></tr>
<tr><td>২</td><td>অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক</td><td>বাংলাদেশ-বাঙালি ও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্‌পর্ব</td><td>৫-১৬</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক</td><td>চর্যাগীতি</td><td>১৭-২৫</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক</td><td>শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য</td><td>২৬-৩৮</td></tr>
<tr><td rowspan="4">পর্যায় গ্রন্থ-২</td><td>৫</td><td>অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর</td><td>মঙ্গলকাব্যের প্রাগ্‌ভাষ</td><td>৩৯-৪২</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর</td><td>মনসামঙ্গল কাব্য ও কবিগণ</td><td>৪৩-৫৫</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর</td><td>চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ</td><td>৫৬-৬৯</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর</td><td>ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ</td><td>৭০-৮১</td></tr>
<tr><td rowspan="5">পর্যায় গ্রন্থ-৩</td><td>৯</td><td>অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস</td><td>অনুবাদ সাহিত্য</td><td>৮২-৯৩</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক</td><td>সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব</td><td>৯৪-১০১</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>অধ্যাপক ড. তাপস বসু</td><td>চৈতন্যজীবনী সাহিত্য</td><td>১০২-১০৯</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>ড. তুষার পটুয়া</td><td>বৈষ্ণব পদাবলী</td><td>১১০-১১৫</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>অধ্যাপক ড. তাপস বসু</td><td>বৈষ্ণব পদকর্তা</td><td>১১৬-১৩৪</td></tr>
<tr><td rowspan="3">পর্যায় গ্রন্থ-৪</td><td>১৪</td><td>অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর</td><td>ইসলামী সাহিত্য (১৫-১৮শতক)</td><td>১৩৫-১৫৯</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক</td><td>গীতিকা (গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য)</td><td>১৬০-১৭৪</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>ড. রাজশেখর নন্দী</td><td>লোকসাহিত্য (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন)</td><td>১৭৫-১৮৭</td></tr>
</table>

B-CORE-101

শিরোনাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রাচীন ও মধ্যযুগ (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-১

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও তার প্রাসঙ্গিকতা

বিন্যাস ক্রম

১.১.১.১ সূচনা ও প্রসারতা
১.১.১.২ যুগবিভাগের প্রাসঙ্গিকতা
১.১.১.৩ যুগবিভাজন
১.১.১.৪ আদর্শ প্রশ্নমালা
১.১.১.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১.১.১.১ : সূচনা ও প্রসারতা

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম **বাংলা সাহিত্য** নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে চর্যাগানগুলি নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থের নাম দেন, "হাজার বছরের পুরান বঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা"। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্তপদাবলি, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, পীরসাহিত্য, নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি এবং ইসলামি ধর্মসাহিত্য ছিল এই সাহিত্যের মূল ধারা।

প্রত্যেক জাতির কাছে তার সাহিত্য ভাণ্ডার হল জাতীয় সম্পদ বা অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও জাতিগত এমন অনেক মূল্যবান তথ্য সাহিত্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকে যা অন্যত্র পাওয়া কঠিন। তাই আধুনিক সাহিত্য অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য অনেক মূল্যবান। আর্যদের (Inner & Outer Aryan) ইতিহাস হল তাদের আসার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা, শবর, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি গোষ্ঠীদের বাস ছিল। শিকার করা, মৎস্য ধরা, এদের জীবন ধারনের প্রধান উপায় ছিল। এদের মধ্যে দ্রাবিড় ও কোলেরা ছিল বেশি সভ্য। দ্রাবিড় সভ্যতার কাছ থেকেই মূর্তিপূজার (দুর্গা, মনসা) প্রথা এল।

১.১.১.২ : যুগ বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলা সাহিত্য ও যুগ সম্পর্কে কৌতূহলের অভাব নেই। বলাবাহুল্য তথ্যগত নানান দিক নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে হয়ে থাকে কিন্তু কালগত বিভাজন বা যুগ বিভাজনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে চর্চা এ পর্যন্ত খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা সাহিত্য শুধু নয় পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে চর্চার প্রয়োজনে সময়ের মূল্যায়ন করাটা ভীষণ জরুরি। সময় দিয়েই সকল বিষয়, প্রকরণ ও প্রবণতাগুলি উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা শুধু কয়েকজন স্রষ্টার সম্পর্কে জেনেই ক্ষান্ত থাকি—আমাদের ধারণা এই হল সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস। অথবা সাহিত্যের একটি বিশেষ সময়ের চর্চা করেই সমগ্র চর্চার সুবিধা উপভোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ইতিহাস জানাটা একটা বিশেষ আগ্রহের বিষয়, বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাসের পাশাপাশি বা সমান্তরালে চলতে থাকে ভাষার ইতিহাস, জাতির ইতিহাস; শুধু ইতিহাসই বা কেন চলতে থাকে দেশ জাতি সংস্কৃতির রুচি প্রবণতার ইতিহাস ও পরম্পরার ইতিবৃত্ত।

বাংলা সাহিত্যের কমপক্ষে বয়স হল হাজার বছর। এই হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের নানা দিক আলোকিত হয়েছে; এমনকি আরও অনেক দিক আলোকপাত করার অপেক্ষায় আছে। এই সমস্ত বিষয় ও বৈচিত্র্যকে সুশৃঙ্খলভাবে বুঝতে চাইলে যুগবিভাজনের ক্রমপরম্পরার সূত্রটিকে সর্বপ্রথম অনুধাবন করতে হয়।

যুগের প্রভাবে সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ সাহিত্য প্রভাবিত হয়ে থাকে যুগের বিভিন্ন প্রভাবের দ্বারা। যেমন—ইংরেজি সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে এলিজাবেথের যুগ, ভিক্টোরিয়া-যুগ প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে তেমনি প্রভাব বিস্তার করেছে আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি; স্বভাবতই সমকালের প্রভাব সেই সাহিত্যের উপর পড়ে। সমসাময়িক সাহিত্যের সেই প্রবণতাগুলি সেই কারণে পরতে পরতে মিশতে থাকে। সেই কারণে শতাব্দীর বিভাজনের হিসেবে না গিয়ে বিভিন্ন যুগের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে এই আলোচনা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

জাতির পরিচয়, সমাজের পরিচয় ও তার ইতিহাস বিধৃত থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। তাই কোন জাতি বা সমাজের কথা অনুধাবন করতে গেলে সময়ের বিভাজন করাটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে 'যুগ বিভাগ' কথাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন ব্যবহৃত হয়।

বিচিত্র এই বাঙালি জাতি। তার জীবনাচরণ, ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই সবই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এক যুগ থেকে একযুগ ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে তার স্রোত। এইভাবে যুগে যুগে বিচিত্র জাতির সংস্পর্শে এসে এই জাতির চরিত্র গড়ে উঠেছে বর্ণাঢ্যময় রূপে। যুগের চরিত্রের সঙ্গে অন্তর্লীন এই রূপটিকে বুঝতেই যুগের বিভাজন প্রয়োজন।

১.১.১.৩ : যুগবিভাজন

কালভেদে স্থানভেদে সাহিত্যের রুচি ও বোধের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই কাল ও যুগকে নির্দিষ্ট রেখে সাহিত্য আলোচনা একটি বৈধ যাত্রা হয়ে উঠতে পারে। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বাংলা সাহিত্য আলোচনার গোড়াপত্তন করেন। আদ্যকাল বলতে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের কালকেই উল্লেখ করেন; দুই, মধ্যকাল বলতে চৈতন্যসমসাময়িক কালকেই তুলে ধরেছেন। আর তিন, আধুনিক অর্থে ইদানীন্তনকাল বুঝেছেন এবং সেখানে ভারতচন্দ্রের কাল থেকে শুরু করে অনেকটা সময়পর্ব আলোচিত হয়েছে। এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিযুক্ত নয়। সমস্যা তৈরি হয় কালের প্রবণতা তাহলে কীভাবে ধরা যাবে? তুলনামূলকভাবে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বিধৃত কালানুক্রমিক পদ্ধতি কিছু প্রাসঙ্গিক। কালানুক্রমিক বিভাজন করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র উক্ত গ্রন্থে নয়টি অধ্যায় যুক্ত করেছেন এবং নবম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় করেছেন 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ'। তাঁর দ্বারা কৃত বিভাজনটি নিম্নরূপ :

১। হিন্দু-বৌদ্ধযুগ

২। গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য

৩। শ্রীচৈতন্যসাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ

৪। সংস্কার যুগ

৫। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে যুগের নামকরণ যাই থাকুক গ্রন্থকার কালকেই ভিত্তিরূপে গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালের অনেকেই এই যুগবিভাজনকে সমর্থন জানাতে পারেননি—বিশেষত যে কারণে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে যুগবিভাগ কল্পিত হয়, সেই কারণে কখনও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যুগকে চিহ্নিত করা চলে না।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখজনেরা ভাষা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন :

- আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৯০০ খ্রি.—১২০০ খ্রি.)
- যুগসন্ধিকাল ১২০০ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি.
- মধ্যযুগ আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত
  - ক। আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি. থেকে ১৫০০ খ্রি. পর্যন্ত)
  - খ। অন্তমধ্যযুগ আনুমানিক ১৫০০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রি.
- আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রি.—বর্তমান কাল)

১.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। যুগবিভাগ বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকে?

২। বাংলা সাহিত্যে যুগবিভাগের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৩। যুগবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। যুগবিভাগের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

১.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—আজাহার খান

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত)—সুকুমার সেন

বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম)—গোপাল হালদার।

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-২

বাংলাদেশ—বাঙালি
ও
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্‌পর্ব

বিন্যাস ক্রম

১.১.২.১ ভূমিকা

১.১.২.২ বাঙালির জাতি পরিচয়

১.১.২.৩ বাংলা দেশের পরিচয়

১.১.২.৪ বাংলা ভাষার পরিচয়

১.১.২.৫ বঙ্গলিপি উদ্ভবের ইতিহাস

১.১.২.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.১.২.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.২.১ : ভূমিকা

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!"

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, আমরা বাঙালি। কবির বাণীতে যে বাংলা ভাষার স্তুতি তার ঐতিহ্য-অন্বেষণ সহজ নয়। কেননা বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির সূত্রানুসন্ধানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই ভাষার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশকেন্দ্রিত পটভূমিকা।

প্রশ্ন জাগে—দেশ আগে না জাতি-সম্প্রদায় আগে? আবার জাতি-সম্প্রদায় আগে না ভাষা আগে? সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণে ঐ সকল জটিল বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, ভাষার স্থান সবার উপরে। কেন না ভাষাকে অবলম্বন করেই এক একটি ভাষা-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব আচার-ব্যবহার-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সাহিত্য—এক কথায় তাদের সভ্যতা।

> *আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, আমরা বাঙালি। ভাষাকে অবলম্বন করেই এক একটি ভাষা-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব আচার ব্যবহার-কৃষ্টি- সংস্কৃতি-সাহিত্য-এক কথায় তাদের সভ্যতা। মন আছে বলেই মানুষ মননশীল। ভাব ও ভাবনার বিচিত্র তরঙ্গ, মননশীল অনুভব ও বোধের মধ্য দিয়ে ক্রমাভিব্যক্তির পথে জন্ম দেয় ভাষার।*

মন আছে বলেই মানুষ মননশীল। তার ভাব ও ভাবনার বিচিত্র তরঙ্গ মননশীল অনুভব ও বোধের মধ্য দিয়ে ক্রমাভিব্যক্তির পথে জন্ম দেয় ভাষার। এই জন্যই দার্শনিক Maxmüller বলেছিলেন—'Language is the autobiography of human mind'.—এই সূত্রে ভাষা যদি মানব মনের প্রতিলিপি বলে বিবেচিত হয়, তা হলে স্বীকার করতে বাধা নেই যে মানুষের মন যত প্রাচীন তার ভাষাও ততটাই প্রাচীন। তাই প্রাচীনতম মানুষের প্রাচীনতম চিন্তন-মননের

অভিব্যক্তি তার ভাষা। সৃষ্টিরহস্যের ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় কবে কোথায় কোন্ দেশের মানুষ প্রথম কোন্ ভাষায় মনের ভাবকে প্রকাশ করেছিল—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? বস্তুত এ রহস্যের কোনো সদুত্তর নেই জেনেই ঋগ্বেদ সংহিতার ঋষি প্রশ্ন তুলেছিলেন—'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্''—সৃষ্টিরাজ্যে প্রথমজাত প্রকাশরূপকে কে প্রথম দেখেছিলেন?

যাই হোক, বোঝা গেল, চিন্তন-মনন ও তার প্রকাশ মানুষের স্বভাবধর্ম। শ্যামজন্মদে বঙ্গ-ভূমিতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কবে কখন প্রথম কেমন বাংলায় ভাবপ্রকাশ করেছিলেন সে রহস্যের সমাধান যতটা অনুমান নির্ভর ততটা তথ্যনির্ভর নয়। তাই প্রাথমিকভাবে আমরা বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করে পরবর্তী স্তরে বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হব।

প্রশ্ন :

১। মানুষ মননশীল কেন?

২। ভাষা সম্বন্ধে Maxmuller কি বলেছিলেন?

১.১.২.২ : বাঙালির জাতি পরিচয়

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বাংলাদেশ বা বঙ্গপ্রদেশ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বাংলাদেশ বলে কোনো রাষ্ট্র বা প্রদেশ ছিল না; তার নাম ছিল কেবল 'বঙ্গ' যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গদেশ' আখ্যা পায়। বস্তুতঃ বাংলার প্রাচীন নাম যাই হোক না কেন সেই নামটির দেশবাচক অথবা জাতিবাচক পরিচয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতা ও আর্যসংস্কৃতির প্রসারের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার অব্দে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সমভাষাভাষী একটি জাতির আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। ঐ জাতির সাধারণ পরিচয় আর্যজাতি। আর্যগণ যাযাবর জাতি হলেও তাঁরা ছিলেন সমুন্নত ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী। আর্যজাতি ও আর্যভাষা সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে আগমনের আগে গিরি-অরণ্য-নদ-নদী পরিবেষ্টিত এ দেশে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরা আদিবাসী ও উপজাতি বা জনজাতি নামে পরিচিত ছিলেন। আর্যের ঐ সকল অধিবাসীও বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এঁদেরই কোনো কোনো সম্প্রদায়কে বৈদিক ও উত্তর বৈদিক যুগে 'অসুর', 'রাক্ষস', 'নিষাদ' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ট্রিক বা কোল বংশ-সমুদ্ভূত সাঁওতাল-মুণ্ডা-শবর-পুলিন্দ-হো-কুর্ক-ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি জনজাতি-সম্প্রদায় তাঁদের উত্তর পুরুষ। এদের মধ্যে ডোম ও চণ্ডাল সম্প্রদায় অন্ত্যজ হলেও আর্য ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন।

> ***বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বাংলাদেশ বা বঙ্গপ্রদেশ। প্রাচীনকালে কেবল বঙ্গ যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গদেশ' আখ্যা পায়। আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব আড়াই হাজার অব্দে আর্যজাতির আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। আর্যজাতি ভারতবর্ষে আগমনের আগে, এদেশে যাঁরা বসবাস করতেন তারা আদিবাসী ও উপজাতি নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের ও বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস ভারতবর্ষের আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।***

বাংলা দেশের ও বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস ভারতবর্ষের আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। সম্প্রসারণশীল আর্য জাতি ভারতে প্রবেশের পর প্রথমে সিন্ধু-কাশ্মীর-গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। অতঃপর পাঞ্জাবের দুই পবিত্র নদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী 'ব্রহ্মাবর্ত' নামক ভূভাগে আর্যনিবাস গড়ে

উঠেছিল। ব্রহ্মাবর্ত দেবনির্মিত জনপদ রূপে বন্দিত হত। এখান থেকেই ভারতে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। এই অভিযান চলতেই থাকে যার ফলে কুরুক্ষেত্র-মৎস্য-পাঞ্চাল-শূরসেন প্রভৃতি 'ব্রহ্মর্ষি' দেশের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলি আর্য সংস্কৃতির অধীনে আসে। এই ভাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে পূর্বসমুদ্র থেকে পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়ায় এসে বৃহত্তর 'আর্যাবর্ত' বা আর্য সংস্কৃতিভুক্ত অঞ্চল গঠন করে। দেবভাষা সংস্কৃতের অনুশীলন এবং বেদবিহিত অনুশাসন মেনে চলা—আর্যসংস্কৃতির দুটি মূল বিষয়।

প্রশ্ন :

১। আর্যজাতির আগমন ভারতবর্ষে কখন হয়েছিল?

২। প্রাচীন ভারতে বাংলাদেশ বলে কোন রাষ্ট্র ছিল না, তখন এর নাম কি ছিল?

১.১.২.৩ : বাংলা দেশের পরিচয়

মৌর্যযুগের (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল বাংলা দেশ আর্যসংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিল। মৌর্যযুগ থেকেই এ দেশে আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্ত যুগে হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৭ম শতক) প্রায় সমগ্র বাংলা দেশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারে আসে। মনুসংহিতানুসারে 'ম্লেচ্ছ দেশস্ততোহন্যতঃ' বলতে আর্যসংস্কার-বহির্ভূত দেশগুলিকেই বোঝানো হয়েছে। মনে হয় 'ম্লেচ্ছ' এই প্রাকৃত শব্দটি 'মৎস্য' শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপ (সংস্কৃত মৎস্য > প্রা. মচ্ছ (মাগ. প্রা মশ্চ > ম্লচ্ছ > ম্লেচ্ছ)। সুতরাং ম্লেচ্ছ শব্দে অবৈদিক অনাচারী 'মছলি খানেওয়ালা' বাঙালি পূর্বপুরুষদের প্রতি কটাক্ষের সংকেত আছে বলে আমাদের ধারণা। সেই কটাক্ষ তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়ে কখনো কখনো শিষ্টতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি।"—অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধ—আর্যসংস্কৃতি বহির্ভূত এই সকল দেশে কোনো কাজে গেলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই বিধান থেকে স্পষ্ট হয় ম্লেচ্ছদের প্রতি আর্য সংস্কারক ও শাস্ত্রপ্রণেতাদের অবজ্ঞার মাত্রা। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত দেশ গুলির মধ্যে সৌরাষ্ট্র (বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত সুরাট অঞ্চল) এবং মগধের কিয়দংশ বাদে বাকি অঞ্চলগুলির প্রায় সবই সুপ্রাচীন কালের বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে পূর্বোল্লিখিত বৈদিক সংস্কার-বহির্ভূত অচ্ছুৎ-অন্ত্যজদের ঐ সকল দেশেও আর্য অভিযান অব্যাহত ছিল এবং গুপ্তযুগের আগেই সেখানে কিছু কিছু আর্যনিবাস ও আর্যসংস্কৃতিপুষ্ট তীর্থস্থান গড়ে উঠেছিল। তা না হলে কেবল মাত্র ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কারণে আর্যবংশজগণ ঐ সকল দেশে আসতেন এবং প্রায়শ্চিত্তের কঠোর বিধান মেনে নিতেন বলে মনে হয় না।

> ***মৌর্যযুগ থেকেই এ দেশে আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্তযুগে সমগ্র বাংলাদেশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারে আসে। 'ম্লেচ্ছ' এই প্রাকৃত শব্দটি 'মৎস্য' শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপ। 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম এই তিনটি বিভাগ উল্লেখ করেছেন। 'অঙ্গ' দেশের বেশির ভাগ অংশ বর্তমান বিহারের অর্ন্তভুক্ত, ক্ষুদ্রাংশটুকু পড়েছে বাংলায়। 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ নিম্ন জলাভূমি। সুতরাং বঙ্গদেশ বলতে অবিভক্ত বাংলার জলময় অঞ্চলগুলিকে বোঝাতো। 'সুহ্ম' বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে, বর্তমান বর্ধমান বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত।***

একটি ভূখণ্ড বা বিভাগ হিসেবে 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ

২য় শতক)। পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম—এই তিনটি বিভাগের উল্লেখ করেছিলেন। অঙ্গদেশের বেশির ভাগ অংশ বর্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত, ক্ষুদ্রাংশটুকু পড়েছে বাংলায়। বর্তমান মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বীরভূম জেলা প্রাচীন 'অঙ্গ' দেশের অঙ্গীভূত ছিল। 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ নিম্ন জলাভূমি। সুতরাং বঙ্গদেশ বলতে অবিভক্ত বাংলার জলময় অঞ্চলগুলিকে বোঝাতো। 'সুহ্ম' বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে বর্তমান বর্ধমান বিভাগ। রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস সুহ্ম, বঙ্গ, ও কামরূপ অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বঙ্গ হ'ল বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং অবিভক্ত সুন্দরবন অঞ্চল। বাংলার উত্তরপূর্ব অঞ্চল পরিচিত ছিল 'সমতট' নামে। এর মধ্যে পড়তো ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম (সিলেট) ও নোয়াখালি অঞ্চল। উত্তর ও উত্তর-মধ্য বঙ্গকে বলা হ'ত 'পুণ্ড্রবর্ধন'। গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত ভূভাগ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের সীমানা। গঙ্গার উত্তর প্রান্তস্থ অঞ্চলকে বলা হ'ত 'বরেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্রী'।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চল 'সুহ্ম' বিভাগের মধ্যে পড়েছে। বস্তুত পশ্চিম বাংলার প্রাচীন নাম সুহ্ম হলেও খ্রীষ্টিয় নবম-দশম শতক থেকে সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে 'রাঢ়' নাম চালু হয়। রাঢ় অঞ্চল আবার দুই অংশে বিভক্ত—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। রাঢ়ের পরিচিতি প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"অজয় ও দামোদরের উত্তরে উত্তর রাঢ়, অজয়ের পূর্বে ও দামোদরের দুই পাশে, দক্ষিণে ও পূর্বে দক্ষিণ রাঢ়। (সেকালে দামোদর ত্রিবেণী-কালনার মাঝামাঝি স্থানে গঙ্গায় গিয়া পড়িত।) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ হইতে শুধু রাঢ় দেশ বলিলে উত্তর রাঢ়ই বুঝাইত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে উত্তর রাঢ়া এবং দক্ষিণ রাঢ়া বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দুই 'মণ্ডল' ছিল। গুপ্তরাজাদের শাসনকালে তাঁহাদের অধিকৃত উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ দুইটি 'ভুক্তি' তে (অর্থাৎ রাজস্ব-সংগ্রহ ভূখণ্ডে) বিভক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্বতীরস্থ প্রদেশ ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে, আর দক্ষিণ ও পশ্চিমতীরস্থ প্রদেশ ছিল বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। সেন-রাজাদের আমলে বর্ধমানভুক্তির আয়তন কমিয়া যায় এবং ইহার উত্তর-পশ্চিমাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া দণ্ডভুক্তির সৃষ্টি হয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ—পৃ-২), ড. সুকুমার সেন)।

> ***পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চল 'সুহ্ম' বিভাগের মধ্যে পড়েছে। খ্রীষ্টিয় নবম-দশম শতক থেকে রাঢ় নাম চালু হয়। রাঢ় অঞ্চল আবার দুই অংশে বিভক্ত উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। 'রাঢ়' শব্দটি জাতিবাচক নয়, গুণবাচক। বঙ্গদেশের অধিবাসী বঙ্গাল > সেই অধিবাসীদের ভাষা বঙ্গালী > বাঙ্গালা > আধুনিক বাংলা বা বাঙলা শব্দের উৎপত্তি। প্রাচিন বাংলার আর একটি অর্থবহ নাম ছিল 'গৌড়'। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'গৌড়' শব্দটিকে 'বঙ্গ' শব্দের সমান্তরাল ও সমার্থক বলে মনে করতেন।***

'বঙ্গ' নামটির অর্থোৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কারো কারো অনুমান, পদটি চীনীয়-তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দসমুদ্ভব। গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীবাচক শব্দের সঙ্গে বঙ্গ (বংগ) শব্দের ধ্বনিগত মিলটি বুঝিয়ে দেয় জলাশয় ও জলময় ভূমির সঙ্গে তার সাদৃশ্য। ঋগ্বেদে 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ নেই। 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম পরিচয় মেলে ঐতরেয়-আরণ্যকে (২-১-১৫)। সেখানে বলা হয়েছে—তিনটি সৃষ্ট তির্যক প্রজাতি (পক্ষী) বিনষ্ট হয়েছিল। এই তিনটি প্রজাতি হ'ল যথাক্রমে 'বঙ্গেরা', 'বগধেরা' এবং 'ইরপাদেরা'

প্রশ্ন :

১। এ দেশে আর্যীকরণ কখন থেকে শুরু হয়?

২। 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম ব্যবহার কোথায় লক্ষ্য করা যায়?

৩। 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ কি ?

বা 'চেরপাদেরা'—"যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।" বাক্যটির ব্যঞ্জিত অর্থ থেকে পণ্ডিতদের অনুমান, যে তিনটি পক্ষী জাতি অর্থাৎ পক্ষীরূপ যাযাবর জাতির মানব সম্প্রদায় বিনষ্ট হয়েছিল তারা হ'ল আর্য অথবা অনার্য ভাষা-ভাষী বঙ্গেরা অর্থাৎ বঙ্গজাতীয় মানুষ, বগধেরা অর্থাৎ বগধ (আনুমানিক মগধ শব্দের পূর্বরূপ) জাতীয় মানুষ এবং চেরপাদ বা ইরপাদ জাতের মানব প্রজাতি। ভারতে দেশ নাম অধিকাংশ স্থলে জাতি নাম থেকে এসেছে। এই সূত্রে 'বঙ্গে' অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমিতে বসবাসকারী জাতির বাসস্থান বঙ্গদেশ রূপে পরিচিত হয়েছিল বলে অনুমান। এমনি বগধ বা মগধ দেশের অধিবাসী মাগধ > ভাষা মাগধী, কিন্তু চেরপাদ বা ইরপাদের 'কোনো সুসঙ্গত ব্যাখ্যা নাই' বলে ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেনের ধারণা।

যাই হোক, বঙ্গ > বঙ্গাল (বঙ্গ + আল) অথবা বঙ্গপাল (বঙ্গ + পাল) শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। বঙ্গপাল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় আনুমানিক খ্রীঃ প্রথম শতকে। উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত একটি গুহালিপি থেকে জানা যায় যে অধিচ্ছত্রার রাজা 'বঙ্গপাল'-এর পুত্র আষাঢ় সেন ঐ লিপি উৎসর্গ করেছিলেন। দ্বাদশ শতকের এক অনুশাসনে 'বঙ্গালবল' শব্দের উল্লেখ আছে। 'বঙ্গালবল' নালন্দার একটি বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিল। এই সময়ে 'বঙ্গাল' নামে এক কবি ছিলেন বলেও জানা যায়। বঙ্গদেশের অধিবাসী বঙ্গাল (বর্তমানে বাঙাল) > **সেই অধিবাসীদের ভাষা বঙ্গালী > বাঙ্গালা > আধুনিক বাংলা বা বাঙ্লা শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালা বা বাংলার ইংরেজি উচ্চারণ Bengal (দেশবাচক) এবং Bengali (ভাববাচক)। ফরাসী বঙ্গালহ > পর্তুগীজ Bengala > ইংরেজি Bengal শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে বলে পণ্ডিতদের অনুমান। অবশ্য পর্তুগীজ Bengala থেকেও বাংলা শব্দটি এসে থাকতে পারে।**

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭-১৮) পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান পুণ্ড্রবর্ধন। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের (অশোকের সমসাময়িক) একটি লিপিতে, 'পুণ্ড্রনগর'-এর উল্লেখ থেকে মনে হয়, এই পুণ্ড্রনগরেরই অর্বাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন।

'সুহ্ম' শব্দের উল্লেখ আছে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ ২য় - ১ম শতক) এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্রে (আয়ারঙ্গসুত্ত)। অষ্টম-নবম শতক ও তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত 'সুহ্ম' দেশ বলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকেই বোঝাতো। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' অনুসারে বাণিজ্যবন্দর 'তাম্রলিপ্ত' (বর্তমান তমলুক) বা 'দামলিপ্ত' নগর সুহ্ম দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়।

'রাঢ়' শব্দটি জাতিবাচক নয়, গুণবাচক ও দেশবাচক। উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়ার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে 'রাঢ়াপুরী'র উল্লেখ এবং 'দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যগর্ব ও আচারশুচিতার প্রতি কটাক্ষ আছে।' নিন্দাত্মক অর্থে 'রাঢ়', শব্দটির ব্যবহার আছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' (ষোড়শ শতক) —

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।"

প্রাচীন বাংলার আর একটি অর্থবহ নাম ছিল 'গৌড়'। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'গৌড়' শব্দটিকে 'বঙ্গ' শব্দের সমান্তরাল ও সমার্থক বলে মনে করতেন। রামমোহনের 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' মধুসূদনের

প্রশ্ন :

১। রাঢ় নামটি কখন থেকে চালু হয়? রাঢ় অঞ্চল কটি ভাগে বিভক্ত?

২। 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' কার লেখা?

'গৌড়জন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গৌড়ানন্দ কবি' প্রভৃতি পদের ব্যবহার এ সত্য সমর্থন করে। কিন্তু গৌড়দেশ বলতে বোধ করি বৃহত্তর বাংলা দেশের একটি অংশকে বোঝালেও তা সমগ্র বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। এ সম্পর্কে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-প্রণেতা ও ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—" 'গোণ্ড' এই জাতিবাচক নামের সঙ্গে গৌড়' নামের যোগ থাকা সম্ভব। গোঁড়দের দেশ গৌড়। "পঞ্চগৌড়" কথাটি হইতে মনে হয়, উত্তর ভারতের একাধিক অঞ্চল একদা গৌড় নাম পাইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দের পূর্বেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর অংশের স্থান ও শহর বিশেষ এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। শশাঙ্কের "গৌড়রাজ" খ্যাতি তাহার প্রমাণ। গৌড়দেশের লোক বুঝাইতে রাজশেখর (নবম শতাব্দ) "গৌড়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালার বাহিরে 'গৌড়িয়া' নামে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের গৌড়ী রীতি এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের গৌড়ী (ভাষা) মোটামুটিভাবে বাংলা দেশকেই নির্দেশ করিতেছে। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খ. পূর্বাধ, পৃ-৫)

১.১.২.৪ : বাংলা ভাষার পরিচয়

ভাষা বোঝাতে বাংলা (বাঙলা) শব্দটি কোন্ সময় থেকে চালু হয়েছে তা বলা মুস্কিল। অষ্টাদশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষা 'দেশী' 'লৌকিক', 'প্রাকৃত' বা 'পরাকৃত' ইত্যাদি নামে অথবা কেবল 'ভাষা' নামে পরিচিত ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাষা বলতে বুঝতেন দেবভাষা বা শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতকে, আর তাঁদের মাতৃভাষা দেশী বা বাঙ্গালাকে। সাধারণ মানুষ তো দূর অস্ত, অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিও সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের নাম জানতেন না। শ্রীকর নন্দীর (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) মহাভারতের অনুবাদের ভাষা ছিল 'দেশী' অর্থাৎ তাঁর মাতৃভাষা—"দেশি ভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার। সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগৎ-ভিতর।।" ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কবি মাধব আচার্য বাংলা ভাষা অর্থে 'লোকভাষা' ব্যবহার করেছেন, রামচন্দ্র খান ব্যবহার করেছেন 'পরাকৃত', কবিশেখর 'লৌকিক', সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত কাজী 'দেশীভাষা' এবং অষ্টাদশ শতকের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কেবল 'ভাষা'—"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।"

> *শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাষা বলতে বুঝতেন সংস্কৃতকে, আর তাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে। ষোড়শ শতকের কবি মাধব আচার্য বাংলা ভাষা অর্থে ' লোকভাষা' ব্যবহার করেছেন। রামচন্দ্র খান ব্যবহার করেছেন 'পরাকৃত, 'কবিশেখর, ব্যবহার করেছেন লৌকিক, সপ্তদশ শতকের কবি দৌলতকাজী 'দেশীভাষা' এবং অষ্টাদশ শতকের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কেবল ভাষা—"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।" 'বিবির্ধার্থ-সংগ্রহে' মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যবহার করেছেন বঙ্গভাষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাভাষা এবং দীনেশচন্দ্র সেন ব্যবহার করেছেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে।*

যাইহোক, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালি পণ্ডিত মুন্সিগণ বাংলা ভাষা বোঝাতে 'গৌড়ীয় ভাষা' ব্যবহার করতেন। রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (১৮৩৩) এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'বঙ্গভাষ' শব্দটির প্রয়োগ প্রথম দেখা যায় উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস' (১৮৪২)-এ—

"পারস্য হইতে এই ইতিহাস সার।
ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষে করিতে প্রচার।।"

প্রশ্ন :

১। ষোড়শ শতকের কবি মাধব আচার্য বাংলাভাষা অর্থে কি নাম ব্যবহার করেছেন?

২। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র ভাষা অর্থে কি বলেছেন ?

'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যবহার করেছেন 'বঙ্গভাষা'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-ব্যবহৃত 'বাঙ্গালা ভাষা', রামগতি ন্যায়-রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এবং দীনেশচন্দ্র সেন-রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতির ব্যবহার থেকে মনে হয়, ভাষাবৈচিত্র্যপ্রিয় বাঙালি মাতৃভাষার নাম ব্যবহারে নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত কোনো একটি শব্দের সীমানায় নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চান নি। তাই বাংলা ভাষা অর্থে ঊনবিংশ-বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যন্ত বঙ্গভাষা, বাঙ্গালা, বাঙলা, বাংলা প্রভৃতি শব্দ সমান্তরাল ভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে। আর বাংলা দেশের অধিবাসী বলতে 'বঙ্গবাসী' (তু. 'ও ভাই বঙ্গবাসি! আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!''—কবি ভাওয়াল গোবিন্দচন্দ্র দাস), বঙ্গালী, বাঙ্গালী, বাঙালী, বাঙালি প্রভৃতি শব্দ ও বানানের ব্যবহার আকছার দেখা যাচ্ছে। উপভাষা 'বাঙ্গালী'-র সঙ্গে অধিবাসী 'বঙ্গালী'-র অর্থগত পার্থক্য বর্তমানে একাকার হয়ে গেছে। ড. সুকুমার সেন এই অর্থ বিপর্যয় এড়াতে সুন্দর সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন—''অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়ার দিকেই দেখিতেছি যে বাঙ্গালা দেশের লোক বুঝাইতে 'বাঙ্গালী' শব্দ চলিয়া গিয়াছে। এখন একই শব্দ ''জাতি ও ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে অসুবিধা হয়, অথচ বাঙ্গালা (দেশের) ভাষা সমাস করিয়া লইলে কোনো অসুবিধা হয় না।'' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ, পৃ-৭) অতঃপর বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসকে চুম্বকরূপে ব্যবহার করলে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দাঁড়ায় এইরূপ—

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা বৈদিক ভাষা
(আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০-খ্রীঃপূঃ ৬০০ অব্দ)

↓ সংস্কৃত
(আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে)

↓ পালি
(আনুমানিক, খ্রীঃ পূঃ ৬০০-২০০ অব্দ)
পালি সাহিত্য, অশোক-যুগের শিলালেখ

↓

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা—প্রাকৃত

↓

প্রাকৃতাশ্রিত সাহিত্য
(আনুমানিক খ্রীঃ ২০০-খ্রীঃ ৬০০ অব্দ) এর কক্ষায়
পড়ে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও জৈন অর্ধমাগধী
প্রাকৃতে রচিত নাটক-নাটিকা।

↓

অপভ্রংশ (আনুমানিক খ্রীঃ ৬০০ খ্রীঃ ৯৫০ অব্দ)

↓

নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক
খ্রীঃ ৯৫০ অব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত)—এই
ভাষার নিদর্শন বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিল,
মগহী, ভোজপুরী, হিন্দি-লহন্দী-প্রভৃতি।

অঙ্কিত কথাচিত্র থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তির ধারাটি সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। এই ভাষার নিদর্শন 'বেদ' নামক মহদ্ গ্রন্থে সুলভ। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টাব্দের সেই প্রাচীন ভাষাকে অপরিহার্য বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে বৈয়াকরণ পাণিনি (আনুমানিক

খ্রীঃ পূঃ সপ্তম-চতুর্থ শতক) তার নাম দেন 'সংস্কৃত'। সংস্কারপূত ভাষা বলেই বৈদিক ভাষা একটি শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মার্জিত হয় সত্য কিন্তু ভাষাশিক্ষা ও ব্যবহারের কঠোর বিধি-বিধানের জন্য সে ভাষার গতি অনেক সময় মন্থর হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের শব্দসম্ভার, পদ গঠন ও বাক্যগঠনপ্রণালী, প্রকৃতি-প্রত্যয়, ণত্ব-ষত্ব বিধি, সন্ধি-সমাস প্রভৃতির প্রভূত প্রভাব বর্তমান। তাই সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার পশ্চাতে সংস্কৃতের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, সংস্কৃতের রূপান্তরে যেমন প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয় নি, তেমনি বাংলা ভাষারও না। বাংলার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত (পালিসহ) ভাষার রূপান্তর সূত্রে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার সহোদরা সদৃশ হলেও কোনো ভাবেই তার মাতৃস্থানীয়া নয়। তাই বাংলা ভাষার 'প্রকৃত জননী' কে তা নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রাকৃত ভাষার দরবারেই আর্জি পেশ করতে হবে।

> ***বাংলা ভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃতাশ্রিত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে 'পালি' প্রাচীনতম। অনেকগুলি প্রাকৃতের মধ্যে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী এবং পৈশাচী প্রাকৃত বিশিষ্ট। 'অপভ্রংশ' প্রাকৃতের অব্যবহিত পরবর্তীস্তরের প্রাচীনরূপ। অপভ্রংশ > অপভ্রষ্ট > অবহট্‌ঠ। 'অপভ্রংশ' ও 'অবহট্‌ঠ' শব্দের অর্থ এক হলেও ভাষাক্রমের দিক থেকে মধ্য ভারতীয় প্রাকৃতের রূপান্তরিত প্রাচীনতম স্তর 'অপভ্রংশ' আর তার তথাকথিত অর্বাচীন বা আধুনিক স্তর 'অপভ্রষ্ট' বা 'অবহট্‌ঠ'। অপভ্রংশ স্তরের পরবর্তী ভাষার নিদর্শন প্রাচীন বাংলা ভাষা।***

বস্তুত, বাংলা ভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা। বৈদিক যুগোত্তীর্ণ সংস্কৃতের সমকাল থেকেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই ভাষা। প্রাকৃতাশ্রিত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে 'পালি' প্রাচীনতম। 'Pali is the oldest form of Prakrit'—এমন দাবি করেন ভারততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Oldenberg। সংস্কৃত-পালি ও পরবর্তী প্রাকৃতের মিশ্রণে একটি উল্লেখযোগ্য 'মিশ্রভাষা' (Mixed or Hybrid Language) হ'ল 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' (Buddhist Sanskrit)। 'জাতক'-'অবদান' প্রভৃতি মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়-সৃষ্ট গ্রন্থগুলি এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

অনেকগুলি প্রাকৃতের মধ্যে শৌরসেনী (শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের প্রাকৃত), মহারাষ্ট্রী (মহারাষ্ট্র অঞ্চলের প্রাকৃত), মাগধী (মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত) এবং পৈশাচী (নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত প্রাকৃত বিশিষ্ট। হেমচন্দ্রের 'প্রাকৃত শব্দানুশাসন'—প্রাকৃত ভাষা-পরিচয়ের জন্য রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাংলা ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাগধীর উপশাখা জৈন অর্ধমাগধীর রূপান্তরে মাগধী 'অপভ্রংশ' > বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া-মৈথিল-ভোজপুরী প্রভৃতি প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রাচীন রূপ গড়ে উঠেছে।

'অপভ্রংশ' প্রাকৃতের অব্যবহিত পরবর্তীস্তরের প্রাচীন রূপ। অপভ্রংশ > অপভ্রষ্ট > অবহট্‌ঠ। 'অপভ্রংশ' ও 'অবহট্‌ঠ' শব্দের অর্থ এক হলেও ভাষাক্রমের দিক থেকে মধ্য ভারতীয় প্রাকৃতের রূপান্তরিত প্রাচীনতম স্তর 'অপভ্রংশ' আর তার তথাকথিত অর্বাচীন বা আধুনিক স্তর 'অপভ্রষ্ট' বা 'অবহট্‌ঠ'। বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' গ্রন্থদ্বয় অবহট্‌ঠ ভাষায় কেন রচনা করেছিলেন তার কারণ নির্দেশসূত্রে অবহট্‌ঠ ভাষার মিষ্টত্ব ও জনপ্রিয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন—

"সক্কয় বাণী বুহঅণ ভাবই।
পাউঅ রসকো মম্ম ণ পাবই।।
দেশিল বঅণা সব জনমিট্‌ঠা।
তেং তৈসন জম্পও অবহট্‌ঠা।।"

অপভ্রংশ স্তরের পরবর্তী ভাষার নিদর্শন প্রাচীন বাংলা ভাষা। চর্যাগীতিগুলি এই ভাষার আদি লক্ষণ বহন করছে। তাই 'চর্যাগীতিকোষ'ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ-নিদর্শন রূপে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষার জননী কে?

২। অপভ্রংশ স্তরের পরবর্তী ভাষার নিদর্শন কোন ভাষা?

১.১.২.৫ : বঙ্গলিপির উদ্ভবের ইতিহাস

প্রসঙ্গতঃ ভাষার লেখ্যরূপ যার দ্বারা পরিস্ফুট হয় সেই লিপির কথা জেনে নিতে হয়। ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার লিখিত রূপের মাধ্যম লিপি। সভ্য দুনিয়ার ভাষায় লিপির উদ্ভবের প্রাথমিক স্তরে ছিল 'গ্রন্থিলিপি' (Quipu), পরে ভাষা-লিপি (Ideogram) > চিত্রলিপি (Pictogram) > চিত্র-প্রতীকের (Hieroglyph) সহায়তায় শব্দলিপি (Phonograph) রচিত হয়। 'শব্দলিপি' থেকে সৃষ্ট হয় 'অক্ষরলিপি' (Syllabic Script) এবং অক্ষরলিপি থেকে 'ধ্বনিলিপি' (Alphabetic Script)। ধ্বনিলিপিতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ (Letter) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রোমকলিপি এই পর্যায়ে পড়ে। বাংলা ও অন্যান্য নব্যভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার লিপি অক্ষরলিপি (Syllabic Script)।

> ***ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার লিখিত রূপের মাধ্যম লিপি। সভ্য দুনিয়ার ভাষায় লিপির উদ্ভবের প্রাথমিক স্তরে ছিল 'গ্রন্থিলিপি'। 'শব্দলিপি' থেকে সৃষ্ট হয় 'অক্ষরলিপি' এবং অক্ষরলিপি থেকে 'ধ্বনিলিপি'। পৃথিবীতে প্রচলিত লিপিগুলি মোটামুটি পাঁচটি। সেগুলি হল-'সুমেরীয় লিপি', 'মিশরীয় লিপি' ফিনিসীয় লিপি, আরামীয় লিপি, 'চীনীয় লিপি, 'ভারতীয় লিপি'। বাংলা লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিটি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে। পরবর্তী লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ মহারাজা চন্দ্রবর্মার লিপি।***

পৃথিবীতে এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত লিপিগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি অথবা ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) 'সুমেরীয় লিপি'—ছয় হাজার বছরের প্রাচীন এই লিপি সুমের জাতি ব্যবহার করতেন। এই লিপির বিশেষত্ব এই যে এতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি ছিল অনেকটা তীরের ফলার মতো। এই জন্য এই লিপির অন্য নাম 'বাণমুখ লিপি' বা 'কীলকাক্ষর লিপি' (Cuneiform)। পারস্যের হখামনীয় লিপি অনুরূপ লিপির দৃষ্টান্ত।

(২) 'মিশরীয় লিপি'-প্রাচীন মিশরের পিরামিডগাত্রে এই লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এই লিপিতে চিত্রলিপি-ভাবলিপি ও ধ্বনিলিপির সমন্বয় ঘটেছে। লিপিটি বর্তমানে অপ্রচলিত।

(৩) 'ফিনিসীয় লিপি'-মূলতঃ মিশরীয় লিপির উন্নততর সংস্করণ এই লিপির বিকাশ ঘটে গ্রীকদের হাতে। ফিনিসীয় বণিকগণ ২২ টি বর্ণমালার সাহায্যে এই লিপি তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত সর্বপ্রকার লিপির পূর্বসূরিত্ব করেছে এই লিপি।

(৪) 'আরামীয় লিপি'-মিশরীয় লিপিরই আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা এই লিপি। অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত 'খরোষ্ঠী' লিপির উদ্ভব এই লিপি থেকে। এই লিপি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়। আরবী-ফারসী-হিব্রু প্রভৃতি তাম্রলিখনে এই লিপি ব্যবহৃত হয়।

(৫) 'চীনীয় লিপি'-মূলত চিত্রলিপি। এক একটি শব্দ বা ধ্বনির জন্য এক একটি অক্ষরের ব্যবহার চীনীয় ভাষার বিশেষত্ব। চীনীয় বা চীনা লিপিতে অক্ষর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এই ভাষায় চিত্রলিপি এখনো ধ্বনিলিপিতে উত্তীর্ণ হয়নি। অন্য দিকে একই লিপির অনুসরণ করলেও জাপানী ভাষায় চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপিতে উত্তরণ ঘটায় তাদের লিপিতে অক্ষরের সংখ্যা অবিশ্বাস্য ভাবে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাতচল্লিশে।

(৬) 'ভারতীয় লিপি'—বৈদিকসাহিত্যের লেখ্যরূপ কেমন ছিল জানা যায় না। পণ্ডিতগণ বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বৈদিক লিপির আবিষ্কারে ব্যর্থ হওয়ায় মনে হয়, সাহিত্যও সংস্কৃতিতে সমুন্নত হলেও আর্যজাতি লিপির ব্যবহার জানতেন না। মহামতি অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) ধর্মীয় অনুশাসন ও উপদেশাবলী-ক্ষোদিত শিলালিপিকেই প্রাচীন 'ভারতীয় লিপি' রূপে গ্রহণ করা হয়। অশোকের অনুশাসন মূলতঃ দুই প্রকার লিপির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল—**খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী**। খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে ততটা জনপ্রিয় হয় নি বরং সেই তুলনায় ভারতে ব্রাহ্মীলিপিরই প্রাধান্য ছিল। এই ব্রাহ্মীলিপি থেকে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্ম দেশ, তিব্বত, কোরিয়া, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) প্রভৃতি দেশের লিপির উদ্ভব ঘটেছে। আলোচিত লিপিবৃত্তের বাইরেও অনেক অপ্রচলিত ও পাঠোদ্ধারহীন লিপি রয়ে গেছে; যেমন ক্রীটদ্বীপে প্রাপ্ত 'মিনোয়ান লিপি', আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহৃত 'মায়ালিপি' ও 'আজতেকলিপি', সিন্ধুসভ্যতার যুগে ব্যবহৃত 'সিন্ধুলিপি' প্রভৃতি। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব না হওয়ায় সে যুগের ইতিহাস অনেকটা আনুমানিক স্তরেই রয়ে গেছে।

প্রশ্ন :

১। পৃথিবীতে প্রচলিত লিপিগুলি কয়প্রকার ও সেগুলির নাম কি?

বাংলা লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা দেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিটি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। লিপিটি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের অশোকের সমসাময়িক এবং প্রাকৃত ভাষায় লেখা। পরবর্তী লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ মহারাজা 'চন্দ্রবর্মার লিপি'। লিপিটি গুপ্তযুগের (খ্রীঃ ৪র্থ শতক) এবং এটিকে বাংলা দেশে বিষ্ণু-উপাসনার প্রথম নিদর্শন বলে মনে হয়। গুপ্ত যুগ থেকেই ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনসূত্রে খ্রীঃ সপ্তম-নবম শতকের অন্তর্বর্ত্তীকালে কুটিললিপির উদ্ভব ঘটে। পূর্বভারতে এই 'কুটিললিপি' 'সিদ্ধমাতৃকা' নামে এবং পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে যথাক্রমে 'নাগরলিপি' ও 'শারদা লিপি' নাম পরিচিত। কুটিললিপি জাত 'বঙ্গলিপির' প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে। লিপিটি 'পাললিপি' নামে সুপরিচিত। সেন-আমলে প্রচলিত মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের 'তর্পনদীঘি লিপি'গুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সকল লিপি ছিল মূলতঃ হস্তলিখিত ও খোদাই করা কেন না ইংরেজগণ এদেশে আসার আগে এদেশে সুষ্ঠু মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি এবং লিপিরও কোনো নির্দিষ্ট মান গড়ে ওঠেনি।

> ***বাংলায় মুদ্রিত লিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে ১৬৯২ সালে রচিত একটি পুঁথিতে। ১৮৭৮ খ্রীঃ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড এর বাংলা ব্যাকরণ— 'A Grammar of the Bengal Language'-ই ভারতবর্ষে বাংলা লিপিতে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। এইগ্রন্থে বাংলা অক্ষরের ছাঁদ তৈরী করেছিলেন হুগলীর প্রসিদ্ধ ঢালাই শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ও তার জামাতা মনোহর কর্মকার।***

বাংলায় মুদ্রিত লিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে ১৬৯২ সালে রচিত একটি পুঁথিতে। ১৭২৫ খ্রীঃ জার্মানীতে মুদ্রিত Urent Szeb নামক একটি গ্রন্থে বাংলা অক্ষরে কয়েকটি সংখ্যা এবং "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মার" (Sergeant Wolfgang Meyer) এই ব্যক্তি নামটি মুদ্রিত হতে দেখা যায়। যতদূর জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ - "A Grammar of the Bengal Language" ই ভারতবর্ষে বাংলা লিপিতে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরী করেছিলেন

হুগলীর প্রসিদ্ধ ঢালাইশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার। অতঃপর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে হুগলী কুঠির ইংরেজ লেখক চার্লস্ উইলকিন্‌সের সহযোগিতায় প্রাচীন বাংলা পুথির অক্ষরের সঙ্গে কালীকুমার রায় ও খুস্‌মত মুন্সী নামক হস্তলিপি বিশারদ দ্বয়ের হস্তাক্ষর মিলিয়ে সেই আদলে আদর্শ বাংলা অক্ষর তৈরী হয়। বর্তমানেও উইলকিনস্-নির্দেশিত অক্ষরের আদর্শ বাংলা মুদ্রণে চালু আছে; যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সেই লিপিরও খানিকটা সংস্কার হয়েছিল বলে কোনো কোনো বিদ্বজ্জন দাবি করেন।

প্রশ্ন :

১। বাংলায় মুদ্রিত লিপির প্রাচীন নির্দশন পাওয়া গেছে কত সালে?

২। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড এর বাংলা ব্যাকরণ এর নাম কি?

১.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ)—ড. সুকুমার সেন

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়)—ড. ভূদেব চৌধুরী

৫। বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

৬। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড)—গোপাল হালদার

৭। History of Bengal (Vol-I)—Dr. Susilkumar De

৮। History of Bengal (Vol-I)—Dr. Rameshchandra Datta

৯। Origin and Development of the Bengali Language (Vol-I)—Dr. Sunitikumar Chatterjee

১০। ভাষার ইতিবৃত্ত—ড. সুকুমার সেন।

১১। বাংলা ভাষা—শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—ড. সুকুমার সেন

১৩। বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)—ড. নীহাররঞ্জন রায়।

১.১.২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা দেশকে প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল? কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে সেই নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ অর্থে তা ব্যাখ্যা করো।

২. বাঙ্গালী জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করো।

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করো।

৪. বঙ্গলিপির উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করো।

৫. বাঙালী রচিত ব্যাকরণ বিস্তৃত পরিচয় দাও।

৬. সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করো ঃ

ব্রহ্মাবর্ত, বোধায়ন ধর্মসূত্র, রাঢ়দেশ ও রাঢ়ী ভাষা, সুহ্মদেশ, বরেন্দ্র, বঙ্গালী ভাষা, গৌড় ও গৌড়ী ভাষা, প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা, মিশরীয় ও চীনীয় লিপি, ভারতীয় লিপি প্রভৃতি।

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-৩

চর্যাগীতি

বিন্যাস ক্রম

১.১.৩.১ ভূমিকা
১.১.৩.২ আবিষ্কর্তা ও আবিষ্কার কাল
১.১.৩.৩ গ্রন্থনাম ও অনুবাদ
১.১.৩.৪ চর্যাগীতি ও প্রাদেশিকতা
১.১.৩.৫ মুনিদত্তের টীকা সংস্কৃতে কেন ?
১.১.৩.৬ সন্ধ্যাভাষা
১.১.৩.৭ চর্যার রচনা কাল
১.১.৩.৮ চর্যার ধর্মদর্শন
১.১.৩.৮.১ হীনযান ও মহাযান
১.১.৩.৯ চর্যার পদকর্তা ও পদসংখ্যা
১.১.৩.১০ চর্যার সমাজচিত্র
১.১.৩.১১ চর্যার সাহিত্যমূল্য
১.১.৩.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলী
১.১.৩.১৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.১.৩.১ : ভূমিকা

বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থটির নাম চর্যাপদ। গ্রন্থটির মূলনাম অজ্ঞাত তবে চর্যার টীকাকার মুনিদত্তের টীকা বা ভাষ্যরচনা থেকে পাওয়া অনুমিত শিরোনাম যথাক্রমে 'চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ও 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। আসল নাম যাই হোক, বাংলায় তা 'চর্যাপদ' কিম্বা 'চর্যাগীতি'-এই দুটি নামেই প্রচলিত। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, রচিত 'চর্যাপদ' ও ড. সুকুমার সেন-রচিত 'চর্যাগীতি' এর প্রমাণ।

১.১.৩.২ : আবিষ্কর্তা ও আবিষ্কারকাল

চর্যাগীতির আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য), আবিষ্কার কাল ১৯০৭ এবং প্রকাশ কাল ১৯১৬। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুযোগ্য উত্তরসূরি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন পুঁথিপত্রের সন্ধানে বেশ কয়েকবার নেপালে গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার নেপালে গিয়ে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর রাজগ্রন্থালয়ে বেশ কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান। ঐ সকল পুঁথির মধ্যে মাত্র ৪টি পুঁথিকে (চর্যাগীতিকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, সরহবজ্রের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব) প্রাচীন বাংলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ১৯১৬ সালে সেগুলিকে একত্র করে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" এই শিরোনামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মহাশয় ৪টি পুঁথিকেই বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে মনে করলেও পরবর্তী কালের ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নানান তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেণ যে কেবল মাত্র 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থটির ভাষাই বাংলা, অন্য তিনটি গ্রন্থের ভাষা বাংলা নয়, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ (১৯২৬) । স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরও একই ধারণা। তদবধি 'চর্যাগীতিকোষ' প্রাচীনতম বাংলায় রচিত আদি গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) চর্যাপদের পুঁথির সন্ধান পান। 'চর্যাগীতি কোষ', কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ', সরহবজ্রের 'দোহাকোষ' ও 'ডার্কাণব' পুঁথিকে একত্র করে ১৯১৬ সালে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা' এই শিরোনামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

১.১.৩.৩ : গ্রন্থনাম ও অনুবাদ

নেপাল রাজদরবারে প্রাপ্ত সংকলিত গ্রন্থটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। গ্রন্থের আবিষ্কর্তা শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।' 'চর্যাগীতি কোষ' গ্রন্থটি মূলতঃ টীকা বা ভাষ্য রচনা - কেন্দ্রিক ব্যাখ্যামূলক একখানি পুঁথি হলেও তাতে টীকা রচনার পাশাপাশি মূল চর্যাগুলিও উদ্ধৃত হয়েছিল। কিন্তু পুঁথিটির শেষের কয়েকটি পাতা ছেঁড়া ছিল বলে খণ্ডিত সেই পুঁথির টীকাকারের নাম সংকলকের জানা ছিল না। পুঁথিতে সাড়ে তিনটি পদের (২৩, ২৪, ২৫ ও ২৮) মূল চর্যা ও তাদের টীকাংশ নেই, সম্ভবতঃ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুনিদত্তের টীকানুসারে 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামে 'চর্যাগীতিকোষ'-এর অন্য একটি নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গবেষণাসূত্রে চর্যাগীতিকোষ-এর তিব্বতী টীকার সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তৎসম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ তখনো তাঁর হাতে আসে নি। পরে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের সমগ্ররূপ আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন ১৯৩৮ সালে। গ্রন্থটির প্রকাশে সহায়তা করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যাইহোক চর্যার তিব্বতী অনুবাদ থেকে জানা গেল, অনুবাদকের নাম মুনিদত্ত। কিন্তু তৎকৃত টীকার যে সংকলন 'চর্যাগীতিকোষে' পাওয়া যায়, পণ্ডিত গণের বিচারে তা একটি কোনো মূল পুঁথির অনুলেখন নয়। দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে অনুলেখক মূল ও টীকার অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেনের অনুমান। (দ্র. চর্যাগীতি-পদাবলী-'মূলের সন্ধানে') সুতরাং 'চর্যাগীতি কোষ-এর মূল আদর্শ পুঁথিটির প্রথম সংকলক কে

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থের নাম কি?

২। চর্যাপদ কে, কোথা থেকে, কত সালে আবিষ্কার করেন?

বা সেটি কোথায় রক্ষিত আছে বা আদৌ আছে কিনা প্রভৃতি সংশয় নিরসনের কোনো উপায় আজও আমাদের হাতে নেই।

তবে 'চর্যাগীতিকোষ' শ্রেণীর গ্রন্থ যে প্রাচীন ভারতে দুর্লভ ছিল না তা চর্যাগীতিকোষের তিব্বতী অনুবাদের আবিষ্কারেই প্রমাণ হয়ে গেল। আবিষ্কর্তা প্রবোধচন্দ্র বাগচি তথ্যসহযোগে জানিয়েছেন যে 'কল্যাণমিত্র পণ্ডিতবর্গ 'চর্যাগীতিকোষ' নামে সিদ্ধ বজ্রগীতের একশত সংকলন' করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগীতিকোষে পূর্ব কথিত চর্যাগীতির এবং প্রাচীন চর্যারচয়িতাদের নামের কিছু কিছু মিল থাকলেও তা যে স্বতন্ত্র রচনা তাতে সন্দেহ নেই। তিব্বতী অনুবাদ-অনুসারে মুনিদত্ত মোট পঞ্চাশটি চর্যার টীকা রচনা করেন।

চর্যাপদের আবিষ্কর্তা শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থটির নতুন নামকরণ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। পুঁথিতে সাড়ে তিনটি পদের (২৩,২৪,২৫,২৮ চর্যা ও তাদের টীকাংশ নেই সম্ভবতঃ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চর্যার তিব্বতী অনুবাদকের নাম মুনি দত্ত। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে মুনি দত্ত মোট পঞ্চাশটি চর্যার টীকা রচনা করেন। 'চর্যাগীতিকোষ' শ্রেণীর গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে দুর্লভ ছিল না, তা চর্যাগীতিকোষের তিব্বতী অনুবাদের আবিষ্কারেই প্রমাণ হয়ে যায়।

১.১.৩.৪ : চর্যাগীতি ও প্রাদেশিকতা

'চর্যাগীতিকোষ' আবিষ্কারের পর ভারতের আর্যভাষাভাষী বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতবর্গ গ্রন্থটিকে নিজের নিজের প্রাদেশিক ভাষায় (মাতৃভাষায়?) রচিত গ্রন্থের নিদর্শন বলে দাবি করতে থাকেন। দাবিদারগণের অনেকের দাবির পশ্চাতে প্রামাণ্য যৌক্তিকতা নেই। যে সকল প্রদেশের ভাষার দাবি আংশিক হলেও কিছুটা গ্রাহ্য তাদের মধ্যে গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, অসমিয়া ও ওড়িয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল ভাষায় ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের পরিচয় চর্যাগীতির ভাষায় পাওয়া যায়। এর কারণ, প্রাকৃতের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা ভারতীয় ভাষাগুলি তখন সবেমাত্র অপভ্রংশ > অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক রূপ গ্রহণ করছে। তখনও তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য স্ফুটোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। তাই প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক ভাষাগুলির বাক্য গঠনে ও পদবিন্যাসে কিছু মিশ্রভাব বর্তমান। কিন্তু বাইরের এই আটপৌরে ভাষাগঠন প্রক্রিয়ায় মূল ভাষার অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় নেই। সেই বিচারে চর্যাগুলি নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের (বৃহত্তর বঙ্গের) পটভূমিকায় রচিত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'Origin and Development of the Bengali Language (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৯২৬)-এর চর্যাগীতি সম্পর্কিত আলোচনায় চর্যার ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার এবং গ্রন্থটিকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের একমাত্র নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেন। প্রাচীন বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনচর্যা, আচার-ব্যবহার, বাগ্‌ধারা, সংস্কার প্রভৃতির উল্লেখ করে এবং

'চর্যাপদ'গুলি বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of the Bengali Language'-এ চর্যার ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলাভাষার একমাত্র নিদর্শন রূপে গ্রহণ করেন। প্রাচীন বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনচর্যা, আচার-ব্যবহার, বাগ্‌ধারা সংস্কার প্রভৃতির উল্লেখ 'চর্যাপদে' আছে।

প্রশ্ন :

১। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদকের নাম কি?

পর্যাপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উদ্ধার করে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তদবধি আজ পর্যন্ত 'চর্যাগীতিকোষ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়ে আসছে। তবে চর্যাগীতিগুলি অবশ্যই তদানীন্তন আসাম ও উড়িষ্যাসহ বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ দুই প্রদেশের কিছু কিছু ভাষালক্ষণ চর্যায় আছে এবং সেইজন্য একই ভাষাসম্ভব বলে ঐ দুই প্রদেশের দাবি খানিকটা মেনে নিতে আপত্তি নেই। সামগ্রিকভাবে চর্যা গানগুলি শ্যামজন্মদে এই বঙ্গভূমিরই সম্পদ।

১.১.৩.৫ : মুনিদত্তের টীকা সংস্কৃতে কেন?

চর্যার টীকা রচয়িতা মুনিদত্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গের অনেকেই সেকালে প্রচলিত জনপ্রিয় মিশ্রভাষা বৌদ্ধ সংস্কৃতে (Buddhist Hybrid Sanskrit) সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধসংস্কৃত শুদ্ধ সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ভাষা। এই ভাষা ছেড়ে মুনিদত্ত সংস্কৃতে টীকা রচনা করলেন কেন? বিষয়টি অনুমান সাপেক্ষ। মনে হয়, বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ যে মিশ্রভাষায় গ্রন্থরচনাতে উৎসাহ বোধ করতেন তার মূলে ছিল আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁদের একপ্রকার বিদ্বেষ বা দ্রোহভাব। বস্তুতঃ তাঁরা সাফল্যও পেয়েছিলেন প্রভূত পরিমাণে। তৎসত্ত্বেও মুনিদত্ত যে সে পথে হাঁটেন নি তার আনুমানিক কারণ—(ক) দেবভাষা সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা (খ) সংস্কৃত ভাষার প্রসাদগুণ (গ) সংস্কৃত ভাষার মাধমে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে বৌদ্ধ সন্তদের উপলব্ধিজনিত আবেদনসৃষ্টি। অবশ্য মুনিদত্ত যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ভাষ্য উপস্থিত করেছিলেন তা আদ্যন্ত শুদ্ধ সংস্কৃত (Classical Sanskrit) ছিল না। তা ছিল ব্যাকরণ দোষদুষ্ট এবং অনেকাংশে অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ।

১.১.৩.৬ : সন্ধ্যা ভাষা

চর্যার ভাষা দুবোর্ধ্য ও সাংকেতিক। আলো-অন্ধকারের মধ্যবর্তী অস্পষ্ট, হেয়ালিপূর্ণ ভাষায় সেগুলি রচিত বলে সেই ভাষাকে টীকাকার 'সন্ধ্যাভাষা' আখ্যা দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যা ভাষয়া প্রকটিতুমাহ', 'সন্ধ্যাবচনেন...বোদ্ধব্যং', 'চিত্তগজেন্দ্র সন্ধ্যয়া তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি' ইত্যাদি বলে। এই ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য—"সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যাভাষায় লেখা। সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" (বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধ, পৃ-৮) ড. সুকুমার সেন শাস্ত্রীজীর অনুমানকে সঠিক বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে সন্ধ্যা শব্দটি আসলে সম্‌ধা অর্থাৎ সম্ $\sqrt{\ }$ ধ্যৈ- -ধাতু নিষ্পন্ন যার অর্থ সম্যকরূপে অনুধাবন। অতএব সন্ধ্যাভাষা = সম্‌ধা ভাষা—সম্যক ধ্যানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির ভাষা।

প্রশ্ন :

১। 'চর্যাপদ'গুলি কি জাতীয় রচনা?

২। 'চর্যাপদ'গুলি কোন ছন্দে লেখা হয়েছিল?

১.১.৩.৭ : চর্যার রচনা কাল

চর্যার রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। গ্রন্থটির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রন্থের ব্যাখাতা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ চর্যাগীতি গুলিকে সাধারণ ভাবে দশম ও দ্বাদশ শতকের অন্তবর্তীকালের রচনা বলে মনে করেন। অন্যদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যারচনার কাল সীমাকে আরও প্রাচীন ধরে নিয়ে চর্যাগীতিগুলিকে অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালের রচনা বলে মনে করেন। অবশ্য চর্যাগীতির অনুলেখনের কালসীমা সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য অন্যরকম। তিনি অনুলেখনের শৈলীতে পঞ্চদশ শতকের লেখন পদ্ধতির মিল খুঁজে পেয়েছেন কোনো কোনো চর্যার অনুলেখনে।

> *'চর্যাপদে'র ভাষা দুর্বোধ্য ও সাংকেতিক। আলো অন্ধকারের মধ্যবর্তী অস্পষ্ট হেয়ালিপূর্ণ ভাষায় সেগুলি রচিত। গ্রন্থটির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রন্থের ব্যাখাতা ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ চর্যাগীতিগুলিকে দশম ও দ্বাদশ শতকের রচনা বলে মনে করেন।*

১.১.৩.৮ : চর্যার ধর্ম-দর্শন

চর্যাগীতিগুলিতে যে ধর্ম ও দর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে তা সাধারণভাবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সহজিয়া ধর্ম-দর্শন নামে খ্যাত। সহজিয়া দর্শনের উৎপত্তির মূলে বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়ের বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় গৃহীত ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিত বিশ্বাস বর্তমান। ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম-দর্শন সাধারণ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূল কথা অহিংসা, সদাচার, সর্বজীবে প্রেম, সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আত্মোন্নতি এবং দুঃখবিনাশের দ্বারা পুনর্জন্মকেন্দ্রিত 'ভবচক্র' থেকে নির্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তি। ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ-সংকলিত হয়ে 'ত্রিপিটক' নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক উপলব্ধির আকর গ্রন্থ এই ত্রিপিটক। হিন্দুদের কাছে যেমন 'বেদ', বৌদ্ধদের কাছে তেমনি 'ত্রিপিটক'। গ্রন্থখানি তিনটি পিটকে অর্থাৎ পর্বে বা ভাগে সম্পূর্ণ। পর্বগুলি যথাক্রমে 'সূত্তপিটক', 'বিনয়পিটক' ও 'অভিধম্মপিটক'। 'ত্রিপিটক' বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর সংকলিত হয়।

১.১.৩.৮.১ : হীনযান ও মহাযান

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৭ অব্দ) অল্পকাল পরেই তাঁর ধর্মকেন্দ্রিত বিশ্বাস, উপাসনা-পদ্ধতি, পালনীয় আচার-বিচার, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নিয়ে শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। সেই বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ ধর্মানুরাগিবৃন্দ সমবেত হয়ে চারটি ধর্মমহাসভা বা 'মহাসঙ্গীতি' আহ্বান করেন। প্রথম সঙ্গীতি উদ্‌যাপিত হয় রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীরে), দ্বিতীয়টি প্রায় শতবর্ষ পরে বৈশালীতে, তৃতীয়টি পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনায়) এবং চতুর্থ বা সর্বশেষ ধর্মসঙ্গীতিটি কুশান সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দ) পুরুষপুরে (বর্তমান পেশাওয়ারে)। শেষ ধর্মসঙ্গীতির সময়েই বৌদ্ধগণ 'হীনযান' ও 'মহাযান'—এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন :

১। 'সন্ধ্যাভাষা' কি?

২। চর্যাপদের রচনাকাল কোন সময়ে?

অবিভক্ত বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মশরণ ও নির্বাণ বা মোক্ষ। ভগবান বুদ্ধ গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জরা-শোক-তাপহীন 'মুক্তপুরুষ' হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আত্মমুক্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকে ত্যাগ করে নিজের চেষ্টার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—"মা খলু পরাবকাশং স্বয়ং যতধবং সদা প্রযত্নেন।" (ললিতবিস্তর) বৌদ্ধধর্ম-শাসনে দুটি পদ বিশেষ মূল্যবান-ক) আর্যসত্য ও খ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্যসত্য চারটি হ'ল ঃ দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের বিনাশ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হ'ল যথাক্রমে সম্যক বাক্য, সম্যক সংকল্প, সম্যক আচরণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জীবন, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যে-কোনো ব্যক্তিমানব চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালনের মধ্য দিয়ে দুঃখময় মিথ্যাজীবন তথা জগৎপ্রপঞ্চ থেকে মুক্তি পেতে পারে বলে বৌদ্ধগণ মনে করেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালে আত্মশরণ বা আত্মমুক্তির জন্য বহু অর্হৎ বা বহু বুদ্ধের উপাসনাপ্রথা চালু ছিল না। তাঁর তিরোধানের পরে কুশান সম্রাট কনিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'হীনযান' ও 'মহাযান'-এ বিভক্ত হয়ে পড়ার পর ঐ প্রথা চালু হয়। মহাযানী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটান তাতে হিন্দুধর্মানুগ গুরুবাদে বিশ্বাস, জন্মান্তরবাদ, বহু অর্হৎ ও বহু বুদ্ধের উপাসনা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা অঙ্গীভূত হয়। অন্যদিকে হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় খানিকটা প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল হয়ে পড়ায় একমাত্র 'ত্রিপিটকে'র অনুশাসন মেনে চলতে থাকেন এবং মূল বুদ্ধ বাণীকে পালি ভাষায় 'ধম্মপদং' নামে সংকলন করেন।

হীনযানীদের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মমুক্তি বা আত্মনির্বাণ। ব্যক্তির নিজের মুক্তি ভাবনার সঙ্গে বিশ্বমানবের মুক্তির (তু. 'আত্মনস্তমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।-স্বামী বিবেকানন্দ) মতো উদার কল্যাণচিন্তাকে তাঁরা আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে নি। অর্থাৎ তাঁরা যেন অনেকটা ব্যক্তিমুক্তির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অবস্থান করতেন। তাঁরা মনে করতেন, মুমুক্ষু ব্যক্তিসাধক মাত্রেই অর্হৎ বা পূজনীয়। এই অর্হৎ সত্তা যেন একটি ক্ষুদ্র যান যাতে আশ্রয় নিয়ে একজন মাত্র আরোহী দুঃখময় ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। "সকল ভোগবাসনা ত্যাগ করো, সংযতেন্দ্রিয় হও, বুদ্ধের ধর্মনীতি ও বাণীর যথাযথ অনুসরণ করো এবং চেতনার বিলোপসাধনের দ্বারা নির্বাণ লাভ করে অর্হৎ বা পূজনীয় হও। অন্যের সাহায্য বা করুণার প্রত্যাশী না হয়ে নিজেই নিজের মুক্তির কারণ হও, নিজেকে আলো দেখাও—'আত্মদীপো ভব'—এই ছিল তাঁদের অনুভব।" (অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (১ম সং)-ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, পৃ-৫)

এরূপ ক্ষেত্রে মহাযান যেন সত্যই একটি মহা যান—যেন একটি বৃহৎ-মহৎ পোত যাতে আরোহণ করে ব্যক্তিসাধক মুমুক্ষু সহযাত্রীসহ দুঃখময় সংসার-সাগর পাড়ি দিতে পারে। এই জন্য আপাত বৈচিত্র্যহীন হীনযান সাধনার ক্ষুদ্রমার্গ বা নিম্নমার্গরূপে, আর 'মহাযান' মহান মার্গ বা উচ্চমার্গরূপে চিহ্নিত হয়েছে। ঈশ্বর, আত্মা, পুনর্জন্ম, কর্মফলবাদ প্রভৃতি হিন্দুধর্মস্বীকৃত বিষয়গুলির অস্তিত্ব মহাযানীরা স্বীকার করে নিলেন। নিজের দুঃখ মোচনের চেয়ে বিশ্বের নরনারীর দুঃখমুক্তির বৃহত্তর-মহত্তর আদর্শকে তাঁরা গ্রহণ করলেন; হীনযানীদের আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ দুর্গ থেকে ধর্মকে মুক্তি দিলেন। শুধু আত্মমুক্তি নয়, বিশ্বজনের দুঃখমুক্তি বা কল্যাণ সাধনই হয়ে দাঁড়াল মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য, আদর্শ।

দার্শনিক প্রত্যয়ের দিক থেকেও দুই সম্প্রদায়ের উপলব্ধিগত স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। হীনযানিগণ জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না। তাঁরা হলেন 'সর্বাস্তিবাদী' অর্থাৎ জড়জগৎ ও

মনোজগতের স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সত্তার অন্তিম উপাদান হ'ল ধর্ম। চিন্তা ও অনুভূতি মানব শরীরের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বলে এদের পৃথক সত্তা আছে। কিন্তু শাশ্বত চেতনসত্তা বলে কিছু নেই। 'আত্মা' বলে যাকে আমরা অনুভব করি তা আসলে পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার একটা ধারা বা প্রবাহ। এ প্রসঙ্গে ভারতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত Maurice Winternitz-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"Ancient Buddhist had explained the origin of suffering or the discords of existence by the Paticca samuppada, i,e, the formula in which it is shown that all the elements of being originate only in mutual interdependence"—A History of Indian Literature (Vol-II, 1998 reprint. P-222)

হীনযান প্রাচীনগ্রন্থী স্থবিরদের মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের সেই জন্য 'থেরবাদী' নামে চিহ্নিত করা হয়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দর্শন -সম্প্রদায় হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হীনযান ও মহাযান ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযান ধর্মমতের প্রাধান্য দেখা যায়।

যাইহোক মহাযান ধর্মসম্প্রদায়ও কালক্রমে পরিবর্তনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। তাই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে সেই ধর্ম থেকে 'মন্ত্রযান', 'বজ্রযান', 'সহজযান', 'কালচক্রযান' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। হীনযানী - সম্প্রদায়ের বুদ্ধনির্দেশিত পথে নির্বাণসাধনা মূলতঃ নাগার্জুন - প্রবর্তিত 'শূন্যবাদ' নামক দর্শনের আশ্রয়ে অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে বিলীন হওয়ার সাধনা। মহাযানীদের উদ্দেশ্য 'শূন্যতা' ও 'করুণা'র সমন্বয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব অর্জন। মন্ত্রযানের মূল প্রতিপাদ্য মন্ত্রসাধন ⁎ ধারণা ⁎ বীজ। এঁরা হীনযান ও মহাযান স্বীকৃত শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, যোগাচারবাদ কিম্বা মাধ্যমিকবাদের দুর্জ্ঞেয় অরণ্যে প্রবেশ করতে চান নি। মন্ত্রযানও পরিবর্তনের ধারায় পরিণত হ'ল বজ্রযানে যার তিনটি মূল প্রতিপাদ্য শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখের বোধ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গুরুবাদ, বিভিন্ন দেব দেবী ও তাঁদের ধ্যান। বজ্রযানীদের সাধনপদ্ধতি বজ্রের ন্যায় কঠোর, দৃঢ় ও গুহ্য। সেইজন্যই বোধ করি বজ্রের ন্যায় কঠোরতাদ্যোতক নাম সম্প্রদায়টির।

> *চর্যাগীতিগুলি সাধারণভাবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সহজিয়া ধর্ম-দর্শন নামে খ্যাত। ভারতের বৌদ্ধ ধর্মানুরাগিবৃন্দ চারটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করেন। শেষ ধর্ম সঙ্গীতের সময়েই বৌদ্ধগণ 'হীনযান' ও 'মহাযান'-এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান। হীনযানীদের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মমুক্তি বা আত্মনির্বাণ। মহাযান যেন একটি বৃহৎ-মহৎ পোত যাতে আরোহণ করে ব্যক্তিসাধক মুমুক্ষু সহযাত্রীসহ দুঃখময়-সাগর পাড়ি, দিতে পারে। 'হীনযান' সাধনার ক্ষুদ্রমার্গ বা নিম্নমার্গরূপে আর 'মহাযান' মহান মার্গ বা উচ্চমার্গরূপে চিহ্নিত হয়েছে।*

বজ্রযানের কঠিন-কঠোর আচার, জপ-তপের বাঁধন ছিঁড়ে, দেবদেবীদের মোহমুগ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম নেয় 'সহজযান' মতবাদ। এই ধর্মের সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল, সর্বপ্রকার দেব-দেবী ও আচার-অনুষ্ঠানাদি বাহুল্যবর্জিত মহা অনুরাগের পদ্ধতি। এই ধর্ম সংসারকে একেবারে অস্বীকার না করে সহজ-স্বাভাবিক জীবনছন্দের মধ্যে এই দেহভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বোধ জাগ্রত করে। দেহের মধ্যেই সব, দেহের মধ্যেই পুরুষ ও প্রকৃতি যুগবনদ্ধরূপে অবস্থান করছে। 'শূন্যতা'র অন্য নাম প্রকৃতি এবং 'করুণা' হ'ল পুরুষ। বুদ্ধ বা পরমজ্ঞানের অবস্থান

প্রশ্ন :

১। অবিভক্ত বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য কি ছিল?
২। বৌদ্ধ সম্প্রদায় যে দুটি দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের নাম কি?

এই দেহে। শূন্যতা ও করুণার অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনজনিত সামরস্যের অনুভূতি পরমানন্দময় মহাসুখ। বোধিচিত্তের এই মহাসুখতন্ময়তার উপলব্ধিই হ'ল সহজ বা সহজানন্দের উপলব্ধি। চর্যার সাধনা সহজ সাধনা। সহজানন্দের উপলব্ধিই তার মূল কথা। তবে সব চর্যাগুলিতেই সহজানী সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি অনুশীলিত হয়েছে এমন বলা যাবে না। কোনো কোনো চর্যায় শূন্যবাদ, যোগাচার বা মাধ্যমিকবাদের পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নয়।

বজ্রযানেরই অন্য একটি ধারা 'কালচক্রযান' নামে চিহ্নিত। এই মতে যা শূন্যতা তাই কালচক্র। অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে অনাদি কাল থেকে প্রবাহিত স্রোতোধারায় আবর্তিত হচ্ছে মানব সংসার। এই প্রবহমান স্রোতোধারাই কালচক্র। ভগবান বুদ্ধও এই কালচক্রেরই সৃষ্টি এবং তিনিও কালচক্রের অধীন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যও হ'ল তাই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-বিড়ম্বিত কালচক্রের অমোঘ পরম্পরাকে স্তব্ধ করে দিয়ে ব্যক্তি-আত্মার মুক্তি। হঠযোগ সাধনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাকালচক্রকে নিরস্ত করে অজর-অমর আনন্দময় বোধিচিত্তের অধিকারলাভ সম্ভব বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

১.১.৩.৯ : চর্যার পদকর্তা ও পদসংখ্যা

চর্যাগীতিতে লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি নামোপাধিযুক্ত ২৪ জন পদকর্তার ৫১ টি পদ সংকলিত হয়েছিল। তার মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটিপদ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। চর্যাগীতিতে সংকলিত পদগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্নপাদ (পদসংখ্যা-১০টি) তারপরে ভুসুকুপাদ (পদসংখ্যা-৮) এবং সরহ বা সরহপাদ (পদ সংখ্যা-৪), বাকিপদ-কর্তাগণের কেউ তিনটি কেউ দুটি এবং কেউ একটি করে পদ রচনা করেন।

১.১.৩.১০ : চর্যার সমাজচিত্র

চর্যাগীতিগুলির বেশির ভাগই রচিত হয়েছে বাংলা দেশ ও বাঙালি-জীবনের পটভূমিকায়। ফলে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালিজীবনের নানা অনুষঙ্গ এসেছে চর্যার গানে। অবশ্য সেখানে বাস্তব জীবনের ছবিগুলি অধ্যাত্মসংগীতে এক একটা আবরণ বা রূপকের ছদ্মবেশ নিয়ে ধরা পড়েছে। ফলে দৈনন্দিন জীবনের রূপ সেখানে রূপক অথবা সাংকেতিক অর্থদ্যোতক হয়ে উঠেছে। তৎসত্ত্বেও সেকালের নর-নারীর সুখ-দুঃখকেন্দ্রিত জীবনচর্যা তাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, হাস্য-পরিহাস, বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক-অবস্থান, দাম্পত্য জীবনের প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ-বিরাগ, সংশয়, বিশ্বাস, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি খুটিনাটির বর্ণনায় আভাষে-ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক দলিল রূপে 'চর্যাগীতি'গুলিকে গ্রহণ করা যায়।

> *'চর্যাগীতি'তে লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি নামোপাধিযুক্ত ২৪ জন পদকর্তার ৫১ টি পদ সংকলিত হয়েছে। তারমধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। চর্যাগীতিগুলির বেশির ভাগই রচিত বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের পটভূমিকায়। ফলে প্রাচীনবাংলা ও বাঙ্গালী জীবনের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক দলিল রূপে 'চর্যাগীতি' গুলিকে গ্রহণ করা যায়।*

১.১.৩.১১ : চর্যার সাহিত্য মূল্য

সাধারণভাবে চর্যার অধ্যাত্ম সংগীতগুলি পারমার্থিক ও দার্শনিক ছাঁচে ঢালা হলেও সেগুলি মানবজীবনের বিচিত্র ও গূঢ় অনুভব, নিসর্গপ্রকৃতির মনোরম আবহ, ধ্বনিঝংকার-সমৃদ্ধ ছন্দোময়ী বাণী ও প্রসাদগুণযুক্ত ভাষার সমবায়ে প্রাচীন কবিদের আত্মপ্রকাশের জগৎটিকে চিরকালের পাঠক পাঠিকাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কাব্যের মূল কথাটি যদি হয় 'বাক্যং রসাত্মকম্' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য, তাহলে নিঃসন্দেহে তা চর্যাগীতিতে আছে যা সেকালের সঙ্গে একালের মানবীয় অভিব্যক্তিকে একসূত্রে যোগ করে দিয়েছে। সেই সহিতত্ত্বের বন্ধনেই চর্যাগীতিগুলির সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও সফলতা।

১.১.৩.১২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। চর্যাগীতির আবিষ্কর্তা, আবিষ্কারকালও গ্রন্থনাম সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতি গ্রন্থের গুরুত্ব নির্দেশ করো।

৩। চর্যাগীতি ও প্রাদেশিকতা সম্পর্কে অলোচনা করো।

৪। চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্মের স্বরূপ আলোচনা করো।

৫। চর্যাগীতিগুলিতে প্রতিফলিত বাঙালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও।

৬। চর্যাগীতিগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করো।

১.১.৩.১৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (২য় সংস্করণ)—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ)—ড. সুকুমার সেন

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়)—ড. ভূদেব চৌধুরী

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-৪

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

বিন্যাসক্রম

১.১.৪.১ ভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক গুরুত্ব
১.১.৪.২ আবিষ্কার কাল ও আবিষ্কারক
১.১.৪.৩ গ্রন্থনাম
১.১.৪.৪ বিষয় সংক্ষেপ
১.১.৪.৫ সমাজ চিত্র
১.১.৪.৬ নাট্য-গীতি কাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
১.১.৪.৭ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রবাদের ব্যবহার
১.১.৪.৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রকৃতি
১.১.৪.৯ চরিত্রচিত্রণ
১.১.৪.৯.১ রাধাচরিত্র
১.১.৪.৯.২ কৃষ্ণচরিত্র
১.১.৪.৯.৩ বড়ায়ি চরিত্র
১.১.৪.১০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ ভাষাপরিচয়
১.১.৪.১১ সহায়ক গ্রন্থ
১.১.৪.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.৪.১ : ভূমিকা : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এই একটি মাত্র গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রকাশের পর নিস্তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যে পরিমাণ আলোড়ন উঠেছিল, যে ধরণের বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদির সূত্রপাত হয়েছিল তার ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধারণার মূলে আঘাত করেছিল এ কাব্যের আবিষ্কার। বাংলাসাহিত্যে পদাবলীর চণ্ডীদাসের একচ্ছত্র আধিপত্য খণ্ডিত হয়েছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের ফলে।

১.১.৪.২ : আবিষ্কার কাল ও আবিষ্কারক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কার করেন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। তিনি বিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথিটি খুঁজে পান। পুঁথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। কিন্তু কাব্যটির সঠিক রচনাকাল এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত পুঁথিটি খণ্ডিত ও আদ্যন্তহীন। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, প্রাপ্ত পুঁথিটির রচনাকাল ১৭৮৩ সাল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে ১৪০০-১৪৫০ এর ধারে কাছের বলে মানতে রাজী নন। তবে মূল কাব্য পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আবিষ্কার কাল ১৩১৬ বঙ্গাব্দ। প্রকাশকাল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। বিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি খুজে পান। কাব্যটির ভনিতায় কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস, পুঁথির সঙ্গে কাগজের টুকরো থেকে পাওয়া 'শ্রীকৃষ্ণসর্ন্দভ' এই শব্দটিও লেখা ছিল। এ দেখেই বসন্ত রঞ্জন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি স্থির করেন।

১.১.৪.৩ : গ্রন্থনাম

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নামকরণ নিয়েও বিতর্ক আছে। প্রচলিত নামটি কাব্যের পুঁথি-আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের দেওয়া। কাব্যটির ভণিতায় কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি পাওয়া গেলেও কোথাও কাব্যনাম পাওয়া যায় নি। পুঁথির সঙ্গে একটি কাগজের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ - এই শব্দটি লেখা ছিল। এ দেখেই বসন্তরঞ্জন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি স্থির করেন। এখন পর্যন্ত এই নামটিই প্রচলিত ও গৃহীত।

১.১.৪.৪ : বিষয় সংক্ষেপ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য। গ্রন্থটি ১৩টি অংশে বিভক্ত — জন্মখণ্ড, তাম্মুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

জন্মখণ্ডে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের পৌরাণিক ভূমিকা রচিত হয়েছে। কংসের অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে নারায়ণ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর 'কাহ্নায়ির সম্ভোগ কারণে' সাগর গোয়ালার ঘরে রাধার

প্রশ্ন :

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথি কে, কোথা থেকে, কত সালে উদ্ধার করেন?
২। কাব্যটির প্রকাশকাল কত?
৩। কাব্যটির ভনিতায় আর কি নাম পাওয়া যায়?

জন্ম। তাম্বুলখণ্ড থেকে কাহিনী এক ভিন্ন পথে গমন করেছে। খসে গেছে পৌরাণিক আবেদন। এই খণ্ডে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপকথা শুনে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গলাভের আকাঙক্ষায় বড়ায়ির হাতে ফুলপান দিয়ে দূতীরূপে তাকে রাধার কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই রাধাকে রাজী করাতে পারেনি। বড়ায়িকে শেষ পর্যন্ত রাধার হাতে চড় খেতে হয়েছে।

দানখণ্ডে কৃষ্ণ মথুরার পথে দানী সেজে রাধার রূপযৌবন দাবী করেছে এবং অপরিণত বালিকা রাধার অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে। নৌকাখণ্ডে পারাণি সেজে কৌশলে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মিলিত হয়েছে কৃষ্ণ। ভারখণ্ডে রাধা যৌবনপ্রাপ্তা। তাই এখন রাধা কৃষ্ণকে ভারী সেজে মথুরার হাটে পসরা নিয়ে যেতে বলেছে। বিনিময়ে সে দিয়েছে কৃষ্ণকে দেহদান করার প্রতিশ্রুতি। ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার ছত্রধারণ করেছে। বৃন্দাবনখণ্ডে নানান কৌশলে রাধা বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কালিয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। যমুনাখণ্ডে জলকেলি ও গোপীদের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করেছে এবং রুষ্টা রাধা কৃষ্ণজননী যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে মদনবাণে বিদ্ধ করেছে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলনে বাণখণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য। গ্রন্থটি ১৩টি অংশে বিভক্ত। জন্মখন্ড, দানখন্ড, বৃন্দাবনখন্ড, রাধাবিরহ ইত্যাদি। জন্মখন্ডে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের পৌরাণিক ভূমিকা রচিত হয়েছে। তাম্বুলখন্ড থেকে কাহিনী এক ভিন্ন পথে গমন করেছে। দানখন্ডে কৃষ্ণ, মথুরার পথে দানী সেজে রাধার রূপ যৌবন দাবী করেছে। বংশীখন্ড ও রাধা বিরহতে একটু ভিন্নসুর বেজেছে কাহিনীতে।

বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহতে একটু ভিন্ন সুর বেজেছে কাহিনীতে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ অপূর্ব এক বংশী নির্মাণ করে। সেই বাঁশির শব্দে রাধার প্রাণ-মন আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কৃষ্ণ আর রাধাকে ধরা দেয় না। অবশেষে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে। বহু অনুনয় বিনয়, বাদানুবাদের পর কৃষ্ণ তার বাঁশি ফেরৎ পায়। বিরহখণ্ডে রাধার হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। রাধার বিরহের তীব্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এখানে। বহু অন্বেষণে রাধা কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মিলনতৃপ্তা অবসন্না রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। জেগে ওঠে রাধার হৃদয়ে আবার বিরহের অনির্বাণ দাহ। এই বেদনার মধ্য দিয়েই খণ্ডিত পুঁথির কাব্যকথা শেষ হয়েছে।

১.১.৪.৫ : সমাজচিত্র

সাহিত্য মূলতঃ সামাজিক চৈতন্যের প্রকাশ। যদিও সাহিত্যে সমাজচেতনার প্রকাশ খোঁজা আধুনিক কালের ব্যাপার, তথাপি লৌকিক ও সামাজিক জীবনকে অবলম্বন করেই জীবনের অনিবার্য ছায়াপাত সাহিত্যেকে গতিশীল ও সত্যমুখীন করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের দৃষ্টিকোণের অন্তরালে সমাজ, রাষ্ট্র ও ইতিহাস চেতনা যেভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত - সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যের ধারা বাদে আর কোনা

প্রশ্ন :

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কি বিষয়ক কাব্য?
২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র তিনটি মূল চরিত্রের নাম কর?
৩। গ্রন্থটি কয়টি খন্ডে বিভক্ত? খন্ডগুলির নাম কি কি?

কাব্যশাখাতেই তার পরিচয় নিরঙ্কুশ নয়। আমাদের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ক্ষেত্রে ঠিক এই জাতীয় সমাজ চেতনার সর্বাঙ্গীন পরিচয় অনুপস্থিত। বরং বলা যায়, এই কাব্যে কতকগুলি বহির্মুখীন চিত্র-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের একটি সম্ভাব্য ছবি ধরা পড়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে তীব্র জীবন পিপাসার মাদকতা না থাকলেও তা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চেতনাকে পরাজিত করেছে। লৌকিক জীবনের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণ-রাধার রসরঙ্গ, স্থূলরুচি, গ্রাম্যতার অকপট প্রকাশ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক দুর্লভ বাস্তববোধ ও সাহসিকতার পরিচায়ক। নাটগীতিমূলক এই আখ্যায়িকাতে লৌকিক জীবনের সমাজচিত্র বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। যদিও তা সমাজচৈতন্যের ঐতিহাসিক ভিত্তিতে হয়ত দৃঢ়বদ্ধ নয়। তবুও এর মধ্যে আমরা পাব বিশেষ যুগের বিশেষ সময়ের, বিশেষ প্রয়োজনের স্মারকচিহ্নসমূহ। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের মত আলোচ্য কাব্যে লোকায়ত দেহাভিচারকেই একটি বিশেষ সমাজমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। একটি সংহত সমাজ ও তার দেশ-কালের বিন্যাস এই কাব্যে আছে। মানবসমাজ ও সংস্কৃতির আটপৌরে দিক নিয়ে সাধারণ মানুষের বৃত্তিনির্ভর জনজীবনের যে বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সমাজ-শ্রেণী রূপের সংহতিসম্পন্ন পারস্পরিক মিলনতীর্থ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কুমার, তেলী, নাপিত, বৈদ্য, আচার্য, সগুণী, বাণিজার, ঝালিয়া, গারুড়ী, বাদিয়া, কাণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতি-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনচর্চার দৈনন্দিন দিক থেকেও কবি বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন—

> *সাহিত্য মূলতঃ সামাজিক চৈতন্যের প্রকাশ। বড়ুচণ্ডীদাস একটি সংহত সমাজ ও তার দেশ কালের বিন্যাসকে এই কাব্যে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কুমার, তেলী প্রভৃতি নানাজাতি ও সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের মুখে যে সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে তৎকালীন সমাজের শিথিলতর যৌনজীবনের ওপর কটাক্ষ লক্ষ্যণীয়। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময়, বিশেষ পশু বা প্রাণী দর্শনে শুভ-অশুভ বিষয়টির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।*

আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী।।
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে।।
ফুলে জড়ি বান্ধি কেশ পাশে।
পরিধান কর নেত বাসে।। (রাধাবিরহ, ১৭)

সে যুগেও তেলী কাঁধে করগুক নিয়ে তেল বিক্রি করতে যেত —

"কান্ধে করুআ ল আঁ তেলী আগে জাত্র।।"

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সোনা, হীরা, মণি, মুক্তা ইত্যাদি রত্নের উল্লেখ-প্রাচুর্য সাধারণ লোকেরও সচ্ছল অবস্থার পরিচয়বহ। কবি গোয়ালিনী রাধাকেও নানান অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করে তুলেছেন। প্রসাধন বর্ণনাও বড়ু বাদ দেননি। কৃষ্ণের দেহও 'চন্দনে চর্চিত', বস্ত্রের পরিমাপ — 'হের যোল হাথ মোর পাটোল।' এই কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের মুখে যে সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং উভয়ের যে চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে তৎকালীন সমাজের শিথিলতর যৌনজীবনের ওপর কটাক্ষ লক্ষ্যণীয়। রাধার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেনতেন প্রকারেণ

কৃষ্ণের কামাবেগের চরিতার্থতা এবং বৃদ্ধা বড়াই-এর অবৈধ সম্ভোগের দূতীয়ালি তৎকালীন অমার্জিত আভীরপল্লীর লোকায়ত সমাজজীবনেরই চিত্রণ। এছাড়া সমকালীন লোকাচার ও লোকবিশ্বাস-এর পরিচয়ও পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। যেমন —

কেশ পাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর।। (তাম্বুলখণ্ড)

যাত্রাকালে বিশেষ পশু বা প্রাণী দর্শনে শুভ-অশুভ বিষয়টির ব্যবহার দেখা যায়। যাত্রার সময়ে হাঁচি, টিকটিকির ডাক, হোঁচট খাওয়া ইত্যাদি অশুভ বলে বিশ্বাস ছিল। আবার সবৎসা ধেনুদর্শন, পূর্ণকলস দর্শন প্রভৃতি যাত্রার পক্ষে শুভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন —

"কোন অশুভখনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।" (বংশীখণ্ড)

আবার —

"কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাত্র।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাত্র।।"

ভাদ্র মাসের চতুর্থীকে নষ্টচন্দ্র বলা হয়। বড়ু চণ্ডীদাস উল্লেখ করেছেন —

"ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।
জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।।" (ঐ)

অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় লোকে কি কি করত তার উল্লেখ আছে বৃন্দাবন খণ্ডে, —

'কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুক্ষর পুণ্য সিনান।।"

এ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বাঙালির ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধ তৎকালীন সমাজ জীবনের খণ্ড খণ্ড উপস্থাপনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

১.১.৪.৬ : নাট্য-গীতিকাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৩টি অংশে বিভক্ত। জন্মখণ্ডে পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী রাধা-কৃষ্ণের জন্মকাহিনী এবং তাম্বুল খণ্ডে কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। এইভাবে কাহিনী বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে রাধা বিরহ অংশে সমাপ্ত হয়েছে। আমরা যাকে নাটক বলে জানি, সেই আধুনিক নাটকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং সংস্কৃত নাটক এবং পরবর্তী কালের যাত্রা ও পাঁচালীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকটা মিল পাওয়া সম্ভব। কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষের

প্রশ্ন :

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' দুটি সামাজিক রীতি-নীতির উদাহরণ দাও।
২। কাব্যটিতে বিভিন্ন জাতির যে উল্লেখ আছে, তাদের নাম কি কি?

মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত-অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বেশ কিছু পদও পাওয়া গেছে এই গ্রন্থে।

নাটকে সাধারণতঃ একটা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে বর্ণিত কাহিনীর চরিত্রগুলিকে তাদের ভেতরের বৈশিষ্ট্য সমেত যথাযথভাবে রূপায়িত করতে হয়। কাহিনীর মধ্যে একদিকে থাকে চরিত্র-পাত্রের ক্রিয়া, অন্যদিকে ঘটনার আকস্মিকতা। নাটকে অঙ্ক বিভাজন বা দৃশ্য থাকে এবং নায়ক-নায়িকার চরিত্র যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কয়েকটি পার্শ্ব বা অপ্রধান চরিত্র সৃজন করেন। বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কখনও উত্তেজনা, কখনও কৌতূহল, কখনও বা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেন। নাট্যকার থাকেন নিরপেক্ষ ও পর্দার আড়ালে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বর্ণনার তুলনায় না টকীয় ঘটনার সমাহার অনেক বেশি। তাই একে বর্ণনামূলক কাব্য বলা যায় না। কাব্যের প্রত্যেকটি খণ্ডকে এক একটি অঙ্ক বা দৃশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। নাটকের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যেমন — কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত — এ-সবই আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পাই।

নাটকে অঙ্ক বিভাজন বা দৃশ্য থাকে এবং নায়ক-নায়িকার চরিত্র যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কয়েকটি পার্শ্ব বা অপ্রধান চরিত্র সৃজন করেন। কাব্যের প্রতিটি খন্ডকে এক-একটি অঙ্ক বা দৃশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কাহিনী, চরিত্র সৃষ্টি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-এ সবই আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে লক্ষ্য করি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সংলাপের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। নানা-ঘাত প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটকীয় উৎকর্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হলেও একে নাট্য গীতিকাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সংলাপ নাটকের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এই সংলাপের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। রাধা-কৃষ্ণ-বড়াইর উক্তি ও প্রতিউক্তির মাধ্যমে কাহিনী নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। তাছাড়া প্রধান চরিত্র রাধার ক্রমপরিণতি বড়ু চণ্ডীদাসকে অবশ্যই নাট্যকারের সম্মান দেবে। কাব্যে নারদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হলেও সুচিত্রিত। দ্বন্দ্ব বা নাটকীয় বেগ সঞ্চর করার জন্য বড়ু প্রথমে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ করে এঁকেছেন এবং ধীরে ধীরে একাধিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে কৃষ্ণ অনুরাগী করে তুলেছেন। রাধাকৃষ্ণের সংলাপে কিভাবে নাট্যধর্ম অনুসৃত হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত হ'ল —

রাধা।। ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী।।
কৃষ্ণ।। তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্নু সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী।।

সুতরাং নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটকীয় উৎকর্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ কাব্যেকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ মাত্র তিনটি চরিত্র, ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল বিন্যাস, সংলাপের পুনরুক্তি, এবং লেখকের স্বগতোক্তি নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে। মূলতঃ যমুনাখণ্ড পর্যন্তই ঘটনার নাটকোচিত গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধার হৃদয়ের আর্তি গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা যখন বলেন —

"কেনা বাঁশী বাত্র বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা।।"

তখন তার মধ্যে লিরিকের স্পর্শ অনুভব করা যায়। কিন্তু এটাও যথার্থ গীতিকবিতা নয়। কারণ কবির ব্যক্তিমানস রাধা-কৃষ্ণকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে, তার উর্ধে ্ব উঠতে পারে নি। রাধাবিরহের গীতিধর্ম আত্মভাবগত নয়। এ কাব্য গঠনের দিক থেকে নাট্যিক এবং ভাবগত দিক থেকে গীতিকাব্যিক। এছাড়া কাব্যের প্রথমাংশে ঝুমুর গান-এর প্রভাবও লক্ষণীয়। তাই একে বিশুদ্ধ নাটক বা বিশুদ্ধ গীতিকাব্য বলা যাবে না। বরং একে নাট্য-গীতিকাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

১.১.৪.৭ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রবাদের ব্যবহার

প্রবাদ হ'ল প্রকৃষ্ট বচন। সুদীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতা প্রবাদের ভিত্তি। আর তার প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ও তির্যক। এই তির্যকতা সরসতার জন্ম দেয়। প্রবাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের গভীর আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্যে প্রবাদের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একাব্য প্রবাদের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডাররূপেই গণ্য হবে। আখ্যান-বিন্যাসে, চরিত্রের বিকাশে এবং পরিস্থিতি চিত্রণে এ কাব্যের প্রবাদসমূহ যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন :

১। কাব্যটিতে নাট্যধর্ম লক্ষ্য করা যায় কি?

২। কাব্যটিকে নাট্য-গীতিকাব্য বলা যায় কি?

দৃষ্টান্ত সহযোগে এ কাব্যে প্রবাদের প্রয়োগ - তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তাম্বুল খণ্ডের ১৯ সংখ্যক পদের প্রবাদে বড়ায়ির প্রশস্তি আছে — 'যেথানে শুঁচী না জাত্র। তথাঁ বাটিআ বহাত্র।'' দানখণ্ডের ৫ সংখ্যক পদে রাধার আক্ষেপোক্তি প্রবাদ-আশ্রয়ে প্রকাশিত — ''ললাট লিখন খণ্ডন না জাত্র।'' রাধার রূপমুগ্ধ কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল অবজ্ঞা প্রকাশ পায় দানখণ্ডে — ''জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বুল।'' অর্থাৎ জ্বরগ্রস্তের যেমন অম্লেরুচি। 'জ্বরো রোগীর যেমন অম্বলে রুচী' — এই প্রবাদটি উল্লেখিত প্রবাদের উৎস। চর্যাপদে আছে 'আপণা মা ংসেঁ হরিণা বৈরী।' বড়ুও লেখেন - 'নিজ মাঁসে জগতের বৈরী।' কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে ব্যাকুল রাধা বলে —

> ''বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
> মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।'' (বংশীখণ্ড)

'বন পোড়ে সবাই দেখে, আমার মন পোড়ে কেউ দেখে না।' — এই প্রবাদটিই রাধার উক্তির উৎস। আরও কয়েকটি প্রবাদ হ'ল ঃ

১। মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।

২। বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্রীক সত্বর করে।

৩। কান্ধে কুরুআ লআঁ তৈলী আগে জাত্র।
সুখান ডালত বসি কাক কাড়ে রাত্র।

৪। কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।

এভাবেই দেখা যাবে, বড়ু চণ্ডীদাস বহুমাত্রিক ব্যবহারে প্রবাদকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বেশি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে রাধার উক্তিতে। বড়ুর রাধা বাঙালি কন্যা। তাই তার কণ্ঠে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রবাদ সমূহের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে প্রবাদ এ কাব্যের স্বাদ-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে।

১.১.৪.৮ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রকৃতি

কাব্য যে জীবনের সন্ধান করে, তার দুটি ভাগ— মানবজীবন ও প্রকৃতিজীবন। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন কবি মানুষকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করেন। সেখানে প্রকৃতি সহায়ক উপাদান। আবার কোনো কবি প্রকৃতির জীবন-সন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষকে দেখেন, সেখানে প্রকৃতিই উন্মোচনের মাধ্যম। প্রাচীন কবিরা প্রকৃতিকে প্রায়শঃ পটভূমিরূপে উপস্থাপিত করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম দিকে ঘটনার বিবরণ থাকলেও কাব্যটি মূলতঃ সংলাপ নির্ভর। এই শ্রেণীর কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার স্থান সংকুচিত, কারণ এখানে ন্যারেটিভ বর্ণনার স্থান কম। দীর্ঘ ও বিস্তৃত প্রকৃতি বর্ণনা বা ঘটনার প্রেক্ষিত রচনার ক্ষেত্রেও প্রকৃতির ব্যবহার এখানে নেই।

তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব সেখানে মানবিক অনুভূতির আবেগে প্রকৃতিবর্ণনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বংশীখণ্ডে 'সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাত্র।' — অংশের প্রাকৃতিক অবস্থাকে বংশীধ্বনি শুনে রাধার হৃদয় প্রজ্জ্বলনের কারকরূপে উত্থাপন করা হয়েছে। কিম্বা 'রাধাবিরহ' অংশে বিরহকালে রাধার অবস্থা বর্ণনায় ঃ "মুকুলিল আম্ব সহারে। / মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে। / ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাত্র।" তবে একথা ঠিক যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রকৃতির কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই। প্রকৃতি এখানে যেটুকু আছে তাকে বড়জোর উপাদান হিসেবে দেখা যেতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রে একে বলে বিভাব। প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্গত নানা উপাদান বা উপকরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — অশোক, আম্ব, অর্জুন, কদম, নইকুল, গঙ্গা, কদম্ব, কেতকী, যূথী, কাঞ্চন, কদলী, আকাশ, আশ্বিন, আষাঢ়, শ্রাবণ, ইত্যাদি। আরো আছে, সব এখানে উল্লেখিত হল না।

> *কাব্যে মানবজীবন ও প্রকৃতিজীবন লক্ষ্য করা যায়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন কবি মানুষকে, কোন কবি প্রকৃতিকে সহায়ক উপাদান হিসেবে ভাবেন। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' মানসিক অনুভূতির আবেগে প্রকৃতি বর্ণনা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে।*

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কবি প্রকৃতি বিষয়ক উপাদান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একধরণের বস্তুনিষ্ঠ মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। যখন তিনি 'কনকচম্পক' বা 'কনকযূথী' লেখেন তখনো বিশেষণ প্রয়োগ করে তাকে অতিরিক্ত কোনো মাত্রা দেওয়া যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে এ কাব্যে লোকজীবনের বাস্তবতার প্রতি কবির মনোযোগ নানাভাবে দেখা যায়। এমনকি প্রকৃতিও এখানে সেই একই প্রেমে বন্দী। প্রকৃতিকে এর বেশি জায়গা কবি দিতে চাননি বা পারেননি।

১.১.৪.৯.১ : রাধা চরিত্র

আগেই আমরা বলেছি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ভাব বৃন্দাবনের রাধা নয় — এ রাধা একেবারেই লৌকিক। রাধাই এ কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই কাব্যকাহিনী বিবর্তনলাভ করেছে। সাগর গোয়ালার কন্যা এবং মাতার নাম পদুমা। কবি জন্মখণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন এই ভাবে —

প্রশ্ন :

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা কর?

"তীন ভুবন জন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী।।
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভূত কনক পুতুলী।।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই রাধা রক্তমাংসের মানবী। কবি এই বালিকা নারীকে যেমন দেখেছেন, ঠিক তেমনটি করেই এঁকেছেন। তার মুখের ভাষাটুকু পর্যন্ত তাঁর নিজের।

মাত্র এগারো বছরেই রাধা আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাম্বুলখণ্ডে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাধাকে পাবার জন্য। কৃষ্ণ বড়ায়ির হাতে ফুল ও পান পাঠায়। কিন্তু রাধা ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যে সামাজিক বন্ধনে তিনি আবদ্ধ তাকে অস্বীকার করবার রুচি তাঁর ছিল না। তাই ক্রুদ্ধ সর্পিণীর ন্যায় গর্জন করে রাধা বলেন - "আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম। / ছুঁইলেঁ খাইলেঁ মরী।" স্বামী, সংসার এবং বংশ মর্যাদার প্রতি ছিল রাধার আত্যন্তিক অনুরাগ ও সম্ভ্রম। কিন্তু দানখণ্ডে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে কৃষ্ণের কাছে। নৌকাখণ্ডে দ্বিতীয়বার দেহদানের মধ্যে মনের কোন যোগ ছিল না। তবে আগের ঘৃণার ভাব অনেকটাই এই অংশে প্রশমিত। ছত্র ও বৃন্দাবন খণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ স্পষ্ট হয়েছে। কালীয়দমন খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিতা। যে রাধা আগে কৃষ্ণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, তিনিই এখন কৃষ্ণের জন্য উদ্বিগ্না। বংশখণ্ডে রাধার পূর্বরাগ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে সমাজ - সংস্কার, অন্যদিকে কৃষ্ণের বংশীধবনি - এ দুয়ের সংঘাতে রাধার মন উদ্‌ভ্রান্ত। পদাবলীর রাধার মতোই তিনি এখন আত্মবিস্মৃতা, পাগলপারা। বাঁশীর শব্দে তাঁর চিত্তে বিরহ জেগে ওঠে —

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' রাধা 'ভাব বৃন্দাবনের রাধা নয়। এই রাধা রক্তমাংসের মানবী। একদিকে সমাজ সংস্কার, অন্যদিকে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি এ দুয়ের সংঘাতে রাধার মন উদ্‌ভ্রান্ত। আর বিরহখন্ডে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী রাধার আর্তনাদ করুণ ও মর্মস্পর্শী। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম এখন তাঁর চিত্তে ভরপুর। বড়ুর রাধা জীবনময়ী এবং সেটাই বড়ুর কৃতিত্ব।

"বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নু গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বে আপিল বিষে।।"

আর বিরহখণ্ডে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী রাধার আর্তনাদ করুণ ও মর্মস্পর্শী। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম এখন তাঁর চিত্তে ভরপুর। রাধার কাছে এখন —

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।।"

তাঁর মর্মভেদী জ্বালা সুদীর্ঘ বিরহ অংশের মধ্যে নানা সুরে ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। —

" দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী।।"

কৃষ্ণবিরহে তাঁর ব্যাকুল আর্তি ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে।।"

তামুল খণ্ড থেকে আরম্ভ করে বিরহখণ্ডে এসে রাধার জীবনচর্চা সমাপ্ত হয়েছে। একদিন যে বালিকা দুচোখে আগুন নিয়ে অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, সেই প্রেমের জন্যই আজ তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ভরে বেদনার ভরা বর্ষা। এই দুই স্বতন্ত্র প্রান্তকে অসামান্য দক্ষতায় যুক্ত করেছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস। এই প্রেক্ষিতেই রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ। রাধার চরিত্র নির্মাণে বড়ু চণ্ডীদাস যে কবিকৌশল অবলম্বন করেছেন তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী। গোটা কাব্যটি লিরিক, ড্রামা ও ন্যারেটিভের বিচিত্র সমন্বয়। একজন জীবন্ত মানুষের চরিত্রাঙ্কন সার্থক হয়েছে ঐ তিন পন্থা অবলম্বনে। বড়ুর রাধা মানবী, দেবী নয়। পদাবলীর রাধা বড়ুর রাধাবিরহের রাধার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু যে ভাব পদাবলীর রাধার ঐশ্বর্য, সে ভাব বড়ুর রাধার নেই। বড়ুর রাধা জীবনময়ী। এবং সেটাই বড়ুর কৃতিত্ব। বিরহেও তাই রাধার মধ্যে আছে ভোগ-বিরতি জনিত হতাশা। 'এ ধন যৌবন' — পদটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই ভোগলিপ্সা মানবীসুলভ। একে বড়ু মুছে ফেলতে পারেননি বলেই তিনি একজন জীবনপ্রেমিক সার্থক কবি। আর রাধা তাঁর সৃষ্ট এক সার্থক প্রাকৃত নায়িকা। জীবন্ত রক্তমাংসের মানবী চরিত্র গীতগোবিন্দসৃষ্ট রাধার উত্তরাধিকার রূপে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম পাওয়া গেল। বড়ুর রাধা চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা বোধ করি এখানেই।

প্রশ্ন :

১। রাধার মাতার নাম কি?

২। বড়ুর রাধাকে জীবন্ত রক্তমাংসের মানবী বলার কারণ কি?

১.১.৪.৯.২ : কৃষ্ণ চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণের পটে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হলেও এই চরিত্রে লৌকিকভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। জন্মখণ্ডে বলা হয়েছে, "কংসের কারণে হত্র সৃষ্টির বিনাস।" সেই কংসের অত্যাচার থেকে জনগনকে রক্ষা করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একটি গোটা পদে কবি কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। এহেন কৃষ্ণ তাম্বুলখণ্ডে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে কামনায় কাতর হয়েছেন। বড়ায়িকে পাঠিয়েছেন দূতীরূপে রাধার কাছে। দানখণ্ডে তিনি অনিচ্ছুক রাধার অঞ্চল ধরেছেন। প্রান্তরে একাকিনী রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই আচরণ ক্ষমা করা যায় না। রাধা কৃষ্ণকে কংসের ভয় দেখালে কৃষ্ণ বলেছেন - "তোর কংসে মোর কিছু করিতে না পারে।" এরপর তিনি বলেছেন, রাধা তার প্রস্তাবে রাজী না হলে "বলে ধরি তোকে তবে দিবোঁ আলিঙ্গ ন।" এ কৃষ্ণ অবতার পুরুষ নন, এ এক উদ্ধত, জেদী, হৃদয়হীন, নারীদেহলোলুপ গ্রাম্য বর্বর অসংস্কৃত যুবক।

> *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণচরিত্রে লৌকিক-ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। দানখণ্ডে তিনি অনিচ্ছুক রাধার অঞ্চল ধরেছেন। রাধা তার প্রস্তাবে রাজী না হলে 'বলে ধরি তোকে দিবোঁ আলিঙ্গন'। এ কৃষ্ণ অবতার পুরুষ নন, হৃদয়হীন, নারীদেহ-লোলুপ গ্রাম্য বর্বর অসংস্কৃত যুবক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কৃষ্ণ তাই শিল্পীর হাতে আঁকা জীবন্ত মানুষ।*

প্রশ্ন :

১। কংসের অত্যাচার থেকে জগৎবাসীকে কে উদ্ধার করেন?

২। রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করেছিল, কোন খন্ডে?

পৌরাণিক পটে কবি কৃষ্ণকে স্থাপন করলেও গোটা কাব্যে কৃষ্ণ তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন, রাধা তাঁর রাণী। অন্যদিকে রাধা আত্মবিস্মৃতা, দানখণ্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত নিজের ঐশী শক্তি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সে সচেতনতা অনেকটাই আরোপিত। কৃষ্ণ এ কাব্যে গ্রাম্য গোঁয়ার যুবক রূপেই উজ্জ্বল। তাঁর প্রেম দেহকামনানির্ভর। রাধার দেহসম্ভোগ করে নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া কৃষ্ণের অন্য কোনো চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। বৃন্দাবনখণ্ড, বাণখণ্ড ইত্যাদিতে কৃষ্ণের গ্রামীণ স্থূলতা বিদ্যমান। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ যখন বলেন — ‘‘আহ্মার জীবন রহে তোমার জীবনে’ তখন মুহূর্তে স্থূলতা, গ্রাম্যতা সরিয়ে কৃষ্ণের যথার্থ প্রেমিক সত্তার উন্মোচন ঘটে। আবার বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করলে কৃষ্ণ প্রথমে কেঁদেছেন, পরে অনুনয় বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং শেষে অশালীন হয়ে বলেছেন —‘‘নটকী গোআলী ছিনারী পামরী সত্য ভাষ নাহি তোরে।’’

অনুরূপ দৃষ্টান্ত থেকে কৃষ্ণের ঐশী সত্তার কথা ভুলে গিয়ে আমরা যদি তাকে মধ্যযুগের গ্রাম বাংলার এক অমার্জিত যুবক বলে গ্রহণ করি তাহলে চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করা হয়। আবার ভালো করে দেখলে কৃষ্ণের আচরণে স্বৈরাচারও লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ঔচিত্যকে কৃষ্ণ মানতে রাজী নন। তিনি নিজের ইচ্ছেমত রাধাকে গ্রহণ করেন অথবা পরিত্যাগ করেন। তিনি বলেন —

‘‘সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে।।’’

তবে কৃষ্ণ চরিত্রের অজস্র অসামঞ্জস্যের কথা মনে রেখেও বলা যায়, গোটা কাব্যে কৃষ্ণ রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্যই তাঁর ঐশী মহিমা প্রচার করেছেন। আবার সেই নারীর মনকে তুষ্ট করবার জন্য ভারবহন ও ছত্রধারণ করেছেন। আসলে কৃষ্ণ চরিত্র নির্মাণে বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে লোকায়ত জীবন-প্রবণতাকেই বড় স্থান দিয়েছেন। তাই বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ তাঁর অজস্র উৎকট অসঙ্গতি নিয়েও শিল্পীর হাতে আঁকা জীবন্ত মানুষ।

১.১.৪.৯.৩ : বড়ায়ি চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম একটি চরিত্র বড়ায়ি। কবি বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিকতার নিদর্শন এই চরিত্রটি। কাব্যে বৃদ্ধা বড়ায়ি রাধার তত্ত্বাবধানের জন্য আনীত। তার চুল শ্বেত চামরের মত, ভ্রুযুগল যেন চুনের রেখা, চোখ কোটরে ঢোকা। ঠোঁট ঝুলে গেছে, চলতে গেলে কাশি হয় — ‘‘বিকট দন্ত কপট বাণী। / ওঠ আধর উঠক জিণী।।/ কাঠী সম বাহু যুগলে। / নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।। / কুটিল গমন ঘন কাশে। / ‘চরিত্রটি কামশাস্ত্রোক্ত দূতীর আদর্শে আঁকা হলেও তার প্রখর বুদ্ধি ও চাতুর্য আমাদের চমৎকৃত করে। সেই রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে তৎপর। তাম্বুল থেকে বাণখণ্ড পর্যন্ত বড়ায়ি কৃষ্ণের পক্ষ নিয়েছে। রাধার হাতে চড় খেয়েও নিরস্ত হয়নি। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে কৃষ্ণকে প্ররোচিত করেছে। বাণখণ্ডে বড়ায়ির পরামর্শেই কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পবাণে বিদ্ধ করেছে।

> *বৃদ্ধা বড়ায়ির চুল শ্বেত চামরের মত, ভ্রূযুগল যেন চুলের রেখা, চোখ কোটরে ঢোকা। ঠোঁট গুলে গেছে, চলতে গেলে কাশি হয়- চরিত্রটি কামশাস্ত্রোক্ত দূতীর আর্দর্শে আঁকা হলেও তার প্রখর বুদ্ধি ও চাতুর্য আমাদের চমৎকৃত করে। রাধা কৃষ্ণের অবৈধ মিলনের কারিগর বড়ায়ির দৌত্যকার্য সমাজ স্বীকৃত না হলেও বড়ুচণ্ডীদাস এই চরিত্র নির্মানে প্রশংসনীয় চার্তুয ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।*

এরপর থেকেই বড়ায়ি চরিত্রে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। বংশী ও বিরহ অংশে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বড়ায়ির শরণাপন্ন। তার পরামর্শেই রাধা বাঁশী চুরি করেছে। রাধার প্রতি গততৃষ্ণ কৃষ্ণকে বড়ায়ি তিরস্কার করে বলেছে—

"ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুনি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।।"

যাইহোক, রাধা-কৃষ্ণের অবৈধ মিলনের কারিগর বড়ায়ির দৌত্যকার্য সমাজ স্বীকৃত না হলেও বড়ু চণ্ডীদাস এই চরিত্র নির্মাণে প্রসংশনীয় চাতুর্য ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ কাব্য যে নাট্যরসের জন্য সমধিক প্রসংশনীয় তার মূলে আছে বড়ায়ির ভূমিকা। এদিক থেকেও কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের ন্যায় বড়ায়িও অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্রশ্ন :

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' রাধা কৃষ্ণের দূতীর নাম কি?

২। তামুল খন্ড থেকে বানখন্ড পর্যন্ত দূতীটি? কার পক্ষ নিয়েছে।

১.১.৪.১০ : ভাষা পরিচয়

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বিশেষত্বগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সুলভ। আদি বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার গ্রন্থখানি। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১.১.৪.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন

২। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ - ১৩৭২)

৩। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা - ১৩২৩) — মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৪। Origin and Development of the Bengali Language (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা - ১৯২৬) — Dr. Sunitikumar Chatterjee.

৫। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (২য় সং) — ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৬। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতসাহিত্য — বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত (২য় সং) — ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ) — ড. সুকুমার সেন।

৮। Buddhist Mystic Songs, Dacca University studies, Dacca — Dr. Muhammad Sahidullaha.

৯। বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) — ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

১০। History of Bengal (Vol - I) — Dr. Rameshchandra Datta

১১। History of bengal (Vol - I) – Dr. Sushilkumar De

১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী (১ম খণ্ড) — ড. সুকুমার সেন

১৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) — ড. নীহাররঞ্জন রায়

১৪। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) — ড. ভূদেব চৌধুরী

১৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ - প্রকাশিত)

১৭। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী

১৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত)

১.১.৪.১২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন্ কোন্ প্রবর্তককে সামনে এনেছিল তা আলোচনা করো।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাজজীবন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। 'আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' — আলোচনা করো।

৪। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব নির্ণয় করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

মঙ্গলকাব্যের প্রাগ্ভাষ

বিন্যাস ক্রম

১.২.৫.১ প্রাগ্ভাষ
১.২.৫.২ মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও উদ্ভবের পশ্চাদ্বর্তী পটভূমি
১.২.৫.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী
১.২.৫.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৫.১ : প্রাগ্ভাষ

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ ধারা। লৌকিক দেবদেবীদের পূজা ও মাহাত্ম্যপ্রচারের লক্ষ্যে এ জাতীয় কাব্যাঙ্গিকের আবির্ভাব। কবিদের সংখ্যা বিচারে পদাবলীর পরেই তার স্থান হলেও আয়তনের সাকুল্যে মঙ্গলকাব্য বোধহয় সবার চেয়ে এগিয়ে। তার সঙ্গে অনুবাদ সাহিত্যের আপাত-সাদৃশ্য আছে - সেটা গল্প বলার প্রকরণে। যদিও এ দুই শাখাতে উদ্দেশ্যের পার্থক্যের কারণে গল্পের চরিত্র ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অস্বীকার করার উপায় নেই, অনুবাদ কাব্যের মতো এরও প্রধান নির্ভর আখ্যান, তবে সেই উপাখ্যানের কোন সংস্কৃত-মূল কাহিনী-উৎস নেই। গ্রাম বাংলার ব্রতকথাগুলি যেমন লোকসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার বৃন্তমূল থেকে উৎসারিত হয়েছিল। তেমনি অগণিত গ্রামীণ বাঙালির ঐহিক কামনা বাসনার রূপায়ন ঘটেছে মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায়। লৌকিক দেবদেবীদের যে পূজা-প্রাপ্তির ইতিবৃত্ত আছে এখানে তার মূল খুঁজতে গেলে পৌঁছুতে হবে সেদিনের বিপন্ন ও অদৃষ্টনির্ভর বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যায়। বস্তুত কাহিনী চরিত্র, পটভূমি সব কিছুতেই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বাংলাদেশকে এমনভাবে পাওয়া যায়, যা আর কোন মধ্যযুগীয় সৃষ্টিতেই মেলে না। বোধহয় এই কারণে মঙ্গলকাব্যের শাখাকে অনেকে প্রাচীন বঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতির ফসল বলে গণ্য করতে চান।

> *মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠধারা। লৌকিক দেবদেবীদের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারের লক্ষ্যে এ জাতীয় কাব্যাঙ্গিকের আবির্ভাব। অনুবাদ কাব্যের মতো এর প্রধান নির্ভর আখ্যান, তবে সেই উপাখ্যানে কোন সংস্কৃত মূলকাহিনীর উৎস নেই। গ্রামবাংলার ব্রতকথার সঙ্গে, মঙ্গলকাব্যগুলির ঐহিক কামনা-বাসনার রূপায়ণ ও লক্ষ্য করা যায়।*

প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে ?

২। ব্রতকথা কি ?

১.২.৫.২ : মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও উদ্ভবের পশ্চাদ্বর্তী পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামক বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকরণের আবির্ভাব ঘটে তুর্কী আক্রমণের কালে। প্রথম দিকের ইতিহাস ধূসরতায় অনেকটাই আচ্ছন্ন বলে সুস্পষ্টভাবে এর সময়সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব। তবে সাহিত্যিক নিদর্শনের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, পনেরো শতক থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলির লিখিত রূপ সর্বসাধারণের গোচরে আসতে শুরু করে। আর এ ধারার পরিসমাপ্তি মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ সীমান্তে। অর্থাৎ মোট চারশ' বছরের সাহিত্য-অনুশীলনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ধারণ করে আছে মঙ্গলকাব্য। এ সাহিত্যকে অনেকেই সংজ্ঞায় বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, তবে সবক্ষেত্রে যে সফলতা এসেছে তা বলা যায় না। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' - এর লেখক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত"। বলাবাহুল্য, এই সংজ্ঞাকে সময়সীমার দিক থেকে যথাযথভাবে মেনে নেওয়া যায় না। 'একশ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য' বললেও মঙ্গলকাব্যের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। এমন অভিধা শিবায়ন কিংবা নাথসাহিত্যের প্রাপ্য হয়। অতএব একালের সাহিত্যজিজ্ঞাসুরা অন্যভাবে মঙ্গলকাব্যের অর্থসন্ধান করেছেন। মঙ্গলকাব্যের আগে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ব্রত-পাঁচালির, যেগুলিতে লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে নানাবিধ আখ্যান স্থান পেয়েছিল। পন্ডিতদের অনুমান, এই ব্রতকথাই কালক্রমে রূপান্তরিত হয় মঙ্গলকাব্যে। আবার মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে যুক্ত 'মঙ্গল' নামটিতে অনেকে খুঁজেছেন এর সংজ্ঞা ও স্বরূপের হদিস। তাঁরা বলেন, শব্দটি তৈরী হয়েছে সুভাষণরীতি থেকে। ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে কিংবা তাঁদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সমাজমন তৈরী করে নিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ 'মঙ্গল'। আবার অন্য শ্রেণীর সমালোচকেরা 'মঙ্গল' শব্দের উৎস খুঁজে পান রাগ সঙ্গীতের নামাবলীর মধ্যে। নারদের মতে, ভৈরব রাগের পুত্রবধূ হল 'মঙ্গলকৌশিকী' আর ক্ষেমকর্ণ পাঠকের মতে হিন্দোলরাগেরই অন্তর্গত একটি উপরাগ হল 'মঙ্গলরাগ'। তবে একথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য সব সময়ে মঙ্গলরাগে গীত হতো না। কাব্যটির সময়নির্ভর গীতি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে অনেকে বলেন, এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এটি গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। একথা চন্ডীমঙ্গল সর্ম্পকে সত্য হলেও মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল সর্ম্পকে খাটে না। এগুলি যথাক্রমে বারো ও ত্রিশ দিনে সমাপ্ত হতো। অতএব নতুন কোন তথ্য পাওয়ার আগে এভাবে নির্দেশে করা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা — যে কাহিনী-আশ্রিত

> *বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিস্তার। সময় নির্ভরতার দিক দিয়ে বলা যায় — এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এটি গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। আবার মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে যুক্ত 'মঙ্গল' নামটিতে খুঁজেছেন এর সংজ্ঞা ও স্বরূপের হদিস। অনেকেই 'মঙ্গল' শব্দের উৎস খুঁজে পান রাগসঙ্গীতের নামাবলীর মধ্যে। যে ধর্মমূলক কাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীদের অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে ও লোক সমাজে তাঁদের পূজা প্রচারিত হয়, যার পাঠে কিংবা শ্রবণে ব্যাষ্টি ও সমষ্টির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ঘটে, তাকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে - দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, রন্ধন দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনাও লক্ষ্য করা যায়।*

প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা কত ধরা হয় ?

২। মঙ্গল শব্দের দুটি অর্থ লেখ ?

৩। 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কি ?

ধর্মমূলক কাব্যের মাধ্যমে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীদের অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা ও লোকসমাজে তাঁদের পূজা প্রচারিত হতো, যার পাঠে কিংবা শ্রবণে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ঘটে বলে বিশ্বাস করা হতো, তুর্কী বিজয়োত্তরকালে বাংলা ভাষায় লেখা সেইসব কাব্যই মঙ্গলকাব্য।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চার-চারটি শতাব্দী লাগাতার মঙ্গলকাব্য অনুশীলিত হওয়ায় এর রচনাভঙ্গিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এগুলি একান্তভাবেই ছিল গতানুগতিক। সাহিত্যের আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসেবে কেমনভাবে যে এসব জুড়ে গিয়েছিল তা আজ আর স্পষ্ট নয়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল ঃ (১) দেবদেবীর বন্দনা (২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা (৩) নায়ক বা নায়িকার বারমাস্যা (৪) পাক-প্রণালীর ও রন্ধন দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনা (৫) বিবাহাচারের নানা দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ (৬) নারীগণের পতিনিন্দা (৭) চৌতিশা স্তব রচনা (৮) যুদ্ধ বর্ণনা (৯) নানারূপ ধারণপূর্বক দেবদেবীর ছলনা (১০) শিব-উপাখ্যান কথন (১১) বিভিন্ন বিষয়ের অকারণ সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান ইত্যাদি। অবশ্য এমন দাবি করা অসঙ্গত হবে যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি অবিকৃত ভাবে কোন একটি কাব্যদেহকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথম পর্বের মঙ্গলকাব্যগুলি যদিও গড়ে উঠেছিল লৌকিক সমাজের অপাংক্তেয় দেবদেবীকে আশ্রয় করে, পরে সেই সীমা প্রসারিত হয়ে যায় এবং অনেক পৌরাণিক দেবতাকে নিয়ে কাব্যলেখার চল দেখা দেয়। লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রেও লোকপুরাণের বাইরে ধ্রুপদী পুরাণের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মঙ্গলকাব্যের দেবখন্ডের গল্পটি নির্মিত হয়ে উঠতো একাধিক পুরাণের সমবায়ে। এতে আবশ্যিকভাবে থাকতো শিবের কাহিনী। দেবলোকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও দেবদেবীদের যে রূপ মঙ্গলকাব্যে ফুটে উঠেছে তাতে লৌকিতার স্বাদ-গন্ধই বেশি পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় কেবল মনসা, ধর্ম, চন্ডীকে নিয়েই মঙ্গলকাব্য লেখা হয়নি। এই তিনটি প্রাথমিক তথা প্রধানস্তরের বাইরে মধ্যম ও গৌণস্তরের অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন সময়ের কবিরা রচনা করেছিলেন। যেমন - কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যের রূপাঙ্গিক এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে বৈষ্ণবসমাজের কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ঘিরে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচেষ্টা চলে। এর প্রমাণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, গোপালমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, ব্রতমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে।

> ***বাংলা ভাষায় কেবল মনসা, ধর্ম, চণ্ডীকে নিয়েই মঙ্গলকাব্য লেখা হয়নি। গৌণস্তরেও অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন সময়ের কবিরা রচনা করেছিলেন। যেমন — কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদি। বৈষ্ণব সমাজের কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ঘিরে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল লেখা হয়েছিল।***

মানুষের বিপন্নতাই মানুষকে দৈববাদী করে তুলেছে। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ ছিল ভীষণই অসহায়, রুদ্র প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। প্রকৃতিকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সব কিছুর পিছনে কোন-না-কোন অদৃশ্য শক্তির কল্পনা এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টির পশ্চাতে এমন বিপন্নতার বোধের অস্তিত্ব বেশি মাত্রায় অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন দুই বিপরীত ধর্মসংঘাতের ঘটনাকে। সমাজে প্রসারিত শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির উত্থানই নাকি মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলিতে বিবৃত। কিন্তু সব মঙ্গলকাব্যে এই ছকটির দেখা মেলে না। অন্য আর একটি মত বলছে যে, আর্যসভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের ফলে যে সংস্কৃতায়নের সূচনা ঘটে, মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীদের উচ্চবর্ণভুক্তির চেষ্টা তারই স্মারক। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের সময়সীমায় রচিত তিনটি প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে এবার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

প্রশ্ন :

১। বাংলাভাষায় প্রধানত কি কি মঙ্গলকাব্য লেখা হয় ?

২। কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ঘিরে কি কি মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল ?

১.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা দাও? এর বিষয়বস্তু কী?

২। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩। বাংলা ভাষায় প্রধানত মঙ্গলকাব্য কোনগুলি? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। টীকা লেখ : (ক) কালিকামঙ্গল (খ) অন্নদামঙ্গল (গ) শীতলামঙ্গল (ঘ) ষষ্ঠীমঙ্গল (ঙ) গঙ্গামঙ্গল (চ) রায়মঙ্গল।

১.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস—ক্ষেত্র গুপ্ত

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম)—শ্রীভূদেব চৌধুরী

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৬

মনসামঙ্গল কাব্য ও কবিগণ

বিন্যাস ক্রম

১.২.৬.১ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

১.২.৬.১.১ কানা হরিদত্ত

১.২.৬.১.২ বিজয় গুপ্ত

১.২.৬.১.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

১.২.৬.১.৪ নারায়ণ দেব

১.২.৬.১.৫ দ্বিজ বংশী দাস

১.২.৬.১.৬ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

১.২.৬.১.৭ তন্ত্র বিভূতি

১.২.৬.১.৮ জগজ্জীবন ঘোষাল

১.২.৬.১.৯ জীবনকৃষ্ণ মৈত্র

১.২.৬.১.১০ বিষ্ণু পাল

১.২.৬.১.১১ ষষ্ঠীবর দত্ত

১.২.৬.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৬.১ : মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচলনের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিষ্ঠা। মানবেতর জীবকুলের মধ্যে সর্প হিংস্র বিষধর এক প্রাণী। তার এক মোক্ষম ছোবলেই মানুষের প্রাণান্ত। এই আধিভৌতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এককালে বিপন্ন মানুষ সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করেছিল। পন্ডিতগণের অভিমত, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে সর্পপূজা প্রচলিত থাকলেও সর্প সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল প্রাচীন মিশরে প্রায় ছ'হাজার বছর পূর্বে। ইউফ্রেটিস-তীরবর্তী তুরানী জাতির মানুষ নাকি সর্বপ্রথম সর্পপূজার প্রচলন করে। তারপর এই জাতির শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হলে সেইসব অঞ্চলে সর্পপূজা বিস্তৃত হয়। ভারতে আর্যানুপ্রবেশের আগে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মধ্যে সাপকে ঘিরে নানা রকম ধারণা ও সংশয় গড়ে ওঠে। ভারতে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে পূজো পেয়ে আসছেন মনসা। বাংলায় এঁকে নিয়ে যে মাহাত্ম্যকথা লেখা হয়েছে তার সাধারণ পরিচিতি হল 'মনসামঙ্গল'। বঙ্গদেশের নানা স্থান থেকে মনসার যেসব বিগ্রহ বা মূর্তি মিলেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, বিবিধ স্তরে মনসার দেবীরূপটি বিবর্তিত হয়েছিল। প্রথম পর্বে তিনি সর্পরূপিনী, দ্বিতীয় পর্বে সর্পাভরণী ও অন্তিম পর্বে সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাংলাদেশে একাদশ শতকের আগে ভাস্কর্য শিল্পে দেবী মনসার চিহ্ন মিলেছে। চৈতন্য ভাগবতে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি সমাজে বিষহরি পূজার কথা উল্লেখিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনী বাংলার আদিম লোক সমাজের সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিকে মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। জাঙ্গুলি প্রকৃতপক্ষে বিষবিদ্যা। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে আরো একজন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন কুরুকুল্লা। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবী হলেন 'মনচা অম্মা'। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, এই দেবী পরে 'মনসা মা'-তে পরিণত হয়েছেন। মনসাকে যাঁরা পৌরাণিক দেবীর রূপান্তর বলে মনে করেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মতে, নানা সময়ের দেবীভাবনা ও তাদের মূর্তিকল্পনা মিলেমিশে গিয়ে মনসার মূর্তি গঠন করেছে। মহাভারতে রয়েছে জরৎকারু ও আস্তিকের প্রসঙ্গ। দশম একাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসার বিস্তারিত উল্লেখ দেখা যায়। মনসামঙ্গলের গল্পসূত্র থেকে মনে হয়, মনসার পূজা প্রথমে অভিজাত হিন্দু সমাজ মেনে নেয়নি। জেলে ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তিনি পূজা পেতেন। অবশেষে এই দেবী বৃহত্তর হিন্দু সমাজে পূজ্য হয়ে উঠলেন চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। মনসামঙ্গলে মনসার দেবকুলগত কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিব-কন্যা হিসেবে তুলে ধরায়; যদিও তাঁর জন্ম সংক্রান্ত দুটি কাহিনীই প্রাগার্য উৎসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। মনসামঙ্গলের কাহিনীটির উৎস ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে এ কাহিনী যে বাংলার লোকসমাজে পঞ্চদশ শতক থেকে বহমান ছিল তার কাব্যগত প্রমাণ মেলে। মনসামঙ্গল কাব্যধারার কয়েকজন বিশিষ্ট কবি সম্বন্ধে সংক্ষপে আলোচনা করা গেল।

> ***সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচলনের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিষ্ঠা। ইউফ্রেটিস তীরবর্তী তুরানী জাতির মানুষ নাকি সর্বপ্রথম সর্পপূজার প্রচলন করে। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে নিয়ে যে মাহাত্ম্যকথা লেখা হয়েছে তার সাধারণ পরিচিতি হল 'মনসামঙ্গল'। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাগুঁলিকে মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবী হলেন 'মনচাঅম্মা'। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মনসার কথা আছে। জেলে ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে মনসার পূজা প্রচলিত হলেও বৃহত্তর হিন্দু সমাজে চাঁদ সদাগরের পূজার মধ্য দিয়ে মনসা পূজা প্রচলিত হয়।***

প্রশ্ন :

১। সর্বপ্রথম সর্পপূজার প্রচলন কারা করেন ?

২। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কি ?

৩। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবীর নাম কি ?

১.২.৬.১.১ : কানা হরিদত্ত

পারিপার্শ্বিক বাহ্য প্রমাণসূত্রে যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয়, মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কানা হরিদত্তের হাতে। বিজয় গুপ্ত তাঁর রচনায় সমালোচনা সূত্রে এ কবির নাম উল্লেখ করেছিলেন। কানা হরিদত্তের কাব্য সম্ভবত বেশি প্রচার পায়নি। বিজয় গুপ্তের কালেই তা অবলুপ্তির মুখে পৌঁছেছিল। ফলে হরিদত্ত-বিরচিত কাব্যের মূল্যায়ন করা একালে সম্ভব নয়। তবে বিজয় গুপ্ত সেই রচনাকে বিশেষ মূল্য দেননি। তাঁর চোখে এ কাব্যের নানা দোষ ধরা পড়ে গিয়েছিল। হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিঘ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করেছিলেন। ওই পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পগন্ধা' নামে একটি অংশ পাওয়া

> ***মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কানা হরিদত্তের হাতে। হরিদত্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মন সিংহের দিঘপাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পগন্ধা' নামে একটি অংশ উদ্ধার করেন। বিজয় গুপ্ত খাঁটি খবর দিয়েছিলেন যে, হরিদত্ত মনসার প্রথম মাহাত্ম্যগীত রচয়িতা।***

গিয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এই কবি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। না মানার প্রধান কারণ হল এর ভাষা। কেননা ভাষায় আধুনিকতার ছাপ রয়েছে যথেষ্ট। বিজয় গুপ্ত হরিদত্তের কাব্যবিষয়ে অনেক কটুকাটব্য করলেও একটা খাঁটি খবর দিয়েছিলেন এই যে, হরিদত্ত মনসার প্রথম মাহাত্ম্যগীত রচয়িতা।

প্রশ্ন :

১। কানা হরিদত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

২। মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কার হাতে ?

১.২.৬.১.২ : বিজয়গুপ্ত

ভৌগোলিক অঞ্চল অনুসারে মনসামঙ্গলের আলাদা আলাদা ধারা গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গ এমনই এক স্বতন্ত্র অঞ্চল। এই অঞ্চলের মনসামঙ্গলের সাধারণ পরিচিতি 'পদ্মাপুরাণ'। আর পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি হলেন বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্য সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পায় বরিশালে। গ্রন্থসূচনায় কবি যে আত্মকথা বিবৃত করেন তা থেকে জানা যাচ্ছে যে মুলুক ফতেহাবাদের অর্ন্তগত গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের জন্ম শিক্ষিত বৈদ্য বংশে। কাব্য রচনা করেন সম্ভবতঃ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। ফুল্লশ্রীতে কিছু কাল আগেও বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মনসার মন্দির ও মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিজয়গুপ্তের কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পায় বরিশালে। কাব্যটি ১৪৮৪ খ্রীঃ রচনা ও আঠাশটি পালায় বিভক্ত। গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের জন্ম, পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। কাহিনীতে অলৌকিকতা থাকলেও সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। মনসা তাঁর কাব্যে গোত্র পরিচয়ে দেবী বটে, কিন্তু স্বভাব পরিচয়ে রাক্ষসী, দানবী। শিবও সমানভাবে কবির কাব্যে দেবত্ব পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে অলংকার ও বাগ বৈদগ্ধ্য প্রকাশে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যের ধারায় প্রথম সন তারিখযুক্ত রচনা।

বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' বেশ আয়তন বিশিষ্ট। এককালে তা গান করা হোতো। ফলে পুরো বইটি আটাশটি পালায় বিভক্ত। মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারকে কবি বর্ণনা করতে গিয়ে চাঁদ সদাগর ছাড়া আরো তিনটি উপকাহিনীর অবতারণা করেছেন। প্রথমেই রয়েছে রাখালদের বিপদে ফেলে পুজো আদায়ের চেষ্টা। সেটি সফল হবার পর নিজ মহিমা প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলমান সমাজে। এরপর অনুগৃহীত করলেন ধীবরবৃত্তিধারী জালু ও মালুকে। সবশেষে এসেছে চাঁদ বণিকের সুপরিচিতি সেই আখ্যান। কবির যে যথেষ্ট কাব্যবোধ ছিল তা তাঁর রচনাটি পড়লেই বোঝা যায়। তবে তিনি গভীর ভাবানুভূতির বদলে নীরস পান্ডিত্যের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। গল্পে অলৌকিকতা যথেষ্ট থাকলেও কবি কাহিনীতে সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবী মনসা যেভাবে সমগ্র কাহিনীতে চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছেন তার সঙ্গে চৈতন্য-পূর্ব পাঠান আমলের রাজকীয় ষড়যন্ত্রময় পরিস্থিতির তুলনা চলে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কিছু আভাস মেলে হাসান-হোসেন পালায়। দেবখন্ড ও নরখন্ডের গল্প উপস্থাপনায় সেযুগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদির অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন।

কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে দেবী মনসার চরিত্র অঙ্কনে। মনসা তাঁর কাব্যে গোত্র পরিচয়ে দেবী বটে, কিন্তু স্বভাব পরিচয়ে রাক্ষসী, দানবী। প্রচলিত আখ্যানে দেখা যায় মনসা ছলে বলে কৌশলে পুজো আদায়

করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন নীতিবোধ, বিবেকের দংশন তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায় নি। কবি দেখিয়েছেন যে দেবীর বিড়ম্বিত জীবনের নানা ঘটনার মধ্যেই ছিল এই ক্রূর প্রতিহিংসার বীজ। যিনি কোনো কামুকের আকস্মিক কামনার ফল, যিনি শৈশব থেকেই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত, বিমাতার রোষে যার এক চোখ কানা হয়ে যায়, দেবকন্যা হয়েও বিবাহ হয় মুনি তনয়ের সঙ্গে, যাঁর ভাগ্যে স্বামীসুখ সয় না, দেবসমাজে ঠাঁই না পেয়ে বাস করতে হয় নির্জন পর্বতে—তাঁর মনে ক্ষোভ, রোষ, দুঃখ,অভিমান, বেদনা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এই অস্থিরতা ও বিপন্নতা থেকে মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা এবং সে সংগ্রামে তাঁর কোন বৈধ রণনীতি নেই। অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এইভাবে চরিত্রটির বাস্তব প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় মনসা হয়ে উঠেছেন বিজয় গুপ্তের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। শিবও সমানভাবে কবির কাব্যে দেবত্ব পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত। কবির চাঁদে বীর্যবত্তার অভাব নেই, তবে আদ্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সনকার পুত্রহারানোর হাহাকার যথেষ্ট আবেদনময়। এদের তুলনায় আরো ভালো ফুটেছে বেহুলা সতী নারীর আদর্শে কবি তাকে এঁকেছেন। অবিচলিত চিত্তে সমস্ত আঘাত বরণ করায় তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে।

বিজয় গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ মানুষ। ফলে কাব্যে অলংকার ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশে তিনি যথেষ্টই কুশল। রসসৃষ্টিতেও পরিচয় রেখেছেন স্বাদবৈচিত্র্যের। মনসামঙ্গল করুণ রসের আকর, তবুও তার স্থানে স্থানে কবি হাস্যরসের ঝিলিক ছড়িয়েছেন। চন্ডী ও শিবের কপট প্রণয়, ডোমনারীকে দেখে শিবের কামাসক্তি, পদ্মার বিবাহ বিষয়ে শিবদুর্গার রহস্যালাপ, গণকের ছদ্মবেশে নারদের ভূমিকা ইত্যাদি বর্ণনায় অফুরন্ত হাস্যরসের আমদানি ঘটেছে। কবি রঙ্গরস পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শোভনতার বেড়াটাও টপকে গেছেন। আদিরসের প্রতি বিজয় গুপ্তের আকর্ষণ ছিল এবং সেটা বোধ হয় যুগরুচির প্রভাবেই। কেউ কেউ তাঁর কাহিনীবিন্যাসে দেখেছেন সামঞ্জস্যের অভাব। এর কারণ বোধহয় জীবনের বহির্ভাগের খন্ড খন্ড কাহিনীর উপর তাঁর অধিক নির্ভরতা। তবে ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কোন কোন পংক্তি চারমাত্রার দ্রুত লয়েও পড়া যায়। দেশি শব্দের প্রয়োগেও কবির কুশলতা চমৎকার। মনে রাখতে হবে, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যের ধারায় প্রথম সনতারিখযুক্ত রচনা।

প্রশ্ন :

১। বিজয় গুপ্তের কাব্যটির নাম কি? কত সালে রচনা করেন?

১.২.৬.১.৩ : বিপ্রদাস পিপিলাই

মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনি সামবেদীয় পিপ্পলাদ শাখার বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবির বাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রামে। কাব্যে যে হেঁয়ালি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে তা ভেঙে ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। যদিও সুকুমার সেনের মতে, বিপ্রদাস মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো কবি। বিপ্রদাসের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'।

'মনসাবিজয়'-এর কাহিনীর প্রথম ভাগে কবির স্বকীয় কল্পনার পরিচয় মেলে। শিবগঙ্গার বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের সূচনা। গঙ্গা পূর্বে শান্তনু ঋষির পত্নী ছিলেন। শর্ত রক্ষা করতে না পারার ফলে শিব গঙ্গাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। শিবের পিতা ধর্ম, যার সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় শিব বল্লুকা নদীর তীরে বারো বৎসর ধরে তপস্যা করতে থাকেন। ধর্ম

শিবকে দেখা দিয়ে কালীদহে পদ্মফুল তুলতে আদেশ দেন। সেই পুষ্পবনে মদন-পীড়িত শিবের রেতঃ স্খলন ঘটতে তা এক কাক উদরস্থ করতে না পেরে উগরে দেয়। অবশেষে সেটি জলে পড়ে পাতাল ভেদ করে পৌঁছয় বাসুকী নাগের জননী নির্মাণির মাথায়। তিনি ঐ ক্ষীরের মতো দ্রব্য দিয়ে একটি পুতুল গড়ে তার জীবন্যাস করে বাসুকীর কাছে দিলে মনসা নাগদের বিষভান্ডারের অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। এরপর বাসুকী তাকে রেখে এলেন কালীদহে। সেখানে পিতা শিবের সঙ্গে মনসার দেখা হতে কন্যার জেদে শিব তাকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কৈলাসে গেলেন। অতঃপর বাকি অংশ বিজয় গুপ্তের মতোই। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে, গল্পে সঙ্গতিবিধানের দিক থেকে বিপ্রদাস অন্য কবিদের তুলনায় এগিয়ে। বর্ণনায় কবি উৎকট আতিশয্যকে বর্জন করেছেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। হাসান-হোসেন পালাটি বিজয় গুপ্তের তুলনায় দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পিত। বিপ্রদাসের মনসা ছলনা করে বেহুলাকে বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেয়।

> ***মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন বিপ্রদাস পিপলাই। কবির বাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রামে। বিপ্রদাসের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। কাব্যের ভাষাতে আধুনিকতার ছাপ আছে, নিমাইতীর্থ ও শ্রীপট খড়দহ তো ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের আগে গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসের কাব্যকে ষোড়শ শতাব্দীর বলে গণ্য করেছেন।***

চরিত্র পরিকল্পনায় বিপ্রদাস সামান্য বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত দেবতারা নিছক মানুষের পর্যায়ে নেমে আসেনি। মনসার চরিত্রে কঠোরতা-নির্মমতা থাকলেও স্থান বিশেষে করুণা ও স্নেহ মমতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। চাঁদ চরিত্র সৃষ্টিতে কবি কিছুটা অসফল হয়েছেন বলে মনে হয়। চাঁদের পৌরুষ সেভাবে দীপ্তিমান নয়। বরং কাহিনীর শেষে চাঁদকে অনুতপ্ত করে যেভাবে মাথা নত করিয়ে দেন তাতে চাঁদ চরিত্রে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। এমনকি চাঁদ মনসার কাছে শাস্তি প্রার্থনা করে বলেছে, "মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার। দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হৌক আমার।।" সনকা চরিত্রটিতে কবি পুত্রহারা জননীর শোকার্তিকে চমৎকারভাবে রূপ দিয়েছেন। সর্প দংশনের পর সনকার বিলাপের সামান্য অংশ ঃ "চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্বোধন। পড়িল ধরনীতলে হরিয়া চেতন।। উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুতুলি। পূর্ণিমার চন্দ্র পুণি কারে দিনু ডালি।।"

বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাচীনত্ব নিয়ে সুকুমার সেন নিঃসংশয় থাকলেও অধিকাংশ পন্ডিত সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কাব্যের ভাষাতে আধুনিকতার ছাপ তো আছেই, এমনকি কবি যেসব স্থাননাম ব্যবহার করেছেন সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি উপনিবেশকালের। নিমাইতীর্থ ও শ্রীপাট খড়দহ তো ষোড়শ সপ্তদশ শতকের আগে গড়েই উঠতে পারেনি। এজন্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসের কাব্যকে ষোড়শ শতাব্দীর বলে গণ্য করেছেন।

প্রশ্ন :

১। মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবির নাম কি ? কাব্যটির নাম কি ?

২। কবির কাব্যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জায়গার নাম কর ?

১.২.৬.১.৪ : নারায়ণ দেব

বঙ্গদেশের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে মনসামঙ্গলের যে কবির কাব্য ভিন রাজ্যে বিপুল প্রচার লাভ করেছে তিনি হলেন নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেবের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অর্ন্তগত বোর গ্রামে। এই গ্রাম একদা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেজন্য শ্রীহট্টবাসীরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের অঞ্চলের কবি বলে দাবি করেন। কবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কবির পূর্বপুরুষ উদ্ধারণ দেব ছিলেন রাঢ়ের অধিবাসী। পরে তাঁরা পূর্ববঙ্গে উপনিবিষ্ট হন। কবিরা জাতিতে কায়স্থ, গোত্রে মৌদগল্য। নারায়ণ দেবের কাব্য আসামে অসমীয়াদের মধ্যে

সুপ্রচলিত। আসামে বহু প্রচলনের কারণে সেখানকার সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের কবি বলে দাবি করেছেন।

নারায়ণ দেবের কাব্য তিন খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে কেবল আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খন্ডে আখ্যান থাকলেও চাঁদ বণিকের গল্প সেখানে নেই, রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান। এই আখ্যানগুলির উৎস বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য। আর তৃতীয় খন্ডে জায়গা পেয়েছে চাঁদ-মনসা-বেহুলা লখিন্দরের পরিচিত গল্পটি। কবির কাব্যে দেবখন্ডের তুলনায় নরখন্ড সংক্ষিপ্ত। অত্যধিক পুরাণ নির্ভরতার জন্য চরিত্র সুবিকশিত হতে পারেনি। তবে চাঁদ চরিত্রে অনমনীয় পৌরুষ প্রদর্শনে কবি সম্পন্ন-শিল্পচেতনার পরিচয় রেখেছেন। সাড়ম্বরে পূজার পরিবর্তে বাম হাতে পিছন ফিরে ফুলজল দেওয়া চাঁদের দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ। নারায়ণ দেবের বেহুলা শেষের দিকে একটু অন্যরকম। একটি পত্রে সে আত্মপরিচয় লিখে রেখে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করেছে। বেহুলা ব্রীড়াশীলা নারী হয়েও নির্মম দৈবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলা। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ায় সময় তার মর্মস্পর্শী বিলাপ করুণরসে পাঠকের মনকে আর্দ্র করে দেয়। স্বামীর মরদেহকে সম্বোধন করে সে বলে — "জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে। ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।। তুমি ত আমার প্রভু আমি যে তোমার। মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।" রসসৃষ্টির দিক থেকে নারায়ণ দেব যেমন করুণরস ও হাস্যরসে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি প্রকাশ করেছেন স্থূল আদিরসও। বেহুলার বিবাহে উপস্থিত বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তির প্রকাশ এর সেরা দৃষ্টান্ত। নাবালক লখিন্দরের মধ্যেও বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এগুলিকে কবির স্বভাবের দোষ না দেখে যুগরুচি হিসাবে দেখা বোধ হয় বেশি সঙ্গত।

> ***নারায়ণ দেব ময়মন সিংহ জেলার কিশোর গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিরা জাতিতে কায়স্থ, গোত্রে মৌদগল্য। নারায়ণ দেবের কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত। কবির কাব্যে দেবখণ্ডের তুলনায় নরখণ্ড সংক্ষিপ্ত। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' লৌকিক উপাদানের চেয়ে পৌরাণিক উপকরণ বেশি মেলে। তাঁর রচনায় শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব আছে যথেষ্ট।***

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারায়ণ দেবের যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা তাঁর কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর পদ্মাপুরাণে লৌকিক উপাদানের চেয়ে পৌরাণিক উপকরণ বেশি মেলে। তাঁর রচনায় শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব আছে যথেষ্ট। অবশ্য সবক্ষেত্রে প্রার্থিত সফলতা আসেনি। কবির কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাবও কম নয়, যার নিদর্শন ধুয়াতে বৈষ্ণব পদের ব্যবহার। কোন কোন সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ দেবকেই মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিতে চান। তাঁদের যুক্তি — এ কবির কাব্যে কাহিনী, চরিত্র, রসসৃষ্টি, পান্ডিত্য, ইত্যাদি বিষয় সুচারুভাবে মিলে মিশে চমৎকার কবিত্বে পরিণত হয়েছে। এজন্যই কি এ কবির কাব্যের অনুলিপি এত বেশি? অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বাস্তবিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগধর্মের জন্য তাহা ততটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই'। পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ বংশীদাস কিয়দংশে নারায়ণ দেব কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন :

১। নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম কি ?

২। নারায়ণ দেবের কাব্যটি কটি খণ্ডে বিভক্ত ?

১.২.৬.১.৫ : দ্বিজ বংশীদাস

মনসামঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ। কবির বাসভূমি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুয়ারি বা পাত্রবাড়ী গ্রামে। যদিও কবির পূর্বপুরুষরা রাঢ়দেশের অধিবাসী, পরে পূর্ববঙ্গে উপনিবিষ্ট হন। কবিরা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ, জননী অঞ্জনা, পত্নী সুলোচনা, কন্যা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী বিদূষী ছিলেন এবং কথিত যে, রামায়ণ লিখেছিলেন। দ্বিজ বংশীর পুথিতে যে সন-তারিখ পাওয়া যায় 'জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার' তা বিশ্লেষণ করে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া গেলেও অনেক পন্ডিত এ কবির এত প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। কবি তাঁর আত্মবিবরণীতে যে হাজরাদি পরগণার কথা উল্লেখ করেছেন সেই পরগণারই সৃষ্টি হয়েছে মানসিংহ কর্তৃক ঈশা খাঁর পরাজয়ের পরে। ঈশা খাঁ পরাজিত হল ১৫৯৫ সালে। সেজন্য সুকুমার সেন দ্বিজ বংশীদাসকে সপ্তদশ শতকেরও পরবর্তীকালের কবি বলে নির্দেশ করতে চান। তবে কাব্য বিচার করে এত পরের সময়ের কবি বলা বোধ হয় সমীচীন নয়। সম্ভবত দ্বিজ বংশীদাস সতেরো শতকেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ সদাগর সম্পর্কে একটা অভিনব খবর পাওয়া যায়। চিরাচরিত আখ্যানের শৈব চাঁদ এ কাব্যে পরিণত হয়েছেন শক্তির উপাসক। তাঁর প্রকৃত আরাধ্য চন্ডী, তবে শিবের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা আছে। চন্ডী মনসার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। চাঁদ চন্ডীর ভক্ত বলে চাঁদের জীবনেও দৈবী বিবাদের সূত্রে দুর্দৈব নেমে এসেছে। মনসা নিজের আক্রোশ মিটিয়েছেন নিরপরাধ চাঁদের উপর। অবশ্য শেষ অব্দি মনসা ও চন্ডীর বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে শিবের হস্তক্ষেপে। দুই বিবদমান দেবীর মাঝখানে পড়ে দ্বিজ বংশীর হাতে চাঁদ চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হতে পারেনি।

কবি সম্ভবত সংস্কৃত পুরাণাদিতে পারঙ্গম ছিলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যেও ছিল তাঁর দক্ষতা। তাঁর অধীত বিদ্যা কাজে লেগেছে দেবখন্ডের কাহিনী নির্মাণে। কালিদাসের কুমারসম্ভবের ঘটনা-সংস্থাপন নজরে পড়ে শিবের জন্য গৌরীর প্রচন্ড তপস্যা, শিবের ধ্যানভঙ্গ, মদনভস্ম, শিব ও পার্বতীর বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনায়। প্রসঙ্গত এসেছে মহাভারতীয় কাহিনীর রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের বিবরণও। হাসান-হোসেনের গল্প ও ধন্বন্তরী শঙ্কর গারুড়ির নিধন প্রসঙ্গ চাঁদ কাহিনীর আগে বর্ণিত। কবি সর্বত্র তাঁর পান্ডিত্য ও রসজ্ঞানকে বজায় রেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনীর বিচারে করুণরসের। এই কবি সেই রসকে সহজ ভাবানুভূতির সূত্রে তাঁর কাব্যে উপস্থিত করেছেন। তবে করুণরসের প্রবাহে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে হাস্যরসের ক্ষণিক ঝিলিক। কাব্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে যথেষ্ট। সংস্কৃত অলংকার প্রয়োগ করেছেন মাঝে মধ্যে। কেউ কেউ বংশীদাসের রচনায় দেখেছেন বৈষ্ণবীয় প্রভাব। সেটা থাকা বিচিত্র নয়; বিশেষত তিনি চৈতন্যোত্তর কালের কবি। দ্বিজ বংশীর পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

> ***দ্বিজবংশী দাস মনসামঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। দ্বিজবংশী দাসের কাব্যে চিরাচরিত আখ্যানের শৈবচাঁদ শক্তির উপাসকরূপে পরিণত হয়েছেন। তবে করুণরসের প্রবাহে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে হাস্যরসের ক্ষণিক ঝিলিক। বংশী দাসের রচনায় বৈষ্ণবীয় প্রভাব আছে বলে, অনেকেই তাকে চৈতন্যোত্তর কালের কবি বলে বর্ণনা করেছেন।***

প্রশ্ন :

১। দ্বিজবংশী দাস চৈতন্যপূর্ব না চৈতন্যোত্তর কালের কবি ?

২। কবির কাব্যের নাম কি ?

লিখেছেন - "সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতলে গিয়া স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে।"

১.২.৬.১.৬ : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

রাঢ়বঙ্গের মনসামঙ্গলের বিশিষ্ট রূপকার হলেন বর্ধমানের কাঁকড়া গ্রামের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি গ্রন্থের সূচনায় যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা থেকে জানতে পারা যায় যে, কবির পিতা শঙ্কর ফৌজদার বারা খাঁর অধীনে কাজ করতেন। যুদ্ধে বারা খাঁর মৃত্যু হলে শঙ্কর আশ্রয়চ্যুত হয়ে জমিদার ভারমল্লের অধীনে এসে বসবাস করেন। সময়টা ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর ভারমল্ল প্রদত্ত জমিতে ধান কাটতে গিয়ে কবির সঙ্গে সন্ধ্যাকালে দেখা হয় মুচিনী-বেশিনী মনসার। দেবী আদেশ দিলে কবি মনসার ভাসান গান লিখলেন। কবি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ।

ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মনসার আর এক নাম কেতকা। যেহেতু কেতকী বা কেয়া বনে মনসা জন্মলাভ করেছিলেন। কবির নামে রয়েছে তারই প্রভাব। তিনি হয়তো মনসার দাস বা সেবক হিসেবে নিজেকে পাঠক সমাজে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। 'ক্ষেমানন্দ' তাঁর পিতৃদত্ত নাম হওয়াই সম্ভব। ইনি যথেষ্ট পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন কাব্য রচনায়। সংস্কৃত জানতেন মনে হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রচনাশৈলীতে। তবে অনর্থক পান্ডিত্য প্রকাশের কারণে তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট। ক্ষেমানন্দের কবিকৃতির স্বকীয়তা নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন যে, লোকজীবন-সম্ভব গল্পের দেহে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ আভিজাত্য সংযোজিত করতে চেয়েছেন। যেমন, মনসার লৌকিক জন্ম ইতিহাস উপলক্ষ করে কবি তাঁকে অযোনীসম্ভবা সতী বলে বন্দনা করেছেন। কেতকাদাসের কাব্যে মোট চোদ্দটি পালা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি যথাক্রমে মনসার জন্ম, চন্ডী মনসার বিবাদ, চিত্রবতী উপাখ্যান, কপিলার মর্ত্য-আগমন, সমুদ্রমন্থন, মনসার বিবাহ, রাখালপূজা, হাসানহাটি, জালুমালু, জ্ঞানহরণ, ধন্বন্তরিবধ, ঊষা-অনিরুদ্ধ, বানযুদ্ধ ও জাগরণ। গল্পগুলির মধ্যে কবি মোটামুটি যোগসূত্র বজায় রাখতে পেরেছেন।

> ***রাঢ়বঙ্গের মনসামঙ্গলের বিশিষ্ট রূপকার হলেন বর্ধমানের কাঁকড়া গ্রামের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা করেছিলেন। ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে মনসার আর এক নাম কেতকা দিয়েছেন। যেহেতু কেতকী বা কেয়া বনে মনসা জন্মলাভ করেছিলেন। কেতকাদাসের কাব্যে মোট চোদ্দটি পালা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি যথাক্রমে মনসার জন্ম, চণ্ডী-মনসার বিবাদ, চিত্রবতী উপাখ্যান, কপিলার মর্ত্য আগমন ইত্যাদি। দক্ষিণবঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।***

এই মনসামঙ্গলে কবির ইতিহাস-নিষ্ঠা ও ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বর্ধমানের অনতিদূরে অবস্থিত চাঁপানগরকে সদাগর চন্দ্রধরের বাসভূমি বলে মনে করেছেন। চাঁদের বাণিজ্যপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং গাঙুরের জলস্রোত ধরে বেহুলা যেভাবে এগিয়েছে দেবলোকের দিকে — কবি দুটি ক্ষেত্রেই বাস্তবের ভূগোলকে অনুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন। দামোদর ও তার শাখানদীগুলির তীরে অবস্থিত জনপদঘাটগুলিই যে কবির কলমের মুখে চলে এসেছে তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। কাব্যে বর্ণিত বাইশটি ঘাটের মধ্যে চোদ্দটি ঘাট এখনও বর্তমান।

চরিত্রচিত্রণে কোথাও কোথাও স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন ক্ষেমানন্দ। বেহুলা চরিত্রে আত্মমর্যাদা ও গর্বময়ী ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তিনি। বাংলার গ্রামজীবনে নারীকূলের আদর্শ হলেন বেহুলা। তাঁর পাতিব্রত্য লোকপুরাণে দুর্লভ। একইভাবে দুঃখসহনশীলতায় বেহুলা অনন্যা। এই বেহুলার মধ্যে সামাজিক জ্ঞান ও বাস্তববোধও যথেষ্ট। লখিন্দরের মৃত্যুর পর ভেলায় ভেসে যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে দাদা ও ভাইদের যেভাবে তিনি পিত্রালয়ে ফিরে যাবার প্রস্তাবে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছেন তা কবির স্বকীয়তাকেই তুলে ধরে। কবি লিখেছেন

ঃ "বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী। কত না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।। মা-বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে। সকল ভাউজ সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।। নারিব সহিতে আমি দুরাক্ষর বাণী।" অন্যান্য চরিত্রগুলি কম-বেশি স্বাভাবিকতায় অঙ্কিত। তাঁর কাব্যে মনসা ততটা উগ্রা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা নন। চৈতন্যোত্তর কালের প্রভাব পড়ার এটা একটা ফল হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ কবির সনকা চরিত্রটি বেদনাবিধুর।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যভাষা আলাদাভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তিনি আয়াসের সঙ্গেই পান্ডিত্য অধিগত করেছিলেন; তবে পান্ডিত্যের জন্য পান্ডিত্যের প্রয়োগ করেননি। তৎসম শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর রচনায় আছে, পাশাপাশি রয়েছে হিন্দি, ব্রজবুলি এমনকি ভারতচন্দ্র কথিত 'যাবনীমিশাল' ভাষা। যেমন - "নটিয়া পটিয়া/ পাগড়ী জটিয়া / শাম গএ যেন ডরকো। হামকো ধরিয়া/ মারণে সে হরিয়া/ ঝুটবাত কহত থাকি সো।।" ক্ষেমানন্দ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রতি অত্যাগ্রহী ছিলেন এবং অনেকটা নৈষ্ঠিকভাবে তার অনুসরণ করেছেন। নারীর রূপবর্ণনায় সংস্কৃত শাস্ত্রসম্মত রীতিকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন, যার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল হাসনের চোখ দিয়ে দেবী মনসার রূপবর্ণনা। তবে সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে আশা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

প্রশ্ন :

১। দক্ষিণবঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন ?

২। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসার অপর নাম কি ছিল ?

১.২.৬.১.৭ : তন্ত্রবিভূতি

মনসামঙ্গল স্থান বিশেষে ত্রিধারায় বিভক্ত - পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গীয় শাখায় অন্যতম বিশিষ্ট কবি হলেন তন্ত্রবিভূতি। কবির এই নাম বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত, কিম্ভূত, বিস্ময়াবহ, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। অনেকের মতে, কবির প্রকৃত নাম 'বিভূতি'। 'তন্ত্র' তাঁর বৃত্তি পরিচয়। অর্থাৎ জাতিতে তিনি তন্ত্রী বা তাঁতি ছিলেন। আর একটি মত, কবি হয়তো তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন বলে 'তন্ত্র' শব্দটিকে নামের পূর্বপদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান, যেহেতু ঐ অঞ্চলেই তাঁর কাব্যের পুথি পাওয়া গিয়েছে। কবি কত প্রাচীন তা জানা যায় না। তবে নানাবিধ কারণে অনুমান করা যায় কবি ষোড়শ শতকের শেষার্ধে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। কবি কাহিনীর মধ্যে কিছু নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন ধর্মপূজা করতে গিয়ে শিব মনসাকে জন্ম দিলেন। মনসার রূপ দেখে পিতামহ ব্রহ্মার আত্মবিস্মরণ ঘটা এবং তার থেকে বিষের জন্ম - সম্পূর্ণ অভিনব তথ্য। ব্রহ্মা সেই বিষ সর্বত্র প্রেরণ করলেন। সমুদ্রমন্থনজাত বিষ একবিন্দু পান করে শিব মূর্ছা গেলে মনসা এসে পিতার প্রাণ রক্ষা করলেন। তখন শিবের বরে মনসা দেবী বলে গণ্য হলেন। নরখন্ডের কাহিনীতে চাঁদের পুত্র লখিন্দর অন্যভাবে পাঠকের নজর টানে। বিবাহ বাসরে পুত্রের সর্পদংশনে প্রাণ যেতে পারে এমন আশংকাতে চাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত লখিন্দরকে বিবাহ না দিলে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মাতুলানীকে ধর্ষণ করে। এই কাহিনী ভব্য রুচির পীড়াদায়ক। তবুও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব কবিই লখীন্দরকে এমন হীন বর্ণে অঙ্কন করেছেন। এ ধরনের রুচিবিকৃতি

> ***উত্তরবঙ্গীয় শাখায় অন্যতম বিশিষ্ট কবি হলেন তন্ত্র বিভূতি। অনেকের মতে, কবির প্রকৃত নাম 'বিভূতি'। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। কবি, কাহিনীর মধ্যে কিছু নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন ধর্মপূজা করতে গিয়ে শিব মনসাকে জন্ম দিলেন। মনসার রূপ দেখে পিতামহ ব্রহ্মার আত্মবিস্মরণ ঘটা এবং তার থেকে বিষের জন্ম — সম্পূর্ণ অভিনব তথ্য।***

কবি আরো দু'একটি স্থানে বর্ণনা করেছেন। মনসার নতুন নামান্তর হয়েছে এ কাব্যে 'ব্রহ্মাণী তোতল' -যার তেমন কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কবি কোন কোন জায়গায় করুণরসের বর্ণনায় যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বেহুলার রূপবর্ণনায় তন্ত্রবিভূতি সংস্কৃত সাহিত্যর নায়িকাকে সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কবির কাব্যের সামান্য উদ্ধৃতি ঃ "সোনকা প্রবোধ চান্দো বলেন বচন। পুত্রের কারণে শোক কর অকারণ।। ভাল হৈল মৈল পুত্র বালা লখিন্দর। নিধনিয়ার ঘরে চোরের নাহি ডর ।। ডাল গেল পাত গেল মূল হৈল সার। কানি বেড়ায় ডালে ডালে চান্দো মহাবীর।।" সম্ভবতঃ কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন :

১। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের নাম কি ?

১.২.৬.১.৮ : জগজ্জীবন ঘোষাল

মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারায় একজন বিশিষ্ট কবি। দিনাজপুরের অর্ন্তগত কুচিয়ামোড়ায় জন্ম। কবির পিতার নাম রূপ রায়চৌধুরী, মাতা রেবতী। কাব্যে কবি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনারায়ণের নাম উল্লেখ করেছেন। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষে মনসামঙ্গল লিখেছিলেন। আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের যুগ্ম সম্পাদনায় এঁর কাব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জগজ্জীবনের কাব্যের দুটি অংশ - দেবখন্ড ও বণিকখন্ড। গল্পের মধ্যে তেমন কোন অভিনবত্ব নেই। চাঁদ সদাগরের আখ্যানে তন্ত্রবিভূতিকে পদে পদে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। তবে যে অংশে তন্ত্রবিভূতি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, জগজ্জীবন সেখানে বিস্তারিত বর্ণনায় গিয়েছেন। কবির সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণটি একটু আলাদা। অনেকটা ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের মতো। আদিরসের বাহুল্য থাকায় নানা স্থানে রুচিবিকৃতির চিহ্ন চোখে পড়ে। তবে তার মধ্যেও ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টিতে কবি সফলতা দেখিয়েছেন। জগজ্জীবনের লেখায় কোথাও কোথাও আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আঞ্চলিক পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি থাকায় ঐ অঞ্চলের পাঠকের মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হয়।

> ***জগজ্জীবন ঘোষালের দিনাজপুরের অন্তর্গত কুচিয়া মোড়ায় জন্ম। কবির পিতার নাম রূপ রায়চৌধুরী, মাতা রেবতী। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষে 'মনসামঙ্গল' লিখেছিলেন। কবির কাব্যটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত — দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড।***

তবে আঞ্চলিকতাই জগজ্জীবনের কাব্যের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। কবি সংস্কৃত পুরাণে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন। তৎসম শব্দের ব্যবহারে, অলংকার প্রয়োগে ও ছন্দ নৈপুণ্যে তিনি বৈদগ্ধ্যের পরিচয় রেখেছেন যথেষ্ট। ভাষা কোথাও তেমন আড়ষ্ট নয়। লখিন্দর বাদে অন্যান্য চরিত্র মোটামুটি স্বাভাবিক। করুণরসের পাশাপাশি আদিরস তাঁর কাব্যে আলাদাভাবে নজর টানে।

প্রশ্ন :

১। জগজ্জীবন ঘোষালের জন্ম কোথায় হয়েছিল ?

২। কবির পিতা ও মাতার নাম কি ?

১.২.৬.১.৯ : জীবনকৃষ্ণ মৈত্র

উত্তরবঙ্গের করতোয়া নদী-তীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া গ্রামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের জন্ম। পিতার নাম অনন্তরাম। কবি পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। লাহিড়ীপাড়া গ্রামটি বগুড়া জেলার অর্ন্তভূক্ত,

যা শাসন করতেন নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ। কায়ক্লেশে কবির জীবিকানির্বাহ হতো। জীবনকৃষ্ণ সম্ভবত জীবিকার্জনে কিছু উদাসীন ছিলেন। মাঝে মাঝে পত্নীর দ্বারা তর্জিতও হতেন। যাইহোক, কবি কাব্যরচনার দ্বারা রাজা রামকৃষ্ণ কর্তৃক যে 'কবিভূষণ' উপাধি পেয়েছিলেন তা তিনি জানিয়েছেন। কাব্যে প্রাপ্ত হেঁয়ালি শ্লোক বিশ্লেষণ করে যে-সনতারিখ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল সমাপ্ত হয়েছিল।

> ***উত্তরবঙ্গের করতোয়া নদী-তীরবর্তী লাহিড়ী পাড়া গ্রামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের জন্ম। কবি কাব্য রচনার দ্বারা রাজা রামকৃষ্ণ কর্তৃক 'কবিভূষণ' উপাধি পেয়েছিলেন। জীবনকৃষ্ণের কাব্যে বেহুলা 'বেললি' বলে নামাঙ্কিত। কবির অনবদ্যতা ফুটে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বর্ণনায়।***

জীবনকৃষ্ণের কাব্যে বেশ কয়েক জায়গায় নতুন তথ্যের আমদানি ঘটেছে। বেহুলা তাঁর কাব্যে 'বেললি' বলে নামাঙ্কিত। তার পিতার নাম বাহো সদাগর। জননী মেনকা। বেললির সাত সহোদরের বদলে মাত্র এক ভাইয়ের উল্লেখ আছে, যার পিতার নাম শঙ্খধর। জীবনকৃষ্ণের কাব্যটি যথেষ্ট আয়তনসমৃদ্ধ। কবি সংস্কৃত জানতেন। ভাষার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে তৎসম শব্দের ব্যবহারে। তবে সেই ব্যবহার কোথাও রচনাকে আড়ষ্ট করে তোলেনি। চরিত্রনির্মাণ গতানুগতিক। করুণরসের বর্ণনায় আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের কবিদের যে বিশিষ্ট প্রবণতা আদিরসের চর্চা — জীবন মৈত্রের কাব্য তা থেকেও বঞ্চিত নয়। বাণিজ্য-প্রত্যাগত শঙ্খধর গাঙুড়ের জলে স্বামী নিয়ে ভেসে চলা ভগিনী বেহুলাকে দূর থেকে চিনতে না পেরে প্রেম নিবেদন করে ও পরে সব বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়।

কবি সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যার পরিচয় মেলে তাঁর তৎসম বহুল কাব্যভাষায়। তবে তৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকলেও কোথাও তাঁর রচনা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট নয়। অলংকার প্রয়োগও সংস্কৃত রীতির অনুসারী। এ কাব্যের অঙ্গীরস করুণ এবং সে রসের বর্ণনায় জীবনকৃষ্ণ অনেকাংশে সফল। সনকা ও বেহুলার বিলাপে সেই সাফল্য টের পাওয়া যায়। কবির অনবদ্যতা ফুটে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বর্ণনায়। তাঁর কোন কোন স্থান পাঠকের মর্মকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়।

প্রশ্ন :

১। জীবনকৃষ্ণ মৈত্রর কাব্যে বেহুলার অপর নাম কি ছিল ?

১.২.৬.১.১০ : বিষ্ণু পাল

সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা বিষ্ণু পালকে মনসামঙ্গলের অপ্রধান কবির তালিকায় গণ্য করেছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ তাঁর কাব্যের মান ও জনপ্রিয়তা। বিষ্ণু পালকে অনেকেই সপ্তদশ শতকের কবি বলে নির্দেশ করার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ তাঁর ভাষায় এই সময়ের ছাপ বর্তমান। বিষ্ণু পালের কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দেন অধ্যাপক সুকুমার সেন। কবির পুথিটি আবিষ্কৃত হয় সেহাড়া গ্রামের এক ধীবরের বাড়ি থেকে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণু পালের পুথির অনুলিপিগুলি পাওয়া গেছে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চলে ও বীরভূমে। অনুমান, কবি এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। 'পাল' পদবী দেখে সুকুমার বাবুর সিদ্ধান্ত কবি কুম্ভকার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে দু'একটি বিশেষত্ব নজরে পড়ে। তিনি সৃষ্টিপ্রকরণের যে বিবরণ দিয়েছেন সে ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ। ধর্ম উপাসনা পদ্ধতির কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। অপর

দিকে এই কাব্যে চন্ডীমঙ্গলের ছায়াও দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তরবঙ্গের কবি মানিকদত্তের লঘুছন্দের প্রভাব এ রচনায় বর্তমান। কোথাও কোথাও তিনি মানিকদত্তের রচনাকেও আত্মসাৎ করেছেন। চন্ডীমঙ্গলে যেমন আটটি পালা রয়েছে, বিষ্ণু পালও তেমনি তাঁর কাব্যকে অষ্টমঙ্গলায় বিভক্ত করেছেন। হাসান-হোসেন পালা বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন মুসলমান সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে। তবে এ রচনায় কয়েকটি দোষ-ত্রুটি ভয়ানক ভাবে উপস্থিত। রচনাটিতে তেমন বাঁধুনি নেই। ছন্দ বড়ই শিথিল, সর্বত্র পয়ারে অক্ষর সমতা দেখা যায় না। মিলের ক্ষেত্রেও কবি অমনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষায় রয়েছে বিপুল মাত্রা আঞ্চলিকতা যা সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায়। বীরভূম অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রয়োগ কাব্যকে সামান্য বিশিষ্ট করে তুলেছে। আর আছে প্রচুর লোকোক্তি, মেয়েলি ছড়া। প্রহেলিকা জাতীয় পদগুলিতে কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমান। তবে এত করেও শেষরক্ষা হয়নি। কাব্যটি পাঠকমনে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য—"বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল নিতান্তই গ্রাম্য মন ও গ্রাম্য পরিবেশের জন্য রচিত হইয়াছিল। কাজেই ভাষার পরিপাট্য ইহাতে নাই বলিলেই চলে, রসরুচিতে কবি গ্রাম্যভাব ছড়াইতে পারেন নাই। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের জন্য একাব্য সাধারণ পাঠক সমাজেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।"

১.২.৬.১.১১ : ষষ্ঠীবর দত্ত

শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই কবির প্রচুর জনপ্রিয়তার কারণে অনেকে মনে করেন ইনি ওই অঞ্চলের অধিবাসী। বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা বসন্তকুমার সেনগুপ্তের মতে, ষষ্ঠীবর ছিলেন বৈদ্যবংশসম্ভূত এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলবীবাজার মহকুমার অধীনে গয়গড় গ্রামে। তাঁদের আদি নিবাস রাঢ় দেশে। বল্লাল সেনের সময়ে তাঁদের পূর্বপুরুষরা রাঢ় ছেড়ে শ্রীহট্টে বসবাস শুরু করেছিলেন। ষষ্ঠীবরের পিতার নাম ভুবনানন্দ, পিতামহ পুরুষোত্তম। তিনি নাকি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি পেয়েছিলেন, যদিও কাব্যের মধ্যে এর কোন উল্লেখ নেই। কাব্যের ভাষাবিচার করে অধিকাংশ পন্ডিত অষ্টাদশ শতককেই কবির আর্বিভাব কাল বলে নির্দেশ করেছেন।

ষষ্ঠীবরের কাব্যে তেমন কোন বিশিষ্টতা নেই। অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর কাহিনী-চরিত্র-রস অনেকাংশে নিষ্প্রভ। পুষ্পচয়নকালে শিবের সংস্পর্শে গৌরীর বিস্রস্ত হয়ে পড়া কিংবা কাপালিকের ছদ্মবেশে গৌরীর সঙ্গে শিবের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি অংশ আপাতভাবে তাঁর কল্পনাবৃত্তির অভিনবত্বের সূচক হলেও আসলে এ ভাবনার মূলে রয়েছে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্য। এই কাব্যে তেমন পাঠযোগ্য গুণের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সূচনাংশে শব্দের প্রয়োগ আলাদা ভাবে নজর কাড়ে। কেউ কেউ ষষ্ঠীবরের রচনায় দেখেছেন ভারতচন্দ্রের প্রভাবও। পূর্ববঙ্গের কবি হলেও এর লেখায় নারায়ণ দেবের প্রভাব অনুপস্থিত। কাব্যটিতে দেব ও বণিকখন্ড তো আছেই, অতিরিক্ত ভাবে আছে স্বর্গারোহণ খন্ড। এই অংশে অভিশপ্ত ঊষা ও অনিরুদ্ধ ফিরে যাচ্ছে স্বর্গলোকে, যারা এতকাল বেহুলা ও লখিন্দররূপে মর্তে দেবীর পূজা প্রচারে ব্যস্ত ছিল। ষষ্ঠীবরের লেখায় কৌতুক রসও কম নেই। নাতিনী-স্থানীয়া বেহুলার সঙ্গে শিবের রঙ্গপরিহাস বেশ উপভোগ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। তবে কাব্যটিতে ব্যাপক পরিমাণে শ্রীহট্টের ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় এই অঞ্চলের বাইরে এ কাব্যের প্রচার তেমন হতে পারেনি।

১.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। মনসামঙ্গলের প্রথম কবির নাম উল্লেখ করো এবং অন্যান্য কবি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। বিজয় গুপ্তের কাব্যটির নাম কি? তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উল্লেখ করো।

৪। চাঁদ সদাগর চরিত্র চিত্রণে মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

৫। টীকা লেখ : (ক) কানা হরিদত্ত (খ) বিজয় গুপ্ত (গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) নারায়ণ দেব (ঙ) দ্বিজ বংশীদাস (চ) কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ (ছ) তন্ত্র বিভূতি (জ) জগজ্জীবন ঘোষাল।

১.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়)—শ্রী সুকুমার সেন

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস—ক্ষেত্র গুপ্ত

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম)—শ্রীভূদেব চৌধুরী

পর্যায় গ্রন্থ্ - ২

একক - ৭

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ

বিন্যাস ক্রম

১.২.৭.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

- ১.২.৭.১.১ মানিক দত্ত
- ১.২.৭.১২ দ্বিজমাধব
- ১.২.৭.১.৩ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী
- ১.২.৭.১.৪ দ্বিজরামদেব
- ১.২.৭.১.৫ মুক্তারাম সেন
- ১.২.৭.১.৬ ভবানীশঙ্কর দাস
- ১.২.৭.১.৭ দ্বিজ মুকুন্দ
- ১.২.৭.১.৮ রামানন্দ যতি

১.২.৭.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.২.৭.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৭.১ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

পন্ডিতদের ধারণা, পুরুষ-প্রধান আর্যসংস্কৃতিতে যেমন পুরুষ-দেবতাদের প্রাধান্য ছিল, তেমনি প্রাগার্য সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছিল নারী-দেবতাকেন্দ্রিক চিন্তা। কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নারীদেবতা-কেন্দ্রিক ভাবনা একদা সক্রিয় ছিল, দেখা দিয়েছিল প্রাচীন মাতৃকেন্দ্রিক উপাসনা। প্রাচীন ভারতবর্ষের মাতৃকামূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাগার্য সংস্কৃতির মধ্যে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি অন্যতম। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে যেসব শিলমোহর পাওয়া গিয়েছে তাতেও মিলেছে প্রাচীন দেবীমূর্তির কল্পনা। বেদে দেবতারা প্রধান হয়ে উঠলেও দেবীরা পুরোপুরি অপাংক্তেয় কিংবা অনুল্লেখিত নন। ঊষা, রাত্রি, পৃথিবী প্রভৃতি দেবীর অস্তিত্বের কথা সেখান থেকে জানা যায়। উপনিষদের যুগে মেলে কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারীর উপাসনার কথা। আর পুরাণে বিপুল সংখ্যায় দেখা দিলেন দেবীরা। নামে ও রূপে ভিন্ন হলেও এঁরা শক্তি ও ভাবে সেই নিত্যা সনাতনীকেই দ্যোতিত করতে থাকেন। দেবী চন্ডী পৌরাণিক কালেরই এক নারী দেবতা, যাঁর মূর্তি ও ভাবনায় নানা সময়েই চিন্তাস্রোত এসে একীভূত হয়েছে।

দেবী চন্ডীর উদ্ভব সম্পর্কে কমপক্ষে তিনটি উৎসের কথা বলেন বিদগ্ধ বাঙালি পন্ডিত সমাজ। এগুলি হল - ১) ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম, ২) অনার্য আদিবাসীদের ধর্মজগৎ ও ৩) হিন্দু পুরাণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। বৌদ্ধধর্মের আদিযুগে কোন

পুরুষ-প্রধান আর্যসংস্কৃতিতে যেমন পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য ছিল, তেমনি প্রাগার্য সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছিল নারী দেবতা কেন্দ্রিক চিন্তা। প্রাচীন ভারতবর্ষে মাতৃকা মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল। দেবী চণ্ডী পৌরাণিক কালেরই এক নারী দেবতা। দেবী চণ্ডীর উদ্ভব সম্পর্কে তিনটি উৎসের কথা বলেন বাঙালি পণ্ডিত সমাজ। এগুলি হল (১) ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম, (২) অনার্য আদিবাসীদের ধর্মজগৎ ও (৩) হিন্দু পুরাণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। ব্রজযানী বৌদ্ধরা 'ব্রজতারা' নামে এক দেবীর কল্পনা করেন। অনেকের মতে ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাও সমাজের দেবী 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে চণ্ডী নাম ধারণ করেছেন। চণ্ডীপূজার মুখ্য উপাচার ধেনোমদ ও ছাগল। এই উৎসসূত্রে মনে হয় চণ্ডী হলেন অরণ্য পশুদের দেবতা। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে দেবীর মৃগীরূপ, গোধিকারূপ, ষোড়শী কন্যার রূপ ধারণ লক্ষ্য করা যায়।

দেবদেবীর অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু পরে হিন্দুধর্মের প্রভাবে বজ্রযানে নানা মূর্তি পরিকল্পিত হয়। বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে এক দেবীর কল্পনা করেন। ইনি বিশালাক্ষী বা পর্ণশবরী নামেও পরিচিতা। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, চন্ডীমঙ্গলের চন্ডী এই বৌদ্ধ দেবীরই হিন্দু রূপান্তর মাত্র। এই সম্পর্কিত আর একটি মত হল, বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত নীল সরস্বতীই মঙ্গলকাব্যের মডেল বা প্রতিরূপ। 'বৌদ্ধসাধনমালা'র ১৩৬ নং স্তোত্রে 'বজ্রধাত্বেশ্বরী' নামে যে দেবীর ধ্যান পাওয়া যায় তার সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায় চন্ডীর বাহ্য অবয়ব। অন্যদিকে

প্রশ্ন :

১। দেবী চণ্ডীর উদ্ভব সম্পর্কে কমপক্ষে কতগুলি উৎসের কথা বলা হয় ? তাদের নাম কি ?

'মঙ্গলচন্ডীর গীত' এর সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মনে করেন, বজ্রতারা কিংবা বজ্রধাত্বেশ্বরীর তুলনায় বৌদ্ধ 'বজ্রশারদা', 'নীলতারা', ও 'জাঙ্গুলীতারা'-র সঙ্গে মঙ্গলচন্ডীর সাদৃশ্য অনেক বেশি। দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী পন্ডিতদের বক্তব্য, ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাও সমাজের দেবী 'চান্ডী' বাংলায় এসে চন্ডী নাম ধারণ করেছেন। ওঁরাও সমাজে এই দেবীকে পূজা করা হয়ে থাকে পশুশিকারে সাফল্য ও যুদ্ধে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে। চন্ডীপূজা করা হয়ে থাকে মাঘী পূর্ণিমায় যার মুখ্য উপাচার ধেনোমদ ও ছাগল। এই উৎসসূত্রে মনে হয় চন্ডী হলেন অরণ্য পশুদের দেবতা। অভয়ামঙ্গলের আখ্যানেও সেটা মেলে। কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনের পশুরা আত্মরক্ষার্থে দেবীর শরণাপন্ন হলে তিনিই তাদের কৌশলে রক্ষা করেন। অনার্য দেবভাবনায় দেবতার বারবার রূপপরিবর্তন অন্যতম বিশেষত্ব। চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে দেবীর মৃগীরূপ, গোধিকারূপ, ষোড়শী কন্যার রূপ, জরতী ব্রাহ্মণের রূপ কিংবা মহিষমর্দিনীর রূপ-ধারণ এই বৈশিষ্ট্যকে প্রবল ভাবে তুলে ধরে এবং তিনি যে অনার্য ধর্মবিশ্বাসের জগৎ থেকে উদ্ভুত এই বিশ্বাসকে পাকা করে তোলে।

চণ্ডী মূলে নারী সমাজেরই দেবতা। চণ্ডী কখনও উমা — শিবপত্নীর কল্যাণীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা ; আবার কখনো এঁকে লক্ষ্মী বলে ভ্রম জন্মায় — কেননা তিনি ধন ও ঐশ্বর্যদাত্রী। আবার ইনিই দুর্গা, ইনিই মহিষমর্দিনী দশভূজা, ইনিই মহাকালী কখনো বা সরস্বতী। চণ্ডীর দেবীত্বের সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি আখ্যান। একটিতে রয়েছে ব্যাধসন্তান কালকেতুর প্রতি দেবীর অহৈতুকী কৃপা, অন্যটিতে রয়েছে ধনপতি সদাগরের সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধ ও সবশেষে বিবাদ-নিষ্পত্তি। কালকেতু পালায় দেবী অরণ্য জন্তুর রূপ ধারণ করেছেন। আর বণিকখণ্ডের কমলেকামিনী আখ্যান থেকে অনুমিত হয় দেবী চিন্তার সঙ্গে, একদা বণিক সমাজ ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির নিবিড় যোগ ছিল।

চন্ডীর পৌরাণিকতা নিয়েও কম আলোচনা হয়নি বিদগ্ধমহলে। তাঁর মাতৃরূপকল্পনায় এই পৌরাণিকতার প্রাথমিক সূচনা। কখনও ইনি উমা — শিবপত্নীর কল্যাণীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা; আবার কখনো এঁকে লক্ষ্মী বলে ভ্রম জন্মায় - কেননা তিনি ধন ও ঐশ্বর্যদাত্রী। আবার ইনিই দুর্গা, ইনিই মহিষমর্দিনী দশভূজা, ইনিই মহাকালী কখনো বা সরস্বতী। অন্যান্য পুরাণে দেবীর উল্লেখ থাকলেও চন্ডীর দেবীত্বের সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে মার্কন্ডেয় পুরাণে। এখানে তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাকে শিবগৃহিণী চন্ডীরই রূপভেদে বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলা চন্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির সৃষ্টি শিবজায়া চন্ডীর মাহাত্ম্যকথাকে ঘিরে। মনসা যেমন সর্পের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতিদানের দেবীরূপে কল্পিত, চন্ডী তেমনি বিবেচিত হয়েছেন ধনৈশ্বর্য লাভের দেবীরূপে। চন্ডীমঙ্গলের দুটি আখ্যান। একটিতে রয়েছে ব্যাধসন্তান কালকেতুর প্রতি দেবীর অহৈতুকী কৃপা, অন্যটিতে রয়েছে ধনপতি সদাগরের সঙ্গে চন্ডীর বিরোধ ও সবশেষে বিবাদ-নিষ্পত্তি। শেষোক্ত আখ্যানটি মনসা মঙ্গলের গল্পের কাঠামোর সঙ্গে তুলনীয়। কালকেতু পালায় দেবীর আরণ্যক স্বভাব পরিস্ফুট। তিনি অরণ্যপশুর রক্ষাকর্ত্রীতে পরিণত।

নিজেও দু একবার অরণ্যজন্তুর রূপ (হরিণ ও গোধা) ধারণ করেছেন ছলনা করার উদ্দেশ্যে। গোধার সূত্র ধরে পন্ডিতেরা এই দেবীতে অনার্যপ্রভাবকে পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত উদ্ধৃত করি ঃ "যে সকল আদিম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্রমে ক্রমে নানাভাবে গোধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে আর্য-গৌরীরূপে সংস্কৃত প্রতিমা লক্ষণে স্থান পাইলেন।" ধনপতির আখ্যান-সূত্রে এই দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে আরো দুএকটি কথা জানা যায়। মনসার মতো ইনিও সর্বপ্রথম পুরুষসমাজে অর্চনীয়া ছিলেন না। পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে গৃহবধূরাই ঘটে ও পটে এঁর পূজা করতেন গৃহের মঙ্গলের কারণে। এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ও দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে — 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা'। অর্থাৎ চন্ডী মূলে নারীসমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি অনুমানের দিকে আমাদের ঠেলে দেয়। চন্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি সরাসরি বৈদিক সংহিতায় ও আদিপর্বের পুরাণগুলিতে উল্লেখিত হলেন না? অন্ত্যজ সমাজের আরাধ্যা বলেই কি পুরুষ সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীজাতির প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? অন্যদিকে, গোধাসনা গৌরীমূর্তিই যে নারীপূজ্যা দেবী তা-ও মন্ডন সূত্রধারের 'রূপখন্ডন' গ্রন্থের প্রতিমা লক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে — 'গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যাশ্রিয়ে সদা'। আর বণিকখন্ডের 'কমলে কামিনী' আখ্যান থেকে অনুমিত হয় দেবীচিন্তার সঙ্গে একদা বণিক সমাজ ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির নিবিড় যোগ ছিল, বিশেষ করে গজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গটি যেভাবে এসেছে তার বিশ্লেষণ সূত্রে অধ্যাপক সুকুমার সেন এইরকম একটি ধারণায় পৌঁছেছেন। যাইহোক, এ বিষয়ে সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, বঙ্গদেশে পনেরো শতকের আগেই চন্ডীমঙ্গলের গীত অষ্টমঙ্গলা হিসেবে গাওয়া শুরু হয়ে যায় যার প্রমাণ মেলে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'- এ চৈতন্য পূর্ববতী' নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মকর্মের বর্ণনায়। চন্ডীমঙ্গলের কোন আখ্যানই পুরাণ থেকে গৃহীত নয়, কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণে চন্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীর প্রসঙ্গকথা বীজরূপে পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

> ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি
> যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচন্ডিকাখ্যা।
> শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং সসূনো
> রক্ষোহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতি বমন্তী ।।

বাঙালী কবিদের হাতে চন্ডীমঙ্গল কাব্যরূপ পাওয়ার আগে সম্ভবতঃ এই দেবীর মাহাত্ম্যকাহিনী ব্রতকথার আকারে সমাজে প্রচলিত ছিল। চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় যে সমস্ত কবিরা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন এখানে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রশ্ন :

১। চণ্ডীমঙ্গলের কটি আখ্যান, সেগুলির নাম কি ?
২। চণ্ডীর বিভিন্ন নাম গুলি কি ?

১.২.৭.১.১ : মানিক দত্ত

চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি বোধ হয় মানিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মানিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন — "মানিক দত্তেরে

আমি করি যে বিনয়। / যাহা হৈতে গীত-পথ পরিচয়।।" মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কোন্ সময়ের রচনা তা এখনো নিঃসংশয়িতভাবে স্থিরীকৃত হয়নি। কাব্যের ভাষা বিচার করে গবেষকগণ ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী বলতে রাজী নন। আবির্ভাবকালের মতো কবির জন্মস্থানও আঁধারে ঢাকা। তবে অনেকের ধারণা তিনি ছিলেন মালদহের ফুলবাড়ী গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পুথিও মিলেছে ওই জেলা থেকে। তাঁর কাব্য এই জেলায় এত জনপ্রিয় যে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা স্থানীয় মানুষেরা পাঠ করে থাকে। কবির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, কবি প্রথম জীবনে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। ব্যাধিমুক্ত হন দেবীর কৃপায়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি পুথি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ে দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়ানোর জন্য রঘু ও রাঘব নামে দুই দোহারকে নিয়ে দল বাঁধেন এবং এদের নিয়ে কলিঙ্গে গিয়ে কলিঙ্গরাজের কুনজরে পড়ে প্রথমে কারারুদ্ধ হন ও পরে মুক্তি পান।

> ***চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত। তবে অনেকের মতে তিনি ছিলেন মালদহের ফুলবাড়ী গ্রামের অধিবাসী। কবি প্রথম জীবনে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। পরে ব্যাধিমুক্ত হন দেবীর কৃপায়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুঁথি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ ও বণিকের দুটি আখ্যানই আছে। কবির বর্ণনা মতে, নিরঞ্জন থেকে সৃষ্ট আদ্যাই হলেন চণ্ডী। কাহিনী ও চরিত্র রচনায় মানিক দত্তের কাব্যে সুষম ঐক্যের অভাব আছে যথেষ্ট।***

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ ও বণিকের দুটি আখ্যানই আছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। সূচনায় রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেছেন যে তাঁর রচনাটি প্রাচীন। কিন্তু মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরার গানে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবির বর্ণনা মতে, নিরঞ্জন থেকে সৃষ্ট আদ্যাই হলেন চণ্ডী। ধর্মের আদেশে মহাদেব আদ্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন।

কালকেতু ও ধনপতি পালার কাহিনী ও চরিত্র রচনায় কবির বিশেষত্ব তেমন নজরে পড়ে না। শিবনিন্দার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, কেবল দক্ষ নন, দক্ষ পত্নী প্রসূতিও জামাতার প্রবল নিন্দা করেছিলেন। ধনপতির গল্পে লহনা ও খুল্লনার সম্পর্ক বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের সতিনী কোন্দলের যথার্থ রূপটি এখানে ধরা পড়েছে। তবে সামগ্রিক বিচারে, বণিক খণ্ডটি আখেটিক খণ্ডের তুলনায় সুপরিকল্পিত। চরিত্রসৃষ্টি ভীষণই গতানুগতিক। কেবল ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি সামান্য পরিমাণে উজ্জ্বল। সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেছেন যে, কাব্যটি জনসাধারণের জন্য লেখা হয়েছিল বলেই যেন একটু ছড়াবহুল। সবশেষ কথা এই যে, মাণিক দত্তের কাব্যে সুষম ঐক্যের অভাব আছে যথেষ্ট। এর ভাষা এবং ছন্দও সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন :

১। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবির নাম কি ?
২। তিনি কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন ?

১.২.৭.১.২ : দ্বিজ মাধব

চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে অন্যতম হলেন দ্বিজ মাধব। অবশ্য কবির জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে। কবিপ্রদত্ত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় গঙ্গানদী-পার্শ্ববর্তী ত্রিবেণীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল; অর্থাৎ তিনি আদতে পশ্চিমবঙ্গবাসী। পরে মোগল-পাঠানের রাজনৈতিক বিরোধ তাঁকে স্বগ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে এবং

তিনি চট্টগ্রামে উপনিবিষ্ট হন। অবশ্য কবির কাব্যের সব পুথিই মিলেছে চট্টগ্রাম, রংপুর, নোয়াখালি, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। দ্বিজ মাধবের কবি-ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবাচার্যের সঙ্গে। দুইজন কবিই ছিলেন চৈতন্য-পরবর্তী এবং মাধবাচার্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ তাঁকে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের অধিবাসী বলে দাবি করেন।

> ***চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বিজমাধব। কবি প্রদত্ত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় গঙ্গা নদী-পার্শ্ববর্তী ত্রিবেণীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদাচরিত'। তবে ভণিতায় 'সারদামঙ্গল' বলেও অভিহিত করেছেন। কবিকঙ্কন পূর্ববর্তী সময়ে দ্বিজ মাধবই চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। দ্বিজ মাধব চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ছিলেন। তার প্রমাণ যত্রতত্র বিষ্ণুপদের প্রয়োগ। চরিত্র চিত্রণেও তিনি বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।***

দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদাচরিত'। এ নাম স্বয়ং কবির দেওয়া। তবে কবি ভণিতায় কোথাও কোথাও 'সারদামঙ্গল' বলেও অভিহিত করেছেন। অথচ অধ্যাপক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য যখন এই কাব্যটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন, আখ্যান অনুসারে নাম দিলেন 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। এ কাব্যরচনার সময় নিয়ে কিছু সংশয় আছে। পুথিতে হেঁয়ালি-শ্লোক পাওয়া যায় এইরকম — 'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।/ দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত।।' অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু গোল বেধেছে আকবরের উল্লেখে। কেননা ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যাইহোক, পুথির উল্লেখ-সূত্রে এ কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত।

কবিকঙ্কণ পূর্ববর্তী সময়ে দ্বিজ মাধবই চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। কাহিনীর বিন্যাসে চরিত্রের উপস্থাপনায়, কাব্যভাষায় সংরচনায় তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যটি আদ্যোপান্ত পড়লে কবির বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন সংশয় তৈরী হয় না। তাঁর পুরাণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ। দেবখণ্ডে মঙ্গলাসুর দৈত্যবধের আখ্যানটি পুরোপুরি কবির নিজস্ব কল্পিত। এজন্য তাঁর দেবী অভয়া চণ্ডী নন, মঙ্গলচণ্ডী, সারদাচরিতে একাধিক ধর্মাদর্শেরও সমাপতন ঘটেছে। আছে তন্ত্র ও যোগের প্রসঙ্গ, ধর্মঠাকুরের পূজার কাহিনী, এমনকি বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ। দ্বিজমাধব যে চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়ে গেছে যত্রতত্র বিষ্ণুপদের প্রয়োগে।

সারদাচরিতের নরখণ্ড দুটিতে দ্বিজ মাধব তাঁর সিদ্ধির সীমা স্পর্শ করেছেন। কবিকঙ্কণের মতো অতটা না হলেও যথেষ্ট বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বরং কোন কোন স্থানে দ্বিজ মাধব প্রকৃত বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। যেমন, কালকেতুর বিবাহে অনার্যরীতির বর্ণনা কিংবা হাটের মাঝে ভাঁড়ুর কোঁচড় থেকে টানাটানিতে কানা পয়সা পড়ে যাওয়া। কবির বর্ণনারীতিও যথেষ্ট স্বাভাবিক। ভাঁড়ুর ভাঁড়ামি , শঠতা, খুল্লনা ও ফুল্লরার নারীত্ব প্রভৃতির বর্ণনায় যে সজীবতা ফুটে উঠেছে তা খুবই মনোগ্রাহী। পরিবেশ চিত্রণে নজর দিয়েছেন খুঁটিনাটির দিকে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'মাধুর ভাঁড়ুদত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু হইতে যাবতীয় প্রবীণ;মাধুর কালকেতু মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী।' একথার প্রমাণ পাওয়া যায় কলিঙ্গরাজ্যের বিরুদ্ধে কালকেতুর যুদ্ধে। মুকুন্দের কাব্যে যেখানে স্ত্রীর কথায় সে ধান্যঘরে আত্মগোপন করে থাকে, সেখানে দ্বিজমাধবের কালকেতু স্ত্রীর সেই পরামর্শ শুনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়, কেননা একথায় তার বীরধর্ম আহত হয়। সে সগর্জনে বলে - "করে নৈয়া শর গাণ্ডী/পূজিব মঙ্গল চণ্ডী/ বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর।। যতেক দেঘহ অশ্ব/সফল করিব ভস্ম/কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।" সত্যই তো, বীর বিক্রমী কালকেতুর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। এমন স্বাভাবিক সৃষ্টি তাঁর ভাঁড়ু কিংবা দুর্বলা। আসলে এ কবির আয়ত্তে ছিল প্রখর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। বাস্তবকে যেমন রুক্ষতায়, অনুপুঙ্খতায় তিনি দেখেছেন, কোন কিছু বাদ না দিয়ে সেভাবেই বানরের লেজসুদ্ধু অঙ্কন করেছেন। অনেকে

এর ফলে তাঁর রচনায় শিল্পসৌন্দর্যের অভাবই প্রত্যক্ষ করেছেন, কেননা তাঁদের মতে, কোন রচনাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে গেলে অনেক অবান্তরকে বর্জন করতে হয়। আসলে, দ্বিজ মাধব দায়বদ্ধ ছিলেন প্রখর ও নিখুঁত বাস্তবধর্মিতার কাছে, অন্যদের মতো কোন কৃত্রিম কাব্যসংস্কার তাঁর শিল্পীচেতনাকে আচ্ছন্ন করে ছিল না। নির্মিত শিল্পগুণের অভাবের দরুণ যদি তাঁর রচনায় কিছু অসংগতি এসে থাকে, তবে তাকে তাঁর কবিস্বভাবের ত্রুটি বলেই গণ্য করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সকল কবিকেই আদর্শের ছাঁচে ফেলে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। দ্বিজ মাধবের কাব্যভাষার মধ্যে কোথাও পণ্ডিতিয়ানার চেষ্টা নেই, নিতান্তই সাদাসিধে বাস্তবকে আঁকাড়া হিসেবে উপস্থিত করায় সে ভাষায় লেগে আছে কাদামাটির সোঁদা গন্ধ। দ্বিজ মাধব সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি সদর্থক মূল্যায়ন দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা যায় — "তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাঙালী জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমিকার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য চিত্র বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন।"

প্রশ্ন :

১। দ্বিজমাধবের কাব্যটির নাম কি ?

২। দ্বিজমাধব কোন সময়ের কবি ছিলেন ?

১.২.৭.১.৩ : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে যাঁর কাব্য সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সাহিত্যগুণে বিশিষ্ট তিনি হলেন দামিন্যার কবি মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। 'কবিকঙ্কণ' তাঁর উপাধি - যা সর্বোত্তম কাব্য রচনার কারণে তিনি লাভ করেছিলেন বলে অনুমিত। মুকুন্দের কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে পরিচিত হলেও তিনি ভণিতায় বারে বারে উল্লেখ করেছেন 'অভয়ামঙ্গল' নামটি। কাব্য-সূচনায় কবি তাঁর সমকালীন ইতিহাসের যে টুকরো তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে মনে হয়, বাংলায় মুঘল শাসনের সূচনাভাগে এ কাব্য লিখিত হয়। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ কিংবা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে অভয়ামঙ্গল সমাপ্তি লাভ করে। কবির দেওয়া বিবরণী থেকে জানা যায়, তাঁর পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামিন্যায়। রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে স্বগ্রাম ছেড়ে তিনি চলে যান এবং গৃহশিক্ষক হিসাবে আশ্রয় পান মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ির অন্তর্ভুক্ত আরড়াতে। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরড়ার ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়। তাঁর পুত্র রঘুনাথের রাজত্বকালে কবি চণ্ডীমঙ্গল লেখেন। কাব্যের মধ্যে পৃষ্ঠপোষক এই দুই সামন্তপ্রভুর নাম উল্লেখ করতে ভোলেননি কবিকঙ্কণ।

চণ্ডীমঙ্গল দেবতার কাহিনী, কিন্তু কবি মুকুন্দ এ কাব্যে বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষকে। এমনকি দেবচরিত্রগুলি দোষে-গুণে-আচরণে মর্ত্যের ধূলিধূসরিত সাধারণ মানবে পরিণত হয়ে গেছে। কবিকঙ্কণ তাঁর বর্ণিতব্য বিষয় ও চরিত্রকে পেয়েছিলেন ঐতিহ্যের সাধারণ ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু তাদের রূপ দিয়েছিলেন তাঁর কল্পনাবৃত্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী। মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত রীতি মেনেও তিনি ছিলেন রচনাকর্মের দিক থেকে প্রাতিস্বিক। তাঁর মধ্যে কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছে গার্হস্থ্যরসের প্রতি আত্যন্তিক অনুরক্তি - যার চিহ্ন রয়ে গেছে তাঁর দ্বিবিধ আখ্যানে।

মুকুন্দের কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল রসসিক্ত বাস্তবতা। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী কবি। দেবতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া মানুষকে এত চমৎকার ভাবে তুলে এনেছেন, যার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত কেবল পাওয়া

যায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে। বাস্তবতা প্রধানতঃ বস্তুর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, তিনি বস্তুর কারবারী ছিলেন না, ছিলেন বাস্তব রসের অনবদ্য কারিগর। জীবনের কাহিনী রূপায়ণে বাস্তবকে তুলে ধরেছেন স্বাভাবিক শিল্পসৌন্দর্যে। ফলে তুচ্ছ বিষয়গুলিও সৌন্দর্যে দীপ্তিমান হয়ে হয়েছে পরম রমণীয় ও উপভোগ্য। তাঁর কাব্যে এমন সরস বাস্তবতা উপস্থিত থাকার কারণে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন — "এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।" কেননা উক্ত প্রাজ্ঞ সমালোচক মনে করেন, উপন্যাসের অন্যতম উপকরণ হল বাস্তবতা। এ ছাড়াও আরো চারটি বিশেষ লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলের। সেগুলি হল — "স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব চিত্র, দক্ষ চরিত্রাঙ্কন, কুশল ঘটনা সন্নিবেশ ও আখ্যায়িকা এবং চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন"। যদিও চন্ডীমঙ্গলে বাস্তবতা আর অলৌকিকতা হাত ধরাধরি করে চলেছে তবুও ভাল ঔপন্যাসিকের কাছে প্রত্যাশিত গুণগুলি তাঁর রচনায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার জনপ্রিয় কবি হলেন বর্ধমান জেলার দামিন্যার কবি মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। 'কবিকঙ্কণ' তার উপাধি। মুকুন্দের কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে পরিচিত হলেও তিনি ভণিতায় বারে বারে 'অভয়ামঙ্গল' নামটি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে 'অভয়ামঙ্গল' সমাপ্তি লাভ করে। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাঁকুড়া রায়। তাঁর পুত্র রঘুনাথের রাজত্বকালে কবি চণ্ডীমঙ্গল লেখেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' দেবতার কাহিনী, কিন্তু কবি মুকুন্দ এ কাব্যে বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষকে। মুকুন্দ ছিলেন বাস্তবরসের অনবদ্য কারিগর। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন —"এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।" উপন্যাসের অন্যতম উপকরণ হল বাস্তবতা। তবে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র নয়, টাইপ চরিত্র রচনায় কবিকঙ্কণের সর্বাধিক সিদ্ধি। তাঁর রচিত কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত কিংবা দুর্বলা দাসী অনন্য। গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনে নানা বর্গের বৃত্তিধারী মানুষের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় তিনি ঔপন্যাসিকের মতো নিখুঁত বর্ণনার পরিচয় দিয়েছেন।

কবি মুকুন্দের ক্ষমতার সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটেছে চরিত্র সৃষ্টিতে। একজন জীবনবাদী ঔপন্যাসিক জীবনচিত্র অঙ্কনে যে ধরনের প্রযত্ন স্বীকার করেন, কবিকঙ্কণের কাব্যে তা লক্ষ্য করা যায়। তবে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র নয়, টাইপ চরিত্র রচনায় কবিকঙ্কণের সর্বাধিক সিদ্ধি। তাঁর রচিত মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত কিংবা দুর্বলা দাসী অনন্য। মুরারি ও ভাঁড়ুর সজীবতা, চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা সমস্ত কাহিনীতে এত বেশি যে কালকেতু-ফুল্লরার চরিত্র এদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্জীব ও জড়প্রায় বলে মনে হয়। অধিকাংশ সমালোচক আখেটিক খন্ডের সাহিত্যরসের উৎস খুঁজে পেয়েছেন মুরারি ও ভাঁড়ুর ধূর্ততায়, শাঠ্যে, অভিনয়-পটুত্বে এবং দুষ্টবুদ্ধিতে। অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত কবিকঙ্কণকে বিবেচনা করেছেন গার্হস্থ্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে। এই বিবেচনা যে যথার্থ তার পরিচয় পাওয়া যায় সমগ্র আখ্যানে অনেকগুলি পরিবার রসের ঘটনাগ্রন্থনে ও তাদের সাহিত্য সার্থকতায়। কালকেতুর জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ, ভোজন ও শিকার আদ্যন্ত একটি গল্পের সীমারেখা টেনে দেয়। অন্যদিকে দেবখন্ডে শিব-পার্বতীর বিবাহ, সংসার জীবন, দারিদ্র্য, মাতা-কন্যার বিবাদ গার্হস্থ্য রসেরই পরিপুষ্টি সাধন করেছে। এমনকি আখেটিক খন্ডে বনের পশুদের গার্হস্থ্যজীবনও কবির বর্ণিতব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বণিক খন্ডটির প্রথমাংশ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনপতি সদাগরের দুই পত্নীর পারিবারিক ঈর্ষা দ্বন্দ্বের উপর। ধনপতির বণিক পরিচয়ের তুলনায় বেশি স্পষ্ট হয়েছে তাঁর গৃহী পরিচয় — তিনি পরিণত হয়েছেন সেকালের ভোগী বিলাসী পুরুষে। এইসব দৃষ্টান্ত-সূত্রে মনে হয়, বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কবির পৃথক

একটি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কবিকঙ্কণকে কেবল পরিবারতন্ত্রের কবি বলে নির্দেশ করলে তাঁর পরিচয়টি সমগ্রভাবে ধরা পড়ে না। তিনি একই সঙ্গে সেকালের সামাজিক জীবনের অন্যতম রূপকারও বটে। গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনকারী হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের নানা বর্গে বিন্যস্ত বৃত্তিধারীদের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় যে বাস্তববোধের পরিচয় দেন, সেটি একজন ঔপন্যাসিকের মতো নিখুঁত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই বিস্তৃত তালিকা থেকে সেকালের বাঙালীসমাজের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারা যায়।

প্রশ্ন :

১। কবি মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর উপাধি কি ছিল ? তাঁর জন্মস্থান কোথায় ?
২। মুকুন্দের কাব্যটির কটি খণ্ড। খণ্ডগুলির নাম কি ?
৩। আখেটিক খণ্ডের চারটি চরিত্রের নাম কর।

ভারতচন্দ্রের মতো আলাদা করে রসের উল্লেখ না করলেও কবিকঙ্কণ ছিলেন একজন সফল সাহিত্যরসের নির্মাতা। তাঁর কাব্যে হাস্য ও করুণ - দুটি রসেরই সমপ্রাধান্য বর্তমান। তবুও আখেটিক খন্ডের কাহিনী বিচার করে কেউ কেউ তাঁকে 'দুঃখবাদী' বলে নির্দেশ করেছেন। এটা ঘটনা যে এখানে দুঃখজনক ঘটনার পৌনঃপুনিক ব্যবহার ও তাদের আত্যন্তিক বর্ণনা কবিকে দুঃখবাদী হিসেবে তুলে ধরলেও তাঁর সত্তায় বা চেতনায় এর কোনও অভিক্ষেপ সৃষ্টি হয়নি। বর্ণনাগুলি ভাল করে খুঁটিয়ে পড়লে কোথাও কবির গভীর নৈরাশ্য ও অতলান্ত বেদনাবোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখি না। আসলে দুঃখের বর্ণনা আর দুঃখবাদ এক বস্তু নয়, ফলে এদের মাপকাঠিও স্বতন্ত্র। কবিকঙ্কণ কাব্যে কোথাও দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা কিংবা তত্ত্ব বানাবার চেষ্টা করেননি। দুঃখপূর্ণ ঘটনা নির্বাচনেও কবির নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল না কিছুই। অতএব এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করা যায় এই যে, দুঃখ ও বেদনার প্রসঙ্গগুলিকে তিনি এতটা সজীব প্রত্যক্ষতায় শিল্পমন্ডিত করে তুলেছিলেন যে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ আবিষ্কারে সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রম উৎপন্ন হয়েছে সহজেই।

অন্যদিকে চন্ডীমঙ্গলে দেবখন্ড ও দুটি নরখন্ড মিলিয়ে এক ডজনের ওপর হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ তৈরী করেছেন কবি। এগুলির অধিকাংশতেই কৌতুককর অসঙ্গতিই হাসির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতি। তাদের প্রাত্যহিক দুঃখদুর্দশার মধ্যে তিনি দেখেন হাসির অফুরন্ত উপকরণ। দাম্পত্যজীবনের নানা ঘটনায় সংসারের অভাবে ও দারিদ্র্যে, কোনও চরিত্রের শঠতায় কিংবা কৃতজ্ঞতায় তিনি আবিষ্কার করেন হাস্যরসের ফল্গুধারাকে। রসজ্ঞ পাঠকের কাছে চন্ডীমঙ্গল তাই হয়ে ওঠে একই সঙ্গে অলৌকিকতাযুক্ত ও বাস্তবতাকেন্দ্রিক ধর্মকাব্য।

কবিকঙ্কণ ছিলেন একজন সফল সাহিত্যরসের নির্মাতা। আখেটিক খণ্ডের কাহিনী বিচার করে কেউ কেউ তাঁকে 'দুঃখবাদী' বলে নির্দেশ করেছেন। আসলে দুঃখের বর্ণনা আর দুঃখবাদ এক বস্তু নয়, ফলে এদের মাপকাঠিও স্বতন্ত্র। কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দারিদ্র পীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতি। দাম্পত্যজীবনের নানা ঘটনায়, কোন চরিত্রের শঠতায় কিংবা কৃতজ্ঞতায় হাস্যরসের ফল্গুধারাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিকঙ্কণ কাব্যটির ভণিতায় 'নূতনমঙ্গল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একজন বাস্তববাদী কথাকারের নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি নিয়ে তিনি রচনা করে চলেছেন একটি আধিদৈবিক মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী।

কবিকঙ্কণ কাব্যটির কোন কোন ভণিতায় 'নূতন মঙ্গল' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এ প্রয়োগ কি আকস্মিক অথবা প্রথাগত? বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দেখা যায় যে, চন্ডীর মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্যে 'মঙ্গল' সাহিত্যধারার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমাহৃত হয়েছে। এখানে রয়েছে দেবখন্ড-নরখন্ডের সুস্পষ্ট বিভাজন, অভিশপ্ত দেবকুমার ও কুমারীরা এসে দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করে যাচ্ছেন, রয়েছে বারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহরীতির বিস্তৃত বর্ণনা, রন্ধন প্রণালী ও আহার্যের তালিকা ইত্যাদি। প্রথার এই ঘেরা টোপের মধ্যে অবস্থান করেও চক্রবর্তী কবি তাঁর পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে দিতে চেয়েছিলেন নতুনত্বের আস্বাদ। কবি নিজেই সচেতন ছিলেন কাব্যটির নির্মাণ ও আঙ্গিক বিষয়ে। বুঝেছিলেন, একজন বাস্তববাদী কথাকারের নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি নিয়ে তিনি রচনা করে চলেছেন একটি আধিদৈবিক মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী। সবশেষে আলোচ্য হয়ে ওঠে কবির কাব্যভাষার বিশেষত্বটি। অন্যান্য কবিদের মতো কবিকঙ্কণ ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। ফলে তাঁর ভাষা, অলংকারে এই সাহিত্যের প্রতি প্রবল আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছিলেন, কাব্যশাস্ত্রের অগাধ পঠন-পাঠনও তাঁর মনের জমি তৈরী করেছিল। তবুও ধ্রুপদী সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে তিনি কোথাও কোথাও প্রবেশ করেছেন লোকায়ত জীবনের পরিসরে। শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে বিসর্জন দিয়ে সেখান থেকে চয়ন করে এনেছেন অনেক আশ্চর্য উপমান। আর এইসব জায়গাতেই তাঁর মৌলিকতা ও কৃতিত্ব যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে। কবি বর্ণনার দিক থেকে ছিলেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। এর প্রমাণ মেলে শব্দের দ্বারা নিখুঁত চিত্র রচনায়। অলঙ্কার ছাড়াই যে সাধারণ বাক্যবন্ধে একটি গোটা ছবিকে তুলে ধরা যায় তা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাবে গুজরাট নগরে কালকেতুর সভায় ভাঁড়ু দত্তের প্রথম আগমনের দৃশ্যটাকে ঃ

"ভেট লয়্যা কাঁচকলা/ পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা/ আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ/ ছেঁড়া ধুতি কোঁচালম্ব/ শ্রবণে কলম খরসান॥
প্রণাম করিয়া বীরে/ ভাঁড়ু নিবেদন করে/ সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি/ মুখে মন্দ মন্দ হাসি/ ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।।"

কোনওরকম অলঙ্কার ব্যতিরেকেই ভাঁড়ুর রাজ-স্তাবকতা, গর্ব, দম্ভ, জাতি-বৃত্তি সহ পুরো মানুষটিকে বাস্তব থেকে অবিকল সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছেন কবি। এইরকম অজস্র টুকরো জীবন্ত ছবিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর কালজয়ী কাব্য চন্ডীমঙ্গল।

প্রশ্ন :

১। 'দুঃখবাদী' কবি কাকে বলা হয় ?
২। 'নূতনমঙ্গল' শব্দটি কবিকঙ্কণ কোথায় ব্যবহার করেছেন ?

১.২.৭.১.৪ : দ্বিজ রামদেব

চন্ডীমঙ্গলের ধারার আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব। এঁর আবির্ভাব সপ্তদশ শতকে, কাব্য লেখেন ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। ভণিতায় দু একবার 'সারদাচরিত' নামটিও উল্লেখিত আছে। কবি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানান নি। কেবল 'দ্বিজ' শব্দের প্রয়োগে জানা যায় যে, কবি ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম বলেছেন কবিচন্দ্র। এটি উপাধি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। দ্বিজরামদেবের কাব্যটি নোয়াখালি থেকে আবিষ্কার করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ দাস এবং ১৯৫৭ সালে তিনি এটি সম্পাদনা করে প্রকাশও করেন।

> *চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব সপ্তদশ শতকে, অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীঃ 'অভয়ামঙ্গল' নামে কাব্য লেখেন। রামদেবের কাব্য তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে রয়েছে সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনা। দ্বিতীয়ভাগে গঠিত হয়েছে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী দিয়ে। তৃতীয়খণ্ডে মেলে বণিক ধনপতির আখ্যান।*

দ্বিজ রামদেবের কাব্যটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একটা বিষয় অবশ্যই সচেতন পাঠককে বিদ্ধ করবে। সেটি হল পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের প্রায় প্রতি পদে পদে অনুসরণ। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দুই কবিই ছিলেন পূর্ববঙ্গ তথা চট্টগ্রামের কবি। ফলে দ্বিজ মাধবের কাছে ঋণী হওয়ার হয়তো যথেষ্ট কারণ আছে। কবির ঋণগুলি এইরকম — (১) মঙ্গল দৈত্যবধের কাহিনী দিয়ে কাব্যশুরু করেছেন। (২) পালা বিভাজনের দ্বিজ মাধব কাহিনীর যেখানে সেখানে ছেদ টেনেছেন, দ্বিজ রামদেবও অন্ধভাবে তারই অনুসরণ করেছেন। (৩) দ্বিজ মাধবের কাব্যে দুবার গণেশ বন্দনা পাওয়া যায়। একই রকম ব্যাপারে ঘটেছে দ্বিজ রামদেবের হাতে। (৪) যে ধরণের ঘটনা বর্ণনায় দ্বিজ মাধব যে যে প্রকারের, ছন্দ ব্যবহার করেছেন, রামদেবও তাই করেছেন। অবশ্য এইসব সাদৃশ্য থাকার দরুণ দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কোথাও কোন নিজস্বতা নেই সেকথা জোর করে বলা যাবে না। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, উভয় কবির মধ্যে যেমন ঘন সাদৃশ্য আছে, তেমনি কাহিনী, চরিত্র প্রভৃতিতেও পার্থক্য আছে যথেষ্ট।

প্রশ্ন :

১। দ্বিজ রামদেব কোন শতকে কাব্য রচনা করেন ?

রামদেবের কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনা। এর পরেই মঙ্গল দৈত্য বধের কাহিনী। ইন্দ্রের শাপমোচন, অভয়ার মর্ত্যে পূজা পাওয়া, কংস সরোবর তীরে বাস, দশভূজার মূর্তিস্থাপন প্রভৃতি আখ্যানও মেলে এই প্রথম ভাগের ভিতরেই। এই অংশে দ্বিজ মাধবের অনুসরণের পরিমাণ বেশি। দ্বিতীয় ভাগটি গঠিত হয়েছে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী দিয়ে। এতে অভিনবত্ব তেমন নেই। তৃতীয় খন্ডে মেলে বণিক ধনপতির আখ্যান। দ্বিজ রামদেব প্রধানত বিবৃতির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কবিকঙ্কণ সুলভ নাটকীয়তা কম। করুণরসের বর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। বিশেষত দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তকে বিদায় দিতে গিয়ে খুল্লনার বিলাপ বর্ণনায় তিনি অনবদ্য। এখানে রামদেবের লেখনী মানবরসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তবে কবিকঙ্কণের রচনায় দুঃখ ও হাস্যরস একত্র মিশে গিয়ে যে আলো আঁধারটি পরিবেশ সৃষ্টি করে কাব্যের উপভোগ্যতাকে বৃদ্ধি করেছে, সেটা রামদেবের কাব্যে মেলে না। আসলে রামদেবের সৃষ্টিক্ষমতা চক্রবর্তী কবির মতো উচ্চশ্রেণীর ছিল না। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, বণিকখন্ডের কাহিনীতে মুকুন্দ যেখানে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ও অপ্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে রামদেব অনেক বেশি পরিমাণ-সমঞ্জস্য। এই কবি বোধ হয় পূর্ববর্তী

অগ্রজ কবি দ্বিজ মাধবের দ্বারা আর একভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেটি শাক্তকাব্য মধ্যে বিষ্ণুপদ রচনায়। রামদেব তাঁর কাব্যের যেখানে সেখানে বিষ্ণুপদ সংযুক্ত করেছেন। এইরকম পদের সংখ্যা প্রায় শতাধিক এবং এগুলিতে কবি কেবল গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করেননি, কোথাও কোথাও ভক্তিনত চিত্তেরও পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজ মাধবের ঐ জাতীয় পদগুলির সঙ্গে তুলনা করে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয়, বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে পদ রচনার চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। মাধব আচার্যের মঙ্গলচন্ডীর গীতেও বিষ্ণুপদ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণতা নাই; তাহার পরিমাণ প্রায় স্থলেই দুই চারি ছত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রামদেব প্রায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে পুরাপদের মাপেই বিষ্ণুপদ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদগুলির ধ্বনিঝঙ্কার ও বৈষ্ণব প্রেমভক্তি কবিকে বৈষ্ণব কবিরূপেও পরিচিত করিতে পারিত। মূল কাব্যের বক্তব্য বিষয়ের প্রবেশক হিসাবে তিনি এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা মাধব আচার্যের বিষ্ণুপদে সুলভ নহে।" পদগুলির অধিকাংশতেই ভণিতায় কবির নাম সংযুক্ত থাকলেও দু'একটি পদের শেষে দ্বিজ উমাকান্ত, গোবিন্দ দ্বিজ, গোবিন্দসুত, মনোহর প্রমুখের নামও পাওয়া যায়। যাইহোক, এইসব বিষ্ণুপদের সূত্রে ধরা পড়ে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবীয় পরিমন্ডলের দুশ্ছেদ্য প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা। সবদিক বিচার করে, কেউ কেউ দ্বিজ রামদেবকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কবিকঙ্কণের পরে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী।

১.২.৭.১.৫ : মুক্তারাম সেন

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যকে আদর্শ করে আঠারো শতকে যে কয়েকজন কবি চন্ডীমঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন মুক্তারাম সেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুক্তারাম সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্য লেখেন 'গ্রহ ঋতু কাল শশী' বা ১৬১৯ শক অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'সারদামঙ্গল'। এটি একই সঙ্গে 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' নামেও পরিচিত। গ্রন্থটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ। গ্রন্থসূচনায় মুক্তারাম যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে জানতে পারা যায় যে, কবির জন্মস্থান ছিল চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রাম, যদিও তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্ভুক্ত কালিয়া গ্রাম।

> ***কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যকে আদর্শ করে আঠারো শতকে যে কয়েকজন কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন মুক্তারাম সেন তাঁদের মধ্যে একজন। 'গ্রহ ঋতু কাল শশী' বা ১৬১৯ শক অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীঃ তিনি কাব্য লেখেন। এটি একই সঙ্গে 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' নামেও পরিচিত।***

মুক্তারামের কাব্য আকারে খুব বড় নয়, বরং ব্রতকথার মতো সংক্ষিপ্ত। কাব্যটির দুটি খন্ড। প্রথমটিতে কালকেতু উপাখ্যান ও পরেরটিতে ধনপতির কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। নরখন্ডের আগে দেবী কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হয়তো তিনি দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাব গিয়ে পৌঁছেছে বিষ্ণুপদ রচনার ক্ষেত্রেও। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা এবং কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা কবির চোখে অভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে মুকুন্দের কাহিনী কবিকে কাব্যরচনায় প্রণীত করলেও মুকুন্দ-তুল্য প্রতিভাশক্তি না থাকায় সাহিত্যরস তেমন জমে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন :

১। মুক্তারাম সেনের কাব্যটির নাম কি ?

১.২.৭.১.৬ : ভবানীশঙ্কর দাস

এই কবির জন্ম আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের কুলীন কায়স্থ বংশে। পূর্বপুরুষ রাঢ়ের অধিবাসী হলেও কোন কারণে তাঁরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এমনকি তাঁরা রাঢ়ের কৌলীন্য ত্যাগ করে বারেন্দ্র সমাজভুক্তও হয়েছিলেন। কবির জন্ম চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নয়ন রায়। কাব্যটিতে যে সন তারিখের উল্লেখ আছে তা থেকে মনে হয় এটি ১৭৭৯ থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। কবির পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে সম্পাদনা করেছিলেন পুথির সংগ্রাহক চট্টগ্রামবাসী রামচন্দ্র দত্ত। সংগ্রাহক ও সম্পাদক রামচন্দ্রবাবু পুথিটির প্রকাশকালে নাম দিয়েছিলেন 'মঙ্গলচন্ডীর পাঞ্চালিকা'। স্থানীয় সমাজে এটি 'জাগরণ' নামে পরিচিত হলেও কবি ভণিতায় বারবার 'পাঞ্চালিকা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

> ***'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা' নামে কবির পুথিটি স্থানীয় সমাজে 'জাগরণ' নামে পরিচিত। কবিরা রাঢ়ের কৌলিন্য ত্যাগ করে বারেন্দ্র সমাজভুক্তও হয়েছিলেন। কবি আখ্যানকাব্য লিখলেও গীতিকবিতার সুর প্রতিধ্বনিত করেছেন অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করে।***

ভবানীশঙ্করের এই রচনা দু'একটি কারণে বিশিষ্টি। কালকেতু ও ধনপতির আখ্যান বর্ণনার আগে তিনি দেবী ভাগবতের কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। এতে আদ্যাশক্তির সতীরূপে জন্ম, শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ, দক্ষ কর্তৃক শিব নিন্দা, স্বামী নিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ, পরে পার্বতী রূপে জন্ম, হরপার্বতীর বিবাহ, পার্বতীর পুত্রকন্যাদির জন্ম এবং অসুরযুদ্ধে দিগ্‌বসনা কালিকার আর্বিভাব ইত্যাদি চিরাচরিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি আখ্যানকাব্য লিখলেও গীতিকবিতার সুর প্রতিধবনিত করেছেন অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করে। মনে রাখতে হবে যে, আঠারো শতক শাক্ত পদাবলী রচনার জন্য বিখ্যাত। কবি হয়তো সেই যুগীয় পরিমন্ডল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাব্যের মাঝে মাঝে ঘোষা, মালসী, লাচাড়ী প্রভৃতি ছন্দে চমৎকার কিছু শক্তিগীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বর্ণনার প্রারম্ভে দীর্ঘ ছন্দে হয় দেবীবন্দনা, নতুবা গান সংযোজন অথবা শিব-অর্চনা বিষয়ক রচনা স্থান পেয়েছে। এতে মূল কাহিনী মন্থর হয়ে গেলেও অভিনবত্ব সঞ্চারিত হতে পেরেছে। এছাড়া রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক পদও দুর্লভ নয়। আসলে কবির মন ছিল গীতিরসে ভয়ানক আর্দ্র। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই মূল কাহিনী বহির্ভূত গান কিংবা স্তব জাতীয় রচনা সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ভাষার মধ্যে কোথাও কোথাও অনর্থক গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। সমাস-সন্ধির প্রতিও কবি অহেতুক আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। এমনটাও কেউ কেউ মনে করেছেন যে, যেহেতু ভবানীশঙ্কর ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকালের কবি ছিলেন, তাই তাঁর রচনায় মার্জিত বাগ্‌বিন্যাস সঞ্চ ারিত হতে পেরেছে অন্নদামঙ্গলের প্রভাব-সূত্রে। অবশ্য সুদুর চট্টগ্রামে অন্নদামঙ্গল কতটা প্রচার পেয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রশ্ন :

১। কবির পুথিটি স্থানীয় সমাজে কি নামে পরিচিত ছিল ?

১.২.৭.১.৭ : দ্বিজ মুকুন্দ

ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর তুলনায় স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্ব। পুরনো বাংলা সাহিত্যে 'মুকুন্দ' নামধেয় কবির সংখ্যা কম নয়। অনেকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কবিখ্যাতিতে লোভপ্রকাশ করে নিজের নামের পরিবর্তে 'মুকুন্দ'

নামও ব্যবহার করেছেন। দ্বিজ মুকুন্দ তাঁর কাব্যের কোথাও কোথাও 'কবিচন্দ্র মুকুন্দ' এ ধরনের ভণিতাও দিয়েছেন। এঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয় বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম থেকে। কাব্যের নাম 'বাসুলীমঙ্গল'। 'বাসুলী' শব্দটি 'বিশালাক্ষী'রই অপভ্রংশ রূপ। 'বিশাল অক্ষী' — এইরকম তাৎপর্য নির্ধারণ করে কবি এ কাব্যকে 'বিশাল লোচনীর গীত' নামেও আখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহ।

কাব্যে যেভাবে রচনাকাল নির্দেশিত হয়েছে তার সঙ্গে ঐক্য রয়েছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের। বোঝা যায় দ্বিজ মুকুন্দ কবিকঙ্কণের দ্বারা এক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্ধমান থেকে প্রাপ্ত পুথিতে পুথি নকলের তারিখ মেলে, আর মেলে মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ। এই সূত্র দুটি ধরে মনে হয় এ কাব্য রচনার কাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। অন্তত কাব্যে প্রযুক্ত ভাষার আধুনিক লক্ষণগুলি বিচার করে এরকম একটা সিদ্ধান্ত করা যায়।

দ্বিজ মুকুন্দের কাব্য বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন। কাব্যের নাম 'বাসুলীমঙ্গল'। এ কাব্যে কালকেতুর আখ্যান নেই, রয়েছে কেবল বণিকের উপাখ্যানটি। কিন্তু এ বণিক ধনপতি সদাগর নয়, ধুসদত্ত।

দ্বিজ মুকুন্দের কাব্যকে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে খুবই অভিনব। কেননা এ কাব্যে কালকেতুর আখ্যান নেই, রয়েছে কেবল বণিকের উপাখ্যানটি। কিন্তু এ বণিক ধনপতি সদাগর নয়, ধুসদত্ত। এখন প্রশ্ন কে এই ধুসদত্ত? কাহিনীর ভিতরে কিছুটা প্রবেশ করলেই উত্তর মিলে যায়। ধুসদত্ত দ্বিজ মুকুন্দের কল্পিত নায়ক বটে তবে তার সমস্ত আদল ধনপতি থেকে ধার করা। ধনপতি যেমন বাণিজ্যে গেলে লহনা খুল্লনার উপর অত্যাচার শুরু করেছিল, এ আখ্যানে ধুসদত্তও বাণিজ্যে গেলে সত্যবতী সতীন রুক্মিনীর প্রতি নির্যাতন আরম্ভ করে। এছাড়া ধুসদত্তের মায়াদহের পুলিনে দেবী-দর্শন, সেই গল্প বর্ধমানরাজ সুরথকে শোনানো এবং রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে না পারার জন্য কারাগারে বন্দী হওয়া ইত্যাদি ঘটনা চণ্ডীমঙ্গলের কালীদহে কমলে-কামিনী ও সিংহলরাজ শালিবাহন কর্তৃক ধনপতির কারারুদ্ধ করার ঘটনার পুরোপুরি নকল। শ্রীমন্ত এ কাব্যে দেখা দিয়েছে গুণদত্ত নাম নিয়ে। অর্থাৎ বোঝা গেল যে, দ্বিজ মুকুন্দ অভিনবত্ব ফলানোর জন্য প্রাচীন চণ্ডীকাব্যের পাত্র পাত্রীর নামগুলিকেই কেবল পরিবর্তন করেছিলেন, যা তাঁর কুশীলকবৃত্তির পরিচয়কেই প্রকট করে তুলেছে।

প্রশ্ন :

১। দ্বিজ মুকুন্দের কাব্যের নাম কি ?
২। বনিকের উপাখ্যানে বনিকের নাম কি ছিল ?

১.২.৭.১.৮ : রামানন্দ যতি

ইনি আঠারো শতকের মানুষ। কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন জানা যায় না। আর একজন কবি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এঁর নাম জড়িয়ে গিয়েছে। তিনি হলেন কলির বুদ্ধ অবতার রামানন্দ ঘোষ। তিনিও এঁর সমকালে আবির্ভূত। ডঃ সুকুমার সেন এই দুই ব্যক্তিকে অভিন্ন বলে মনে করেন কয়েকটি কারণে। যাইহোক রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। কাহিনী উপস্থাপনায় কোন নতুনত্ব দেখা যায় না। খুবই সাদামাঠা রচনা। অথচ ইনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে। মুকুন্দ যে বিশ্বাসমূঢ় ছিলেন এমন একটা অভিযোগ আছে

রামানন্দের লেখায়। রামানন্দের সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে অলৌকিকতা বিরোধী মনোভাব। প্রাথমিকভাবে একে যুক্তিবাদিতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায় তিনিও সেই পুরনো বৃত্তে ঘুরে মরেছেন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কবি আসলে নিজের কাব্যকে গৌরবান্বিত করার জন্যই এই অহেতুক আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। রামানন্দের দাবী, মুকুন্দের দোষ সংশোধন করবার জন্য শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি নতুন করে চন্ডীমঙ্গল লিখছেন । কবির জবানীটি লক্ষ্য করা যাক —

"চন্ডী যদি দেন দেখা/ তবে কি তা যায় লেখা/ পাঁচালির অমনি বচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে/ তারা বলে সত্য বটে। পথে চন্ডী দিলা দরশন।।
এত দোষ উদ্ধারিতে/ লোকের চৈতন্য দিতে/ চন্ডী রচে রামানন্দ যতি।
অনেকের উপরোধ/ কেহ না করিও ক্রোধ/ অনেক শিষ্যের অনুমতি।।"

১.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী উল্লেখ করে ঐ কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। চণ্ডীমঙ্গলের অপ্রধান কবিদের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। চণ্ডীমঙ্গল (অভয়ামঙ্গল) কাব্যে বাংলা উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল,—আলোচনা করো।

৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে মুরারী দত্ত ও ভাড়ু শীল চরিত্র দুটি পর্যালোচনা করো।

৫। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত ফুল্লরার বারমাস্যার বিবরণ দিয়ে ফুল্লরার চরিত্র পর্যালোচনা করো।

৬। টীকা লেখ : (ক) মাণিক দত্ত (খ) দ্বিজ মাধব (গ) দ্বিজ রামদেব (ঘ) মুক্তারাম সেন (ঙ) ভবানীশঙ্কর দাস (চ) রামানন্দ যতি।

১.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী/পুরুষ—ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়)—শ্রী সুকুমার সেন

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস—ক্ষেত্র গুপ্ত

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৮

ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ

বিন্যাস ক্রম

১.২.৮.১ ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারা

১.২.৮.১.১ ময়ূর ভট্ট

১.২.৮.১.২ রূপরাম চক্রবর্তী

১.২.৮.১.৩ রামদাস আদক

১.২.৮.১.৪ সীতারাম দাস

১.২.৮.১.৫ যাদুনাথ বা যাদবনাথ

১.২.৮.১.৬ ঘনরাম চক্রবর্তী

১.২.৮.১.৭ মানিকরাম গাঙ্গুলী

১.২.৮.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.২.৮.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৮.১ : ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারা

ডোম-পন্ডিত পূজিত ধর্মঠাকুর একমাত্র রাঢ়ের দেবতা। রাঢ় অবিভক্ত বঙ্গের একটি বিশিষ্ট ভূমিভাগ। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাঢ় ভূখন্ডের বিস্তার। রাঢ়ের রুক্ষ লাল কাঁকুরে মাটি তার সীমানা-নির্দেশক। আজও এইসব জেলায় ধর্মঠাকুরের পূজা চলে। তবে সর্বত্র একই পদ্ধতি অবলম্বন করে নয়। দেবতাও সর্বত্র একরূপে অবস্থান করেন না। ধর্মঠাকুরকে অনেকেই আঞ্চ লিক দেবতার পর্যায়ে গণ্য করেছেন। কারণ ধর্মরাজের পূজা কেবল রাঢ়বঙ্গেই সীমাবদ্ধ এবং যে কয়টি ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে তার রচয়িতাদের বাসস্থানও বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলে। ধর্মমঙ্গলে উল্লেখিত ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা। সম্ভবত অনার্য ধর্মভাবনা থেকে এঁর উদ্ভব। ইতিহাসের তথ্য এই যে, রাঢ় অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে অনার্যজাতির মানুষজন দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। কাব্যপ্রমাণে জানা যায় 'রাঢ়' শব্দটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ। সহজেই অনুমেয়, রাঢ়ের এই আর্যেতর তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজে লালিত ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও ধারণা কিছুটা তাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধর্মঠাকুরের পূজার্চনায় ডোম পন্ডিতদের অগ্রগণ্যতায় এবং উক্ত দেবতাকেন্দ্রিক গান রচনায় তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পাতিত্যে। ধর্মঠাকুরের প্রতীক কচ্ছপাকৃতি বিশিষ্ট একটি শিলা। তবে কোথাও কোথাও ডিম্বাকার চতুষ্কোণ শিলাখন্ডও ধর্মমূর্তি হিসাবে পূজা পায়। আবার জামা জুতো মোজাপরা মনুষ্যমূর্তির ধর্মরাজও আছেন। স্থানবিশেষে ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, গরীব রায়, ক্ষুদি রায়, কালু রায়, বৃদ্ধ রায়, জগ্র রায়, মদন রায় নামেও পূজা পান।

মনসা ও চন্ডীর মতো ধর্মঠাকুরের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ও গবেষক একমত হতে পারেননি। এঁদের ধারণাগুলিকে খুব সংক্ষেপে এখানে রাখা যেতে পারে ঃ

(১) ধর্ম হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা — মতটিকে প্রথমে প্রচার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর অভিমত, ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি হলেন ধর্মঠাকুর। শূন্যমূর্তি বুদ্ধদেবেই হস্তপদহীন কূর্মমূর্তিস্বরূপ ধর্মশিলায় পরিণত হয়েছেন। শূন্যমূর্তি ছাড়া বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া গেল আরও পাঁচটি বিষয়ে। এগুলি যথাক্রমে (ক) শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ;(খ) ধর্মঠাকুরের উৎসব অধিকাংশ স্থলেই বৈশাখী পূর্ণিমা অর্থাৎ বুদ্ধপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে;(গ) ধর্মরাজের পুরোহিত ডোম পন্ডিতরা এককালে বৌদ্ধ ছিলেন;(ঘ) বৌদ্ধরা নিজেদের সধর্মী বলে পরিচয় দিতেন;এবং (ঙ) শঙ্খ ধর্মপূজার অঙ্গ। অবশ্য এসব যুক্তিই খন্ডিত হয়েছে ভিন্ন মতাবলম্বী পন্ডিতগণের দ্বারা। সবচেয়ে প্রধান বিরোধী যুক্তি হল, ধর্মরাজের পূজায় ছাগ, মেষ, মোরগ, পায়রা ও শূকর বলি দেওয়া হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। এই রীতি পুরোপুরি বৌদ্ধধর্মের প্রতিকূল। কেননা বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বুদ্ধদেব ছিলেন অহিংসার পূজারী।

(২) ধর্মপূজা অনার্যজাতির সূর্যপূজারই রূপান্তর — এমন ভাবনা ভেবেছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। সুনীতিবাবুর মতে, ধর্ম শব্দটির আদিরূপ হল কোল গোষ্ঠীর কূর্মবাচক শব্দ 'দড়ম' বা 'দরম'। আর নীহাররঞ্জন বলেন, 'ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্ আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা।' আশুতোষ ভট্টাচার্য রাঢ়ের আদিম অধিবাসী ডোমদের অতিপ্রাচীন সূর্যউপাসনার কথা জানিয়েছেন। ডোম গোষ্ঠী মনে করতো সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণের। তাই সেই দেবতাকে তুষ্ট করতে তারা শ্বেত বর্ণের পশু বলি দিত। ক্রমে রাঢ়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের বসবাস সূচিত হয় এবং উক্ত সূর্যদেবতার সঙ্গে নিজেদের ধর্মের কিছু কিছু উপাদান মিশিয়ে দিয়ে তাকে নিজেদের গ্রহণ করে। 'এইভাবে ডোম জাতির সর্বোত্তম দেবতা সূর্য বৌদ্ধ নিরঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইলেন।' কিন্তু এই মতকে নির্বিচারে অনেকেই গ্রহণ করেননি।

> ***ডোম পণ্ডিত পূজিত ধর্মঠাকুর একমাত্র রাঢ়ের দেবতা। রাঢ়ের রুক্ষ লাল কাঁকুরে মাটি তার সীমানা- নির্দেশক। ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা, সম্ভবত অনার্য ধর্মভাবনা থেকে এর উদ্ভব। ধর্মঠাকুরের প্রতীক কচ্ছপাকৃতি বিশিষ্ট একটি শিলা। তবে কোথাও কোথাও ডিম্বাকার চতুষ্কোণ শিলাখণ্ড ও ধর্মমূর্তি হিসাবে পূজা পায়। স্থান বিশেষে ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, গরীব রায়, ক্ষুদি রায়, কালু রায়, বৃদ্ধ রায়, জগৎ রায় নামেও পূজা পান। সুনীতিবাবুর মতে, ধর্ম শব্দটির আদিরূপ হল কোল গোষ্ঠীর কর্মবাচক শব্দ 'দড়ম' বা 'দরম'। নীহাররঞ্জন রায় বলেন — 'ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা। আশুতোষ ভট্টাচার্য রাঢ়ের আদিম অধিবাসী ডোমদের অতি প্রাচীন সূর্য উপাসনার কথা জানিয়েছেন। অধ্যাপক সেনের মতে, জন্মসূত্রে ধর্ম হলেন বৈদিক দেবতা বরুণ।' ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুর শিব, ও মৃত্যুর দেবতা যমরাজের সঙ্গে মিল আছে। শূন্য পুরাণের মতে, ধর্মঠাকুরও বিষ্ণুর মতো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ।***

(৩) উপরোক্ত দুটি ভাবনা ছাড়া বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে ধর্মরাজের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন কিছু পন্ডিত-গবেষক। ধর্মরাজের স্বরূপ সম্পর্কে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যমতের প্রভাবের ব্যাপারে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই ভাবনার সঙ্গে একমত হয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন। অধ্যাপক সেনের মতে, 'জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ'। প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব. ও শুনঃসেপের কাহিনী. যা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণ দেবতাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে

এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রয়েছে। ধর্মের সঙ্গে বরুণের বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে পুত্রদানের ক্ষমতায়। শিবের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরের অভেদ কল্পনা করেছেন কেউ কেউ। শিবলিঙ্গ ও ধর্মশিলার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় অভিন্ন। অনেকস্থানে শিবলিঙ্গই ধর্মরাজ বলে পূজিত। এই দুই দেবতার গাত্রবর্ণও শুভ্র। এছাড়া ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুরকে কৈলাস থেকে আগমন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। শিব ছাড়া ধর্মের সঙ্গে মিল আছে মৃত্যুর দেবতা যমের। যম হিন্দুপুরাণে 'ধর্মরাজ' বলে কথিত। আবার ধর্মের সঙ্গে গম্ভীর সংযোগ লক্ষ করা গেছে হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা বিষ্ণুরও। শালগ্রামশিলা ধর্মশিলার সাদৃশ্য, কূর্মরূপী বিষ্ণু ও ধর্মরাজের কচ্ছপাকৃতির আকারগত মিল, বিষ্ণুবাহন গরুড় ও ধর্মবাহন উলুকের মুখাকৃতি ও আহার্যের ঐক্য পন্ডিতসমাজকে যথেষ্ট ভাবিয়েছে। শূন্যপুরাণের মতে, ধর্মঠাকুরও বিষ্ণুর মতো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ এবং তাঁর অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠ কিংবা দ্বারকায়। হিন্দু পুরাণের আর একটি দেবতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুব গভীর। তিনি হলেন সূর্য। ধর্মরাজ কুষ্ঠরোগের নিরাময়কারী — যে ভূমিকা একদা বেদে নির্ধারিত হয়েছিল সূর্যের। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মরাজকে জ্যোতিরূপী কোটি সূর্যের প্রভাসম্পন্ন দেবতা বলা হয়েছে। পুরাণে সূর্যকে কশ্যপতনয় বলা হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক কশ্যপের পুত্র লাম্বাদিত্য লাউসেনরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আরো লক্ষণীয় যে, রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে নারীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, সূর্যের গতিস্তব্ধ হয়। এ ঘটনাও সূর্যের সঙ্গে এই দেবতার সংযোগকে ইঙ্গিত করে। সবশেষে বলা যায়, ধর্মদেবতার শুভ্রতাও সূর্যের ও সূর্যালোকের শুভ্রতার দ্যোতক। অধিকাংশ পন্ডিতই মেনে নিয়েছেন, যে ধর্মরাজ হিন্দু সূর্যদেবতারই রূপান্তর।

> ***বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনার সমন্বয় ঘটেছে। ধর্মপাল, ইছাইঘোষ, ঢেকুর গড়, ময়না গড় ইত্যাদির নাম পালযুগের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের যোদ্ধৃ মনোভাব ও অপরাজেয় যুদ্ধ কাহিনী ধর্মমঙ্গলে স্থান পাওয়ায় অনেকে একে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলে নির্দেশ করতে চান। কিন্তু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন — 'মঙ্গলকাব্যে'র কাহিনী ও ভাবরস যেমন সমগ্র জাতির অন্তরে বাইরে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে, ধর্মমঙ্গলের আখ্যানবস্তু ঠিক তেমনি ব্যাপকতার সঙ্গে রাঢ়ের সবশ্রেণীর মানুষের অন্তরের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি'।***

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনার সমন্বয় ঘটেছে। তবে ধর্মমঙ্গলে পুরাণের তুলনায় লোক-উপাদানের পরিমাণ বেশি। তার অন্যতম কারণ হল এর কাহিনী তুলনামূলক ভাবে বেশি বাস্তবতাসমৃদ্ধ ও ইতিহাসনির্ভর। ধর্মপাল, ইছাই ঘোষ, ঢেকুর গড় , ময়নাগড় ইত্যাদি ব্যক্তি ও স্থান নাম পালযুগের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। কেউ বলেন লাউসেন দশম শতাব্দীর লোক, আবার কেউ বলেন তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। ধর্মমঙ্গলের ময়নাপুর বা ময়নার যে উল্লেখ আছে সেটি নাকি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে ১২-১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। অন্যমতে, ময়নার অবস্থান মেদিনীপুরে। ময়নাগড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও নাকি সেখানে আছে। যাইহোক, লাউসেন যে 'Semi-mythical Hero' ছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত। তবে কবিদের কলমে লাউসেনের মানবোচিত গুণগুলি তেমনভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। সংস্কৃতঅলংকারশাস্ত্রের

প্রশ্ন :

১। ধর্মঠাকুর কোথাকার দেবতা ছিলেন ?

২। বিভিন্ন স্থানে ধর্মঠাকুর কি কি নামে পরিচিত ?

নিরিখে লাউসেন ধীরোদাত্ত নায়ক। তাঁকে সর্বত্র সাহসী, নির্ভীক ও বলশালী করে আঁকা হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও এ কাহিনীতে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। তাদের যোদ্ধৃ মনোভাব ও অপরাজেয় যুদ্ধকাহিনী ধর্মমঙ্গলে স্থান পাওয়ায় অনেকে এই মঙ্গলকাব্যটিকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলে নির্দেশ করতে চান। কিন্তু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও ভাবরস যেমন সমগ্র জাতির অন্তরে বাইরে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে, ধর্মমঙ্গলের আখ্যানবস্তু ঠিক তেমনি ব্যাপকতার সঙ্গে রাঢ়ের সবশ্রেণীর মানুষের অন্তরের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর মতে, এই সমাজে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, শাক্ত আদর্শ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির যেরূপ প্রভাব, ধর্মমঙ্গলের সেরূপ প্রভাব নেই। বস্তুত লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাৎপটে রাঢ়ের বিস্মৃত যুগের কাহিনী নিহিত থাকিলেও জাতীয় মহাকাব্য হইতে গেলে যেরূপ সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপকতা প্রয়োজন, ধর্মমঙ্গলের আঞ্চলিক কাহিনী সেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই।' আনুমানিক ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যাঁরা ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করে কোন না কোন বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, নিচে সেইসব কবিদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

প্রশ্ন :

১। ধর্মমঙ্গলে পালযুগের ইতিহাসের দুটি জায়গার নাম উল্লেখ কর ?

২। ধর্মমঙ্গলকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলে কে নির্দেশ করতে চাননি ?

১.২.৮.১.১ : ময়ূর ভট্ট

মাণিকরাম গাঙ্গুলী ও ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁদের রচিত ধর্মমঙ্গলে ময়ূর ভট্টকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার 'আদিকবি' বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। অথচ পণ্ডিতমহলে ময়ূর ভট্টের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ময়ূর ভট্টের নামে প্রচলিত পুথির সম্যক আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ময়ূর ভট্টের নামে প্রচলিত গ্রন্থটি আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যার ধর্মমঙ্গলেরই হুবহু নকল। কিন্তু এমনটা বিবেচনা করেন না এ গ্রন্থের প্রথম সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি রচনাটি ময়ূর ভট্টেরই দাবি করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ময়ূর ভট্টের গ্রন্থটির নাম 'শ্রীধর্মপুরাণ'। ময়ূর ভট্টের ব্যক্তিপরিচয় আজও অজ্ঞাত। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ নামে এক কবি আছেন যিনি 'সূর্যশতক' লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সূর্যের বন্দনা লিখে রোগ থেকে তিনি মুক্ত হন বলে কথিত। অনেকে মনে করেন সূর্যশতকের লেখক ময়ূর ভট্টই বাংলায় প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখেন, যে ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেন। ময়ূর ভট্ট এই শাখার আদিকবির সম্মান পেলেও তাঁর কাব্যের ভাষা যথেষ্ট আধুনিক। ময়ূর ভট্টের অস্তিত্ব যাঁরা অস্বীকার করেন এইখানে তাঁরা যুক্তির জোর খুঁজে পান অনেকটাই।

> ***মানিকরাম গাঙ্গুলি ও ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁদের রচিত ধর্মমঙ্গলে ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার 'আদিকবি' বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। ময়ূরভট্টের গ্রন্থটির নাম 'শ্রী ধর্মপুরাণ'।***

প্রশ্ন :

১। ধর্মমঙ্গলের আদিকবি কে ছিলেন ?

১.২.৮.১.২ : রূপরাম চক্রবর্ত্তী

সপ্তদশ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'অনাদ্যমঙ্গল'। কাব্যটি লেখার সঠিক সন-তারিখ না জানা গেলেও কবি শাহ সুজার যে উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় এটি সতেরো শতকের মাঝামাঝি লেখা হয়েছিল। কাব্য মধ্যে কবি নিজের সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি-শ্রীরামপুরে। তাঁর পিতার নাম অভিরাম। তিনি পন্ডিতব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত একটি টোলও চালাতেন। কবি তিন ভাইয়ের মধ্যে মধ্যম। কবি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাশের গ্রাম পাসন্ডাতে গেলেন রঘুরাম ভট্টাচার্যের কাছে। একদিন পড়া নিয়ে তর্ক বাধলো গুরুর সঙ্গে। তিনি পুথির পাটা দিয়ে প্রহার করলে ক্ষুব্ধ শিষ্য নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে পলাশনের বিলের কাছে ব্রাহ্মণ-রূপী ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। তিনি নিজেকে বাঁকুড়া রায় পরিচয় দিয়ে রূপরামকে ধর্মের গান গাইতে বললেন, আর কবির কানে দিলেন মহাবিদ্যা। ওদিকে গোপভূমের রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় গণেশ রায় দেবতার স্বপ্নাদেশ পেলেন এবং রূপরামকে কাছে পেয়ে দ্বাদশ পালায় ধর্মের গান রচনা করতে বললেন। কবি জানাচ্ছেন — 'সেই হইতে গীত গাই ধর্মের আসরে'।

> ***সপ্তদশ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব। কবি তার কাব্যের নাম দিয়েছেন 'অনাদ্যমঙ্গল'। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি - শ্রীরামপুরে। তাঁর আগে যাঁরা ধর্মঠাকুরের পালা গান লিখেছেন, সেগুলি ছিল পাঁচালি ও ব্রতকথা ধরনের। রূপরামই প্রথম সেই কাহিনীকে সুডৌল মঙ্গলকাব্যের রূপ দিতে সক্ষম হলেন। কবির কাব্যে লাউ সেন পালা ও হরিশচন্দ্র পালা দুটি আখ্যান পাওয়া যায়। গৌড়রাজকে নিতান্তই মেরুদণ্ড হীন করে দেখিয়েছেন রূপরাম, অন্যদিকে মহামদ দুরন্ত। কালু ডোম তার রুক্ষ চোয়াড় জীবনের ব্যথা, গ্লানি, দারিদ্র্য নিয়ে এ কাব্যে উপস্থিত।***

রূপরামের কাব্য অপেক্ষাকৃত সুগ্রথিত। তাঁর আগে যাঁরা ধর্মঠাকুরের পালা গান লিখেছেন সেগুলি ছিল অনেকটা পাঁচালি ও ব্রতকথা ধরনের। রূপরামই প্রথম সেই কাহিনীকে সুডৌল মঙ্গলকাব্যের রূপ দিতে সক্ষম হলেন। কাহিনী বর্ণনার একটা সাবলীল ভঙ্গি আয়ত্ত না করলে যে এমনটা সিদ্ধি পাওয়া যায় না, সেটা সহজে বুঝতে পারা যায়। অথচ রূপরামের কাব্য প্রখর পান্ডিত্যবর্জিত। ভাষা ও অলংকারের যে জৌলুষ আমরা কবিকঙ্কণে কিংবা ভারতচন্দ্রের লেখায় পেয়ে থাকি, রূপরামে তার বড়ই অভাব। তবে অসাধারণ জীবনানুরাগ তাঁর অনেক দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দিয়েছে।

রূপরাম ধর্মমঙ্গলের দুটি আখ্যান— লাউসেন পালা ও হরিশ্চন্দ্র পালা রচনা করেছিলেন। একজন প্রতিভাবান কবি যেমন বিচক্ষণতার সঙ্গে কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণ করে থাকেন, রূপরামের লেখায় তা দেখতে পাওয়া যায়। কবির বর্ণনার ভাষা খুবই প্রাঞ্জল। বাস্তব জীবনের অনুপুঙ্খময় বর্ণনায় তিনি কবি মুকুন্দের দোসর। তাঁর কাব্যে হাস্য, বীর, করুণ প্রভৃতি রস দারুণভাবে ফুটেছে। চরিত্ররচনাতেও তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। খুব স্বল্পকথায় একটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। রঞ্জাবতীর মধ্যে নারীসত্তা ও জননীসত্তার পারস্পরিক অবস্থান চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। লাউসেনকে এঁকেছেন নীতিবাদী ও সংযমী পুরুষ হিসেবে। ভ্রষ্টা নারী নয়ানীর আহ্বানকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন লাউসেন, তাতে তাঁর চরিত্রটি আরো একধাপ উন্নীত হয়েছে। অথচ এতবড় বীরের চিত্তদৌর্বল্যও কম নয় - সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে। গৌড়রাজকে নিতান্তই মেরুদন্ডহীন করে দেখিয়েছিলেন রূপরাম, অন্যদিকে মহামদ দুরন্ত। অস্তির পাখর কিংবা বাটুয়ার প্রসঙ্গে কবি অবিরল হাস্যধারার ফোয়ারা ফুটিয়েছেন। কালু ডোম তার রুক্ষ চোয়াড় জীবনের ব্যথা, গ্লানি, দারিদ্র্য নিয়ে এ কাব্যে উপস্থিত। সে দোষে, গুণে বীরত্বে, স্বদেশপ্রেমে, লোভে, স্বার্থে একান্তই বাস্তব গুণসম্পন্ন। কবির বর্ণনা

মোটামুটি চিত্রধর্মী। মাঝে মাঝে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার প্রয়োগ করে বর্ণনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সব মিলিয়ে রূপরামের কাব্যে তাঁর কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের অনেক কবি রূপরামকেই তাঁদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন :

১। সপ্তদশ শতকের একজন ধর্মমঙ্গলের কবির নাম কর ?

২। রূপরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্যটির নাম কি ?

১.২.৮.১.৩ : রামদাস আদক

ভুরশুট পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াৎপুর গ্রামে এঁর জন্ম। ইনি জাতিতে চাষী কৈবর্ত ছিলেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগের কারণে তেমন বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতে পারেননি। একবার চৈতন্য সামন্ত নামে এক রাজকর্মচারীর দ্বারা পীড়িত হয়ে কাছারি ঘরে বন্দী ছিলেন। পরে মুক্তি পেয়ে মাতুলালয়ে যাওয়ার পথে সিপাহী বেশী ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান। ধর্ম সিপাহী বেশ পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ বেশে এসে ধর্মের গান গাইবার আদেশ দিলে কবি দেবতার কৃপায় কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। যাদবচন্দ্র রায় নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদার কবির কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জমিদারীর পদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। কাব্যে কবি যে হেঁয়ালি শ্লোকের অবতারণা করেছেন তা থেকে মনে হয় রামদাস আদকের 'অনাদিমঙ্গল' ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

ভুরশুট পরগণার রাজা প্রতাপ নারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াৎপুর গ্রামে রামদাস আদকের জন্ম। রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল ১৬৬২ খ্রীঃ রচিত হয়।

অনেকেই অনাদিমঙ্গলে সম্পন্ন ভাষা, পরিপাটি অলংকার, বিদগ্ধ বাক্‌ভঙ্গি ইত্যাদি দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কাব্যটি এত প্রাচীন নয়, যথেষ্ট অবচীন। বিশেষত ভাষাব্যবহারে লোকোক্তির সার্থক প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে, রামদাসের কাব্যের তিন চতুর্থাংশই রূপরামের পুথির বস্তু। ভণিতাটি কেবল রামদাসের। একথার সত্যতা টের পাওয়া যায় পালা সন্নিবেশে ও কাব্যপংক্তিতে। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ দুই কবির কাব্যপংক্তি উদ্ধৃত করে তাদের ভিতরকার হুবহু মিল দেখিয়েছেন। রামদাসের আত্মবিবরণীতেও ছাপ পড়েছে রূপরামের ভাবনার। তবে সারা কাব্যের মধ্যে রামদাসের নিজস্বতাকেও কোথাও কোথাও আবিষ্কার করা যায়। কবি সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা ব্যবহার করেছেন। পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনাতে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা এ গ্রন্থের প্রখর সমালোচনা করলেও এমন মন্তব্য করতে কুণ্ঠিত হননি - "তবে প্রশংসার বিষয় কবি সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই পরিবেশে লালিত পালিত হইয়া এরূপ একখানি মার্জিত রুচি ও রীতির কাব্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা, পুরাণ ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার যেকোন ব্রাহ্মণ কবির সমতুল্য,

প্রশ্ন :

১। রামদাস আদকের জন্ম কোথায় ?

২। কাব্যটি কত সালে রচিত হয় ?

তাহা সানন্দে স্বীকার করিতে হইবে। সর্বোপরি কবির অসাম্প্রদায়িক উদার মন ও রুচির শুচিতা বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে।"

১.২.৮.১.৪ : সীতারাম দাস

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারা যখন একটি নিয়মিত সাহিত্যপ্রবাহে পরিণত হয়ে গেছে, সেইকালে এই শাখার একজন সাধারণ মানের কবি হিসাবে সীতারাম দাসের আবির্ভাব। সীতারামের পিতা দেবীদাস ছিলেন বর্ধমানের সুখসায়রের অধিবাসী। সীতারামের জননী কেশবতীর পিত্রালয় বাঁকুড়ার ইন্দাস। কবির জন্ম এই মাতুলালয়েই। কবিদের গৃহদেবী ছিলেন গজলক্ষ্মী। তিনি তাঁর বিশেষ ভক্ত। এই দেবীর কৃপা লাভ করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য কাব্যলেখার আগে প্রথাগত ভাবে তিনিও স্বপ্নে ধর্মদেবতার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কাঠসংগ্রহ করতে গিয়ে মাঠে সন্ন্যাসীবেশী ইন্দাসের ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের সাক্ষাৎ পান। গান লিখতে সাহায্য করেন ওই গ্রামের ধর্মের পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিত। মাত্র চল্লিশ দিনের ভিতর তিনি কাব্যটি লিখে ফেলতে সক্ষম হন বলে কবি আত্মবিবরণীতে জানিয়েছেন। একটি পুথিতে কাব্যের রচনাকাল দেওয়া আছে ১০০৪ সাল। সম্ভবত এটি মল্লাব্দ, কেননা কবি মল্লভূমিতেই বাস করতেন এবং সেখানকার রীতি অনুযায়ী মল্লাব্দেই সাল তারিখ উল্লেখ করতে হতো। অতএব মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ১৬৯৮ - ৯৯ সাল নাগাদ সীতারামের কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল।

সীতারামের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি খুবই সাধারণ মানের। কাব্যসূচনায় তিনি বারবার ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করেছেন। এবং তাঁর কাব্যানুসরণে সীতারাম যে এই গ্রন্থ রচনা করছেন সেটাও জানিয়েছেন। অবশ্য কবির এই বিবৃতিকে কেউ কেউ সঠিক বলে মনে করেন না, কেননা তাঁদের ধারণায় বঙ্গদেশে ময়ূর ভট্ট নামে কোন কবির অস্তিত্ব ছিল না, তাঁর লেখা কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যও পাওয়া যায় না। যাইহোক, সীতারাম কাব্যবর্ণনায় মোটামুটি স্বচ্ছন্দ গতি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ঘটনার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্ব না দেখাতে পারলেও তাঁর নিজের জীবনকাহিনীটি কম চমকপ্রদ নয়। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সীতারাম দাসের নামে প্রচলিত ও প্রাপ্ত পুথিগুলি সবই খণ্ডিত। সেগুলিকে কতকগুলি পৃথক পালা সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন এগুলির অধিকাংশ অর্বাচীন কালের ডোম পণ্ডিতের নকল। ভাষার মধ্যে তেমন আলঙ্কারিক পারিপাট্য না থাকলেও বর্ণনাকে সার্বিকভাবে নীরস বলা যাবে না। কবি সহজ বিবৃতিমূলকতার দিকেই বেশি ঝুঁকেছিলেন।

১.২.৮.১.৫ : যাদুনাথ বা যাদবনাথ

যাদুনাথের কাব্যের নাম 'ধর্মপুরাণ'। ইনিই একমাত্র কবি যিনি কেবল হরিশচন্দ্র-মদনা-লুইচন্দ্রকেন্দ্রিক উপাখ্যানটিকে নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। যাদুনাথের কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর পুথি গবেষক অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল। রচনাটির মধ্যে কবির সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে পারা যায়। কবির নিবাস দোম গ্রামে। সম্পাদক পঞ্চাননবাবুর মতে এটি আসলে হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রাম। কেননা সেখানকার এক তাঁতির বাড়ি থেকে এই কবির পুথি সংগৃহীত হয়েছিল। সম্ভবত কবি নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিনোদ নাথ। কাব্যটি ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক হলেও এতে বৈষ্ণব ও শাক্ত মতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ফলে কেউ কেউ কবির

যাদুনাথের কাব্যের নাম 'ধর্মপুরাণ'। তাঁর কাব্যে হরিশচন্দ্র- মদনা- লুইচন্দ্র কেন্দ্রিক উপাখ্যানটিকে নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যটি ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক হলেও এতে বৈষ্ণব ও শাক্তমতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষার্থে পিতামাতার মিলিতভাবে নৃশংসভাবে সন্তানকে হত্যা করার কাহিনী বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কারুণ্যের সৃষ্টি করেছেন।

মধ্যে অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। কাব্যটি কোন্ সময়ে লিখিত হয় তার সুষ্পষ্ট নির্দেশ কবি কোথাও করে যাননি। তবে রচনাটির মধ্যে যে ঐতিহাসিক সংকেত আছে সেটা বিশ্লেষণ করে মনে হয় ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ গ্রন্থরচনা সমাপ্তি লাভ করেছিল।

ধর্মঠাকুরকে অবলম্বন করে পুরাণধর্মী কাব্য রচনা করলেও ধর্মপুরাণের আদিকবি বলে কথিত ময়ূরভট্টের নাম যাদুনাথ একবারের জন্যও করেননি, অথচ রামাই পন্ডিতের উল্লেখ আছে। কাব্যটিতে যে আখ্যান উপস্থিত করা হয়েছে, তা অনেকটা পুরাণঘেঁষা। বারাণসীর রাজা হরিশচন্দ্র প্রথমাবধি ধর্মবিরোধী ছিলেন। যারা ধর্মের উপাসনা করতো তিনি তাদের উপর অত্যাচার করতেন। ফলে ধর্মের অভিশাপে তিনি সন্তানহীন ছিলেন। পরে তাঁর স্ত্রী মদনার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীবেশে বল্লুকার তীরে উপনীত হয়ে রামাই পন্ডিতের উপদেশে কঠোর তপস্যা করে পুত্রবর পেলেন। যথাসময়ে পুত্র লুইচন্দ্রের জন্ম হল। তবে শর্ত ছিল এই যে, তিনি ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রকে বলি দেবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর রাজা শর্ত রক্ষা করলেন না দেখে ধর্ম নিজেই সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে এসে লুইয়ের রাঁধামাংস খেতে চাইলেন। রাজা নিরুপায় হয়ে পুত্রকে বলি দিয়ে ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা করলেন। রাজার সত্যনিষ্ঠা দেখে ধর্ম নিজরূপ ধারণ করে লুইচন্দ্রকে বাঁচিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এই আখ্যানে ধর্মপূজার রীতিপ্রকরণ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন যাদুনাথ। ফলে এটি একাধারে 'ধর্মপূজাবিধান' ও ধর্মপুরাণের সমাহার হয়ে উঠতে পেরেছে।

যাদুনাথ তাঁর রচনায় আবেগ ও ভাষাকে সংহত ভাবেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষার্থে পিতামাতার মিলিত ভাবে নৃশংসভাবে সন্তানকে হত্যা করার কাহিনী বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কারুণ্যের সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের যশোদা যেন নতুন রূপ পেয়েছে স্নেহব্যাকুল জননী মদনার মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণে কবির বিশেষ দক্ষতা ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পৌরাণিক ঘটনার নিপুণ উল্লেখে, যেগুলি তিনি কাব্যবর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। আরো একটা ব্যাপার এই যে, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কবি কেবল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত উপমতগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হননি, ইসলামধর্মের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। পৌরাণিক শাক্ত ও হিন্দুসমাজের লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম নিবেদন করেছেন পীর ফকির গাজীদের প্রতিও। নিরঞ্জনের দশ অবতারের বর্ণনা দিয়েছেন। সর্বশেষ দশম অবতারে বুদ্ধ কল্কি ও ধর্ম এক হয়ে যে বাদ্‌শাহরূপে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছেন — এমন অভিনব সংবাদ যাদুনাথ তাঁর কাব্যে পরিবেশন করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ একটু উদ্ধৃত হল ঃ

"দশমে বন্দিনু বোদ্ধ কল্কি অবতার।
সত্যশূন্য নাম তার মেলেশ্চ আকার।।
যবন রূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাৎসাই ঠাকুরালি।
যবনরূপে একাকার সংহারিলে কলি।।"

১.২.৮.১.৬ : ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

আঠারো শতকেও ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা তার স্রোত হারিয়ে ফেলে নি। এই শতকে যে কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট তিনি হলেন বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। কবির পিতার নাম ছিল গৌরীকান্ত, মাতা সীতাদেবী। ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তাঁর

কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মসঙ্গীত'। অবশ্য কোন কোন ভণিতায়, 'অনাদিমঙ্গল'ও পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে নিজের সম্পর্কে খুব স্বল্প কথাই বলেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন নাড়গাঁ নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছে ঘনরামের আত্মকাহিনীর মর্মাংশ হিসেবে যা পেয়েছিলেন তার প্রামাণিকতায় যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। কবি কিভাবে কাব্যরচনার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেখানে সেকথা বলা হয়েছে। সে কাহিনী ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে কবি যে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি অবশ্য কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন না।

আঠারো শতকে বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতাদেবী। ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রীঃ রচিত হয়। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মসঙ্গীত'। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তিনি লাউসেন ও হরিশচন্দ্র দুটি আখ্যানকে কাব্যরূপ দেন। কেবল আয়তনগত বিশালতা নয়, চরিত্রসৃষ্টি এবং উপস্থাপনা কৌশলের গুণে ঘনরাম তাঁর রচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। কাব্যটিতে দৈব প্রাধান্যের বদলে মানবচরিত্রের প্রাধান্য আছে। সন্তানহীনা রানী রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী খুব নজর টানে। কলিঙ্গা, কানড়া, লখাই প্রমুখ নারীরা বীরাঙ্গনা নারীতে পরিণত হয়েছে। ঘনরামের গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ঘনরামের 'শ্রীধর্মসঙ্গীত' যথেষ্ট আয়তনবিশিষ্ট। ঐতিহ্য থেকে পাওয়া আখ্যানটুকু তো ছিলই, তার সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন নানা পুরাণ-উপপুরাণের গল্প। তিনি লাউসেন ও হরিশচন্দ্র — দুটি আখ্যানকে কাব্যরূপ দেন। রূপরামের হাতে যে কাব্য হয়েছিল পাঁচালী, ঘনরামের হাতে সে কাব্য যেন মহাকাব্য হয়ে উঠলো। কেবল আয়তনগত বিশালতা নয়, চরিত্রসৃষ্টি এবং উপস্থাপনা কৌশলের গুণে ঘনরাম তাঁর রচনায় নতুন মাত্রা যোজনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘনরামের কাব্যটিতে মোট চব্বিশটি পালা আছে, যার শুরু 'স্থাপনা পালা'য় এবং শেষ 'স্বর্গারোহণ' পালায়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনীসমূহকে তিনি প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছেন। কাব্যটিতে দৈবীপ্রাধান্যের বদলে সূচিত হয়েছে মানব চরিত্রের প্রাধান্য। গুরু ত্ব পেয়েছে সন্তানহীনা রাণী রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্র সাধনা এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী। খুব আলাদা করে নজর টানে ঘনরামের লাউসেন। কবি লাউসেনকে অনমনীয় পৌরুষের প্রতীক করে তুলেছেন। একইভাবে নৈতিক পবিত্রতায় লাউসেন হয়ে উঠেছে সকল পুরুষের আদর্শ। এটা হতে পারে যে, আঠারো শতকের সার্বিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে ঘনরাম নায়ক লাউসেনের দৃঢ় চরিত্রাদর্শ নির্মাণ করে সমকালের রুগ্নতাকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন। ঘনরামের নারীচরিত্রগুলিতেও বীরত্বের দীপ্তি এসে লেগেছে। কলিঙ্গা, কানড়া, লখাই প্রমুখ নারীরা কেবল গৃহবন্দিনী হয়ে অবস্থান করেনি। ঘনরামের কলমে তারা এক একজন বীরাঙ্গনায় পরিণত। এই কাব্যটি সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণটি চমৎকার। তিনি লিখেছেন — "লাউসেনের বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার চারিত্র্যবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার অধিকতর প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রমণীয় মাতৃত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বীরাঙ্গনার বীরমূর্তি,

প্রশ্ন :

১। আঠারো শতকের একজন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতার নাম কর ? কাব্যটির নাম কি ?

২। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের দু'জন নারীর নাম কর, যারা বীরাঙ্গনা নারীতে পরিণত হয়েছিল ?

দেবতার প্রতি ভক্তের একান্ত আত্মসমর্পণ, ক্রূর খলের নষ্টামি - এ সমস্ত বর্ণনাও কবির রচনাশক্তিকে সুপ্রমাণিত করিয়াছে।"

ঘনরাম পন্ডিত-কবি ছিলেন বলে অনুমান। সংস্কৃত সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে অধিগত করেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মার্জিত ও তৎসম-প্রধান কাব্যভাষায়। তাঁর রুচিবোধও প্রশংসনীয়। কোন রকম গ্রাম্যতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কাব্যে অনুপ্রাস থাকলেও, তা রামেশ্বরের মতো শব্দের বপ্রক্রীড়ায় পরিণত হয়নি। কবির কাব্যে বহুস্থলে রামভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় - বিশেষ করে ভণিতাতে। লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যুদ্ধ রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধের আদর্শে পরিকল্পিত। সম্ভবত গুরুর নির্দেশেই কবি এ কাব্য লেখেন। তাঁর গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন বলে ঘনরাম জানিয়েছেন। বাস্তবিকই কাব্যটি আয়তনে, গুণমানে, ভাষাগত সম্পন্নতায়, চরিত্রসৃজনে অনবদ্য, হয়তো বা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়ার যোগ্য।

১.২.৮.১.৭ : মাণিকরাম গাঙ্গুলী

এই কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে পন্ডিতমহলে ঘোরতর বিতর্ক বর্তমান। কবি তাঁর কাব্যে যেভাবে রচনাকাল নির্দেশ করেছেন তার আঙ্কিক পাঠোদ্ধার সহজ নয়। তিনি লিখেছিলেন 'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে/ সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে।।' এ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু কবির কাব্যের ভাষা এত প্রাচীন নয় বলে পন্ডিতদের অভিমত। এজন্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পঞ্জিকা ও জ্যোতিষী গণনার দ্বারা এর কালনির্ধারণ করেন এবং মোটামুটি স্থির করেন যে ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই কাব্য লেখা হয়। এই তারিখটি অন্য একটি প্রমাণসূত্রেও মিলে যায়। তবে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের যে উল্লেখ করেন সেটি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল, তার পূর্বে নয়।

> *হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বেলডিহা গ্রামে মাণিকরামের জন্ম। তাঁর পিতার নাম গদাধর, মাতা কাত্যায়নী। মানিকরাম তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীধর্মমঙ্গল'। গ্রন্থের আরো একটি নাম 'বার্মাতি'। বারমতি অর্থাৎ বারোদিনে সমাপ্য কোন গীতিমুখর কাব্য। চরিত্র-চিত্রনে দু-একটি স্থানে সামান্য অভিনবত্ব আছে। কালুডোমের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনটি কবির কলমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কাব্যটি ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।*

গ্রন্থের সূচনায় কবি নিজের সম্পর্কে বিশদভাবে জানিয়েছেন পূর্ব প্রথানুসরণে। তাতে দেখা যাচ্ছে, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বেলডিহা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম গদাধর, মাতা কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কবিই জ্যেষ্ঠ। তাঁর চতুর্থ ভাই ধর্মঠাকুরের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে কাব্যের গায়েন হয়েছিলেন। প্রথম দিকে অন্ত্যজজাতির দেবতাকে নিয়ে কাব্য লিখতে কুণ্ঠিত হলেও দেবতা স্বয়ং যখন অভয়বাণী শোনালেন, তখন কাব্য রচনা করতে আর বাধা রইলো না।

মাণিকরাম তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীধর্মমঙ্গল'। এছাড়া এ গ্রন্থের আরো একটি নাম আছে 'বার্মাতি'। এটি 'বারমতি' শব্দের অপভ্রংশ। বারমতি অর্থাৎ বারোদিনে সমাপ্য কোন গীতিমুখর কাব্য। মোট বারো দিন ধরে দিন ও রাতে এ কাব্য পাঠ করা হতো বলে এমন নাম। অবশ্য আয়তনগত দিক দিয়ে কাব্যটি ঘনরামের কাব্যের তুলনায় হ্রস্ব। কাব্যের কাহিনীতে কোথাও কোন নতুনত্ব নেই। চরিত্রচিত্রণে দু'একটি স্থানে সামান্য অভিনবত্ব আছে। যেমন লাউসেনের ভাই কর্পূরধবল চরিত্র, যে বিপদের সময় লাউসেনকে এগিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করে। কবি হয়তো সমকালীন ভীরু বাঙালিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এই চরিত্রের ভিতর দিয়ে। মাণিকরাম কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বজ কবি ঘনরামকে অনুসরণ করেছিলেন। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে

সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনায়। এখানে কবি মার্কণ্ডমুনির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। আর একটি চরিত্র রচনায় মাণিকরাম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি কালু ডোমের চরিত্র। এ চরিত্রচিত্রণে তিনি অনেক বেশি সহৃদয়। কালুর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনটি কবির কলমে এইরূপ — "ম্লান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফিরা।/কটিতে কৌপীন তার গন্ডা দশ গিরা।। তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।/ কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের ডেড়ি।।" তার লবণহীন অন্নব্যঞ্জন কালুর চরম অভাবকে নিরাবরণ করে দিয়েছে। মাণিকরামের কলমে যুগের এই বাস্তবতা ফুটে ওঠায় তা অনেক বেশি ইতিহাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এর অন্যপ্রান্তে রয়েছে আদিরসের বাড়াবাড়ি। ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে এ বিষয়ে তিনি অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারেন। রামায়ণ - মহাভারতকে ঘনরাম যেমন অক্লেশে ব্যবহার করেছেন, তেমনটা মাণিকরামে দেখা যায় না। তবে তাঁর কাব্যেও এর প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তৎসম শব্দ কিংবা সংস্কৃত অলংকারের প্রতি মাণিকরামের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। মোটের উপর তাঁর কাব্য অন্য অনেকের তুলনায় উপভোগ্য। এই কাব্য ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত কবিগণের বাইরে আরো অনেক কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে হৃদয়রাম সাউ, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যা, রামকান্ত রায়, প্রভুরাম মুখুয্যে, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধিরাম গাঙ্গুলী, রামনারায়ণ, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনায় কী ঘটনা সংস্থাপনে কী চরিত্রসৃজনে কোন বিশিষ্টতা দেখা যায় না। প্রতিভাশক্তির অভাবে তাঁরা কেবল গতানুগতিক প্রথারই অনুবর্তন করে গিয়েছেন। তাই এগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের তালিকা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে মাত্র, রসজ্ঞ পাঠকের মর্মলোকে চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতো অন্যান্য মঙ্গলকাব্যধারাতেও এমন অক্ষম লেখকের সংখ্যাও কম নয়। এঁদের মাথাগণনা কেবল ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহের তাগিদেই।

প্রশ্ন :

১। মানিকরামের কাব্যের নাম কি ?

২। এই কাব্যটি কোথা থেকে, সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ?

১.২.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী / পুরুষ — ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়) — শ্রীসুকুমার সেন

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম) — শ্রীভূদেব চৌধুরী

১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ধর্মমঙ্গল অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের থেকে আলাদা কেন ? এর কাহিনী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. ধর্মমঙ্গল 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য'— ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য আলোচনার মধ্য দিয়ে এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার করো।

৩. ময়ূর ভট্ট ও রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. টীকা লেখ ঃ

(ক) রূপরাম চক্রবর্তী

(খ) ঘনরাম চক্রবর্তী

(গ) মাণিকরাম গাঙ্গুলী

(ঘ) ময়ূরভট্ট

(ঙ) যাদুনাথ বা যাদবনাথের ধর্মমঙ্গল

(চ) সীতারাম দাস

(ছ) রামদাস আদক

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ৯ : অনুবাদ সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

১.৩.৯.১ ভূমিকা

১.৩.৯.২ ভাগবত

১.৩.৯.২.১ মালাধর বসু

১.৩.৯.২.২ রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

১.৩.৯.২.৩ দ্বিজমাধব

১.৩.৯.২.৪ ভবানন্দ

১.৩.৯.৩ রামায়ণ

১.৩.৯.৩.১ কৃত্তিবাস

১.৩.৯.৩.২ অদ্ভুতাচার্য

১.৩.৯.৩.৩ চন্দ্রাবতী

১.৩.৯.৩.৪ রঘুনন্দন গোস্বামী

১.৩.৯.৩.৫ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী

১.৩.৯.৪ মহাভারত

১.৩.৯.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

১.৩.৯.৪.২ শ্রীকর নন্দী

১.৩.৯.৪.৩ কাশীরাম দাস

১.৩.৯.৪.৪ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী

১.৩.৯.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৩.৯.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.৯.১ : ভূমিকা

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল আদি-মধ্যযুগে। কবিবর মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নির্দিষ্ট সন তারিখযুক্ত প্রথম অনুবাদ। মহাকবি কৃত্তিবাসের 'রামপাঁচালী'র রচনাকাল আনুমানিক হলেও প্রাচীনত্বের দিক থেকে প্রথম হওয়া সম্ভব। ভাগবত অথবা রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার ও বাঙালির সারস্বত সাধনার অগ্রগতির ইতিহাস ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের অন্বয় বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে করেছিল সুদৃঢ়। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোধকরি এখানেই।

১.৩.৯.২ : ভাগবত

১.৩.৯.২.১ : মালাধর বসু

বাংলা ভাষায় 'শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ' গ্রন্থের কিছু অংশের প্রথম অনুবাদ করেন মালাধর বসু। তিনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিখ্যাত কবি। চৈতন্যদেব তাঁকে চোখে দেখেননি কিন্তু তাঁর কাব্যকে বিশেষ সম্মান করতেন। 'ভাগবত'কে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের উপনিষদ বলা হয়। মালাধর সেই গ্রন্থের অংশবিশেষ সরল বাংলায় অনুবাদ করে এদেশে বৈষ্ণব মতের সূচনা করেন। কবির ব্যক্তি পরিচয়ের খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তা হল, তিনি বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ কুলীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবি-পৌত্র রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহ কবির কাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন কবি মালাধর। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'।

> *বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে প্রথম সন তারিখ যুক্ত গ্রন্থ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য। মালাধর বসু প্রাক চৈতন্য যুগের কবি। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহ কবির কাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ও কবিকে 'গুণরাজখাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'ভাগবত'কে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের উপনিষদ বলা হয়। মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেন। ১৪৭৩ খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন ও ১৪৮০ খ্রীঃ শেষ করেন। কাব্যের নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশী মাহাত্ম্যই প্রধান বিষয়বস্তু। কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁর জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী এ কাব্যের বিষয়। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।*

বিদ্যোৎসাহী সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহের রাজত্বকালে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচিত হয়েছিল। সুলতান কবিকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কাব্য-মধ্যে এর রচনাকাল সম্পর্কিত দুটি ছত্র পাওয়া যায় —

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

প্রশ্ন :

১। মালাধর বসু ভাগবতের কোন অংশ অনুবাদ করেন ?
২। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য আর কি নামে পরিচিত ?
৩। মালাধর বসুকে 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি কে দিয়েছিলেন ?

অর্থাৎ শকাব্দের হিসাবে এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২। খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৪৭৩-৮০। একটি মাত্র পুঁথিতেই এই ছত্র দুটি পাওয়া যায়। তাই এর প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নয়। তবে বলা যেতে পারে কবি প্রাক্-চৈতন্য যুগের মানুষ ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন এবং এই সময়েই তিনি ভাগবতের অনুবাদ করেন।

পঞ্চদশ শতকে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ-কাহিনীকে নিয়ে বাংলাভাষায় অনুবাদের ঢেউ উঠেছিল। কবি মালাধর পুরাণ-কথিত হিন্দু ধর্মের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর-কাহিনী গুরুত্ব পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের ঐশী মাহাত্ম্যই এই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। তুর্কী আক্রমণ-পরবর্তী সময়ে যবন-শাসন সমাজে অত্যাচারের মাত্রা যেভাবে বাড়িয়েছিল তাতে সাধারণ মানুষ ছিল বিপর্যস্ত। তাই মানুষের মনে একটা প্রতিবাদের ভাষা তৈরীর জন্য এই কাব্যের অবতারণা। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক আদর্শ তুলে ধরা কবির উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের শৌর্য-বীর্যের আড়ালে নিজেদের উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ এবং তার জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী এ কাব্যের বিষয়। সমগ্র কাহিনীকে কবি তিনটি খন্ডে ভাগ করেছেন। বৃন্দাবন লীলা - কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রায় এর সমাপ্তি। মথুরালীলা শেষ হয়েছে দ্বারকা নগরী নিমার্ণের পরিকল্পনায়। দ্বারকালীলা — কৃষ্ণের তনুত্যাগ ও যদুবংশ ধ্বংস-এর প্রধান ঘটনা। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি থেকে কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন কবি। গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা অনেকাংশে বর্জন করে রচনা সহজবোধ্য করার জন্য মালাধর প্রশংসার দাবি রাখেন। অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়ে কবি তাঁর মৌলিকতার নিদর্শন রেখেছেন।

> *মালাধর বসুর জন্ম বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হলেও বাঙালির নিজস্ব মনোভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। মালাধর বসু কৃষ্ণকে প্রথম প্রাণনাথ বলে সম্বোধিত করেছেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। সাহিত্যগুণের কথা বাদ দিলেও বাংলায় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের প্রথম প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এর গুরুত্ব ভীষণভাবে স্বীকৃত।*

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ। তা সত্ত্বেও সেখানে বাঙালির ঘরের কথা, বাঙালির নিজস্ব মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। রাখাল বালকের সাথে কৃষ্ণের ভাত খাবার দৃশ্য, মথুরা-বৃন্দাবনের গৃহদ্বারে কলাগাছের সারি, সুপারি-নারকোলের বাগান, বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব ফুল-ফল, বৃক্ষলতায় ভাগবতের কাহিনী-পরিমন্ডল তৈরী করতে কবি সংকুচিত হননি। সরল পয়ার-ত্রিপদীতে ঘটনার বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন। এ গ্রন্থেই কৃষ্ণকে প্রথম 'প্রাণনাথ' বলে সম্বোধিত করা হয়েছে - 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনার ইঙ্গিত এখানেই মেলে। সাহিত্যগুণের কথা বাদ দিলেও বাংলায় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের প্রথম প্রবেশক গ্রন্থ হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর গুরুত্ব ভীষণভাবে স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস-কাশীরামের মতো জনপ্রিয়তা মালাধর দাবি করতে পারেন না। শিল্প উৎকর্ষের বিচারে মহাকাব্য হয়ে ওঠার

প্রশ্ন :

১। মালাধর বসু কোন্ সময়ের কবি ? তাঁর বাবা ও মায়ের নাম কি ?
২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের কি কি লীলা আছে ?

সঙ্গতি এ কাব্যে নেই। মানুষের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেননি কবি। তাছাড়া রামায়ণ মহাভারতের মতো ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রহণযোগ্য হয়নি। ভাগবতের মতো বীররসাত্মক কাব্য অপেক্ষা রামায়ণের মতো পারিবারিক জীবনরসাশ্রিত কাব্য সাধারণের কাছে বেশি আদরণীয়। তবুও প্রথম যুগের ভাগবত অনুবাদক হিসাবে মালাধরের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১.৩.৯.২.২ : রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

বাংলা ভাষায় ভাগবত-অনুবাদ হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী'। গ্রন্থটির রচয়িতা কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। রঘু পন্ডিত তাঁর আসল নাম। ভাগবতাচার্য তাঁর উপাধি। জানা যায়, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন লীলাচল থেকে বাংলায় আসেন তখন পথিমধ্যে বরাহনগরের জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ভাগবত পাঠ শোনেন এবং অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' এ কথার সমর্থন আছে। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্য সমকালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ছিল। তিনি মূল ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্দ সংক্ষিপ্ত রূপে ও শেষ তিনটি স্কন্দ পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য মূল গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তাতে বাদ পড়েনি। তথ্যনিষ্ঠা ও সংযত ভাষারীতি এ কাব্যের বিশেষ গুণ। চৈতন্য-সমকালে এ কাব্য রচিত এবং কবি চৈতন্যভক্ত বলে এতে চৈতন্যদেবকে কোথাও কোথাও অবতাররূপে দেখানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

> ***বাংলা ভাষায় ভাগবত অনুবাদক হিসেবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' উল্লেখযোগ্য। তিনি মূল ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্দ সংক্ষিপ্ত রূপে ও শেষ তিনটি স্কন্দ পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেছিলেন। কবি চৈতন্যভক্ত ছিলেন বলে চৈতন্যকে অবতার রূপে দেখেছেন।***

প্রশ্ন :

১। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের আসল নাম কি ? তার উপাধি কি ছিল ?

১.৩.৯.২.৩ : দ্বিজমাধব

দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য হলেন ভাগবতের অনুবাদক কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। ভাগবতের গুরুগম্ভীর বিষয়কে লোকসমাজের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচিত। মহাপ্রভুকে অবতাররূপে দেখাতে চেয়েছেন কবি। পান্ডিত্য নয়, আবেগ ও সহৃদয়তার গুণে এ কাব্য পাঠকসমাজে সমাদৃত। এ কাব্যের বিশেষত্ব হল কৃষ্ণলীলার 'দানখন্ড'। 'নৌকাখন্ড' অংশও এখানে আছে।

> ***দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। ভাগবতের গুরুগম্ভীর বিষয়কে লোকসমাজের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় এই কাব্যটি রচিত হয়।***

প্রশ্ন :

১। দ্বিজমাধবের কাব্যের নাম কি ?

১.৩.৯.২.৪ : ভবানন্দ

বাংলা ভাষায় ভাগবত-অনুবাদক কবিদের মধ্যে ভবানন্দ একটি বিতর্কিত নাম। ভাগবত মূলত বীররসাত্মক কাব্য। কিন্তু ভবানন্দের 'হরিবংশ' কাব্য কামাসক্তির বিকৃত প্রকাশে অনেকটাই স্থূলরুচির বাহক। পাবনা জেলা থেকে ১৯২২ খ্রীঃ নাগাদ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ভবানন্দের কাব্যের একখানি খন্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হরিবংশ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। তবে গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বির্তক রয়ে গেছে। সতীশ চন্দ্রের মতানুযায়ী কাব্য রচনাকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী। কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে -এ কাব্য রচিত হয়। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও ভট্টশালীর সঙ্গে সমমত পোষণ করেন।

> *ভাগবত মূলত বীররসাত্মক কাব্য, কিন্তু ভবানন্দের 'হরিবংশ' কাব্য কামাসক্তির বিকৃত প্রকাশে অনেকটাই স্থূল রুচির বাহক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হরিবংশ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। কাব্য পরিণতিতে শ্রী রাধার দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণও পাওয়া যায়।*

ভবানন্দের কাব্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। তাঁর কাব্যে রতি বর্ণনার একটা কৈফিয়ৎও তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া বস্ত্রহরণ, বাঁশিচুরি, রাস প্রভৃতির বর্ণনা যেমন এখানে আছে, তেমনি কাব্য পরিণতিতে আছে শ্রীরাধার দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ। রাধা কৃষ্ণ শরীরে লয়প্রাপ্ত হন। এ বর্ণনা অভিনব। এ কাব্যে রাধার আর এক নাম 'তিলোত্তমা' যা নিছকই কবিকল্পনা। যা হোক, এ কাব্যে কবির বিলাসপ্রিয়তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেলেও সুললিত ভাষাভঙ্গী, সাবলীল ছন্দরীতি, অলংকার নৈপুণ্য ও চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর কবিকৃতি সুবিদিত।

প্রশ্ন :

১। ভবানন্দের কাব্যটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ? কোন বঙ্গাব্দে ?
২। কাব্যটির নাম কি ? বিতর্কিত কেন ?

১.৩.৯.৩ : রামায়ণ

১.৩.৯.৩.১ : কৃত্তিবাস

বাংলা ভাষায় অনুবাদ চর্চার প্রথম যুগে বাল্মীকির রামায়ণকে যিনি বাংলা ভাষায়, বাঙালির মতো করে বাঙালির কাছে উপস্থিত করেন তিনি 'বঙ্গের অলংকার' কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় জীবনের কবি। তাঁর 'শ্রীরামপাঁচালী' বাঙ্গালির জাতীয় মহাকাব্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয় পঞ্চদশ শতকে। সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঙালির হৃদয়ে যে আনন্দসুধা দান করেছেন কবি কৃত্তিবাস তা অন্য কোনও বাঙালি কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙালির হৃদয়ে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন কবি।

কৃত্তিবাসের কাব্যে 'আত্মবিবরণী' অংশে তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের কিছু জানা যায়। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ছিলেন পূর্ববঙ্গের বেদানুজ রাজার পাত্র। সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতায় তিনি এপার বাংলায় চলে আসেন। গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, মাতা

মালিনী। তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কাব্যের মধ্যে শ্লোক অনুযায়ী কবির জন্ম মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে। কিন্তু কোন সাল তা উল্লিখিত হয় নি। জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেছেন ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম। বারো বছর বয়সে কবি উত্তরবঙ্গে পদ্মাতীরে গমন করেন। বিদ্যার্জনের পর গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাতটি শ্লোক লিখে রাজাকে নিবেদন করেন। তাঁর শ্লোক শুনে খুশি হয়ে রাজা তাঁকে মালা-চন্দনে ভূষিত করেন এবং পট্টবস্ত্র উপহার দেন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর কাব্যরচনা শুরু করেন।

> *বাল্মীকির 'রামায়ণ' কে যিনি বাংলা ভাষায়, বাঙালির মতো করে বাঙালির কাছে উপস্থিত করেন তিনি 'বঙ্গের অলংকার' কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর 'শ্রীরামপাঁচালী' বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য। পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়। কবির পিতার নাম বনমালী, মাতা মালিনী। কাব্যের মধ্যে শ্লোক অনুযায়ী কবির জন্ম মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে। সম্ভবত রাজা গনেশ কবিকে মালা চন্দনে ভূষিত করেন।*

কৃত্তিবাসের কাব্যে গৌড়েশ্বর ও তাঁর সভাসদের বর্ণনা থাকলেও তিনি কোন্ গৌড়েশ্বরের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তা কাব্যে উল্লিখিত হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই সংশয় তৈরী হয়েছে। কোনও কোনও গবেষক মনে করেন, কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনেকেই তা মানতে চান না। কেউ কেউ বলেন কৃত্তিবাস তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। যাই হোক, রাজা যিনিই হোন না কেন, তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি সপ্তকান্ডে রামায়ণ অনুবাদ করেন।

কৃত্তিবাসের কাব্য মূলতঃ ভাবানুবাদ। বাঙালি সমাজ ও লোকজীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাধারণ মানুষের জন্য লিখিত বলে এ কাব্য পাঁচালির ঢঙে লেখা। আপামর সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে কবি সহজবোধ্য ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মূল কাহিনীর অনেক অংশই বর্জন করা হয়েছে। কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, অম্বরীষ যজ্ঞ, রামচন্দ্রের আদিত্য-হৃদয়, স্তবপাঠ ইত্যাদি বিষয় মূল গ্রন্থে থাকলেও কৃত্তিবাস গ্রহণ করেন নি। আবার লোক-উৎস থেকে কিছু কাহিনী এ কাব্যে সংকলিত। সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, বীরবাহুর কথা, তরণীসেন কাহিনী, মহীরাবণ-অহীরাবণ কথা, রামচন্দ্র-কর্তৃক দেবীর অকালবোধন — এগুলো পুরাণসিদ্ধ কাহিনী নয়। এই অংশগুলি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়ে যথেষ্ট মৌলিক কল্পনার পরিচয় রেখেছেন কবি। বাল্মীকির গ্রন্থ ছাড়াও 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'জৈমিনি ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কবি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাই কৃত্তিবাস শুধু অনুবাদকই নন, সার্থক সংকলক ও সম্পাদকও বটে।

প্রশ্ন :

১। কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় জ্ঞাপক শ্লোকটির নাম কি ?
২। কবির পিতা ও মাতার নাম কি ? কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

কবি বাঙালি মানসের গভীর সুরটি ধরতে পেরেছিলেন। গার্হস্থ্য-জীবনরস এ কাব্যে অধিক মাত্রায় উচ্ছলিত। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বন্ধুবান্ধব সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠা যে পারিবারিক বৃত্ত, তার হাসি-কান্না দুঃখ-বেদনা আনন্দ-অশ্রু কৃত্তিবাসের কাব্যে উপস্থিত। পাঠক কাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেদের সাযুজ্য ভীষণভাবে অনুভব করে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন পাঠকের পরিচিত চরিত্র। ভক্তিরস

কৃত্তিবাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূল রামায়ণে রাম বীর চরিত্র। 'শ্রীরামপাচাঁলী'তে রামের মধ্যে বীরত্ব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। এ কাব্যের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকে উদ্ধার করেন। এমনকি বনের পশুপাখিরাও তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত নয়। হনুমানের জীবনকে সার্থক করেছেন তিনি। বিভীষণ তাঁর ভক্ত। এই ভক্তিভাবের সঙ্গে পারিবারিক আদর্শ, পিতা-মাতা গুরুজনকে ভক্তি করা সব মিলেমিশে গেছে এ কাব্যে। বাঙালির জীবনচারণের প্রতিটা দিক এখানে উপস্থিত। বাঙালির প্রিয় খাদ্য ভাত। তাছাড়া লুচি, গুড়পিঠে, ক্ষীরনাড়ু, চিতুইপুলি, নারকেলপুলি, পায়েস, রোহিত-চিতলমাছ দিয়ে উৎসবের ভোজের আয়োজন। এমনকি গুয়া-পানও বাদ যায় না। কবি অত্যন্ত সুকৌশলে বাংলাদেশের কিছু স্থানের নামও এনেছেন তাঁর কাব্যে - আদি সপ্তগ্রাম, গুপ্তিপাড়া, নবদ্বীপ ইত্যাদি। কৃত্তিবাসের রচনাশক্তি, সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী, ছন্দ-অলংকারের নিপুণ প্রয়োগ কাব্যকে রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ করেছে। কৃত্তিবাসের কাব্য একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারের আদর্শ ও ভক্তিরসের ফল্গুধারায় যুগ যুগ ধরে অভিসিঞ্চিত করে চলেছে বাঙালির হৃদয়।

কৃত্তিবাসের কাব্য মূলত ভাবানুবাদ। বাঙালি সমাজ ও লোক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাল্মীকির গ্রন্থ ছাড়াও 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'জৈমিনি ভারত' প্রভৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কৃত্তিবাসের কাব্য বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ও ভক্তিরসের ফল্গুধারায় অভিসিঞ্চিত করে চলেছে বাঙালির হৃদয়। মূল রামায়ণে রাম বীর চরিত্র, শ্রীরামপাঁচালীতে রামের বীরত্ব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। বাঙালির প্রিয় খাদ্য তালিকাও কৃত্তিবাসের কাব্যে স্থান করে নিয়েছে।

প্রশ্ন :

১। কৃত্তিবাস, বাল্মীকির গ্রন্থ ছাড়াও আর কি কি গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ?
২। কৃত্তিবাসের কাব্য মূলত কি ধরণের ?
৩। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কতগুলি কাণ্ডে বিভক্ত ? কাণ্ডগুলির নাম কি কি ?

১.৩.৯.৩.২ : অদ্ভুতাচার্য

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী বুকানন কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে গিয়ে অদ্ভুত আচার্য নামে এক কবির সন্ধান পান, যিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। বুকাননের বিবরণীতেই প্রথম অদ্ভুত আচার্য নামটি ছাপার হরফে পাওয়া যায়। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর আগে এই কবিকে নিয়ে কেউ তেমন কোনও আলোচনা করেননি। ডঃ ভট্টশালী সমসাময়িক কুলজীগ্রন্থ ও জমিদার বংশের ইতিহাস থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন অদ্ভুত আচার্য ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা শহরের কাছে সোনাবাজু অথবা অমৃতকুন্ডা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর কাব্যের নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'। ১৯১৩ সালে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় অদ্ভুত রামায়ণের আদিকান্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত বাল্মীকি রামায়ণের মতো অদ্ভুত রামায়ণও সাতটি কান্ডে রচিত। যদিও মূল সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে এই রামায়ণের সংযোগ গভীর নয়। ডঃ ভট্টশালী অদ্ভুত আচার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে গিয়ে কৃত্তিবাসের প্রতিভাকে খানিকটা খাটো করে ফেলেছেন। কবির সহজ সরল রচনারীতি হরিষে-বিষাদে মনকে ছুঁয়ে যায়। তাই বলে অদ্ভুত রামায়ণের কিছু অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর এ কথা না বলাই

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী বুকানন কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে গিয়ে অদ্ভুত আচার্য নামে এক কবির সন্ধান পান, যিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। পাবনা শহরের কাছে অমৃতকুণ্ডা গ্রামে ১৬৪৭ খ্রীঃ অদ্ভুতাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'। সপ্তদশ শতকে উত্তরবঙ্গে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ প্রচলিত ছিল এবং তাতে কিছু প্রতিভার পরিচয় মেলে একথা স্বীকৃত।

ভালো। তবে সপ্তদশ শতকে উত্তরবঙ্গে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ প্রচলিত ছিল এবং তাতে কিছু প্রতিভার পরিচয় মেলে - এ কথা স্বীকৃত।

> **প্রশ্ন :**
> ১। অদ্ভুত আচার্য নামে এক কবির সন্ধান কে পেয়েছিলেন ?
> ২। অদ্ভুত আচার্যের জন্ম কোন শহরে ?

১.৩.৯.৩.৩ : চন্দ্রাবতী

মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে যে সমস্ত মহিলা কবি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম চন্দ্রাবতী। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা। দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন চন্দ্রাবতী ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল করুণরসাত্মক। মানসিক শান্তির জন্য তিনি নদীতীরে একটি শিব মন্দিরে দিনযাপন করতেন এবং সেখানেই সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি মনসার ভাসান, মলুয়া এবং কেনারাম প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র গাথা রচনা করলেও তাঁর রামায়ণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও এ কাব্যের কোনও লিখিত পুঁথি পাওয়া যায়নি। প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রাহক চন্দ্রনাথ দে পূর্ববঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত এই কবির রামায়ণ কাব্য উদ্ধার করেছিলেন। এই কবির কাব্যপাঠে রসিকজন উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ নিয়ে কিছু সংশয়ও তৈরী হয়েছে। এর ভাষারীতি অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন, এমনকি কোথাও কোথাও আধুনিকতার ছোঁয়াও আছে। আবার কাব্যটি মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত হলেও এতে স্থানীয় বাচনভঙ্গিমা অনুপস্থিত। যাই হোক, কাব্যটি পরবর্তীকালে সংগৃহীত এবং এর লিখিত পুঁথি পাওয়া যায়নি বলে এমনটা হতে পারে। তবে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে সমকালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

> ***মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে যে সমস্ত মহিলা কবি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম চন্দ্রাবতী। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা। তিনি মনসার ভাসান, মহুয়া এবং কেনারাম প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র গাথা রচনা করলেও তাঁর রামায়ণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।***

১.৩.৯.৩.৪ : রঘুনন্দন গোস্বামী

রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে খুবই আধুনিক কালের একজন হলেন রঘুনন্দন গোস্বামী। তিনি মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার নাড় গ্রামে। নিত্যানন্দ বংশোদ্ভুত কবির পিতা ছিলেন কিশোরীমোহন। তাঁর লেখা কাব্যের নাম 'রামরসায়ণ'। বৈষ্ণব পরিমন্ডলের মানুষ হওয়ার কারণে এ কাব্যে কিছুটা বৈষ্ণব ভাবাদর্শে প্রাণিত। মূল রামায়ণের অনেক অংশই এ কাব্যে না থাকলেও কবির শব্দবিন্যাস ও ছন্দোমাধুর্য প্রশংসনীয়।

> **প্রশ্ন :**
> ১। একজন মহিলা কবি 'রামায়ণ' রচনা করেছেন, তাঁর নাম কি ?
> ২। সপ্তদশ শতকের একজন রামায়ণ অনুবাদকের নাম কি ?

১.৩.৯.৩.৫ : কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সপ্তদশ শতকের একজন রামায়ণ অনুবাদক কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। দীর্ঘজীবী কবির জন্ম ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পানুয়া (বর্তমানে পেনো গ্রামে)। মৃত্যু ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে

১১৬ বছর বয়সে। জানা যায়, তিনি রামায়ণ ছাড়াও ভাগবত, মহাভারত, শিবায়ণ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। মল্ল রাজবংশের আশ্রিত কবির রচনা অনেকাংশেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে করেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন।

১.৩.৯.৪ : মহাভারত

১.৩.৯.৪.১ : কবীন্দ্র পরমেশ্বর

সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম বাংলায় অনুবাদ-রূপ দেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে এ কাব্যের নাম 'পরাগলী মহাভারত'। 'কবীন্দ্র' হল কবির উপাধি, পরমেশ্বর নাম এবং উপাধি দাস। কিন্তু কবিকে নিয়ে তৈরী হয়েছে বিতর্ক। বেশিরভাগ গবেষকই মনে করেন প্রাক-কাশীরাম যুগে পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী নামে পৃথক দুজন কবি মহাভারত রচনা করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই কবি। 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' হল উপাধি এবং শ্রীকর নন্দী নাম-পদবি। তাঁরা কিছু যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে সে যুক্তি যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী মহাভারতের দুজন পৃথক কবি। সময়ের হিসাবে তাঁরা সামান্য কিছু আগে-পরে কাব্য রচনা করেন। যাই হোক, গবেষকদের অনুমান 'পরাগলী মহাভারত' রচিত হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।

> ***সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম বাংলায় অনুবাদ রূপ দেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে এ কাব্যের নাম 'পরাগলী মহাভারত'। গবেষকদের অনুমান ১৫০০ থেকে ১৫১৫ খ্রীঃ মধ্যবর্তী সময়ে 'পরাগলী মহাভারত' রচিত হয়।***

প্রথম যুগের মহাভারত অনুবাদক হিসাবে পরমেশ্বর সাফল্য অর্জন করেছেন। কাহিনী বর্ণনায় সাবলীল গতি উঁচু দরের কবিত্বের প্রমাণ। নাটকীয় ভঙ্গীতে কাহিনী পরিবেশনা, উৎপ্রেক্ষা-অলংকারের সফল প্রয়োগ, পয়ার ত্রিপদী ছন্দের কুশল ব্যবহার কাব্যটিকে সরসতা দান করেছে।

প্রশ্ন :

১। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যটির নাম কি ? কার আজ্ঞায় তিনি কাব্যটি রচনা করেছিলেন ?
২। শ্রীকর নন্দীর কাব্যটির নাম কি ? কত সালে রচিত হয় ?
৩। প্রাক্ চৈতন্যযুগের দু'জন মহাভারত অনুবাদকের নাম কি ?

১.৩.৯.৪.২ : শ্রীকর নন্দী

শ্রীকর নন্দী মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রশ্ন হোল, এই ছুটি খান কে? সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষক বলেন ছুটি খানের আর এক নাম নসরৎ শাহ্। তিনি হুসেন শাহের পুত্র। কিন্তু বেশিরভাগের ধারণা পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান। ছুটি খানের প্রেরণায় শ্রীকর নন্দীর কাব্য রচিত বলে এ কাব্য 'ছুটিখানী মহাভারত' নামেই বেশি পরিচিত। গবেষকদের অনুমান ১৫১২ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ কাব্য রচিত। শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মতো সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেননি। কবি 'জৈমিনি সংহিতা' অবলম্বনে

মহাভারতের শুধুমাত্র অশ্বমেধ পর্বই অনুবাদ করেছিলেন। তাই কেউ কবির কাব্যকে মহাভারত না বলে বাংলা 'জৈমিনি-সংহিতা' বলারই পক্ষপাতি। রাজদরবার ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত বর্ণনায় কবির প্রতিভা স্বীকৃত।

১.৩.৯.৪.৩ : কাশীরাম দাস

যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয়ে মহাভারত কথার অমৃতবর্ষণ করে চলেছেন যিনি, তিনি কাশীরাম দাস। বাংলায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। আপামর সাধারণ বাঙালির জীবনে সুধার সন্ধান দিয়ে নিত্য স্মরণীয় হয়েছেন কবি কাশীরাম। জনপ্রিয়তার নিরিখে তিনি কৃত্তিবাসের কাছাকাছি। বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি (মতান্তরে সিদ্ধি) গ্রামে কায়স্থ পরিবারে কবির জন্ম। পৈতৃক উপাধি 'দেব'। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পরিবারে কবির জন্ম বলে কাব্যের সর্বত্র বৈষ্ণবসুলভ বিনয় বজায় রেখেছেন কবি। এবং সে কারণেই নিজেকে 'দাস' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'ভারত পাঞ্চালী'।

কাশীরামের কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও কাব্যের মধ্যে ব্যবহৃত একটি শ্লোক থেকে জানা যায় ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিরাট পর্বের সূচনা হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা চলে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক 'ভারত পাঞ্চালী'র রচনাকাল। রচনাকাল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেলেও কাশীরামের নামে প্রচলিত কাব্যের কতখানি অংশ কাশীরাম নিজে লিখেছিলেন এবং কতখানি অংশ বা অন্যেরা সে সম্পর্কে কিছু সংশয় আছে। কাব্যের মধ্যে একস্থানে একটি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।

অর্থাৎ কাব্যে আদি, সভা, বনপর্ব সম্পূর্ণ এবং বিরাট পর্বের কিছু অংশ রচনা করার পর কাশীরামের মৃত্যু হয়। গবেষকরা বিভিন্ন পুঁথি বিচার করে দেখেছেন যে উপরোক্ত শ্লোকটি সত্য। কবির মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম কিছু অংশ রচনা করেছিলেন। 'শান্তি পর্বে'র রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ বসু এবং জয়ন্ত দাস 'স্বর্গারোহণ' পর্ব রচনা করেছিলেন। কেউ বলেন জয়ন্ত দাস কবির পুত্র, কেউ বলেন কবির জামাতা। যাই হোক বিভিন্ন কবির লেখা মিশে কাশীরামের নামে প্রচলিত কাব্য বাঙালির ঘরে ঘরে পবিত্রতার সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

বাংলা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থ পরিবারে কবির জন্ম। পৈতৃক উপাধি 'দেব'। তাঁর কাব্যের নাম 'ভারত পাঞ্চালী'। সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক 'ভারত পাঞ্চালী'র রচনাকাল।
"আদিসভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।"
বীররস প্রধান কাহিনীর সঙ্গে ভক্তিভাব মিশে এক অপরূপ আস্বাদ নির্মিত হয়েছে এ কাব্যে। কবি কাশীরাম বাঙালি, কাব্যের ভাষা বাংলা, কাব্যের পাঠক বাঙালির জন্য কোথাও ভাবানুবাদ, কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ, কোথাও সারানুবাদ করে অষ্টাদশ পর্বে কাব্যটিকে বিন্যস্ত করেছিলেন।

চৈতন্য পরবর্তীকালে কাশীরামের কাব্য রচিত। স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তিব্যাকুলতা এখানে উপস্থিত। বীররসপ্রধান কাহিনীর সঙ্গে ভক্তিভাব মিশে এক অপরূপ আস্বাদ নির্মিত হয়েছে এ কাব্যে। কাশীরামের সংস্কৃত জ্ঞান সম্পর্কে এক সময় পন্ডিতদের মধ্যে সংশয় তৈরী হয়েছিল। কিন্তু রচনাশক্তির নিপুণতায় সে সংশয় স্থায়ী হয় নি। ঘোরতর সংগ্রাম ও অর্জুনের বীরত্ব বর্ণনায় বীররস যেমন আছে, তেমনি আছে পিতামহের অন্তিম বর্ণনা-দৃশ্যে আবেগের প্রাধান্য। মহাভারতীয় গাম্ভীর্য ও ধ্বনিঝংকার কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে যথাসাধ্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। মূল মহাভারতের প্রায় সমস্ত অংশই কাশীরামের কাব্যে আছে। তা সত্ত্বেও কাহিনী বর্ণনায় কোথাও তা দুর্বোধ্য ও নীরস হয়ে ওঠেনি। কোন কাব্য সর্বজনপ্রিয় হওয়ার প্রাথমিক শর্ত সহজ বোধগম্যতা যা কাশীরামের কাব্যের প্রধান গুণ। আবার একই সঙ্গে ধ্রুপদী কাব্যের মান বজায় রাখতে তৎসম শব্দ ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগ তাঁর কাব্যকে অপরূপতা দান করেছে। আধুনিক কবিদৃষ্টিতে

তিনি ছিলেন 'ভারত পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস'। 'অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল শোভা' - কাশীরামের কাব্যের বিশেষ গুণ।

কাশীরামের মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত। মূল মহাভারতের তত্ত্ব ও নীতিকথার অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কবি স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'শ্রীবৎসচিন্তা' থেকে কিছু উপকরণ এ কাব্যে গৃহীত। 'জৈমিনি ভারত' থেকেও কিছু কিছু অংশ 'ভারত পাঞ্চালী'তে স্থান পেয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ, কোথাও ভাবানুবাদ এবং কোথাও সারানুবাদ করা হয়েছে এ কাব্যে। কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মহাভারতের পৌরাণিক পরিমন্ডল বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

কবি কাশীরাম বাঙালি; কাব্যের ভাষা বাংলা, কাব্যের পাঠক বাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির রীতি আদর্শের কথা এখানে উপস্থিত। মহাভারতের অমৃতবাণী যুগ যুগ ধরে বাঙালির মানসলোকে নীতি-আদর্শ-বিশ্বাসের রাজপথ নির্মাণ করে চলেছে। বাঙালি যতদিন থাকবে, কাশীরামও তত দিন থাকবে। বাঙালির জীবনে পুণ্য সঞ্চয়ে কাশীরাম দাসই নিত্য সঙ্গী —

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

প্রশ্ন :

১। কাশীরামের জন্মস্থান কোথায় ? তাঁর পিতার নাম কি ?
২। কাশীরাম মহাভারতের কটি পর্ব রচনা করার পর মারা যান ?
৩। কাশীরামের কাব্যটির নাম কি ? সেটি কটি পর্বে বিন্যস্ত ?

১.৩.৯.৪.৪ : কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্ত্তী

রাঢ়বঙ্গের কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পানুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে তাঁর কাব্য রচিত হয়। কাব্যে জোরালো কোনো কবিত্বশক্তি না থাকায় তা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া কাশীরাম দাসের কাব্যের আড়ালে অনেক কবির প্রতিভাই ঢাকা পড়ে গেছে।

১.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড) — শ্রীসুকুমার সেন
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) — শ্রীভূদেব চৌধুরী
৬। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা — গোপাল হালদার

১.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ ভাগবত অনুবাদকের নাম কি ? তাঁর অনুবাদকর্ম ও কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দাও।

২. কয়েকজন বিখ্যাত রামায়ণ অনুবাদকের অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি কাশীরাম দাসের অনুবাদকর্মের পরিচয় দাও।

৫. কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী ও সঞ্জয়ের মহাভারত অনুবাদের প্রকৃতি ও কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৬. রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ কম হওয়ার কারণ কি ? — আলোচনা করো।

৭. কৃত্তিবাসী রামায়ণ জনপ্রিয়তার নিরীখে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে এগিয়ে আছে কেন?— আলোচনা করো।

৮. অনুবাদ সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত কবিজনেরা এই কাজে রাজসভার পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছিলেন কেন? আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১১

শ্রীচৈতন্য জীবনীসাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

১.৩.১১.১ ভূমিকা

১.৩.১১.২ শ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

১.৩.১১.৩ সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী

১.৩.১১.৪ বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্য জীবনীকাব্য

১.৩.১১.৪.১ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

১.৩.১১.৫ বিতর্কিত কাব্য এবং নব্য আবিষ্কৃত কাব্য

১.৩.১১.৬ জীবনীসাহিত্যের সূচনা — অভিনবত্ব

১.৩.১১.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৩.১১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১১.১ : ভূমিকা

শ্রী চৈতন্যদেবের পুণ্য আবির্ভাবে (১৪৮৬ খ্রী) বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুমুখী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই কথা সংক্ষেপে আমরা যদি উল্লেখ করি, তাহলে দেখবো, সমাজ জীবনে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মানবিক লড়াই; সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নামকীর্তন, কৃষ্ণলীলা, পালাকীর্তন, বাউলসঙ্গীত, নৃত্য, কথকতা ইত্যাদির সূচনা এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া। কারুশিল্প, দারুশিল্প, বয়ন শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি, সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ধারায় জীবনী কাব্যের সূচনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে স্মরণীয়-বরণীয় করে তুলেছে। ভয়ানক মানুষী - চণ্ডীর রূপ শান্ত হয়ে আসা এবং তাদের মাহাত্ম্যের পাশাপাশি, মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার কাহিনী যেমন গুরুত্ব পেয়েছিল

১৪৮৬ সালে ফাল্গুন মাসের, পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, নবদ্বীপের মায়াপুরে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যদেব হলেন বঙ্গসমাজ ও বাঙালীর গর্ব। তিনি একছত্র বাংলা না লিখেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এযুগের সংস্কৃতি নতুন খাতে প্রবাহিত হয় যার নাম 'চৈতন্য সংস্কৃতি'। সমাজ সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিক থেকে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন :

১। শ্রী চৈতন্যদেব কতসালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি?

১.৩.১০.২ : সাহিত্যে প্রভাব

চৈতন্যদেব সাহিত্যের ইতিহাসের গতানুগতিক ধারাকে নতুন করে উন্নীত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত ধর্মকে নতুন ভক্তিবাদের আলোকে যখন ব্যাখ্যা করলেন শ্রীচৈতন্যদেব; তাঁর ভাষ্যে ও জীবনাচরণে সাহিত্যে প্রতিফলিত হল এক নতুন রূপ ও তত্ত্ব।

ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত ধর্মকে নতুন ভক্তিবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। মহাপ্রভুর জীবন ও কর্ম আশ্রয় করে সৃষ্টি হল বাংলা চরিত্র সাহিত্য। বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের সমারোহ ও সমৃদ্ধি চরমসীমা স্পর্শ করে ও নানা রস পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। চৈতন্য পরবর্তীকালে জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবি এই পর্যায়ের পদ রচনা করেন। চৈতন্য পূর্বযুগে কাব্যভাষা হিসেবে ব্রজবুলি বিকশিত হয়, কিন্তু বহুল ব্যবহার চৈতন্যযুগ থেকেই। চৈতন্য পূর্বযুগের মঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর উগ্ররূপ প্রকাশিত ছিল, কিন্তু চৈতন্য জন্মের পর তা, কল্যাণী বরদাত্রী রূপে পরিণত হয়। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' রাম ও কৃষ্ণকে মাধুর্যরসের দৃষ্টিতে দেখা যায়। লোকসঙ্গীত, মুসলমানী সাহিত্য, অনুবাদসাহিত্য ও লোকসাহিত্যেও শ্রীচৈতন্য নিত্য বিরাজমান।

সমাজকে তিনি প্রেমভক্তির সৌন্দর্যে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত উদার আকাশের নীচে স্থাপন করেন। তাই সাহিত্যও নব পল্লবিত হয়ে ওঠে। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে উদার মাটিতে সদ্য ফোটা ফুল। তাই বাংলা সাহিত্যে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য-বিস্তৃতি সম্ভবপর হয়। ষোড়শ শতাব্দী বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যের ঐশ্বর্য পর্ব মহাপ্রভুর জীবন ও কর্ম আশ্রয় করে সৃষ্টি হল বাংলা চরিত সাহিত্য। বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জীবনী সাহিত্য সংস্কৃত চরিতসাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষায় এই সব জীবনীগ্রন্থগুলি পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে একটি ধারার সৃষ্টি করল।

ভক্তবৃন্দের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন 'সংকীর্ত্তন ধর্মের নিদান'। আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। তাই রাধাকৃষ্ণ পালাকীর্ত্তনের আগে চৈতন্যদেবকে স্মরণ করা হয়। এই রস কীর্ত্তনের আসরে সৃষ্টি করা হয়েছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। আর সেটাই 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে পরিচিত। গৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনকথা অবলম্বনে শত সহস্রপদ রচিত হয়েছে। চৈতন্যের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের সমারোহ ও সমৃদ্ধি চরমসীমা স্পর্শ করে। তখন থেকে নানা রসপর্যায় সৃষ্টি হয়। দাস্য, বাৎসল্য সখ্য প্রভৃতি রসের পদ চৈতন্যপর্বে সৃষ্টি হয়নি। চৈতন্যপরবর্তীকালে জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবি এই পর্যায়ের পদ রচনা করেন। সাধারণত 'রতি'কে কৃষ্ণরতিতে রূপান্তরিত করে রচিত

হয় ভক্তিরসের কাব্য বৈষ্ণবপদাবলী। ষড়গোস্বামী প্রবর্তিত দর্শনের ভাষ্যরূপে চৈতন্য-প্রভাবিত পদাবলীসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

চৈতন্যপূর্বযুগে কাব্যভাষা হিসাবে ব্রজবুলি বিকশিত হয়। কিন্তু এর বহুল ব্যবহার চৈতন্যযুগ থেকেই। গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রমুখ শক্তিশালী কবিদের হাতে ব্রজবুলি যেন তার শক্তিকে নতুন করে আবিষ্কার করল। সহজিয়া সাহিত্য পদাবলীর উদ্ভব ঘটেছিল বৈষ্ণবধর্মের বিকৃতি থেকে। 'অমৃতরসাবলী'র মত তত্ত্ব গ্রন্থ ছাড়াও সেখানে পাওয়া গেল 'বিবর্তবিলাস', 'অনুরাগাবলী' প্রভৃতি গদ্যে লেখা 'কড়চা' বা নিবন্ধজাতীয় রচনা।

চৈতন্যোত্তর সাহিত্যের ভাবকলা ও রূপবন্ধ নিয়ন্ত্রিত রয়েছে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে নায়িকার পূর্বরাগ, অভিসার, প্রবাস, শৃঙ্গার প্রভৃতি বিভাগ দেখানো হয়েছে এবং সেই অনুসারে কবিরা বিভিন্ন পদ রচনা করেছেন। পয়ার ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহুল ব্যবহৃত ছন্দ বা বাহন। কোথাও প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার থাকলেও তার ব্যাপক প্রসার ঘটতে দেখা যায় না পদাবলী সাহিত্যে। কিন্তু ব্রজবুলি ভাষাকে আশ্রয় করে মাত্রাবৃত্ত বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ আশ্রয়। ধামালীর পথ ধরে স্বরবৃত্ত এসে দেখা দেয় কাব্য ক্ষেত্রে। পদাবলীর উৎসগত পার্থক্য রয়েছে দুই যুগে। বিদ্যাপতি মিথিলাতে বসে যখন রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবিতা লিখেছেন তখন তা ছিল লৌকিক মানবিক সঙ্গীতধারার অনুগামী। কিন্তু চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদে ধর্মভক্তির প্রাধান্য থাকায় প্রণয় কবিতার নাম হয়ে দাঁড়াল 'সাধনসঙ্গীত'।

চৈতন্যপূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও মানবতাবাদ চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যগুলিকে অসাম্প্রদায়িক করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল। কোন কোন সমালোচক মনে করেন শাক্তদেব-দেবীদের উগ্ররূপ প্রশমিত হয়ে কল্যাণী বরদাত্রীরূপে পরিণত হওয়ার পিছনে স্বভাববিনয় বৈষ্ণববাদের একটা ভূমিকা আছে। সেজন্য রুদ্রাণী-উগ্রচণ্ডা চণ্ডী সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এসে অন্নদায় পরিণত হলেন।

শাক্তপদের নতুন ধারায় গড়ে উঠল নতুন বাৎসল্য রসের পদ। বৈষ্ণব কবিরা যেমন ক্রমপর্যায় মেনে পদ রচনা করেছেন, সেই সচেতনতা দেখা গেল শ্যামসঙ্গীত রচনাতেও। রাধাতত্ত্ব যেমন বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে শাক্তভাবনার সংযুক্তি বহন করে তেমনি লীলাকীর্তন শক্তিসাধনার সাথে পদাবলী কীর্তনের সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে।

অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের ক্ষেত্রে রাম ও কৃষ্ণকে মাধুর্যরসের দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা বেশিরভাগ কবির মধ্যে দেখা যায়। এই সব কাব্যে কোথাও কোথাও নামভক্তির প্রাবল্য নববৈষ্ণববাদের উত্তাপকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া লোকসঙ্গীত, মুসলমানী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও লোকসাহিত্যেও প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য নিত্যবিরাজমান। আবার বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষারীতি, অলঙ্করণ, ছন্দ এবং বিশেষ করে 'ব্রজবুলি' ভাষার প্রতি সাহিত্যিকদের আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্য জীবনী কাব্য কোনটি? কার লেখা?
২। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির নাম লেখ?
৩। ব্রজবুলি ভাষা কি?
৪। চৈতন্য পরবর্তীকালের দু'জন বৈষ্ণব কবির নাম লেখ?

১.৩.১০.৩ : সঙ্গীত-নাট্যকলায় প্রভাব

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে সংস্কৃতে যে ধারাটি উজ্জীবিত হয়েছে তা হল সঙ্গীতের ধারা। বঙ্গ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারা সঙ্গীত।

চৈতন্যদেব ছিলেন 'সংকীর্তন ধর্মের নিদান'। শ্রীচৈতন্যই প্রথম দলবদ্ধ ভাবে সমবেত সঙ্গীতকে বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরফলে নব সংস্কৃতির সৃষ্টি হল। বাউল গানের কেন্দ্রস্থলে রইলেন চৈতন্যদেব। নগর পরিক্রমা করে, লোকনাট্য, লোক গানের পল্লবিত বিকাশ ঘটে চৈতন্যপ্রভাবে। কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তন হল চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে।

চৈতন্যদেব ছিলেন 'সংকীর্ত্তন ধর্মের নিদান'। তাই রসকীর্ত্তনের আসরে সৃষ্টি হয়েছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ অর্থাৎ 'গৌরচন্দ্রিকা'। কীর্ত্তনের আসরে অপূর্ব নৃত্যকলার পরিচয় দিয়ে তিনিই প্রথম দলবদ্ধভাবে সমবেত সঙ্গীতকে বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে নব সংস্কৃতির সৃষ্টি হল।

বাউল গানের কেন্দ্রস্থলে রইলেন চৈতন্যদেব। কীর্ত্তনে সংগীতের বিকাশ। সুর ঝংকারে ও অক্ষর বিন্যাসে সেই সঙ্গীত গীতিধর্মিতা ও গতিধর্মিতারূপে প্রসার লাভ করল। পদাবলী কীর্ত্তনের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবন ঘটেছিল আরও দুটি পদ্ধতি 'তুক্ক' ও 'ছুটে'। মহাপ্রভুর জীবিতকালে বাংলাদেশে তিনটি পদ্ধতিতে সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়েছিল — রানীহাটী, মনোহরশাহী, গরাণহাটী। কিন্তু কৃষ্ণলীলার মাথুর বিরহ প্রভৃতি পালাগুলি বিরহ বিধুরতার আবেগে অভিসিঞ্চিত বলে মনোহরশাহীতে সুরের কাজ ব্যাপক। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এর প্রভাবে বাংলাদেশে নারীকীর্ত্তনীয়ার দল আবির্ভূত হয়। এদের কীর্ত্তনকে বলা হত টপকীর্ত্তন। নগরে নগরে পথে পথে পরিক্রমা করে সবাইকে নিয়ে শুরু হল এই নাম সংকীর্ত্তন। এর ফলে লোকনাট্য লোকগানের পল্লবিত বিকাশ ঘটে। নাট্যকলার দিক থেকে বড় পরিবর্তন আসে চৈতন্য-প্রভাবিত কৃষ্ণলীলা যাত্রায়। চৈতন্যপূর্ব যুগে বাংলায় রাসযাত্রা ও শিবযাত্রা অভিনীত হত। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে কৃষ্ণযাত্রার রূপ ও রীতি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে আখর কাটতে কাটতে মঞ্চে প্রবেশ করতে শুরু করল নায়ক ও নায়িকারা।

প্রশ্ন :

১। বাংলার সমাজে নগরকীর্তন কে চালু করেন?

২। কৃষ্ণযাত্রা কি?

১.৩.১০.৪ : মন্দির ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রসার

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বাংলাদেশের কোণে কোণে গড়ে উঠেছিল মন্দির। এই সমস্ত মন্দিরের অভ্যন্তরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির ব্যাপক আরাধনা শুরু হয়েছিল। একদিকে মন্দির নির্মাণ অন্যদিকে মূর্তি নির্মাণ; এই দুই-ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শিল্পীরা নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শুধু নবদ্বীপ বা শ্রীহট্টেই নয়, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমের সন্নিহিত অঞ্চলেও এই শিল্পধারা ছড়িয়ে পড়ে।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি নির্মাণ করে বাংলাদেশের শিল্পীরা নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নবদ্বীপ ছাড়িয়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার সন্নিহিত অঞ্চলেও চারচালা, আটচালা, মন্দির, বাংলা মন্দির শিল্পে নিজস্বতা বহন করেছে।

পোড়া মাটির কাজ সমস্ত মন্দিরগুলিকে এক বিশেষ অলংকারে সাজিয়ে তুলেছিল। চারচালা, আটচালা, বাংলামন্দির শিল্পে নিজস্বতা বহন করেছে। ফলে ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতরূপটি আমরা পেয়ে যাই এসময়ে। আর লোকচিত্রকলার প্রসারিত রূপটি ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার গ্রামে গ্রামে।

প্রশ্ন :

১। চৈতন্যদেবের তিরোধান কোন সালে হয়েছিল?

২। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর যে মন্দির তৈরী হয়েছিল, সেখানে কার আরাধনা শুরু হয়েছিল?

১.৩.১০.৫ : ধর্মে প্রভাব

চৈতন্যদেব ছিলেন ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক এবং মানবতাবাদের প্রবক্তা ও প্রচারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেও মানবতাই ছিল তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র। তাই তিনি হরেকৃষ্ণ নামের মাধ্যমে বাঙালীর ধর্মে এক নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন। ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেব ছিলেন অবতার। ফলে জীবিত অবস্থায় মূর্তি তুলে তাঁর পূজা শুরু হয়। চৈতন্যপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াই প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্তি (কাঠ) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া শ্রীখন্ডে নরহরি সরকার, কাটোয়ার গঙ্গাধর দাস, বৃন্দাবনের কাশীশ্বর পন্ডিত প্রমুখও চৈতন্যদেবের বিগ্রহ নিয়ে পূজা করতে থাকেন। পরিশেষে গৌরের সঙ্গে নিতাই, পরে বিষ্ণুপ্রিয়ারও পূজা প্রচলিত হয়।

চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেও মানবতাই ছিল তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র। তাই তিনি হরেকৃষ্ণ নামের মাধ্যমে বাঙালীর ধর্মে এক নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন। গৌরের সঙ্গে নিতাই, পরে বিষ্ণুপ্রিয়ারও পূজা প্রচলিত হয়।

বস্তুতঃ এই পূজার্চনা ও শ্রদ্ধাভক্তি গৌড়ে নতুন দুটি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল। একটি 'গৌরনাগরবাদ', অন্যটি 'গৌরপারম্যবাদ'। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ছিল মূলতঃ পরকীয়া প্রেম বা অবৈধ প্রেম। ঐ প্রেম আস্বাদন করেই তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে তাঁর দ্বারাই সর্বপ্রথম অবৈধ প্রেম ঐশী স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রশ্ন :

১। চৈতন্যদেবের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কি?

২। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র কি ছিল?

১.৩.১০.৬ : সমাজে প্রভাব

চৈতন্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্য প্রাথমিক দুর্বলতা পরিহার করে যেমন নবযৌবন লাভ করে, তেমনি বাঙালীর সমাজেও এর প্রভাবও প্রচন্ডভাবে পড়ে।

স্মার্ত হিন্দুসমাজের বুদ্ধিক অহঙ্কার দূরীভূত হয়। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ প্রবল প্লাবনের ন্যায় বাংলার মানুষকে নবভাবে প্লাবিত করে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নয়, সমাজ সংগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নানা বর্ণ, নানা জাতি, বিভিন্ন আচার আচরণে বিভাজিত বাংলার হিন্দু সমাজে ধর্মকে আশ্রয় করে সংহতিবোধ সৃষ্টি করে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে জাতিভেদ ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দূর হল। তিনি ব্রাহ্মণ্যরীতি লঙঘন না করে সকল মানুষকে আহ্বান করেন সংকীর্তন-যজ্ঞের অঙ্গনে।

মহাপ্রভু বলেন —

"চন্ডাল চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে।।"

চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম সমাজের মধ্যে মানবমুক্তির উদার আহ্বান ঘোষণা করেন। মানুষ যে দেবতাদের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়, বরং সমষ্টির মিলনাকাঙ্ক্ষা, প্রেমভক্তির ভাব বিপ্লবই যে সকল শক্তির উর্ধ্বে চৈতন্যদেব সেটাই ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব সকলকেই পবিত্র জীবন যাপনে, আত্মশক্তি, সংযম ও চরিত্রশক্তি অর্জনে অনুপ্রাণিত করেন। সুকঠিন শাস্ত্রচর্চা ও জনবিচ্ছিন্ন জীবনের বিপরীতে তিনি বলেছেন —

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা যোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।"

(চৈতন্যচরিতামৃত - ১৬শ পরিচ্ছেদ)

এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা, মানবিকতা কাজ করেছে। চৈতন্যদেব ছিলেন সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক এবং মানবতাবাদের প্রবক্তা ও প্রচারক। তৎসঙ্গে তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক মূলমন্ত্রের স্রষ্টা।—

"চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঃ হরিভক্তি পরায়ণ"।

তাঁর ঐ মূলমন্ত্রই সেদিন বাঙ্গালীজাতিকে অর্থকৌলীন্য, জাতিকৌলীন্য এবং ধর্মকৌলীন্য থেকে উদ্ধার করেছিল। তিনি পংক্তি ভোজনের আসরে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় সকলকে ভেদাভেদ ভুলে একত্রে মিলিয়ে ছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে নবদ্বীপের অভিজাত গোস্বামী এবং ব্রাত্য যবন হরিদাস সমমর্যাদাবান।

বাঙালী নারীর সামাজিক অবস্থানকে অনেকটাই পরিবর্তন করতে সমর্থ হয় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ। বৈদিক যুগের পর থেকে বাঙালী সমাজে নারীরা পুরুষ প্রাধান্যের ফলে বঞ্চিত ও অপমানিত ছিল। বিধবা রমণীদের পক্ষে সমাজের অনুশাসন ছিল ভয়ঙ্কর। শূদ্রদের মতো মহিলাদেরও শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু সমগ্র হিন্দু সমাজে না হলেও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়েছিলেন নতুন আলোর সন্ধান। দিশা দেখিয়েছিলেন উদ্‌ভ্রান্ত নারীদের। বিধবাদের পুনর্বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করল, লাভ করল কণ্ঠী বদলের মাধ্যমে। মর্যাদা ফিরে পাওয়ায় গুরুর মতো গোস্বামী নারীরা নিজ নিজ সমাজে গুরুত্ব পেতে থাকে।

দেশের সর্বত্র কৃষ্ণ আরাধনার ধুম পড়ে গেল; যেন 'কানু ছাড়া গীত নাই' — এই প্রবাদের জন্ম এই সময় থেকে। সামান্য ভিক্ষুকও দিন যাপনের জন্য উচ্চারণ করত কেবল প্রিয় নাম 'রাধেশ্যাম'। বৈষ্ণব সমাজে বিবাহপ্রথা খুব সহজ ও জটিলতাহীন। কণ্ঠীবদল করলেই বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্বের গান্ধর্ব বিবাহের ভিত্তি হতো পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক নির্বাচন, কোন বর্ণ গোত্রের বিচার নয়। হিন্দু-মুসলমানের দুস্তর ব্যবধানকে মুছে দিতে চেয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। বীরভদ্রের শিক্ষামূলক 'কড়চা'ই এর প্রমাণ। হিন্দু বাউলের সঙ্গে মিলেমিশে মুসলমান ফকিরেরা দেহযোগ সাধনায় চৈতন্যকে গুরু বলে বন্দনা করেছেন। অনেকে মনে করেন, বীরভদ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের শীর্ষে খুন্তি পুঁতে একই সঙ্গে হিন্দুর ত্রিশূলও মুসলমানের অর্ধচন্দ্রকে মেশাতে চেয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্য ক্ষেত্রেই নয়, নানা বর্ণ, নানা-জাতির মধ্যে সংহতি বোধ সৃষ্টি করে। মানুষ, দেবতাদের থেকে কোন অংশে কম নয়, তা চৈতন্যদেব মানুষকে বুঝালেন। চৈতন্যদেব বলেন-'চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণ।" চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে নবদ্বীপের অভিজাত গোস্বামী এবং ব্রাত্য যবন হরিদাস সমমর্যাদাবান। বাঙালী নারীর সামাজিক অবস্থানকে অনেকটাই পরিবর্তন করতে সমর্থ হয় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ। হিন্দু বাউলের সঙ্গে মিলে মিশে, মুসলমান ফকিরেরা দেহযোগ সাধনায় চৈতন্যকে গুরু বলে বন্দনা করেছেন। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছেন। বিশ্বসংস্কৃতির কর্ণধার যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব প্রমুখের মতো বঙ্গ সংস্কৃতিতেও চৈতন্যদেবের নাম উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যুগ যুগ ধরে।

চৈতন্যদেবই প্রথম ভারতের ঐতিহ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবিষ্কার করবার জন্যই সমগ্র ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেন। ওইসব জায়গাগুলিতে ভাবধারা বিনিময় হবার ফলে পরবর্তীকালে বাঙালীরা ভ্রমণে উৎসাহিত হয়। তাই মানুষ আজও পুরী, বৃন্দাবন মথুরা, নীলাচল প্রভৃতি জায়গায় দেশভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। চৈতন্যদেবই প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশে গণসংঘ বা মিছিল পরিচালনা করেন। চৈতন্যদেবের মতে সংঘশক্তি সবচেয়ে বড়শক্তি।

কিন্তু মাথার উপর ঐশ্বরিক শক্তিকে রাখতে হবে। তাই অহিংসার পথে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করে কাজীর নির্দেশ অমান্য করেন। বলাবাহুল্য, সুবৃহৎদলের সমর্থন নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম সংকীর্ত নের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন —

"চৈতন্যের এই উদ্যম ভারতবর্ষে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ।"

তুর্কি শাসনাধীন বাংলাদেশে এক মিশ্রিত জীবনবোধের মাঝে তিনি সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটালেন। তাঁর আবির্ভাব এবং জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যায় তা হল —

১। অস্পৃশ্যতা বর্জন ২। সাম্যবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ৩। সেবা ও পরোপকারের আদর্শ ৪। অহিংসা ধর্ম ৫। সহিষ্ণুতা ৬। স্বাবলম্বন ৭। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকান্ড

একথা অনস্বীকার্য যে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর জীবৎকালে শ্রীচৈতন্য বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন, ইতিহাসে তাঁর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বসংস্কৃতির কর্ণধার যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব প্রমুখের মতো চৈতন্যদেবের অস্ত্র ছিল মানবতাবাদ ও প্রেমের ধর্ম। তাই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত তবুও তাঁর ভক্তিবাদ ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপকেও আকৃষ্ট করেছে। বঙ্গ সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের নাম উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন :

১। চৈতন্যের জন্মের পর বাংলার সাহিত্যে কি প্রভাব পড়েছিল, দুটি উদাহরণ দাও?

২। চৈতন্যের জন্মের পর বাংলার সমাজে কি প্রভাব পড়েছিল, দুটি উদাহরণ দাও?

১.৩.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ) — ড. সুকুমার সেন

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য়, ৩য়) — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) — শ্রীভূদেব চৌধুরী।

৪. বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) — ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

৫. বাঙালির মনন ঃ নানা নিবন্ধ (১ম সংখ্যা) — ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

১.৩.১০.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ পরিবেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালির সমাজজীবনে কিরূপ প্রভাব পড়েছিল তা আলোচনা করো।

২. "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ"— এই উক্তির ধারক ও বাহকের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা লেখো।

৪. বাঙালির সামগ্রিক জীবনবোধে প্রতিফলিত শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শুভফলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫. ধর্মনেতা, সংগঠক ও সংস্কারক শ্রীচৈতন্যের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিটি বিশদ করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব

বিন্যাস ক্রম

১.৩.১০.১ ভূমিকা
১.৩.১০.২ সাহিত্যে প্রভাব
১.৩.১০.৩ সংগীত নাট্যকলায় প্রভাব
১.৩.১০.৪ মন্দির ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রভাব
১.৩.১০.৫ ধর্মে প্রভাব
১.৩.১০.৬ সমাজে প্রভাব
১.৩.১০.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী
১.৩.১০.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১০.১ : ভূমিকা

বাঙালি তুর্কি বিজয়ের প্রাথমিক অভিঘাতের যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য থেকে সহজে মুক্তি পায় নি। যখন পেয়েছিল ঠিক তখনই বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসে চৈতন্যদেব এক বিরল স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি যুগের প্রতিনিধি নন; তিনি সর্বযুগের প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতীক। তাঁর জীবনযাত্রা ও ধর্ম বাঙালীর সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর যতটা প্রভাব ফেলেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বোধ হয় ততটা নয়। তাই চৈতন্যোত্তর যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজজীবনের স্বর্ণযুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ সমগ্র বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোষণা করেন —

> "যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
> চারিভাব ভক্তি দিয়া ভুলাইমু ভুবন।।

তুর্কি বিজয়ের প্রাথমিক অভিঘাতের যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য থেকে বাঙ্গালিকে উদ্ধার করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, নবদ্বীপের মায়াপুরে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা। তাঁর জীবন যাত্রা ও ধর্ম বাঙ্গালির সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর যতটা প্রভাব ফেলেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বোধ হয় ততটা নয়।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতির উপর চৈতন্যদেবের প্রভাবও দীর্ঘপ্রসারী যে, তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। চৈতন্যদেব শুধু একটি যুগের প্রতিনিধি নন, তিনি যুগের স্রষ্টা। মহাপ্রভুর ধর্মমতকে ও জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলায় সুবিশাল সাহিত্য ভান্ডার গড়ে উঠেছিল।

তেমনি কাব্যসৌন্দর্য - সহজ ঋদ্ধতার গুণে বৈষ্ণবপদাবলী বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছতে পেরেছিল এবং বহুমুখী ধারায় সাহিত্যে প্রবাহিত হয়েছিল, — শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সূত্রেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় সংহতি, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে — এইসবই তাঁর আবির্ভাবকে যুগান্তকারী করে তুলেছে। নবজাগরণের সূচনা এবং পূর্ণতাও ঘটেছে।

১.৩.১১.২ : শ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (৮৯২ বঙ্গাব্দে) ফাল্গুনী-দোলপূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। তাঁর ডাক নাম ছিল নিমাই। ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন নিমাই পণ্ডিত, গৌর অঙ্গের অধিকারী গৌরাঙ্গ। সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু, অগ্রজ বিশ্বরূপের কৈশোরে সংসার ত্যাগ, প্রয়াত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে গমন এবং প্রত্যাগমনে নিমাই অন্তরাত্মার আহ্বান শুনতে পেলেন। সংসারের ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগৎ-জীবনের মঙ্গলপথ অন্বেষণে, নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী বিষুণপ্রিয়া এবং বৃদ্ধা মাতা শচীদেবীকে পরিত্যাগ করে বাহির হলেন পথে পথে। গয়াতে পেয়েছিলেন মন্ত্রদীক্ষা ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী সন্ন্যাস নিলেন কেশব ভারতীর কাছে। নতুন নাম হ'ল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বৃন্দাবন, পুরী, কাশী, মথুরা, দক্ষিণাত্য, প্রভাস, পরিক্রমা করার পর নীলাচলে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রেই তাঁর তিরোধান ঘটে ৪৮ বছর বয়সে, ১৫৩৩-এ।

> ***নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন শ্রী চৈতন্যদেব। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। তাঁর ডাক নাম ছিল নিমাই। বল্লভ আর্চাযের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। সংসারের ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে, বৃহত্তর জগৎ জীবনের মঙ্গলপথ অন্বেষণে, নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী বিষুণপ্রিয়া এবং বৃদ্ধ মাতা শচীদেবীকে পরিত্যাগ করে বাহির হলেন পথে পথে। ১৫১০ খ্রীঃ ২৬ জানুয়ারী সন্ন্যাস নিলেন কেশব ভারতীর কাছে, নতুন নাম হল শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য। বৃন্দাবন, পুরী, কাশী, মথুরা পরিক্রমা করার পর নীলাচলে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান ঘটে ৪৮ বছর বয়সে, ১৫৩৩ খ্রীঃ।***

প্রশ্ন :

১। শ্রী চৈতন্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর বাবা ও মায়ের নাম কি?

২। শ্রী চৈতন্য কার কাছে, কোথায় মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন?

১.৩.১১.৩ : সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থটি বাঙালির রচিত হলেও বাংলাভাষায় নয়। মুরারি গুপ্ত রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম, প্রথম চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ। এটি সংস্কৃতে রচিত। চৈতন্য-পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ গুলির মধ্যে বিশিষ্ট। পরমানন্দ সেনের উপাধি কবি কর্ণপুর। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে গৌরলীলা, নীলাচললীলার বর্ণনা আছে। মহাপ্রভুর

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে গম্ভীরালীলা বর্ণিত হয়েছে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌরাঙ্গের জীবনকথা পরোক্ষে এসেছে মূলতঃ গৌরাঙ্গের পার্ষদদের কথা প্রসঙ্গে।

প্রশ্ন :

১। সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ কে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থগুলির নাম কি?

২। কবি কর্ণপুর কার উপাধি ছিল? তাঁর দুটি গ্রন্থের নাম কর?

১.৩.১১.৪ : বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য

বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ হ'ল বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানালেও উল্লেখ করেছেন, চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর গর্ভজাত তিনি। অনুমিত হয় ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের রচনাকাল নিয়েও মতান্তর আছে। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ - এই বিভিন্ন সময়পর্বের কথা উল্লেখ করা হয় চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল নির্দেশ প্রসঙ্গে। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে বলেছেন —

> ***শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ মুরারী গুপ্ত রচিতসংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম'। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য' সংস্কৃতে রচিত। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'। বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'।***

'নিত্যানন্দ স্বরূপের আশা করি শিরে
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে।।"

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। এর থেকে ড. বিমান বিহারী মজুমদার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই কাব্যে রচনা সম্পূর্ণ হয়। এর থেকে নির্ভরযোগ্য, যুক্তি সম্মত সন তারিখের পরিচয় এই প্রসঙ্গে আর পাওয়া যায় না।

বৃন্দাবন দাস তিন খণ্ডে এই জীবনীকাব্যটিকে বিভক্ত করেছেন। পনেরোটি অধ্যায়ে প্রথম পর্ব, ছাব্বিশটি অধ্যায়ে দ্বিতীয় পর্ব, দশটি অধ্যায়ে তৃতীয় পর্ব — মোট একান্নটি অধ্যায়ে এই জীবনী গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও বৃন্দাবন ভ্রমণের কাহিনী বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নি। এর একটি কারণ হতে পারে গৌড়লীলার চৈতন্যকে, যে চৈতন্যের সঙ্গে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের সংযোগ ছিল, সেই চৈতন্যদেবকেই বৃন্দাবন দাস হয়তো ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যে। চৈতন্যদেবের যে জীবনপর্বকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে তুলেছিলেন সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রতি হয়তো সেভাবে আকৃষ্ট হন নি বৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চৈতন্য দেবের জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়ায় পিতৃপিণ্ড প্রদান করে নবদ্বীপে আগমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনকাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়খণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে নীলাচলে আগমন পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃতি লাভ করেছে। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কবি মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ সহ জৈমিনি ভারত, মনুসংহিতা থেকে প্রয়োজন মতো শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সহজ, সরল কাহিনী বিন্যাসের কৌশলে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত হৃদয়গ্রাহী। গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 'ভাগবত' থেকে ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই কারণে তিনি বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' নামেও সম্মানিত হয়েছেন। কথিত আছে, কবি প্রথমে তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেণ 'চৈতন্য-মঙ্গল' পরে মাতৃনির্দেশে গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। একদিকে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মানব মূর্তি অন্যদিকে তাঁর ভাগবত মূর্ত্তি - এই দুটি অপূর্ব ভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে এই কাব্যে। আর একটি প্রধান বিষয় এই কাব্যে সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক নৈরাজ্য। সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা বাস্তবসম্মত রূপেই চিত্রিত হয়েছে। চৈতন্যভাগবত তাই তত্ত্ব ও তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। চৈতন্যদেব সম্পর্কে কবির মনোভাব ছিল অনেকটাই ভাবাবেগ নির্ভর। তাই ভক্তরূপে ভগবানের লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যলীলার বর্ণনায় অলৌকিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু, এই অলৌকিকতা অনেকটা সহজভক্তি সঞ্জাত। চৈতন্য ভাগবতে ভক্তিরস প্রবল হলেও মানবজীবনরস তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে অনন্য সাধারণ রূপে।

> ***বৃন্দাবন দাস ছিলেন চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভাতৃকন্যা নারায়নীর গর্ভজাত। ১৫১৯ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবন দাস তিনখন্ডে এই জীবনী কাব্যটিকে বিভক্ত করেছেন। প্রথমপর্বে ১৫টি, দ্বিতীয়পর্বে ২৬টি, তৃতীয়পর্বে ১০টি, মোট ৫১টি অধ্যায়ে এই জীবনী গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। প্রথম খন্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়ায় পিতৃপিণ্ড প্রদান, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবন কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়খণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে নীলাচলে আগমন পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃতি লাভ করেছে। বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' নামে সম্মানিত করা হয়। গ্রন্থের প্রথমে নাম ছিল 'চৈতন্য মঙ্গল' পরে মাতৃনির্দেশে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কাব্যে সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক নৈরাজ্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের মানবমূর্তি ও অন্যদিকে তাঁর ভাগবত মূর্তি অপূর্বভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে।***

প্রশ্ন :

১। চৈতন্যলীলার ব্যাস কাকে বলা হয়?

২। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের প্রথমে কি নাম ছিল? পরে, কার নির্দেশে কি নাম রাখা হয়?

মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, ড. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখের মতে লোচনদাসের কাব্য ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে, ১৫৫০ থেকে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন একটি সময়ে রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণবদের কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যটি গীত হতো পাঁচালীর ঢঙে। লোচনদাস শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নরহরি সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরহরি সরকার বৈষ্ণব সমাজে 'গৌর-নাগর' শাখার প্রবর্তক - (লোচন দাসও এই মতের অনুসারী হয়ে কৃষ্ণকে নাগর বা প্রেমিক রূপে কল্পনা করেছেন)। কবির মতে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেবের দারুভূত মূর্ত্তিতে লীন হয়ে যান, যদিও এর প্রামাণিকতা নেই, লোকমুখে প্রচলিত গল্প কাহিনী এর অবলম্বন। ঐতিহাসিক, প্রামাণ্য ঘটনাবলীর

> ***মুরারী গুপ্তের কড়চার অনুসরণে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' এর কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখের মতে লোচনদাসের কাব্য ১৫৭৬ খ্রীঃ আগে, ১৫৫০ থেকে ১৫৬৬ খ্রীঃ কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল। চারটি খন্ডে বিভক্ত কাব্যটি পাঁচালীর ঢঙে লেখা। সহজ বিশ্বাস ও কবিত্বে লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।***

বিবৃতিতে নয় — সহজ বিশ্বাস ও কবিত্বে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিশেষ জনপ্রিয়তা, অর্জন করেছিল। সাধারণ মানুষ-শ্রোতা-পাঠক- অনুরাগী এই কাব্যটি পড়তে বা কাব্য কাহিনী শুনতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতো। কারণ — সহজতা, সারল্য আর অলৌকিকতা। সাধারণের দুর্নিবার আকর্ষণ তো এসবের প্রতি বারংবার ধাবিত হয়েছে।

প্রশ্ন :

১। কোন সময়ে লোচনদাসের কাব্য রচিত হয়েছে?

২। তাঁর কাব্যটি ক'টি খণ্ডে বিভক্ত?

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটির পুঁথি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছে। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, বর্ধমানের কাছে আমাইপুরা গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জয়ানন্দের জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দ যখন শিশু তখন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধাম থেকে বাংলায় ফেরার সময় সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। কবির 'জয়ানন্দ' নামটি চৈতন্যদেব প্রদত্ত। অনুমিত হয় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জয়ানন্দের কাব্যটি রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থও মঙ্গলকাব্যের মতো মুখ্যতঃ গীত হবার জন্যই রচিত। কাব্যটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। জনরুচির মুখাপেক্ষী হবার কারণেই হয়তো এই কাব্যে আদ্যাশক্তির বন্দনা আছে। কাব্য হিসেবে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল খুব উন্নতমানের নয় - কিন্তু, তিনি এমন কয়েকটি তথ্য তাঁর কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন, যা পণ্ডিত - গবেষকমহলে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করেছে। চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগেই হাবসী শাসনের ফলে সমগ্র গৌড়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক দুর্বিপাক দেখা দিয়েছিল তা ইতিহাস সম্মত। জয়ানন্দের মতে, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রের উৎপীড়নে তারা শ্রীহট্টে চলে আসেন বাধ্য হয়ে। এছাড়াও গ্রন্থে নানা অবৈষ্ণব মনোভাবও প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় আদর্শের বিশেষ কোন প্রতিফলন এই কাব্যে নেই। জয়ানন্দের কাব্যে চৈতন্যদেবের তিরোধান বিষয়ে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে — লীলা সঙ্কীর্তনের সময় পায়ে ইটের টুকরো বিদ্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈষ্ণবোচিত ভক্তিরসের একান্তই অভাব এ কাব্যে।

জয়ানন্দের জন্ম হয় বর্ধমানের কাছে আমাইপুরা গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। অনুমিত হয় ১৫৬০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে জয়ানন্দের কাব্যটি রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নয়টি খন্ডে বিভক্ত। 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ ও মঙ্গলকাব্যের মতো মুখ্যতঃ গীত হবার জন্যই রচিত। জয়ানন্দের কাব্যে আছে — লীলা সঙ্কীর্তনের সময় পায়ে ইটের টুকরো বিদ্ধ হয়ে চৈতন্যদেব মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন :

১। জয়ানন্দের জন্ম কোথায় হয়?

২। তাঁর কাব্যটির নাম কি? ক'টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি বিষয় মাহাত্ম্যে, তথ্য নিষ্ঠায়, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের মেলবন্ধনে সমগ্র মধ্যযুগে এক অসামান্য সৃষ্টি। কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে কবির জন্ম। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবনে আসেন।

গ্রন্থের সর্বত্র কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দকে গুরুরূপে বন্দনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের যে অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করেছেন এবং চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্বের যে বিশেষ ঘটনাবলী উল্লেখ না করে গ্রন্থটিকে প্রায় অসম্পূর্ণই রেখেছিলেন, কৃষ্ণদাস চৈতন্য জীবনের সেই পর্বকেই বিশদরূপে উপস্থাপিত করেছেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য জীবনের যে পর্বগুলিকে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন সেইগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত রূপে পরিবেশন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ, চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত বৈষ্ণবআচার্যদের সারণী এবং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আনুকূল্যে নির্মিত বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দিরের উল্লেখে মনে হয়, ১৫৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

> ***কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি বিষয় মাহাত্ম্যে, তথ্য নিষ্ঠায়, দর্শন ইতিহাস ও কাব্যের মেলবন্ধনে সমগ্র মধ্যযুগে এক অসামান্য সৃষ্টি। ১৫৯০-৯২ খ্রীঃ পর 'শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি রচিত হয়। বাষট্টি অধ্যায়ের, আদিলীলায় ১৭টি, মধ্যলীলায় ২৫টি, অন্ত্যলীলায় ২০টি পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থাটি বিচিত্রায়িত করেছেন কৃষ্ণদাস। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই যে প্রেম; রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, প্রেম যে জ্ঞানের থেকে বড়, সেই বিষয়কেই প্রতিষ্ঠা করেছেন।***

বাষট্টি অধ্যায়ের সমগ্র কাব্যটিকে কৃষ্ণদাস আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় বিভক্ত করেন। গ্রন্থটি রচনা শেষ করতে কবির প্রায় সাত বছর (মতান্তরে নয় বছর) সময় লেগেছিল। আদিলীলার সতেরোটি পরিচ্ছেদ নিমাইয়ের জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বারোটি পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ, চৈতন্য জন্মের সামান্য ও মুখ্য কারণ, পঞ্চতত্ত্ব আখ্যান, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। মধ্যলীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে শুরু করে বৃন্দাবন মথুরা-কাশী ভ্রমণের শেষে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যলীলার কুড়িটি পরিচ্ছেদে, চৈতন্য জীবনের শেষ পর্ব — চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থাটি চিত্রায়িত করেছেন কৃষ্ণদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণদাস এই পর্বে। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, সখী-গোপীতত্ত্ব, সাধ্য সাধন তত্ত্ব, মহাভাব তত্ত্ব এবং চৈতন্যাবতারের তাৎপর্যের মতো দুরূহ জটিল বিষয়কেও অতি সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই যে প্রেম; রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, প্রেম যে জ্ঞানের থেকে বড়, মহান ইত্যাদি বিষয়কে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রয়োজনীয় উদাহরণ সহযোগে। বৃন্দাবনদাস, স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্তসহ অন্যান্য পূর্বসূরীদের ঋণ স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। সংস্কৃত ভাষা - সাহিত্যে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত কৃষ্ণদাস শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা, ব্রহ্মসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অজস্র শ্লোক উদ্ধার করেছেন, প্রয়োজনে শ্লোকগুলিকে অনুবাদও করেছেন। রঘুবংশ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, কিরাতার্জুন থেকে শ্লোক গৃহীত হয়েছে এই কাব্যে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি মহৎ সম্পদ। এটি কেবলমাত্র একটি দার্শনিক মহাগ্রন্থই শুধু নয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজও কেবলমাত্র দার্শনিক - ঐতিহাসিক পণ্ডিতই ন'ন - মূলতঃ তিনি ভক্ত — সেই বৈষ্ণবীয় ভক্তি-বিশ্বাসই এই গ্রন্থের প্রাণ। দার্শনিকের প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিকের যুক্তিনিষ্ঠায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

প্রশ্ন :

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন বৃত্তান্ত কি?
২। কৃষ্ণদাসের **কাব্যটি** কোন সময়ে রচিত হয়?
৩। গ্রন্থটির গুরুত্ব কোথায়?

১.৩.১১.৪.১ : শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আকর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যটি। বৈষ্ণবীয় বিভিন্ন তত্ত্ব — রাধা তত্ত্ব, সাধ্যসাধন তত্ত্ব, সখীতত্ত্ব ইত্যাদি এই কাব্যে পরম রমণীয় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং অবতারত্ব যে রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত ভাব-রূপেই প্রকাশ - তা কৃষ্ণদাস চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাব-ভাষা-ছন্দ-কাব্যকলার অন্যান্য দিকগুলিও অনবদ্য। তাই সব মিলিয়ে 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যটি সংশ্লিষ্ট কাব্যগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর সঙ্গে গভীর সংযোগ এবং কবিত্ব শক্তির অমোঘ প্রকাশ তাঁর কাব্যকে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশটি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।

১.৩.১১.৫ : বিতর্কিত কাব্য এবং নবাবিষ্কৃত কাব্য

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে চৈতন্যচরিত্রের একটি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় শান্তিপুরবাসী জয়গোপাল গোস্বামীর উদ্যোগে। গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তাঁর সহযোগী ছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে প্রতিদিন তিনি পথের বিবরণ লিখে রাখতেন। এই দিনলিপিই 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে সুপরিচিত। দিনলিপির আকারে রচিত এই কড়চাটি দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রেখেছে। অনুমিত হয়, এতে পুঁথির আবিষ্কর্তা ও প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীর বহুল হস্তক্ষেপ ঘটেছে।

> **'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে চৈতন্যচরিত্রের একটি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় ; শান্তি পুরবাসী জয় গোপাল গোস্বামীর উদ্যোগে। গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তাঁর সহযোগী ছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে প্রতিদিন তিনি পথের বিবরণ লিখে রাখতেন।**

চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত, পুঁথির লিপিকার সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের এই গ্রন্থ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্রপুরী সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রশ্ন :

১। কার উদ্যোগে ' গোবিন্দ দাসের কড়চা' রচিত হয়?

১.৩.১১.৬ : জীবনীসাহিত্যের সূচনা - অভিনবত্ব

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী সাহিত্যের বন্ধ দরজা বাংলা সাহিত্যে খুলে গিয়েছিল। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা। অব্যবহিত পরবর্তীকালে নবদ্বীপের বৈষ্ণব আচার্যদের নিয়ে যেমন জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে, তেমনি আধুনিককালে কবি ভারতচন্দ্রের জীবন, মধ্যযুগের অন্তিম পর্বের প্রতিচ্ছবি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন আধুনিক বিশিষ্ট লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পদ্যে নয়, গদ্যে। 'অমাবস্যার গান' পাঠ, আমাদের এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন। আধুনিক যুগে জীবনী (Biography), আত্মজীবনী (autobiography), সাধুসন্তের জীবনী (Hagiography), স্মৃতিকথা (Memories) ইত্যাদির

ঢল নেমেছে বাংলা সাহিত্যে। কোনভাবেই ভুললে চলবে না এসবের উষালগ্ন চিহ্নিত হয়ে আছে — শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যগুলিতে।

১.৩.১১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ) — সুকুমার সেন
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) — ভূদেব চৌধুরী
৫. মধ্যযুগের কবি ও কাব্য — শঙ্করীপ্রসাদ বসু
৬. চৈতন্যচরিতের উপাদান — বিমানবিহারী মজুমদার

১.৩.১১.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২. শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যজীবনী রচয়িতা কে ? তাঁর রচিত গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করো।
৩. বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্যের রচয়িতা কে ? তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লেখো।
৪. শ্রীচৈতন্যজীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৫. টীকা রচনা করো —
   (ক) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের বিশিষ্টতা।
   (খ) লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের কাব্যগুণ।
   (গ) চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্য।
   (ঘ) গোবিন্দ দাসের কড়চা।
   (ঙ) শ্রীচৈতন্যজীবনী পাঠে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের গুরুত্ব।
৬. শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যগুলির পরিচয় দিয়ে জীবনীকাব্যটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।
৭. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য দুটির মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-১২

বৈষ্ণব পদাবলী

বিন্যাস ক্রম :

১.৩.১২.১ ভূমিকা

১.৩.১২.২ বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস ও বাংলা সাহিত্য

১.৩.১২.৩ বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তিবাদ

১.৩.১২.৪ মূলভাব ও তাৎপর্য

১.৩.১২.৫ কৃষ্ণতত্ত্ব

১.৩.১২.৬ শ্রীরাধাতত্ত্ব

১.৩.১২.৭ গোপীতত্ত্ব

১.৩.১২.৮ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

১.৩.১২.৯ অপরাপর কবি

১.৩.১২.১০ আদর্শ প্রশ্নমালা

১.৩.১২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

১.৩.১২.১ ভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা-সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য একটি বিস্তৃত কালপর্ব জুড়ে বিন্যস্ত। 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ বিষ্ণু যাদের উপাস্য দেবতা, আর 'পদাবলী' হল পদ সমষ্টি বা গানের সমষ্টি। প্রাক-চৈতন্যযুগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তী যুগে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস বিশেষভাবে খ্যাতিমান হলেও আরও বহু কবি বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত পদ লিখেছেন। তবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পদাবলী চর্চার এই ইতিহাস চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের পরই এই বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বেশি। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণের লীলা এবং মূলত মাধুর্যলীলা। রাধাকৃষ্ণলীলাকথাই প্রধানত পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু। এখানে সখ্য ও বাৎসল্যরসের পদ সংখ্যায় বেশি। রাধা-কৃষ্ণ প্রাসঙ্গিক কথাকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করে পদকর্তারা বিভিন্ন পদ রচনা করেছেন এবং তাঁদের বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছেন। চৈতন্যদেব এখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যিনি আসার পরে পদাবলীর চরিত্র বদলে গেল। খুব সহজেই বোধগম্য হয় তাঁর.

আবির্ভাবের পূর্বের পরিস্থিতি কেমন ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ ৪৮২) বলেছেন, 'বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিক জীবনের ক্লান্ত রোমন্থন হইতে রক্ষা করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পনাকে ভৌম বৃন্দাবনে উধাও হইতে সাহায্য করিয়াছে এবং অনুবাদ-সাহিত্যের পুনরাবৃত্তির স্রোতকে নিত্য নব নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ করিয়াছে।'

১.৩.১২.২ বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস ও বাংলা সাহিত্য

প্রাচীনযুগ পেরিয়ে মধ্যযুগ ও তারপর আধুনিকযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে বিস্তৃত লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বৈষ্ণব সাহিত্যের গুরুত্ব একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। ইতিহাসের ও কালের ধারায় এবং সামাজিক অবস্থানভেদে এই সাহিত্য ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়নি। বলা বাহুল্য বৈষ্ণব ধর্ম এমনই ধর্ম যাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাই এই ধর্মকে অনুধাবন করতে না পারলে সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। ধর্মকে আশ্রয় করে এই সাহিত্য রচিত তাই এই ধর্মকে এত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব-ধর্ম, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব এবং চৈতন্য-কাল্ট তাই বোধগম্য হওয়া এত জরুরি বিষয়।

বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব স্বীকার করেছেন আধুনিক কালের অগ্রদূতেরা। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমনকি শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ধর্ম-সংস্কৃতি একটি পৃথক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রেম সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখনই তার কথা এসেছে তখন এই পদাবলীর কথা স্মরণ করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্য বলতে বেশিরভাগ পাশ্চাত্যধারাপুষ্ট সাহিত্যধারাকেই বুঝিয়ে থাকে কিন্তু এই সমকালের সাহিত্যধারাতেই অবলীলাক্রমে মিশে গেছে বৈষ্ণব ভাবের রসধারাপুষ্ট চিন্তা-চেতনা।

বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উৎস খুঁজতে গেলে উপনিষদের আশ্রয় ছাড়া খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এই উপনিষদের তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে আদিতে ব্রহ্মই ছিলেন এক এবং একমাত্র। পরে দ্বিতীয়ের খোঁজে যাত্রা শুরু হলে নারী-পুরুষের বন্ধন তৈরি হল। বৈষ্ণব-দর্শনের রাধাতত্ত্বের মূল কথাও তাই। ব্রহ্মের ইহজগতে রমণেচ্ছার কারণে শ্রীরাধার আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী বেশ ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে হরিবংশ থেকে বিষ্ণুপুরাণে। এছাড়াও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, হালের গাথা, প্রাকৃত-পৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থেও কৃষ্ণপ্রেমের মধুরলীলার কথা বর্ণিত হয়েছে। সর্বোতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। কৃষনই সকল রসের আধার এবং এই কৃষ্ণকে শ্রীরাধিকা পরমপুরুষ কল্পে সেবা করে থাকে।

১.৩.১২.৩ বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তিবাদ

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই সাহিত্যকে অতীন্দ্রিয় ভাবরস ও মিস্টিক তত্ত্বের উপর রেখে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।' বৈষ্ণব পদকর্তাদের মুখ্য উপজীব্য প্রেম এবং তাদের প্রধান ধর্ম প্রেমধর্ম। যে প্রেম জগৎ ও জীবনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানে না, জাগতিক বাধাবিঘ্ন মানে ভক্তের ভালোবাসার তীব্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরল স্বাভাবিক গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। সুতরাং এখানে ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ক মধুর একান্ত আপনের মতো। তাই ভক্তরা তাদের প্রেমকে বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের কাছে প্রদর্শন করে। ভক্তরা ভগবানকে ঐশ্বর্যশালী

সর্বশক্তিমান ভেবে শুধু পূজা করা থেকে বিরত থাকে। তারা প্রেমের মধ্যে দিয়ে নিজেরে পূজার্ঘ নিবেদন করে। তাই বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয়ে সম্পর্ক স্থাপন করেন। বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের মধ্যে দিয়ে নানা লীলায় নিয়ত।

১.৩.১২.৪ মূলভাব ও তাৎপর্য

বৈষ্ণব পদাবলী গেয় কবিতা। অর্থাৎ গান করে না শুনলে এর ভাব উপলব্ধ হয় না। শুধু পড়লেই তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, শ্রীমদ্ রামানুজ ও অন্যান্য আচার্যগণের দ্বারা প্রচারিত মতবাদের উপর নির্ভর করে এই ধর্ম ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈষ্ণবেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনিই পরমপুরুষ এবং রাধা তাঁরই শক্তি। কুলবধূ যেভাবে প্রেমচাঞ্চল্যের বশীভূত হয়ে পরপুরুষের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, ভক্ত যদি সেইরকম প্রেমচাঞ্চল্যের সঙ্গে লজ্জা ধর্ম বা সর্বস্ব অর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করতে পারে, তবে তাকেই মাধুর্য ভাব বলবো। রূপোল্লাস, পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য, মান অভিসার, বিরহ, মিলন, সম্ভোগ, রসালাপ, ভাব-সম্মিলন, প্রভৃতি এই ভাবের অঙ্গ। শ্রীরাধা এই ভাবের মূর্তিমতি দেবী ও প্রেমময় চৈতন্যদেব এই ভাবের মূর্ত অবতার। তবে এখানে কিন্তু 'কামগন্ধ' নেই—"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।/ লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥/আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।/কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥/কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।/কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম তো প্রবল॥" অবশ্য এমন নয় যে কৃষ্ণের ঐতিহ্যলীলার চিত্রিত হয়নি। তবে সংখ্যাধিক্যের হিসেবে কম। আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা স্তরে স্তরে এমন গভীর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে অনেকের ধারণা বাংলা সাহিত্যে এ আসলে একটি রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের নমুনা। বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মতনই এও বিশেষভাবে ধর্মাশ্রিত ও বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ববিশ্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তবে যে কোন ধর্মের মতনই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বেরও অনেকগুলি ঘরানা ছিল। এর মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগোষ্ঠী। এদের ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব পড়েছে চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের রচনায়। প্রাক-চৈতন্যযুগের পদাবলীকারদের রচনায় তন্ত্র বা নানা সহজিয়া সাধন পন্থার প্রভাব রয়েছে।

১.৩.১২.৫ কৃষ্ণতত্ত্ব

বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পুরুষ বা পরমপুরুষ হলেন কৃষ্ণ। তিনি আবার সমস্ত বৈষ্ণবের কাছে প্রধান আরাধ্য দেবতাও অর্থাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান। সকল দেবতার অংশীভূত এবং তিনিই পরমপিতা ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল। উপনিষদের ব্রহ্ম ও পুরাণের বিষ্ণুর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। সম্বিৎ, চিৎ ও হ্লাদিনী এই ত্রিবিধ শক্তি তাঁকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তবে বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণুলীলার আস্বাদনই প্রেম কামনার বিষয়। তাঁদের কাছে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীবিষ্ণু আরাধ্য মূর্তি নয়; বরং আরাধ্য দেবতা হলেন বংশীধারী নন্দদুলাল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলেছেন,

'পূর্ণ ভগবান অবতারে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে।'

৩য় পরিচ্ছেদে বলেছেন,

'দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥'

অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, কৃষ্ণই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ।

১.৩.১২.৬ শ্রীরাধাতত্ত্ব

বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের মতো রাধা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচীন কিছু পুরাণে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ নানান লীলাশক্তির অধিকারী। কৃষ্ণের এই শক্তিকে কোথাও কোথাও তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—স্বরূপ শক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এর মধ্যে স্বরূপশক্তিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। আনন্দ শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। তিনিই মায়াময় জগতের প্রধান। আর এই রাধা চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের প্রধান সখী সেই হ্লাদিনী শক্তির অধিকারী।

রাধার এই রূপ ও তত্ত্বের প্রকাশ বিকশিত হয়ে ওঠে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পরে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাধার ভাব ও কান্তি নিজ অঙ্গে ধারণ করেই। কৃষ্ণদাস বলেছেন,

"কৃষ্ণ বলে নাচে কাঁদে হাসে অনুক্ষণ।
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম॥'

১.৩.১২.৭ গোপীতত্ত্ব

হরিবংশের পরে রচিত ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে গোপীগণের উল্লেখ আছে। সেখানে রাধার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও প্রধান এক সখীর সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলার কথা উল্লিখিত আছে। হরিবংশেও গোপীদের কথা আছে যে, তারা সংসার বন্ধন তুচ্ছ করে জীবনকে মধুর করে উপভোগ করবার জন্যে কান্তার সঙ্গে মিলিত হোত। তারাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সহায়িকা। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা দর্শনই তাদের একমাত্র কাম্য বস্তু। আবার এই গোপী বা সখীহীনা রাধা অসম্পূর্ণা। এই সখীবৃন্দ রাধার 'কায়ব্যূহ' স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে।

১.৩.১২.৮ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু সম্পর্কিত যে আলোচনা হয়েছিল তাকে অবলম্বন করেই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

রামানন্দ এক এক করে কৃষ্ণের সমার্পণ, স্বধর্মত্যাগ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করে ভগবৎপ্রপত্তি, জ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে সাধ্যরূপে উপস্থাপন করেছেন আর মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলে বলছেন, 'এহো বাহ্য আগে কহো আরো'। আর পর রামানন্দ যখন বললেন, 'রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।/প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ সার।।" অর্থাৎ মহাপ্রভু সেই কথাকে যেন এবার অনুমোদন করলেন। রামানন্দ তখন দাস্যপ্রেমকে অনুমোদন করলেন ও চৈতন্যদেব তাকেও অনুমোদন করলেন। রামানন্দ একে একে বিস্তৃত বর্ণনা করতে গিয়ে যখন সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম ও কান্তাপ্রেমের কথা উত্থাপন করলেন তখন চৈতন্যদেব আরো একটু বিস্তৃত শুনতে চাইলেন। রামানন্দ তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেও তিনি বিস্তৃত বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি অবশ্য বারবার রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করেছেন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সর্বত্র। এইভাবেই বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩.১২.৯ অপরাপর কবি

প্রাক্-চৈতন্যযুগে তিনজন পদাবলীকার ছিলেন জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। তাদের সকলের কাব্যের মূল বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণলীলা। বিদ্যাপতি সেই স্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে আদিরসের পরিচয় দিয়েছিলেন। জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির ব্যবধান তিন শতাব্দীর। এই সময়ের অবসরে বাঙালির মন অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল কৃষ্ণনাম শোনার জন্য। চৈতন্য-সমসাময়িক বা তাঁর পরবর্তীকালের পদকর্তারা হলেন জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রমুখ। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ছাড়াও যশোরাজ খান, চাঁদকাজী, রামচন্দ্র বসু, বলরাম দাস, নরহরি দাস, বৃন্দাবন দাস, বংশীবদন, বাসুদেব, অনন্ত দাস, লোচন দাস, শেখ কবির, সৈয়দ সুলতান, হরহরি সরকার, ফতেহ পরমানন্দ, ঘনশ্যাম দাশ, গয়াস খান, আলাওল, দীন চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, হরিদাস, শিবরাম, করম আলী, পীর মুহম্মদ, হীরামনি, ভবানন্দ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবি।

১.৩.১২.১০ আদর্শ প্রশ্নমালা

১। বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝ? এর বিষয়বস্তু কী?

২। বৈষ্ণব পদাবলী পাঠের তাৎপর্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

৩। পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণতত্ত্ব বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকে? সংক্ষেপে কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও রাধা-তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করো।

৪। বৈষ্ণব দর্শনে রাধার পাশাপাশি তার সখীদের একটি মূল্যবান স্থান দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৫। বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোচনায় সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা কেন প্রয়োজন সংক্ষেপে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৬। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অবস্থান নির্ণয় করো।

১.৩.১২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

১। বৈষ্ণব পদাবলী—ড. সত্য গিরি

২। বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩। বৈষ্ণব রস-প্রকাশ—ক্ষুদিরাম দাস

৪। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৫। বৈষ্ণব কবিপ্রসঙ্গ—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। পাঁচশত বৎসরের বৈষ্ণব পদাবলী—ড. বিমানবিহারী মজুমদার

৭। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১৩

বৈষ্ণব পদকর্তা

বিন্যাস ক্রম :

১.৩.১৩.১ ভূমিকা

১.৩.১৩.২ বিদ্যাপতি

- ১.৩.১৩.২.১ বিদ্যাপতির সময়কাল — রাজসভার সঙ্গে সংযোগ ও সাধনা
- ১.৩.১৩.২.২ বিদ্যাপতির নানা রচনা
- ১.৩.১৩.২.৩ বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় বিদ্যাপতি
- ১.৩.১৩.২.৪ বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্তির কারণ
- ১.৩.১৩.২.৫ ব্রজবুলি ভাষা
- ১.৩.১৩.২.৬ পরিশেষ

১.৩.১৩.৩ চণ্ডীদাস

- ১.৩.১৩.৩.১ ভূমিকা
- ১.৩.১৩.৩.২ চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব
- ১.৩.১৩.৩.৩ পূর্বরাগ-অনুরাগ ছড়িয়ে
- ১.৩.১৩.৩.৪ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা
- ১.৩.১৩.৩.৫ পরিশেষ

১.৩.১৩.৪ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

- ১.৩.১৩.৪.১ ভূমিকা
- ১.৩.১৩.৪.২ বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় কৃতিত্ব
- ১.৩.১৩.৪.৩ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের তুলনা
- ১.৩.১৩.৪.৪ পরিশেষ

১.৩.১৩.৫ বলরাম দাস

১.৩.১৩.৫.১ ভূমিকা

১.৩.১৩.৫.২ বাল্যলীলার পদে কৃতিত্ব

১.৩.১৩.৫.৩ সখ্যভাবের পদ রচনা

১.৩.১৩.৫.৪ উপসংহার

১.৩.১৩.৬ গোবিন্দদাস

১.৩.১৩.৬.১ ভূমিকা

১.৩.১৩.৬.২ গোবিন্দদাস

১.৩.১৩.৬.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৩.১৩.৬.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১৩.১ : ভূমিকা

বিদ্যাপতি বাঙালী ছিলেন না, বাংলা ভাষায় তাঁর কোন রচনা নেই, তবু, মিথিলার এই প্রতিভাময় কবি বাংলা সাহিত্যে যেমন অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন তেমনি ভারতীয় সাহিত্যে 'কবি সার্বভৌম' রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি শৈব ধর্মে দীক্ষিত হয়েও বৈষ্ণব কবিতা রচনায় যেমন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি রচনা করেছেন প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত ভাষায় রাজকাহিনী সম্বলিত জীবনীকাব্য এবং পুরাণ অনুসারী গ্রন্থাদি। শুধু তাই নয়, বহুমুখী পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিদ্যাপতি সাহিত্যরচনার পাশাপাশি স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রূপে সমাজিক জীবন সুচারু রূপে নিয়ন্ত্রণের মতামত যেমন দিয়েছেন, তেমনি ভূতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক রূপে ও আমরা তাঁকে পেয়েছি।

১.৩.১৩.২.১ : বিদ্যাপতির সময়কাল, রাজসভার সঙ্গে সংযোগ এবং সাধনা

বিদ্যাপতি মিথিলার (বর্তমান বিহার প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত) মধুবনী মহকুমার 'বিসফী' গ্রামের সংস্কৃতিমান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তাঁর অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর তিরোধান ঘটে। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠক্কুর (বর্তমানে ঠাকুর)। ঠক্কুর ছিল তাঁদের উপাধি। বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী বিদ্যাপতি রাজ্যশাসন সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মিথিলা রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন, রাজা কীর্তি সিংহ থেকে দেবীসিংহ, বীরসিংহ, শক্তিসিংহ ও ভৈরব সিংহ প্রমুখের রাজত্বকালে। সমসাময়িককালে কামেশ্বর রাজবংশের অন্যতম রাজা শিবসিংহের

> *বিদ্যাপতি মিথিলার মধুবনী মহকুমার 'বিসফী' গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন চর্তুদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠক্কুর, ঠক্কুর ছিল তাদের উপাধি। তিনি মিথিলার রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের পঞ্চদেবতার উপাসক ছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন শৈব। বিদ্যাপতি রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি হল—কীর্তিলতা (১৪০২-১৪০৪), ভূপরিক্রমা (১৪০০), পুরুষ পরিক্রমা (১৪১৮) ইত্যাদি।*

সুহৃদ ছিলেন। শৈব সাধক হলেও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি হিন্দুধর্মের পঞ্চ দেবতা অর্থাৎ শিব ছাড়াও বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য ও গণপতির উপাসক ছিলেন। বিদ্যাপতির জীবন ও সাহিত্য পরিক্রমা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে যেমন উঠতে পেরেছিলেন তেমনি পাণ্ডিত্য অর্জন ও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে সহজেই সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন :

১। বিদ্যাপতিদের উপাধি কি ছিল? তাঁর বাবার নাম কি?
২। তিনি কোন রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
৩। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম কর?

১.৩.১৩.২.২ : বিদ্যাপতির নানা রচনা

বিদ্যাপতি-রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি হলো কীর্তিলতা (১৪০২-১৪০৪), ভূপরিক্রমা (১৪০০), পুরুষ পরিক্রমা (১৪১৮), কীর্তিপতাকা (১৪১৮), লিখনাবলী (১৪৩৮), শৈব সর্বস্বহার ও গঙ্গাবাক্যাবলী (১৪৩০-৪০), বিভাগসার, দানবাক্যাবলী ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (১৪৪০-১৪৬০)। এই গ্রন্থগুলির বিষয় বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির বহুমুখী পাণ্ডিত্যকে তুলে ধরেছে। ভৌগোলিক বিষয় যেমন এতে আছে, রাজরাজড়ার জীবনীও আছে, তেমনি আছে পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। বিশেষত উল্লেখ্য, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী বর্তমানে দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

১.৩.১৩.২.৩ : বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির প্রধান কৃতিত্ব রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনায় যা বৈষ্ণব পদাবলী নামেই সু-চিহ্নিত। পাঁচশোরও বেশি বৈষ্ণব পদ তিনি রচনা করেছিলেন। ভারতীয় অলংকারনিষ্ঠ বিদ্যাপতি, অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত প্রণয় লীলাকে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত নানা রস পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের অভিসার-বিরহ-মিলনলীলার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পদগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিচ্ছিন্নভাবে রচিত হলেও সেগুলির মধ্যে ক্রমপরম্পরিত ঘটনা প্রবাহ লক্ষিত হয়। আমাদের বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, চৈতন্য পূর্ব যুগে বিদ্যাপতির লেখনীর সূত্রে বৈষ্ণবপদাবলী রচনার সুবিস্তৃত পথের সূচনা হয়। সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালের অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার পথচলা শুরু হয়েছিল যার পরিণতিতে ঘটেছিল বৈষ্ণবপদাবলীর বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির আঙিনায় উত্তরণ।

বিদ্যাপতির প্রধান কৃতিত্ব রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনায়, যা বৈষ্ণব পদাবলী নামে সুপরিচিত। অলংকার নিষ্ঠ বিদ্যাপতি পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত নানা রস পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, অভিসার, বিরহ, মিলন লীলার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় তিনি প্রধানত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' দ্বারা প্রভাবিত। একারণেই 'অভিনব জয়দেব' রূপে তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক অনুভব, ভক্তি তন্ময়তার সার্থক নির্দশন 'নিবেদন' ও 'প্রার্থনার' পদগুলি উপলব্ধির গভীরতায় কাব্যরস মণ্ডিত হয়েছে।

বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় তিনি প্রধানত জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। একারণেই 'অভিনব জয়দেব' রূপে তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। জয়দেবের রাধার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার

চরিত্রগত সাদৃশ্য অনেকাংশে লক্ষিত হয়। বয়ঃসন্ধি ও পূর্বরাগের যে রাধাকে বিদ্যাপতির পদে আমরা প্রত্যক্ষ করি, পরবর্তী পর্যায়ে তাকে ধীরে ধীরে মুকুলিত করে দেখিয়েছেন কবি। কৈশোর ও সদ্য সমাগত যৌবনের দ্বন্দ্বে আলোড়িত রাধার মনোগহনের ছবিটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে। রাধার অনিন্দ্য রূপরাজি মোহিত করেছে কৃষ্ণকে —

> "যব গোধূলি সময় বেলি।
> ধনি মন্দির বাহির ভেলি।।
> নব জলধর বিজুরি রেহা
> দ্বন্দ্বপসারি গেলি।"

প্রেমের অজানা পুলকে শিহরিত রাধিকার তনুমন। এই প্রেমকেই তিনি জীবনের সর্বস্ব বলে জেনেছেন। দায়িত্বের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিদ্যাপতির রাধা কোন বাধা মনে নি। সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে, জাগতিক সুখ, সাংসারিক - সামাজিক নিয়মনীতির প্রতি উদাসীন রাধা, কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকে ছাড়া রাধা নিজের অস্তিত্বকে সার্থক বলে মনে করে না, তাই বলতে পারে —

> "হৃদয়ক মৃগমদ গীমকহার।
> দেহক সরবস গেহক সার।।
> পাখীক পাখ মীনক পানি।
> জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।"

প্রিয় মিলনের অভিলাষে বিদ্যাপতির রাধা সঙ্কেত স্থানে গমন করে। অতিক্রম করে পারিবারিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশকে। স্বভাবতঃই এরপর পূর্ণ হয় কাঙ্ক্ষিত মিলন। কিন্তু সে মিলনের আভা দেহ - মনে ছড়িয়ে থাকলেও 'মাথুর' অর্থাৎ বিরহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

> "নব অনুরাগিনী রাধা।
> কিছু নাহি মানএ বাধা।।
> একেলি কএল পয়ান।
> পথ বিপথ নাহি মান।।"

বিরহের পদে বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অবিসংবাদী, বেদনাবিদীর্ণা রাধিকা প্রিয়ের অদর্শনে কাতরোক্তি করেছে। পূর্ব মিলনের সুখস্মৃতি রাধার মনকে ভারাক্রান্ত করেছে —

> "কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
> কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।।
> নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
> সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ।।"

প্রিয়জনকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কোন নারীর উপস্থিতির আশঙ্কা দুর্লক্ষ্য নয় —

'আন অনুরাগে প্রিয়া আনদেশে গেলা।
প্রিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।।'

রাধার বিরহবেদনাকে চরম ঐশ্বর্যরূপ দান করেছেন কবি

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"

যাঁরা বলেন, বিদ্যাপতি বহিরঙ্গের কবি অন্তরঙ্গের কবি ন'ন, তাঁরা এই পর্বে 'কৃষ্ণসুখের তাৎপর্যময়ী' রাধিকার দেখা পান যিনি অন্তরের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। কৃষ্ণপ্রেমতন্ময় যে রাধাকে আমরা এই পর্বে পাই তার সঙ্গে জয়দেবের রাধিকার পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতির ব্যক্তি অনুভবের অকৃত্রিম প্রকাশে সমুজ্জ্বল এই রাধিকাকে জয়দেবের কাব্যে আমরা পাই না। রাধা এই পর্বে কৃষ্ণসঙ্গসুধা পানে ততটা ব্যাকুল ন'ন, "শুধু একবার মাত্র তার দেখা পেতে উৎসুক। কল্পলোকে, ভাবলোকে দয়িতের সঙ্গে তার মিলন ঘটে। চিরবিরহের সমুদ্রতীরে নির্বাসিতা রাধিকা অনুভব করেছেন তার অন্তরেই পরম আকাঙ্ক্ষার ধন কৃষ্ণ অধিষ্ঠান করছেন। রাধিকার হৃদয় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা কোন ভাবেই সম্ভবপর নয়। তাই নির্দ্বিধ চিত্তে রাধিকার কথা আমরা শুনতে পাই —

'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।'

বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক অনুভব, ভক্তিতন্ময়তার সার্থক নিদর্শন 'নিবেদন' ও 'প্রার্থনার' পদগুলি — উপলব্ধির গভীরতায়, ব্যাপ্ত অনুভূতিতে কাব্যরসমণ্ডিত হয়েছে —

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়াব মোয়।"

দেহ-দেহাতীত, মর্ত্য-মর্ত্যাতীতের সংযোগে বিদ্যাপতির পদ অনুপম রসমাধুর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন :

১। 'অভিনব জয়দেব' কাকে বলা হয়?
২। 'বৈষ্ণবপদাবলী' রচনায় বিদ্যাপতি কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?
৩। বিদ্যাপতির প্রধান কৃতিত্ব কি?

১.৩.১৩.২.৪ : বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্তির কারণ

বিদ্যাপতি বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ না করলেও, বাংলায় পদরচনা না করলেও বাঙালীর হৃদয়ে সমাসীন হয়েছেন কবি। তাঁর পদাবলী বাঙালীর হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করতেন —

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।'

তদানীন্তন কালে মিথিলা সারস্বততীর্থ রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা তখন বিস্তৃত হয়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। বাংলাদেশ, অসম, ওড়িষা থেকে ছাত্ররা বিদ্যাচর্চার জন্য মিথিলায় প্রায়ই যেত। বাংলা ও মিথিলা — এই দুই স্থানের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাঙালী কর্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলী সমাদৃত হয়েছিল এবং মিথিলাবাসীও এই সূত্রে আকৃষ্ট হয়েছিল কবির বৈষ্ণবপদাবলী রচনার প্রতি।

> ***বিদ্যাপতি বাংলায় পদ রচনা না করলেও বাঙালীর হৃদয়ে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর পদাবলী বাঙালীর হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করতেন। বাংলা ও মিথিলা এই দুই স্থানের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কারণে মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার, আসামের ছাত্রদের ক্ষেত্রে অসমিয়া ভাষার সংযুক্তি ঘটে। 'মৈথিল' ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা রচনা করে বাঙালী তথা বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছেন।***

বিদ্যাপতির পদে প্রেমের, মধুর রসের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণবীয় 'কান্তাপ্রেম'-এর সমৃদ্ধ কাব্যরূপ বিদ্যাপতিকে অমরত্ব দিয়েছে। মিথিলা বিদ্যাপতির জন্মস্থান হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তরা তাঁর পদে তাঁদের সাধনার বিষয় খুঁজে পেয়েছিলেন বিশেষ ভাবেই।

১.৩.১৩.২.৫ : ব্রজবুলি ভাষা

সারস্বত সাধনায় যুক্ত ছাত্ররা অধ্যয়ন শেষে যখন ফিরে এসেছেন বাংলায়, তখন তারা বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদগুলি কপি করে এনেছেন। কপি করার সময় মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার, আসামের ছাত্রদের ক্ষেত্রে অসমিয়া ভাষার, ওড়িয়া ভাষীদের ক্ষেত্রে ওড়িয়ার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটে। এই সংযুক্তির সূত্রে বিদ্যাপতির মূল রচনার ভাষার সঙ্গে পার্থক্য সূচিত হয়। নব্য সৃষ্ট এই মিশ্রিত (Mixed) ভাষাকেই বলা হয়ে থাকে 'ব্রজবুলি' ভাষা।

প্রশ্ন :

১। ব্রজবুলি ভাষা কি?

২। বিদ্যাপতিকে বাংলাসাহিত্যে অর্ন্তভুক্তির দুটি কারণ নির্দেশ কর?

১.৩.১৩.২.৬ : পরিশেষ

রাধাকৃষ্ণের যুগল সাধনায় বাঙালীর আন্তরিকতা এবং আত্মনিয়োজন বহুকাল আগেই সূচিত হয়েছে। বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে পৌঁছোনোর পর সেই পদ বাঙালীরা বারংবার বড়েছেন, শুনেছেন, নিমগ্ন চিত্তে 'প্রেম আর পূজায়' অবগাহন করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সহ বৈষ্ণব আচার্যেরা বিদ্যাপতির রচিত পদের রস

আস্বাদন করেছেন। চৈতন্য সমসাময়িক এবং উত্তর কালের পদ রচনায় বৈষ্ণব কবিজনেরা বিদ্যাপতির ভাব - ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এসব কারণেই বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হয়েও, মাগধী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ - অবহট্‌ঠ হয়ে পূর্ব ভারতে জন্ম নেওয়া পাঁচটি ভাষার অন্যতম 'মৈথিল' ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা রচনা করে, বাঙালী তথা বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে এতে উদ্দীপ্ত হয়েছে; বৈষ্ণব কবিতার ধারাও প্রবহমান ও গতিশীল হয়েছে।

১.৩.১৩.৩ : চণ্ডীদাস

১.৩.১৩.৩.১ : ভূমিকা

কেবলমাত্র প্রাক্-চৈতন্য যুগেই নয় — মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। সহজ সরল ভাষায় প্রেমের আনন্দমধুর বেদনাকে রসসমৃদ্ধ করেছেন কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদে গভীর জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। কবির ব্যক্তিপরিচয় সেভাবে জানা যায় না। জনশ্রুতি, বীরভূম জেলার নান্নুর (বর্তমানে নানুর) গ্রামে চণ্ডীদাস বাস করতেন।

১.৩.১৩.৩.২ : চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব

বিদ্যাপতির পদে যে নাগরিক মণ্ডনকলার প্রকাশ, চণ্ডীদাসের পদে তা অনুপস্থিত। চণ্ডীদাসের রাধিকার স্বাতন্ত্র্য, অসাধারণত্ব কৃষ্ণপ্রেমের বিশিষ্টতায়। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথম থেকেই কৃষ্ণগতপ্রাণা। চরিত্রগত বিবর্তন তার মধ্যে লক্ষিত হয়নি। পূর্বরাগ পর্বের রাধিকার মধ্যেও বিরহের বাতাবরণ। কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষ না করে, কেবল তার নাম শুনেই রাধা ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়েছেন —

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।"

চণ্ডীদাস 'পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগ'-এর শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর প্রতিভার স্বতোচ্ছল প্রকাশ এই সব পর্যায়ের পদেই। নব প্রেমমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃতা, ভাববিহ্বলা রাধা 'বিরতি আহারে', 'রাঙ্গাবাস পরে', 'যে মত যোগিনী পারা'। রাধা কৃষ্ণ প্রেমলাভের সাধনায় তন্নিষ্ঠা। পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস মুগ্ধ নায়িকার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীর প্রতিভা নিয়ে। ত্রিলোকে এই প্রেমের কোন উপমা নেই। চণ্ডীদাসের রাধা জানেন যে, কৃষ্ণ বিনা তার জীবন যৌবন ব্যর্থ — নারীজন্মের সার্থকতা কৃষ্ণের প্রেমলাভে কিন্তু কুলবালা রাধার কামনা অনেকসময়ই পূর্ণায়ত রূপলাভ করতে পারে না।

> ***প্রাক্-চৈতন্যযুগেই নয়— মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। সহজ-সরল ভাষায়, প্রেমের আনন্দ মধুর বেদনাকে, রস সমৃদ্ধ করেছেন কবি চণ্ডীদাস। জনশ্রুতি অনুসারে বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস বাস করতেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথম থেকেই কৃষ্ণগত প্রাণা। চণ্ডীদাস 'পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগ' এর শ্রেষ্ঠ কবি। চণ্ডীদাসের রাধা জানেন যে, কৃষ্ণ বিনা তার জীবন যৌবন ব্যর্থ। আত্মবিস্মৃতা, ভাব বিহ্বলা রাধা 'বিরতি আহারে', 'রাঙ্গাবাস পরে', 'যে মত যোগিনী পারা'। রাধা কৃষ্ণ প্রেমলাভের সাধনায় তন্নিষ্ঠা। তবুও কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয়নি তাঁর।***

আক্ষেপোক্তি ধ্বনিত হয় রাধার কণ্ঠে। সর্বদা কৃষ্ণানুভব করে তার ইন্দ্রিয়াদি — এ জন্য বিব্রত রাধিকা ইন্দ্রিয়সংবেদ্য প্রেমকে সীমায়িত করতে চায়, কৃষ্ণরূপে বিস্মৃত হ'তে চায়। চণ্ডীদাসের রাধার যদিও এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণানুভবের, প্রেমরস আস্বাদনের গোপন আনন্দই অভিব্যক্ত —

"সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান।।
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।"

এই কৃষ্ণকে লাভ করার সাধনায় রাধা নিমগ্ন — দিন ও রাতের ব্যবধান দূরীভূত হয়েছে তাঁর কাছে তবুও কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয়নি তাঁর। অসহায় রাধা মরমী কোন বন্ধুকে খুঁজেছেন যার কাছে নিজের যন্ত্রণার কথা জানাতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেম তাঁকে অস্তিত্বের তট থেকে সমূলে উৎপাটিত করেছে —

'কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।'

প্রশ্ন :

১। চণ্ডীদাসের জন্ম কোথায়? চণ্ডীদাস কোন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি?
২। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথম থেকেই কি রকম?

১.৩.১৩.৩.৩ : পূর্বরাগ - অনুরাগ ছড়িয়ে

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে পূর্বরাগ পর্যায়ের পদগুলি যেমন অবিস্মরণীয় তেমনি স্বগত-কথনে রাধার আক্ষেপানুরাগের পদগুলিও নিজ উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। নিজের বিরূপ ভাগ্য তার এই দুঃখের কারণ তাই, আপাত ভাবে যেসব বিষয়াদি জীবন নির্বাহের পক্ষে অনুকূল সেই গুলিই রাধিকার কাছে বিরূপ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে —

> ***চণ্ডীদাস রাধিকাকে বিরহিনী রূপেই প্রভাসিত করেছেন। দুঃখের অনলে যার প্রেম 'নিকষিত হেম' হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি।'***

"যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ।।
অতএব এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে।।"

চণ্ডীদাস রাধিকাকে বিরহিণী রূপেই প্রভাসিত করেছেন — দুঃখের অনলে যার প্রেম 'নিকষিত হেম' হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। দুঃখের, দুঃখবোধের নিবিড় অনুভূতিই

প্রশ্ন :

১। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্ম্পকে কি বলেছেন?

চণ্ডীদাসের পদে প্রেমের ভুবন রচনা করেছে। রাধিকার আত্মানুভূতির সুনিবিড় আনন্দ পদগুলিকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছে। চণ্ডীদাসের পদে সচেতন ভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেই।

১.৩.১৩.৩.৪ : চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা

রাজসভার সঙ্গে সংযুক্ত, বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদ্যাপতির পদে ভাষার ঐশ্বর্য, অলঙ্কারের বর্ণবিভা — অন্যদিকে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার নিরাভরণ রূপ, সহজ সারল্য, আন্তরিকতা পাঠককে অভিভূত করেছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবকল্পনার পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়েছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে। চণ্ডীদাসের গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।' বস্তুতপক্ষে, চণ্ডীদাসের রাধিকা ধ্যাননিমগ্না, বিদ্যাপতির রাধিকা বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে বয়ঃসন্ধি থেকে ভাব সম্মিলনে পৌঁছেছেন। দেহবোধকে স্বীকার করেই দেহাতীত প্রেমের স্বর্গে উপনীত হয়েছেন তিনি। চণ্ডীদাসের পদে যে অলঙ্কার তাতে গ্রামবাংলার প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। ভাষাও দৈনন্দিন জীবন ঘনিষ্ঠ - 'গুরুজন জ্বালা জলের শিহুলা / পড়সী জিয়ল মাছে। / ফুল পাণিফল কাঁটায় সকল / সলিল বেড়িয়া আছে।' অন্যদিকে, বিদ্যাপতির পদে দুঃখ-যন্ত্রণা বর্ণনাও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে — 'চিকুরে গর এ জলধারা / মুখশশী ভয়ে কিয়ে কাঁদে, আঁধিয়ারা?' অথবা, 'চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি অঞ্জন শোভন তায়,/ জনু ইন্দিবর পবনে ঠেলন অলিভরে উলটায়।'

> ***বিদ্যাপতি রাজসভার সঙ্গে যুক্ত, অলঙ্কারের বর্ণবিভা। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহজ-সারল্য, আন্তরিকতা পাঠককে অভিভূত করেছে। চণ্ডীদাসের ভাবকল্পনার পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়েছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে। চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর"।***

প্রশ্ন :

১। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা কর।
২। পূর্বরাগ কত রকমের হতে পারে?

১.৩.১৩.৩.৫ : পরিশেষ

চণ্ডীদাস শেষ পর্যন্ত গভীর অনুভূতিকে নির্বিশেষ মিস্টিক আবহ দান করেছেন, অন্যদিকে, বিদ্যাপতি রোমান্টিকতার বাতাবরণে, লৌকিক জীবনরসে প্রেমকে অভিসিঞ্চিত করেছেন। চণ্ডীদাস ভাবুক কবি, তাঁর পদে যেন তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধতা — অন্যদিকে বিদ্যাপতির পদে ঝাড়বাতির ঔজ্জ্বল্য — বিদ্যাপতি রূপদ্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা — চণ্ডীদাস রূপের অতীত যে অরূপরতন তাকেই ধরতে চেয়েছেন পদাবলীর আসরে।

১.৩.১৩.৪ : জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

১.৩.১৩.৪.১ : ভূমিকা

ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গীর সরলতায় চৈতন্যোত্তর পর্বের বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন জ্ঞানদাস। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন কবি। অনুমিত হয়, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন এবং নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছেন। খেতুরীতে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১.৩.১৩.৪.২ : বৈষ্ণপদাবলী রচনায় কৃতিত্ব

জ্ঞানদাস বাংলা, ব্রজবুলি, বাংলা-ব্রজবুলি — এই তিনটি ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও অন্যান্য রসপর্যায় বিষয়ক পদ রচনা করলেও জ্ঞানদাসের প্রতিভার পূর্ণায়ত প্রকাশ ঘটেছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদগারের পদে। তাঁর কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা ভাবের রূপশিল্প সৃজনে ভক্ত কবি জ্ঞানদাসের সৃষ্টিতে ভক্তিভাব ও কল্পনার সংশ্লেষণ ঘটেছে। ভক্তিভাবকে রোমান্টিক রসমাধুর্যে তিনি অভিষিক্ত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কবি ও শিল্পী। অনুভূতির তীব্রতা যেমন তাঁর মধ্যে ছিল, তেমনি ছিল প্রকাশের দক্ষতা। অসীম অতলান্ত ভাবকে শোভন সুন্দর, সীমাসংহত রূপের আধারে মূর্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। সান্দ্র অনুভূতিকে অনেক সময়েই যথাযথ ভাবে রূপঋদ্ধ করতে পারেন নি চণ্ডীদাস, তাই অনেক সময়েই তাকে মিস্টিক (mystic) বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে জ্ঞানদাস অনুভবকে, উপলব্ধিকে পাঠকের মনে, ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন সহজেই। জ্ঞানদাসের এই রোমান্টিক কবিধর্ম তাকে কৃষ্ণের রূপমাধুর্যে মুগ্ধা, কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা রাধিকার রূপচ্ছবি নির্মিতিতে তন্নিষ্ঠ করেছে। রাধার মন কৃষ্ণের রূপসায়রে নিমজ্জিত — কৃষ্ণের যৌবনের উপবনে রাধিকা পথ হারিয়েছেন। অনুরাগের এ এক অত্যাশ্চর্য প্রকাশ —

> *চৈতন্যোত্তর পর্বের বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন জ্ঞানদাস। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন কবি। জ্ঞানদাস বাংলা, ব্রজবুলি, বাংলা ব্রজবুলি এই তিনটি ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও অন্যান্য রসপর্যায়ের পদ রচনা করলেও প্রতিভার পূর্ণায়ত প্রকাশ ঘটেছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদগারের পদে। জ্ঞানদাস অনুভবকে, উপলব্ধিকে পাঠকের মনে, ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন সহজেই। জ্ঞানদাসের রোমান্টিক কবিধর্ম কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা রাধিকার রূপছবি নির্মিতিতে তন্নিষ্ঠ করেছে।*

"আলো মুঞিঃ জানো না —
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত্ত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।

অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ।।"

রাধিকার প্রেম দেহস্পর্শ বিরহিত নয়, তাই অনায়াসে জ্ঞানদাসের রাধা বলেন — 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।'

এক অনির্দেশ্য বেদনাবোধ রোমান্টিক কবি মানসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানদাসের পদে এর সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভের মধ্যেও রাধার মনের আর্তি সংগুপ্ত থাকে নি —

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"

আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ে জ্ঞানদাস রাধার বেদনার্তিকে প্রকাশ করেছেন। বেদনা-বিধুরা রাধিকার কাতরোক্তি জ্ঞানদাসের পদকে কালোত্তীর্ণ করেছে —

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু

অনলে পুড়িয়া গেল।

অমিয় সাগরে সিনান করিতে

সকলি গরল ভেল।"

অরূপকে রূপের আধারে আবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর পদে। জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি দু ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। জ্ঞানদাস প্রকৃত অর্থেই চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য।

প্রশ্ন :

১। জ্ঞানদাসের জন্ম কোথায়?

২। চৈতন্যোত্তর দু'জন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম উল্লেখ কর।

৩। জ্ঞানদাসকে কি রোমান্টিক কবি বলা যায়?

১.৩.১৩.৪.৩ : জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের তুলনা

জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস দু'জনেই চৈতন্যোত্তর যুগের কবি এবং দু'জনেই বৈষ্ণব সাধক। জ্ঞানদাস চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হ'ন এবং নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেন। জ্ঞানদাসের সময়পর্বে ষড় গোস্বামীদের সাহিত্যদর্শন বাংলাদেশে তেমন ভাবে প্রচারিত হয়নি। গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের প্রেরণালাভ করেছিলেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পাঠ করেছিলেন কবি। সেই পাঠলব্ধ

জীবনবোধ, দর্শন-চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর পদাবলীতে। জ্ঞানদাসের পদের রোমাণ্টিক আবেগ পাঠককে এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। এই রোমাণ্টিক ভাব বিহ্বলতা গোবিন্দদাসে নেই। গোবিন্দদাসের পদে এক ক্লাসিক সংহতি লক্ষিত হয় যা জ্ঞানদাসে অনুপস্থিত। সঙ্গত কারণে গীতিপ্রাণতাই জ্ঞানদাসের পদাবলীর অলঙ্কার। অন্যদিকে, প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বৈচিত্র্যে গোবিন্দদাসের পদ অনন্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে মধুর রসের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন আছে তাকেই ভক্তের নিষ্ঠা নিয়ে অনুসরণ করেছেন গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাস জন্মাবধি রোমাণ্টিক।

> *জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস দু'জনেই বৈষ্ণবসাধক। জ্ঞানদাস, নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেন। গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের প্রেরণালাভ করেছিলেন। 'উজ্জ্বল নীলমনি' ও 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পাঠ করেছিলেন কবি। জ্ঞানদাসের পদে রোমান্টিক আবেগ থাকলেও গোবিন্দদাসে নেই। গোবিন্দদাসের পদে এক ক্লাসিক সংহতি লক্ষিত হয়, যা জ্ঞানদাসে অনুপস্থিত।*

প্রশ্ন :

১। জ্ঞানদাস কোন পর্যায়ের পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

২। জ্ঞানদাসকে কার ভাবশিষ্য বলা হয়?

১.৩.১৩.৪.৪ : পরিশেষ

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আলোকে প্রত্যক্ষ করেও জ্ঞানদাস তাকে প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে, ভাবের গভীরতায় লোকায়ত জীবনের সঙ্গে অন্বিত করে দেখিয়েছেন। জ্ঞানদাসকে যে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়ে থাকে তা অসংগত নয়। ভাব-ভাষা ও প্রকাশরীতির দিক থেকে দুই কবির মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সেটিই এর কারণ হলেও উভয় কবির মনোভঙ্গিতে কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। যেমন চণ্ডীদাস বৈষ্ণবতত্ত্বকে আশ্রয় করে পদ রচনা করেন নি, কিন্তু চৈতন্যোত্তর পর্বে জ্ঞানদাসের পদে বহু বৈচিত্র্য এসেছে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের অবলম্বনে লীলাবৈচিত্র্য অনুসরণে। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা, জ্ঞানদাসের রাধা মহাভাবময়ী হয়েও সৌন্দর্যমুগ্ধা। দু'জনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।

১.৩.১৩.৫ : বলরাম দাস

১.৩.১৩.৫.১ : ভূমিকা

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে বলরাম দাস সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদরচনায় বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলরামদাসই কবিকৃতির দিক থেকে বিশিষ্ট। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেন কবি। বলরাম দাসের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর বলরামদাস কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে বাস করতে থাকেন। কবি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয়, গুরু নিত্যানন্দ সঙ্গরসের সাধক। — গুরুর এই বিশেষ ধর্মদর্শন কবি বলরাম দাসকে বিশেষ প্রভাবিত করে। 'পদকল্পতরু' - গ্রন্থে বলরাম দাসের বহু পদ সংকলিত হয়েছে।

১.৩.১৩.৫.২ : বাল্যলীলার পদে কৃতিত্ব

বলরাম দাসের পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাব ও ভাষার সারল্য। কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা (Picturesquess) তার পদগুলিকে বিশেষ এক মাত্রা প্রদান করেছে। বাৎসল্য রসকে শ্রীরূপ গোস্বামী বৎসলভক্তিরস বলেছেন। এই রসের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী বলছেন, বাৎসল্য বিভাবাদির দ্বারাপুষ্ট হলে বৎসল্য ভক্তিরসের সৃষ্টি হয়। এর উদ্দীপন বিভাব হলো কৌমারাদি বয়স, বাল্য চাপল্য, ক্রীড়া ইত্যাদি। কৃষ্ণের বাল্যকাল থেকে শুরু করে সমগ্র কৌমারকাল অবলম্বন করে বলরামদাস পদ রচনা করেছেন। বালক কৃষ্ণ, স্নেহময়ী মাতা যশোদা, যশোদার লালন-তাড়ন, কৃষ্ণের আবেগ-অভিমান প্রভৃতি তাঁর বাৎসল্য রসের পদগুলিকে শিল্প সুষমা দান করেছে। মা ও সন্তান এই দুই প্রধান চরিত্র ছাড়াও পদগুলিতে বলরাম জননী রোহিণী, কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি চরিত্রগুলির অবতারণা ঘটেছে। সখাদের সঙ্গে ধেনু নিয়ে নিকটবর্ত্তী গোচারণ ক্ষেত্রে যাওয়া, যাওয়ার আগে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা, সাজসজ্জা, মায়ের সাবধানবাণী, মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, নির্দিষ্ট সময়ের পরেও সন্তান অদর্শনজনিত ব্যাকুলতা সব কিছুই আন্তরিক ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে বলরাম দাসের বাৎসল্য রসের পদাবলীতে —

> ***বলরাম দাস সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদরচনায় বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। বলরাম দাসের অদিনিবাস ছিল শ্রীহট্টে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে বলরামদাসের বহু পদ সংকলিত হয়েছে। বালক কৃষ্ণ, স্নেহময়ী মাতা যশোদা ও কৃষ্ণের আবেগ-অভিমান তাঁর পদগুলিকে শিল্প সুষমা দান করেছে। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, সুদামের সঙ্গে গোচারণ ক্ষেত্রে যাওয়া, যাওয়ার আগে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা সবই আন্তরিক ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।***

"সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।।"

বালক কৃষ্ণের অনুপম রূপ বর্ণনা করেছেন কবি —

"শ্বেতকান্তি অনুপম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাইন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন শ্যাম।"

প্রশ্ন :

১। দু'জন কৃষ্ণসখার নাম কর?
২। বলরাম দাস কোন পর্যায়ের পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

১.৩.১৩.৫.৩ : সখ্যভাবের পদ রচনা

সখ্য রসের পদেও বলরামদাস যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণ ও তার সখাদের পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে তা প্রভাসিত হয়েছে —

"আজ কানাই হারিল দেখ বিনোদ মেলায়
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়।।"

কৃষ্ণের রাধাপ্রেমেও কামনার উন্মত্ততা, সংরাগের প্রকাশ নেই, বরং বলরাম দাসের কৃষ্ণ রাধিকার প্রতি এক স্নিগ্ধ মধুর মনোভাবপরায়ণ। কামনার উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতার পরিবর্তে এখানে এক মমতা-মধুর পরিবেশ রচিত হয়েছে।

> ***বলরামদাসের কৃষ্ণ, রাধিকার প্রতি এক স্নিগ্ধ মধুর মনোভাব পরায়ণ। মিলনের আবেগ দীপ্তির চেয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মনিবেদন তুলনাতীত ভাবে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ-রাধিকা পরস্পরের সান্নিধ্যেই যেন তৃপ্ত, আনন্দিত। শ্যামনামে ভাববিভোর বলরামদাসের রাধা, চণ্ডীদাসের রাধার মতোই বলেন- 'ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ'।***

বলরাম দাসের মধুর রসের পদাবলীতেও মিলনের আবেগদীপ্তির চেয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মনিবেদন তুলনাতীতভাবে ফুটে উঠেছে। —

"সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে
আপনার হাতে পাত্র সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।"

কৃষ্ণ রাধিকা পরস্পরের সান্নিধ্যেই যেন তৃপ্ত, আনন্দিত। বলরাম দাস কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষ করার পর রাধিকার যে পরিচয় দিয়েছেন তা ও এক কথায় অনিন্দ্য গভীর ভাবঋদ্ধ — 'হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা কাতর পরাণ কান্দে।' রাধার অন্তর্লীন বেদনার আবেগদীপ্ত প্রকাশ অপূর্ব শব্দবন্ধে। বলরাম দাস আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের যে পদগুলি লিখেছেন তাতে চণ্ডীদাসের প্রভাব বিদ্যমান। শ্যামনামে ভাববিভোর বলরাম দাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতোই বলেন — 'ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ'। রাধিকার অন্তরে স্বয়ং কৃষ্ণের অধিষ্ঠান — তাই বলরাম দাসের রাধিকা বলতে পারেন 'আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির'।

প্রশ্ন :

১। বাৎসল্যরস কি?
২। বলরাম দাসের পদাবলীতে কৃষ্ণের গোচারণ ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে কার অনুমতি প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে?

১.৩.১৩.৫.৪ : উপসংহার

সার্থক চিত্রকল্প বলরাম দাসের পদগুলিকে কাব্যকলার চরম উৎকর্ষ দান করেছে। দয়িতের রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা বলরাম দাস সামান্য দু'একটি শব্দযোজনায় অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত

করেছেন — 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।' — রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত বলরামদাসের এই চিত্রকল্পের আবেদন পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ের দুয়ারে হলেও (visual) একই সঙ্গে তা হয়ে উঠেছে অন্তরিন্দ্রিয়ভেদী।

১.৩.১৩.৬ : গোবিন্দ দাস

১.৩.১৩.৬.১ : ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুসারী 'রাগানুগা' ভক্তিই গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রধান অবলম্বন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের অনুসরণে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে বিচিত্র পর্যায়ে বিন্যস্ত করে অনপম ভাবভঙ্গি, অলঙ্কার সৌকর্য, ছন্দ-সৌষম্যে তাকে কাব্য রূপ দান করেছেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের (আনুমানিক ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত দামোদর সেন ছিলেন শাক্ত। তাঁর পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। কবির পিতা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। কবি জাতিতে বৈদ্য। প্রথম জীবনে মাতামহের প্রভাবে কবি শাক্তধর্মে দীক্ষিত হলেও পরে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবধর্ম দর্শনের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গেও গোবিন্দদাসের সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করতেন শ্রীজীব। খেতুরীর বৈষ্ণব সম্মেলনে গোবিন্দদাসের রচিত পদকীর্তনের আসরে গীত হয়েছিল এবং বৈষ্ণব আচার্যগণ তাঁর রচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

> **গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুসারী 'রাগানুগা' ভক্তিই গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রধান অবলম্বন। কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। কবির পিতা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। খেতুরীর বৈষ্ণব সম্মেলনে গোবিন্দদাসের রচিত পদ কীর্তনের আসরে গীত হয়েছিল এবং বৈষ্ণব আচার্যগণ তাঁর রচনায় অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। গোবিন্দদাস, গৌরলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়কে অবলম্বন করে অজস্র পদ রচনা করেছেন, একান্ত আন্তরিকতা নিয়ে।**

প্রশ্ন :

১। গোবিন্দ দাসের জন্ম কোথায়? তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি?
২। কোন বৈষ্ণব সম্মেলনে গোবিন্দদাসের রচিত পদ আসরে গীত হয়েছিল?

১.৩.১৩.৬.২ : গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস, গৌরলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়কে অবলম্বন করে অজস্র পদ রচনা করেছেন, ভক্তিভাব নিষ্ঠাও একান্ত আন্তরিকতা নিয়ে। চৈতন্যলীলাস্বাদনের সুযোগ তিনি পাননি ঠিকই, এবং এই কারণে তাঁর আক্ষেপের অন্ত্য ছিলনা, তবু বৈষ্ণবাচার্যদের কাছ থেকে শুনে, গ্রন্থাদি পাঠ করে গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের করুণাঘন দিব্যরূপটিকে, মহাপ্রভুর পতিত পাবনী লাবণীকে ফুটিয়ে তুলেছেন —

"কি পেঁখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।"

শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কিত বৈষ্ণবীয় তত্ত্বাদর্শের কাব্যিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন কবি —

"জয় শচী নন্দন রে।
ত্রিভুবনমণ্ডন কলিযুগ কাল-
ভুজগেভয়খণ্ডন রে।।"

গৌরচন্দ্রিকার এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

গোবিন্দদাসের পদে রাধিকা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, মহাভাবময়ী হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মহাভাবরূপিনী রাধা যেন মূর্ত্তিমতী শৃঙ্গাররস। কবি রাধিকা এবং কৃষ্ণ - উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণরূপ দর্শনে রাধিকার যে আনন্দ তা' ইন্দ্রিয়বেদ্য; আবার সেই সঙ্গে কৃষ্ণের গুণাদিও রাধিকাকে মুগ্ধ করেছে —

"কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরণ লব লেশ।।
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম।।"

আবার, রাধিকার রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করে কৃষ্ণের অনুভব ব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে —

'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।'

অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণ করে কবি অভিসারকে বিভিন্ন পর্বপ্রকরণে বিন্যস্ত করেছেন - এর ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে অভিসারিকা রাধার মধ্যেও এসেছে অনেক বৈচিত্র্য। সত্য যে কঠিন - আর সেই কঠিনকে আয়ত্ত করার জন্যই - দুর্গমকে, দুরূহকে জয় করার লক্ষ্যেই যেন শ্রীরাধিকার অভিসার। তাই এতে আছে বিপুল গতির আবেগ। গোবিন্দদাসের রাধা সে শুধু অভিসার যাত্রা করেছেন তাই নয়, এর জন্য প্রস্তুত হয়েছেন শরীরে-মনে, বিপুল উৎসাহে। অভিসারিকা রাধার এই রূপ প্রাক্-চৈতন্য পর্বের পদকারদের মধ্যে বা চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের পদেও বিরল। এই কারণেই অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। রাধিকার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি - অতন্দ্র সাধনার কথা বলেছেন কবি —

"কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"

সংসার এমন কী প্রকৃতির প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে প্রস্তুত গোবিন্দদাসের রাধা —

"কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি।।"

গোবিন্দদাস পর্যায় অনুসারে দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, বর্ষাভিসার, তামসীভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চ রাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার—উপস্থিত করেছেন। রাধিকার পৃথক পৃথক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। ক্ষুরধার পথ—দুর্গম অভিসার যাত্রার শেষে পরম আকাঙ্ক্ষিতের কাছে আত্মনিবেদনের সময় রাধা নিজের কায়িক ক্লেশের বর্ণনা দিলেও শেষ পর্যন্ত মাধবকে নিজের মতো একান্তে পেয়ে বিস্মৃত হয়েছেন সব কিছু—

"একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আসে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।।"

অভিসার পর্যায়ের পদ ছাড়াও রাসলীলা বিষয়ক পদেও গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়। রাসলীলার পদগুলি ধ্বনিমাধুর্যে, অলঙ্কারের প্রয়োগে, প্রকৃতির অফুরান সৌন্দর্যের সূচারু বর্ণনায় অনুপম কাব্যশ্রী লাভ করেছে। 'শারদ চন্দ পবন মন্দ' শীর্ষক পদটিতে রাসলীলার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের বিষয়াদি বর্ণিত এবং এই পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় পদ এটি।

উজ্জ্বলনীলমণির প্রকরণ অনুযায়ী গোবিন্দদাস ভাবী, ভবন ও ভূত — এই তিন প্রকারের বিরহ নিয়েই পদরচনা করেছেন, লক্ষণীয় বিষয় এটি যে, গোবিন্দদাস মাথুর বিরহের পদে বিদ্যাপতির মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার কারণ, চৈতন্যোত্তর পর্বের কবিরা বিরহকেই শেষ বলে মানেন নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বও একই বিষয় উপস্থাপিত করেছে যাতে রাধিকা ও কৃষ্ণ 'ভিন ভিন দেহা'। তাই কৃষ্ণের হ্লাদিনী অংশ কিছুতেই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। রাগানুগা ভক্তিভাবে ভাবিত গোবিন্দদাসের বিরহের পদগুলিতে মঞ্জরী ভাবের প্রকাশ ঘটেছে — 'মঞ্জরী সেবিকা হয়ে যেন তিনি রাধার বিরহখিন্না রূপটিকে দেখেছেন, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন —

"যাহা পহুঁ ভরসই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ধাম।।
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী।
মো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি।।"

অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'উজ্জ্বল নীলমনি' অনুসরণ করে কবি অভিসারকে বিভিন্ন পর্ব প্রকরণে বিন্যস্ত করেছেন। গোবিন্দদাসের রাধা অভিসার যাত্রার জন্য, শরীরে মনে, বিপুল উৎসাহে তৈরি হয়েছেন। অভিসার পর্যায়ে পদ ছাড়াও রাসলীলা বিষয়ক পদেও গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব দেখা যায়। রাগানুগা ভক্তিভাবে ভাবিত গোবিন্দদাসের বিরহের পদগুলিতে মঞ্জরী ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বল্লভদাস তাঁর পদে বলেছিলেন 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। বিদ্যাপতির মতো গোবিন্দদাস ও ছিলেন বিদগ্ধ কবি। বিদ্যাপতি প্রথমে জীবন রসিক কবি, অন্যদিকে গোবিন্দদাস প্রথমে ভক্তসাধক।

বল্লভদাস তাঁর পদে বলেছিলেন 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। বস্তুতপক্ষে বিদ্যাপতির কাব্যিক বৈশিষ্ট্য আকৃষ্ট করেছিল গোবিন্দদাসকে। বিদ্যাপতির মতো গোবিন্দ দাসও ছিলেন বিদগ্ধ কবি। কিন্তু, ভাববৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুই কবির মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে। বিদ্যাপতির রাধিকা প্রাকৃত নায়িকার মতোই অন্যদিকে গোবিন্দ দাসের রাধা মহাভাবময়ী। বিদ্যাপতি প্রথমে জীবনরসরসিক কবি, অন্যদিকে গোবিন্দদাস প্রথমে ভক্তসাধক। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভক্তিসাধনার পরিপূরক রূপেই তিনি কাব্যরচনা করেন। গোবিন্দদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শকে প্রাকৃত জগতের মানব প্রেমের বৈচিত্র্যে লীলারসায়িত করে তুলেছেন।

প্রশ্ন :

১। গোবিন্দদাস কোন যুগের কবি? কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

২। অভিসার কাকে বলে? অভিসার কয়প্রকার?

৩। 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' কাকে বলা হয়?

১.৩.১৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি — শঙ্করীপ্রসাদ বসু

২. মধ্যযুগের কবি ও কাব্য — শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়, ৩য় খণ্ড) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় ঃ নবপর্যায় — নীলরতন সেন

৫. পাঁচশত বৎসরের বৈষ্ণব পদাবলী — ড. বিমানবিহারী মজুমদার

৬. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) — শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং)

৭. বৈষ্ণব পদাবলী — ড. উমা রায়-সম্পাদিত

৮. বৈষ্ণব রসপ্রকাশ — ক্ষুদিরাম দাস

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত

১০. বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গ — দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. চৈতন্যচরিতের উপাদান — বিমানবিহারী মজুমদার

১২. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত — সুকুমার সেন-সম্পাদিত

১.৩.১৩.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের কয়েকজন পদকর্তার নাম লেখো ও তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ নির্দেশ করো।

৩. 'পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস' — আলোচনা করো।

৪. রোম্যান্টিক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা করো। প্রসঙ্গতঃ চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করো।

৫. বলরাম দাসের জীবন ও পদাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৬. চৈতন্যোত্তর কয়েকজন পদকর্তার নাম উল্লেখ করো এবং তাদের মধ্যে গোবিন্দ দাসের পদের বিষয়বস্তু ও কাব্যসৌন্দর্য্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার তুলনামূলক মূল্যায়ন করো।

৮. 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।' — কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৯. বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর পরিচয় দাও। বৈষ্ণবপদাবলী রচনায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে তাঁদের প্রভাব নির্ণয় করো।

১০. চণ্ডীদাস মিস্টিক কবি—আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

ইসলামী সাহিত্য (১৫শ - ১৮শ শতক)

বিন্যাস ক্রম

১.৪.১৪.১ ভূমিকা

১.৪.১৪.২ ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সীমা-সরহদ্দ

১.৪.১৪.৩ পঞ্চদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

- ১.৪.১৪.৩.১ শাহ মুহম্মদ সগীর
- ১.৪.১৪.৩.২ জৈনুদ্দিন
- ১.৪.১৪.৩.৩ মোজাম্মেল

১.৪.১৪.৪ ষোড়শ শতকে ইসলামী সাহিত্য

- ১.৪.১৪.৪.১ সাবিরিদ খান
- ১.৪.১৪.৪.২ দৌলত উদির বাহ্রাম খান
- ১.৪.১৪.৪.৩ দোনা গাজি চৌধুরী
- ১.৪.১৪.৪.৪ শেখ পরাণ
- ১.৪.১৪.৪.৫ আফজল আলি
- ১.৪.১৪.৪.৬ শেখ চান্দ
- ১.৪.১৪.৪.৭ শেখ ফয়জুল্লা
- ১.৪.১৪.৪.৮ শেখ কবীর

১.৪.১৪.৫ সপ্তদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

- ১.৪.১৪.৫.১ দৌলত কাজী
- ১.৪.১৪.৫.২ সৈয়দ আলাওল
- ১.৪.১৪.৫.৩ কোরেশী মাগন ঠাকুর
- ১.৪.১৪.৫.৪ সৈয়দ সুলতান
- ১.৪.১৪.৫.৫ মুহম্মদ খান
- ১.৪.১৪.৫.৬ আবদুল হাকিম
- ১.৪.১৪.৫.৭ নসরুল্লাহ খান
- ১.৪.১৪.৫.৮ শেখ সেরবাজ চৌধুরী

১.৪.১৪.৬ অষ্টাদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

১.৪.১৪.৬.১ ফকীর গরীবুল্লাহ

১.৪.১৪.৬.২ সৈয়দ হামজা

১.৪.১৪.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৪.১৪.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৪.১ : ভূমিকা

হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে বহিরাগত হিসেবে প্রবেশ করেছিল ইসলাম ধর্ম এবং তার অনুসারকরা। অবশ্য সূচনাতেই মুসলমানরা এদেশে শাসক-শক্তি হিসেবে দেখা দেয়নি। ইংরেজদের মতো তারাও ছিল নিছক বণিক জাতি। তারপর সুযোগ বুঝে করায়ত্ত করে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে মুহম্মদ ঘোরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আর তার দশ বছর পরেই বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে সমগ্র বঙ্গদেশকে নিজের মুঠেয় আনতে সক্ষম হন। সূচনা হয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের নতুন এক যুগের - যার নাম মধ্যযুগ। বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়ে আছে যে বাহ্য লক্ষণের দ্বারা, সেটি এক কথায় ইসলামী শাসন। এই সময়ে ভূমিষ্ঠ নেওয়া সাহিত্য স্বভাবতঃই চেহারা ও চরিত্রে এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের তুলনায় ভিন্ন। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের শুভারম্ভ হয় এই সময়েই। এ সাহিত্যের স্রষ্টারা সবাই মুসলমান ছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। অথচ এ বঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-নির্মাতারা এই ইসলামী সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ বোধ করেননি। তাঁদের রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাত-অখ্যাত হিন্দু কবিরাই শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ জুড়ে রয়েছেন। সেইসব উপেক্ষিত কবিদের শক্তিশালী রচনাকর্মের সঙ্গে পাঠার্থীদের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের আয়োজন।

১.৪.১৪.২ : ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সীমা-সরহদ্দ

আগেই বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ শতকের আগে সূর তথা আরবীয় বণিকদের বাংলার নৌবন্দরগুলিতে ব্যবসাসূত্রে উপস্থিতি ঘটলেও ১২০৩ সালে তুর্কিবিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ত করে ইসলাম-বিশ্বাসীরা। প্রথম পর্বে তাদের ভাবমূর্তি হিন্দু-বৌদ্ধ জনসাধারণকে আতঙ্কিত করে তোলে। 'হয় ইসলাম বরণ, নতুবা মৃত্যু' - এই প্রবল পরধর্মদ্বেষী নীতির আশ্রয়ে তারা এদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দলে দলে মুসলমান বানিয়েছিল। অবশ্য কেবল তলোয়ারের জোর নয়, বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণও সে সময় বজায় ছিল। যেমন —

১। উচ্চবর্ণের হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে অন্ত্যজদের মুক্তিলাভের ইচ্ছা

২। ইসলামের আপাত শ্রেণীবিভেদহীন সমাজের প্রতি আগ্রহ

৩। পীর ফকির সূফী সাধকদের অলৌকিক কেরামতি ও দিব্যজীবনের অনুপ্রেরণা

৪। রাজকীয় পদপ্রাপ্তি ও সেইসূত্রে অর্থনৈতিক সুবিধালাভের আকাঙ্ক্ষা

৫। যাবনিক সংসর্গে কূর্মবৃত্তিপরায়ন হিন্দু সমাজের বহিষ্কার নীতি

যাঁরা সেদিন রাতারাতি ধর্ম পাল্টে ফেলেছিল, বলাবাহুল্য, তাঁরা কোনদিনই মুসলমান সমাজে 'খানদানি' বলে বিবেচিত হননি। এঁরা 'আজলফ' বা বড়জোর 'আতরফ' হতে পারতেন। কোনদিন 'আসরফ' নয়। বর্তমানে এবঙ্গে ও ও-বঙ্গে যে বিপুল পরিমাণ বাঙলাভাষী মুসলমান দেখতে পাওয়া যায়, এঁদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন এইসব ধর্মান্তরিতরা। বলাবাহুল্য এঁদের সংস্কৃতি অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির ছিল। সেজন্য তাঁদের চরিত্রে দোলাচলতটা ছিল সবচেয়ে বেশি। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ধর্মান্তরিত বাংলাভাষী মুসলমানরাই একদা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাবতীয় দোভাষী পুথির বেশিরভাগই এঁদের সৃষ্টি। এঁদের মাতৃভাষা সন্দেহাতীতভাবে বাংলা, যদিও পৈতৃক আভিজাত্য রক্ষার জন্য শাস্ত্রভাষা আরবি ও প্রশাসনিক ভাষা ফারসি শেখায় এঁরা কম আগ্রহ দেখাননি। তবে মাতৃভাষা বাংলার জন্য তাঁদের যে আলাদা দরদ ছিল তার লিখিত প্রমাণ আছে। কবি আবদুল হাকিম বাংলাভাষা-বিদ্বেষী উন্নাসিকদেরকে কঠোর আক্রমণ করে বলেছিলেন —

"যে সব বঙ্গেও জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াত্র।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে না জাএ।।"

এইসব দেশীভাষা-অভিমানীদের নিরন্তর লেখনী চালনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রচুর আরবী-ফারসীর অন্তর্ভুক্তিতে বাংলা শব্দভাণ্ডারের আয়তনও স্ফীত হয়ে উঠেছিল। এঁদের অধিকাংশ রচনাই ছিল অনুবাদধর্মী। আর অনুবাদক কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী তমদ্দুনের বিস্তৃতিসাধন। তার সঙ্গে তাঁরা ভাষার প্রশ্নকে কোনও ভাবেই জড়িয়ে ফেলেননি। আসলে তাঁরা জানতেন, পারস্য সংস্কৃতির রসে নিজেদের মনের শেকড়কে ভেজাতে গেলে এবং পাক আচরণধারাকে সর্বস্তরের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করতে গেলে মাতৃভাষা বাংলাই হল সেরা মাধ্যম। অন্যদিকে শিক্ষিত খানদানি মুসুলমানরাও চাইছিলেন দেশীয় ভাষায় ইরান ও পারস্যের প্রণয় কিস্‌সাগুলো রূপান্তরিত হোক। শক্ত হয়ে উঠুক পারস্য-সংস্কৃতির ভিত। এজন্য দেখা যায়, সতেরো, শতকে রাজসভা-সংশ্লিষ্ট উজির, সচিব, সিপাহসালাররা বাঙালি মুসলমান কবিদের নির্দেশ দিয়ে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, পৃষ্ঠপোষণা করে লিখিয়ে নিচ্ছেন অসংখ্য প্রণয়কাব্য। এছাড়া ছিল মোল্লা কাজি মুয়াজিম-খোন্দকারদের প্রভাব। তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ থেকে না পাক সংস্কৃতির পুরোপুরি নির্বাসন। এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য থেকে নির্গত সাহিত্য

> *ত্রয়োদশ শতকের আগে সুর তথা আরবীয় বণিকদের বাংলার নৌবন্দর গুলিতে ব্যবসাসূত্রে উপস্থিতি ঘটলেও ১২০৩ সালে তুর্কি বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ত করে ইসলাম বিশ্বাসীরা। 'হয় ইসলাম বরণ, নতুবা মৃত্যু',- এই পরধর্মদ্বেষী নীতির আশ্রয়ে এদেশের সংখ্যা গুরু হিন্দুদের দলে দলে মুসলমান বানিয়েছিল। যাঁরা ধর্ম পাল্টে ছিলেন, তারা মুসলমান সমাজে 'খানদানি' বলে বিবেচিত হননি। এরা 'আজলফ' বা বড়জোর 'আতরফ' হতে পারতেন। কোন দিন 'আসরফ' নয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ধর্মান্তরিত বাংলাভাষী মুসলমানরাই একদা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশ রচনাই ছিল অনুবাদধর্মী। আর অনুবাদক কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী তমদ্দুনের বিস্তৃতি সাধন। সতেরো, শতকে রাজসভা-সংশ্লিষ্ট উজির, সচিব, সিপাহসালাররা বাঙালি মুসলমান কবিদের নির্দেশ দিয়ে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, পৃষ্ঠপোষণা করে লিখিয়ে নিচ্ছেন অসংখ্য প্রণয় কাব্য। এছাড়া ছিল মোল্লা কাজি মুয়াজিম-খোন্দকারদের প্রভাব। এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য থেকে নির্গত সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন রং ও রূপ নিয়ে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল।*

ভিন্ন ভিন্ন রং ও রূপ নিয়ে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল। খুব স্থূলাকারে তাদের বিভাজন এইরকম — (অ) প্রণয় আখ্যান কাব্যের ধারা ও (আ) ইসলাম ধর্ম বিষয়ক কাব্যের ধারা। প্রথম বিভাগটির আরো সূক্ষ্ম বিভাজন সম্ভব। যেমন — (ক) আরবী-ফারসী উৎসজাত প্রণয়-আখ্যান (খ) হিন্দী-অওধী-উর্দূ উৎসজাত প্রণয় আখ্যান। একইভাবে দ্বিতীয় বিভাগটিকেও বিভক্ত করা যায় কয়েকটি উপশাখায় । যথা (১) নবীবংশ জাতীয় গ্রন্থ (২) জঙ্গনামা শ্রেণীর গ্রন্থ (৩) দোভাষী পুথিসাহিত্য (৪) বিশুদ্ধ ইসলাম শাস্ত্রনির্ভর রচনা। পনেরো থেকে আঠারো শতক অব্দি সময়ের বিস্তারে উপরোক্ত ধারাগুলি অবলম্বন করে প্রচুর রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন কবি হয়তো একটি মাত্র রচনাতেই সীমিত থেকেছেন, আবার কেউ কেউ ৫/৭টি লেখাও লিখেছেন। একাধিক কাব্যের রচয়িতারা সবক্ষেত্রে আবার একই ধারার মধ্যেও অবস্থান করেননি। অতএব আলাদা করে ধারা ধরে বিচার না করে শতক অন্তর্বর্তী কবি ধরে আলোচনা করা বেশি যুক্তিযুক্ত। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান কবিদের অবদানের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা।

প্রশ্ন :

১। তুর্কী আক্রমণ কখন ঘটেছিল ?

২। সতেরো শতকে অসংখ্য প্রণয় কাব্য লেখার কারণ কি ?

১.৪.১৪.৩ : পঞ্চদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রমাণ সূত্রে মনে হয় বঙ্গে বাঙালী মুসলমান কবিদের প্রথম অভ্যুদয় ঘটে পঞ্চদশ শতকেই। তবে এই শতাব্দীতে ব্যাপক হারে মুসলিম কবিদের দেখা মেলে না। এমনটা হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক। কারণ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রথমাবধি শিক্ষাদীক্ষার অভাব ছিল যথেষ্ট। এমনই প্রতিভাদৈন্যের দিনে পনেরো শতকে মাত্র তিনজন মুসলমান কবির আর্বিভাব হয়েছিল বলে দাবি করেছেন 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-এর লেখক ডঃ এনামুল হক। এই তিন কবি হলেন— শাহ্ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দিন ও মোজাম্মেল। শেষোক্ত জনের আর্বিভাব কাল নিয়ে অবশ্য অন্য অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

১.৪.১৪.৩.১ : শাহ্ মুহম্মদ সগীর

এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শাহ্ মহম্মদ সগীরই বাঙালি মুসুলমান কবিদের মধ্যে আদি কবি। তাঁর লেখা কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'য় সন তারিখ কিছু না পাওয়া গেলেও সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের নাম পাওয়া যায়, যিনি ১৩৮৯-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাহী তক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সগীরের কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের আদি নিদর্শন। সাহিত্যের এই ধারাটি হিন্দু কবিদের কাব্যচর্চার গতানুগতিক ছকের বাইরে ছিল। কেননা হিন্দু কবিরা এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। তাঁরা প্রেমকথাকেও প্রকাশ করছিলেন। ধর্মের কর্মের আড়ালে কিন্তু মুসলমান কবিরা এগিয়ে এলেন ভিন্ন একটি মনোভঙ্গি নিয়ে। তাঁরা নরনারীর কামনা বাসনাকে ব্যক্ত করলেন প্রখর বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই। এজন্য মুসলমান কবি-রচিত বাংলা রোমান্স কাব্যের ধারাকে মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত হিসেবে অনেকে গণ্য করেছেন। এ ধারায় রচিত সাহিত্য পূর্বাগত সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার

বিসর্জন দিয়ে নির্ভেজাল মানুষকেই তার উপজীব্য করে তুললো। বস্তুতঃ আচারবাদী ধর্মকে সম্পূর্ণতঃ একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল মানবাশ্রিত কাব্য রচনার নজির গড়তে পারলেন মুসলিম কবিরা। এর পিছনে ইসলামের ভূমিচারী দৃষ্টির ও সূফীধর্মের আত্যন্তিক মানবপ্রীতির সদর্থক ভূমিকা ছিল। শাহ্ মুহম্মদ সগীর এই পথের অগ্রপথিক।

ইউসুফ-জোলেখার কাহিনীটি কবির নিজস্ব নয়। এর উৎস হল পবিত্র কোরাণসরীফ। ঐ ধর্মগ্রন্থের 'সুরা ইউসুফ' অধ্যায়ে মোট ১১১ টি আয়াতে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন সগীর কোরাণের বাইরে ইমাম গজ্জালীর লেখা তফসীর বা ব্যাখাপুস্তকের দ্বারাও তাঁর কাব্যরচনায় প্রভাবিত হন। অবশ্য তফসীরের তুলনায় সগীরের বর্ণনা বর্ণাঢ্য, পল্লবিত, নাটকীয় পারম্পর্যযুক্ত এবং আবেগতপ্ত। সগীর উৎস থেকে ঋণ নিয়েও নিজস্বতা দেখিয়েছিলেন আখ্যানে। একটি আস্ত স্বকপোলকল্পিত কাহিনী গল্পের শেষাংশে জুড়ে দিয়েছিলেন। সেটি হল ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ শাহাবালের কন্যা বিধুপ্রভার প্রণয়বৃত্তান্ত।

সগীর-বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম ঃ তাউমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখা। বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে তিনি একদিন স্বপ্নদর্শনে কোন এক রূপবান পুরুষের প্রতি আসক্তি বোধ করেন। কিন্তু জোলেখার সঙ্গে আজিজ মিশরের বিবাহ হলে সেই স্বপ্নে দেখা পুরুষকে না পেয়ে জোলেখা হতাশ হয়ে পড়েন। এদিকে বৈমাত্রেয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইউসুফ গৃহহারা হয়। এক বণিক তাম্রমুদ্রার বদলে তাকে বিক্রি করে দেয়। নীল নদীর জলে ইউসুফ স্নান করলে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। জোলেখা এই অপূর্ব রূপবান যুবককে দেখে মূর্চ্ছা যান এবং পরে ধনরত্ন দিয়ে ইউসুফকে কিনে অন্তঃপুরে রেখে দেন। এরপরেই রয়েছে বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তাঁর ঘটাপূর্ণ বিবাহ ও বাসর যাপনের বর্ণনা। উৎসবের বাইরে কখনো কখনো পা রেখেছেন সগীর। কোরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেও সগীর গল্পটিকে মূলতঃ মানবীয় প্রেমোপাখ্যানের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। কাব্যটাতে প্রেমের যে কিস্‌সা অনুসরণ করা হয়েছে তার প্রকৃতি রূপজ। জোলেখার ভালবাসা সম্পূর্ণ দেহগত। স্বামীর নপুংসকত্ব তার অতৃপ্ত জৈবিক কামনা-বহ্নিকে শতশিখায় উদ্দীপ্ত করেছে। অন্যদিকে ইউসুফকে নীতিধর্মের শুষ্ক কাষ্ঠপুত্তলিকা বলে মনে হয়। তাঁর হৃদয়ে প্রেমজ কোন আসক্তি নেই, নেই কোন দ্বন্দ্বও। সমস্ত কাব্যটিতে স্বপ্নের যেন বন্যা বয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখেছেন ইউসুফ, জোলেখা, বণিক মিশররাজ, ইবিন আমিন ও বিধুপ্রভা। কাব্যের মধ্যে রয়েছে ছয়-সাতটি দৈববাণীও। এতে কাহিনীর রস তরল হলেও কবির রোমান্স সুলভ খেয়ালি কল্পনা ডানা মেলে ওড়ার সুযোগ পেয়েছে।

> ***বাঙালি মুসলমান কবিদের অভ্যুদয় ঘটে পঞ্চদশ শতকেই। পনেরো শতকে মাত্র তিনজন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়েছিল। এই তিন কবি হলেন—শাহ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দিন ও মোজাম্মেল। শাহ মহম্মদ সগীরই বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে আদি কবি। তাঁর লেখা কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'। মুসলমান কবি-রচিত বাংলা রোমান্স কাব্যের ধারাকে মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত হিসেবে অনেকে গণ্য করেছেন। কবিরা নরনারীর কামনা বাসনাকে ব্যক্ত করলেন প্রখর বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই। এর পিছনে ইসলামের ভূমিচারী দৃষ্টির ও সূফীধর্মের আত্যন্তিক মানবপ্রীতির সদর্থক ভূমিকা ছিল। ইউসুফ-জোলেখার কাহিনীটি কবির নিজস্ব নয়। এর উৎস হল পবিত্র কোরাণ সরীফ। জোলেখার যৌবন প্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তার বিবাহ ও বাসর যাপনের বর্ণনা মানবীয় আকারে সীমাবদ্ধ। কাব্যটিতে বণিক মিশররাজ, ইবিন আমিন ও বিধুপ্রভার চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।***

প্রশ্ন :

১। শাহ্ মুহম্মদ সগীর কোন সময়ের কবি ছিলেন? কাব্যটির নাম কি?

২। পঞ্চদশ শতকের তিনজন মুসলিম কবির নাম লেখ?

১.৪.১৪.৩.২ : জৈনুদ্দিন

এঁর কাব্যের নাম 'রসুলবিজয়'। কাব্যটি সম্ভবত ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবির বাসস্থান কোথায় জানা যায়নি। এঁর কাব্যে গৌড়ের সুলতান য়ুসুফ শাহের প্রশংসা আছে। সম্ভবত ইনি কবিকে পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছিলেন। কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন অভিজাত সিদ্দিকি বংশের সন্তান নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা সম্ভবতঃ এ কাব্য রচনায় প্রণোদিত করে। কবির উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যগর্বী মুসলমানদের মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তিরস সঞ্চারিত করা। কাব্যটি মুখ্যত রসুল উল্লাহ্ হজরত মহম্মদের জীবনকাহিনী হলেও কাব্যের বিষয় বস্তুতে গতি সঞ্চার করেছে একটি বিশেষ যুদ্ধকাহিনী। যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়েছে রসুলের সঙ্গে ইরাকাধিপতি জয়কুমের। ফারসী ও উর্দূতে ও ধরণের যুদ্ধের বিবরণ অনেক মেলে। কবি জৈনুদ্দিন হয়তো তেমন কোন বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কাফেরদের যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা এই ধরনের যুদ্ধাভিযানের মূল লক্ষ্য। অবশ্য কাব্যটিতে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যতা সব সাহিত্যবেত্তা পন্ডিত স্বীকার করেননি। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সংযোগসূত্রে এসেছে হজরত ওমর, ওসমান, আবু বকর, আলী ও হাসান, হোসেন, খলিফা প্রমুখ বীরদের ইতিবৃত্ত। কবি যুদ্ধক্ষেত্রের জমজমাট বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে ফুটে উঠেছে ইসলামের বীরপুরুষদের বীরত্বব্যঞ্জক আচার-আচরণ। সবশেষে দেখানো হয়েছে দয়ার সাগর হজরত মহম্মদের কাছে বহু বিধর্মীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ছবি। বোধহয় জৈনুদ্দিনের এই কাব্যগ্রন্থটি ছিল রসুলচরিত ও জঙ্গনামাধর্মী রচনাসম্ভারের প্রাচীনতম নিদর্শন।

> ***জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়'। কাব্যটি সম্ভবত ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবির উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যগর্বী মুসলমানদের মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তিরস সঞ্চারিতকরা। কাব্যটি মুখ্যত রসুল উল্লাহ হজরত মহম্মদের জীবন কাহিনী হলেও কাব্যের বিষয়বস্তুতে গতি সঞ্চার করেছে একটি বিশেষ যুদ্ধকাহিনী। সবশেষে দেখানো হয়েছে দয়ার সাগর হজরত মহম্মদের কাছে বহু বিধর্মীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ছবি।***

১.৪.১৪.৩.৩ : মোজাম্মেল

এই কবির আর্বিভাব কাল নিয়ে সংশয় আছে। কেউ কেউ মনে করেন ইনি ষোড়শ শতকের কবি। কিন্তু ডঃ এনামূল হক এর কাব্যের ভাষার প্রাচীনত্ব দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে পনের শতকের গন্ডিতেই এঁর আর্বিভাব। এঁর নামে তিনটি পুথি মিলেছে — নীতিশাস্ত্রবার্তা, সায়াৎনামা ও খঞ্জনচরিত্র। প্রথম বইটি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে তার প্রসঙ্গ এখানে আছে। যেমন চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের বৃত্তান্ত, স্বপ্নবৃত্তান্ত, তার সুফল-কুফলের কথা, মানবজীবনে মঙ্গলামঙ্গলের প্রসঙ্গ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বইটি সূফীতত্ত্ব বিষয়ক। কবি নিজে ছিলেন ঐ মতাদর্শে বিশ্বাসী। কবি আরবী থেকে এটি অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য সূফীতত্ত্বের পাশাপাশি এখানে ঠাঁই পেয়েছে তৎকালীন দেশীয় সংস্কার ও সমস্যা। কাব্যটিতে পীর বদরুদ্দিন আলমের প্রশস্তি আছে, যাঁর কাছে কবি

> ***ডঃ এনামূল হক মোজাম্মেলের কাব্যের ভাষার প্রাচীনত্ব দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে পনের শতকের গন্ডিতেই এর আর্বিভাব। কবির তিনটি পুঁথি পাওয়া যায়, সেগুলি হল-নীতিশাস্ত্রবার্তা৷ সায়াৎনামা ও খঞ্জনচরিত্র। নীতি শাস্ত্রবার্তাতে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের বৃত্তান্ত, স্বপ্নবৃত্তান্ত, তার সুফল-কুফলের কথা আছে। সায়ৎনামাতে সূফীতত্ত্ব বিষয়ক বর্ণনা আছে। কাব্যটিতে পীর বদরুদ্দিন আলমের প্রশস্তি আছে, যাঁর কাছে কবি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।***

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর খঞ্জনচরিত্র সায়াৎনামা কাব্যেরই একটা অংশ মাত্র। অল্প কয়েকটি পাতাতে এটি সমাপ্ত।

প্রশ্ন :

১। জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম কি? কাব্যটি কত খ্রীঃ রচিত হয়?
২। মোজাম্মেলের তিনটি পুঁথির নাম কি?

১.৪.১৪.৪ : ষোড়শ শতকে ইসলামী সাহিত্য

ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই দ্বিতীয় শতকটি কেবল বিকাশ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত নয়, একই সঙ্গে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবারও পর্ব। আগের শতকে যেসব সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছে তারা আরো ডালপালা মেলে দিলো এই সময়ে। হিন্দু কবিদের কাব্যদর্শনও এইসময় অনুসৃত হতে থাকে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের জীবনচরিত ও কাফের দমন কাহিনী ঢালাই করা হয়েছিল নাকি হরিবংশ পাণ্ডববিজয়ের ছাঁচে। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসরা সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্য ছিল ফারসী-জানা বাঙালি মুসলমান কবিদেরও। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় নসরুল্লাহ খানের এই বিবৃতিতে ঃ "তে কাজে ফারসী ভাঙি কৈলুম হিন্দুয়ানী। / বুঝিবারে বাঙালে সে কিতাবের বাণী।।" হিন্দুর মূর্তি-নির্ভর দেববাদ ও আচার আচরণের যে সূক্ষ্ম প্রভাব তখনো পর্যন্ত ধর্মান্তরিত তথা লৌকিক ইসলামের অন্ধ বিশ্বাস সংস্কারে টিকে ছিল, তাকে বিনাশ করতে না পারলে যে নৈষ্ঠিক ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অসম্ভব এটা মুসলমান সমাজপতিরা বুঝেছিলেন। এজন্য দেখা যায়, বিশেষ একটা সময়ের পর তোহ্‌ফা কিংবা শরীয়তনামার মতো বিশুদ্ধ আচারমূলক গ্রন্থ অনুবাদ করা হচ্ছে। ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের পবিত্র জীবনের কথা সকলকে জানানোর উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে নবীবংশ বা রসুলচরিতের মতো বইও। বলাবাহুল্য, চৈতন্য ও অন্যান্য মহান্ত জীবনীর ধারাপথ বেয়ে এদের আর্বিভাব। ইসলামের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীগুলি 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। দোভাষী পুথিগুলিকে এক ধরণের যুদ্ধকাহিনীর সন্ধান মেলে। যার মূল উপজীব্য ঃ হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে মুসলিম পীর-গাজী-পয়গম্বরদের যুদ্ধ। সেই কল্পিত যুদ্ধে পরোক্তরাই জয়ী। কারণটি সহজেই অনুমেয়। জঙ্গনামার লেখকরা চেয়েছিলেন, না পাক সংস্কৃতির অভ্যন্তরের অশুচিতাকে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসীদের সত্যধর্মে অনুপ্রাণিত করতে। তাঁদের সেই উদ্দেশ্য কতকাংশে সফলও হয়েছিল। যাইহোক, এই প্রেক্ষাপট টুকুকে পেছনে রেখে এখন ষোড়শ শতকের কবিদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

> *ইসলামী সাহিত্য চর্চার ষোড়শ শতকটি কেবল বিকাশ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত নয়, একইসঙ্গে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবারও পর্ব। ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের পবিত্র জীবনের কথা সকলকে জানানোর উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে নবীবংশ বা রসুলচরিতের মতো বইও। ইসলামের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীগুলি 'জঙ্গ নামা' নামে পরিচিত। সাবিরিদ খান ষোড়শ শতকের কবি, তাঁর কাব্যটির নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। সাহিত্য ইতিহাসকারদের মতে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠকের রসস্বাদনের জন্য ষোড়শ শতক থেকে কবিরা চৌর পঞ্চাশিকার অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। সাবিরিদের রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীটিকে সর্বতোভাবে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে মর্ত্যজীবনের গল্প হিসেবে পরিবেশন করা। 'বিদ্যাসুন্দর ছাড়া সাবিরিদ আরো দুটি কাব্য লেখেন—'রসুল বিজয়' এবং 'হানিফা ও কয়রাপরী' 'রসুল বিজয়ে' হজরত মহম্মদের ধর্মীয় বিজয়াভিযানের কাহিনী। আর 'হানিফা ও কয়রাপরীতে' মেলে রোমান্টিক ভাবের এক উদ্দীপনাময় সাহিত্য রূপায়ণ।*

১.৪.১৪.৪.১ : সাবিরিদ খান

এ কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারা যায়নি। এঁর লেখা পুথি পাওয়া গিয়েছে চট্টগ্রামে। সেই সুবাদে অনেকে মনে করেন ইনি চট্টগ্রামের লোক। কবিপ্রদত্ত আত্মবিবরণীতে 'জি ঠাকুর' শব্দটির উল্লেখে মনে হয় তাঁর পূর্বপুরুষ উচ্চ কুলোদ্ভব হিন্দুই ছিলেন। তাঁর লেখা কাব্যটির নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। সংস্কৃত চৌর-পঞ্চাশিকার সূত্রে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনী ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। নব্য ভারতীয় ভাষাতে তো বটেই, উর্দূ ও ফারসীতে কোন কোন মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কথা অনুবাদ করেছিলেন। সাহিত্য ইতিহাসিকদের মতে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠকের রসাস্বাদনের জন্য ষোড়শ শতক থেকে কবিরা চৌর পঞ্চাশিকার অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। এ ধারার প্রথম হিন্দু কবি দ্বিজ শ্রীধর ও একমাত্র মুসলমান কবি সাবিরিদ খান দুজনেই ষোড়শ শতকে আর্বিভূত হন। সাবিরিদের রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীটিকে সর্বতোভাবে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে মর্ত্যজীবনের গল্প হিসাবে পরিবেষণ করা। হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর পৃথক ধর্মীয় পরিচিতির কারণে। গ্রন্থ সূচনায় সাবিরিদ যে স্বরচিত শ্লোক যোজনা করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, তিনি কালিকামঙ্গলের গল্পের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানটির যোগাযোগ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তবুও প্রচলিত সাহিত্যধারাকে তেমন আমল দেননি। বরং বিদ্যা ও সুন্দরের গল্পে বাস্তব নরনারীর প্রতপ্ত দেহবাসনার যে বর্ণময় আলিম্পন দেখেছিলেন তার প্রতি শিল্পগত দিক থেকে আকৃষ্ট হয়ে এ ধরণের কাহিনী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কাব্যটির ভাষায় কিছু প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। কবি রচনাটিকে নাটগীত হিসেবেই লিখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কবিত্বের উপযোগী ছন্দ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাও কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছে। কাব্যের বহু স্থলে রয়েছে বহু পঠনজাত পন্ডিত্যের ছাপ। নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবি যে চমৎকার কবিত্বের দীপ্তি ফুটিয়েছেন তাতে অলংকার শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রমাণ হয়। সাহিত্য ঐতিহাসিকদের মতে, বিদ্যাসুন্দর ছাড়া সাবিরিদ আরো দুটি কাব্য লেখেন— 'রসুল বিজয়' এবং 'হানিফা ও কয়রাপরী'। রসুল বিজয়ে আছে হজরত মুহম্মদের ধর্মীয় বিজয়াভিযানের কাহিনী। আর হানিফা ও কয়রাপরীতে মেলে রোমান্টিক ভাবের এক উদ্দীপনাময় সাহিত্য-রূপায়ণ। হানিফা চরিত্রটি ঐতিহাসিক। ইনি হজরত আলির পুত্র। এ কবির কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, সাহিরামের কন্যা বীর্যবতী জৈগুণকে পরাজিত করে হানিফা তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন। এরপর শুরু হয় হানিফার দ্বিগ্বিজয়। হানিফার রূপ ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হন শাহাপরীর কন্যা কয়রা। হানিফার সঙ্গে মিলনের প্রচন্ড স্পৃহায় কয়রা হানিফাকে অপহরণ করেন এবং মিলিত হন।

প্রশ্ন :

১। সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম কি?
২। নবীবংশ বা রসুলচরিতের মতো বই কেন লেখা হয়?

১.৪.১৪.৪.২ : দৌলত উদির বাহ্রাম খান

ইনি চট্টগ্রামের মানুষ ছিলেন। দৌলতের পূর্বপুরুষ হামিদ খান ছিলেন গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রধান সচিব। এনামূল হকের মতে, বাহরমে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ সুরের কাছ থেকে 'দৌলত উজির', উপাধি পেয়েছিলেন। 'লায়লী-মজনু' কাব্যটি লেখেন ১৫৬০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এ কাহিনীর

উৎস আরবের লোকগাথাতে প্রথম মেলে। পনেরো শতকের শেষ দিকে পারস্যের কবি আবদুর রহমান জামীও লায়লা মজনুর আখ্যান লিখেছিলেন। বাহরামের আশ্রয় অবশ্য নিজাম গঞ্জভীর কাব্য ঘমসহ্। মূলের সঙ্গে দৌলত উজিরের লেখায় অল্প কিছু পার্থক্য আছে ঘটনা ও চরিত্রে। বস্তুত লায়লা ও মজনুর অমর প্রেমকাহিনী পৃথিবীর সেরা প্রণয় আখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম। গল্পটি অচরিতার্থ বাসনার কাহিনী হিসেবে প্রসিদ্ধ। রূপবতী লায়লাকে পাঠশালে দেখে আমীরের পুত্র কয়েস ভীষণভাবে তার রূপমুগ্ধ হয়ে পড়ে। লায়লীও কয়েসের প্রতি আসক্ত হয়। গোপনে তারা মিলিত হয়। তাদের মধ্যে প্রণয় প্রগাঢ় হয়ে উঠলেও পরিণয়ের পথে বাধা আসে অভিভাবকদের কাছ থেকে। মিলনের সহজ পথ রুদ্ধ হলে কয়েস ছদ্মবেশ নেয়। এবার সেখানেও বাধা উপস্থিত হলে প্রেমে পাগল হয়ে যায় কয়েস। তার আশ্রয় নজদ বন, একমাত্র ধ্যান লায়লী। প্রেম উন্মত্ত এই পুরুষই 'মজনু' নামে কথিত। অন্যদিকে লায়লীও প্রেমিকের বিচ্ছেদে দুঃখকাতর। তার পিতা অন্যত্র বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু লায়লী মজনু ভিন্ন অন্য পুরুষকে বিবাহ করে দ্বিচারিণী হতে পারবে না। তবু জোর করে অন্যত্র তাকে বিবাহ দেওয়া হলো। কিন্তু সে কিছুতেই স্বামী গ্রহণ করতে পারলো না। কিছুকাল পরে লায়লীর পিতা সপরিবারে শ্যামদেশে রওনা হলেন। নজদ বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লায়লী গিয়ে মজনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। বিবাহের প্রস্তাব করলেও মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দিল। কেননা সে প্রেমে মজেছিল বটে কিন্তু ধর্ম ও সমাজকে বিস্মৃত হয়নি। অতঃপর প্রত্যাখ্যাত লায়লী বিরহের আগুনে পুড়তে পুড়তে জীবনের সমাপ্তি লগ্নে পৌঁছে যায়। হেমন্তে ঝরে পড়ে লায়লীর জীবন। সেই মৃত্যুসংবাদ বহন করে মজনুর কাছে নিয়ে আসে লায়লীর মা, মজনু ঘ্রাণ দিয়ে চিনে নেয় লায়লীর কবর। তারপর প্রচন্ড শোকে মুহ্যমান মজনু বিলাপ করতে করতে সেখানে নিঃসাড় নিস্তব্ধ হয়। জগতের অন্যতম সেরা প্রেমকাহিনীর এই ট্র্যাজিক পরিণাম পাঠকচিত্তকে করুণ রসে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অবশ্য মজনুর মধ্যে doing-এর অনুপস্থিতি ও suffering-এর আধিক্য থাকায় অনেকেই একে আদর্শ ট্র্যাজিডি বলতে অনিচ্ছুক। কাব্যরচনায় এ কবির কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন গবেষক লিখেছেন, "দৌলত উজীর তাঁর কাব্যে অশ্লীল রস পরিবেশন করার সুযোগ লাভ করলেও সে সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। ফলে তাঁর কাব্যের সর্বত্রই সুরুচির পরিচয় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। কাব্যের ভাষা ব্যবহারে, উপমা, রূপক, জমক ইত্যাদি অলংকার প্রকরণে কাব্যকলার নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশ ছাড়াও রুচিসৌষ্ঠব ও সুস্থ চিন্তাচেতনার পরিচয়ে কাব্যখানি উজ্জ্বল। ভাষাপ্রয়োগে কবি সংস্কৃত ও ফারসীর মিলনকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার লালিত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি যেমন কবিমনের মুগ্ধতার আবেশ, তেমনি ফারসী ভাষার প্রতি নিবিড় অন্তরঙ্গতা।"

> ***দৌলত উদির বাহরাম খান ছিলেন চট্টগ্রামের মানুষ। এনামূল হকের মতে, বাহরমে ১৫৬০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে নিজম শাহ সুরের কাছ থেকে 'দৌলত উজির' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৫৬০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে 'লায়লা-মজনু' কাব্যটি লেখেন। এ কাহিনীর উৎস আরবের লোকগাথাতে প্রথম মেলে। বস্তুত লায়লা ও মজনুর অমর প্রেমকাহিনী পৃথিবীর সেরা প্রণয় আখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম।***

১.৪.১৪.৪.৩ : দোনা গাজি চৌধুরী

এঁর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। ইনিও একটি প্রখ্যাত প্রেমকথা নিয়ে কাব্য লিখেছেন, 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল'। এই দুই নায়ক নায়িকাকে নিয়ে নানা সময়ে একাধিক কাব্য লেখা হয়েছে। তবে দোনাগাজিই ছিলেন প্রথম কবি। তাঁর লেখা পুথিটি খন্ডিত ও কীটদষ্ট। কাহিনীটর আদি উৎস আরবী আলেফ-

লায়লা। ফারসী ভাষার এর কাহিনী লিখেছিলেন ভারতীয় কবি মহাফিল। দোনাগাজির আদর্শ ছিল হয়তো এই বই। মূল আখ্যানটি রূপকথাধর্মী। সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরকম ঃ মিশরের বাদশা সিফুয়ানের একমাত্র পুত্র সয়ফুলমুলুক। যে একদা পরীবালা বদিউজ্জমালের চিত্রপট দেখে তার রূপে বিভোর হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। আসক্তির গাঢ়তায় ক্রমে শাহজাদা উন্মত্ত প্রায় হয়ে ওঠে। রাজপুত্রের মনের কথা জানতো কেবল তার বাল্যবন্ধু উজির পুত্র সায়েদ। একদিন শাহজাদা স্বপ্নে পরী রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেল। অজানা রাজ্যের সন্ধানও মিললো; তারপর সয়ফুল বন্ধু সায়দকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। পথে বহু বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা, অবশেষে রাজকন্যা ও শাহজাদার মধুর মিলন। বন্ধু সায়েদের জীবনও আর সঙ্গিহীন রইলো না। সরন্দ্বীপের যে রাজকন্যা মালেকাকে সয়ফুল একদা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল তার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হল সায়েদ। কবি বর্ণনার ক্ষেত্রে fancy কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। নায়কের অনির্দ্দেশ্য অভিযাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অদ্ভুত প্রাণী অলৌকিক দেওপরীর সঙ্গে তার সংগ্রাম ও জয়লাভের ঘটনার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের রস আছে। নায়কের সমস্ত বিপদকে অক্লেশে বরণ সে কেবল প্রেমিকালাভের জন্য। রূপকথাসুলভ আঙ্গিক, ঘটনা সংস্থাপন কিংবা চরিত্র নির্মাণ কেবল এ কাব্যেই লক্ষ্য করা যায় না, মধুমালতী, গুলেবকাওলি চন্দ্রাবতী, হপ্ত পয়কর ইত্যাদিতে ও লভ্য। এসব কাব্যে প্রেমের চেহারা ও চরিত্র বাস্তবের মাটিঘেঁষা নয়। মধ্যযুগের সমস্ত সমাজের আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিরা সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের প্রেম-বিরহ মিলনের ছবি এঁকেছেন এ ধরণের কাব্যে। এইসব প্রেমকাহিনীর অধিকাংশ ভোক্তা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষজন। তাই এ প্রেমকে দরবারী, প্রেম বলে নির্দেশ করা বোধহয় অসঙ্গত নয়।

> *দোনা গাজি, চৌধুরী 'সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল' একটি প্রখ্যাত প্রেমকথা নিয়ে কাব্য লিখেছেন। কাহিনীটির আদি উৎস আরবী আলেফ-লায়লা। চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুন্ডের অধিবাসী ছিলেন শেখ পরান। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি 'নূরনামা' ও 'নসিহতনামা'। এখানে ধর্মীয় আচার-আচরণ সংক্রান্ত পরামর্শকেই নসিহত বলা হয়েছে।*

১.৪.১৪.৪.৪ : শেখ পরাণ

চট্টগ্রামের অর্ন্তগত সীতাকুন্ডের অধিবাসী ছিলেন শেখ পরাণ। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি — 'নূরনামা' ও 'নসিহতনামা'। কবির পুত্র শেখ মুত্তালিবের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী তাঁর গুণী পিতা সব মসায়েলকে একত্র করে প্রকাশ করেছিলেন। নূরনামা বিষয়ে ডঃ আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, বইটি 'কায়দানী খেতাবের অংশ'। এ গ্রন্থে ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত। 'রোজ-ই-আজল' অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় কথার ব্যাখা প্রসঙ্গে কবি 'নূর-ই-মহম্মদী'র সৃষ্টির কথা বলেছেন, যা থেকে অন্যান্য বিষয়ের আগমন। এই অংশে কবির ইসলামী শাস্ত্র বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ কবিত্বের তুলনায় ধর্মতত্ত্বের নীরস কচ্‌কচি এখানে গুরুত্ব পাওয়ায় রসজ্ঞ পাঠকের মন সেভাবে এ গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তাঁর আর গ্রন্থ নসিহতনামা কোন মৌলিক রচনা নয়, ভাবাশ্রয়ী অনুবাদ। 'নসিহত' শব্দের অর্থ পরামর্শ। এখানে ধর্মীয় আচার আচরণ সংক্রান্ত পরামর্শকেই নসিহত বলা হয়েছে। এ ধরণের গ্রন্থের অভাব বাংলা ভাষায় তখন যথেষ্ট ছিল, অথচ ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে এর প্রয়োজন ছিল ব্যাপক। সেজন্য ফারসী রচনার অনুবাদ করে এই পন্ডিত কবি বোধ হয় তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বইটিতে রয়েছে ওজুর প্রক্রিয়া বর্ণনা, নামাজের ফরজ, গোসলের ফরজ, চার কুর্সী, মজহারের বিবরণ, সপ্ত ইমাম প্রসঙ্গ ইত্যাদি। দুটি কাব্যেই কবি শেখ পরাণ যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করেছেন যা তাঁর ধর্মনিষ্ঠ ভাবমূর্তিটিকে আরো প্রগাঢ় করে তুলেছে।

১.৪.১৪.৪.৫ : আফজল আলি

নসিহতনামার আর একজন লেখক ছিলেন আফজল আলি। ইনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার অন্তর্গত মিলুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভঙ্গু ফকির। সুলতান নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের উল্লেখ সূত্রে মনে হয় কবি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তাঁর কাব্য লিখেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে সমকালের মুসলমান সমাজের নানা গর্হিত আচার আচরণের কথা তুলে ধরেছেন। কবি তামাকু ও গঞ্জিকাসেবনের সমালোচনা করে এইসব নেশাড়ুদের 'ইবলিসবাহন' বলে নিন্দা করেছেন। কাব্যের বিষয় উপস্থাপনে আফজল নতুন কৌশল গ্রহণে তৎপর। তিনি গুরু রুস্তমের মুখ দিয়ে স্বপ্নচ্ছলে ইসলামী তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এদিক থেকে এটি ধর্মোপদেশ মূলক গ্রন্থ এবং কবির দাবি, এর বাণীসমূহ কোরাণ ও হাদিস সমর্থিত।

> *নসিহতনামার আর একজন লেখক আফজল আলি। ইনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার অন্তর্গত মিলুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কবি তাঁর কাব্যে সমকালের মুসলমান সমাজের নানা গর্হিত আচার-আচরণের কথা তুলে ধরেছেন। ষোড়শ শতকের ইসলামী কবিদের মধ্যে শেখ চান্দ, শেখ ফয়জুল্লা ও শেখ কবীরের নামও উল্লেখযোগ্য।*

প্রশ্ন :

১। দৌলত উদির বাহরামখানের কাব্যটির নাম কি?
২। দোনা গাজি চৌধুরীর কাব্যটির নাম কি?
৩। শেখ পরাণের গ্রন্থের সংখ্যা কটি? কি কি?

১.৪.১৪.৪.৬ : শেখ চান্দ

আলোচ্য সময়েপর্বের একজন বিশিষ্ট কবি। এ কবির আর্বিভাব ও জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। ইনি বোধ হয় ত্রিপুরার লোক। কেননা তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মিলেছে ত্রিপুরা থেকে। এঁর গুরু ছিলেন শাহদৌলা পীর। এই গুরুর উপদেশ ও আর্শীবাদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি যাবতীয় কাব্য রচনা করেছিলেন। পুথির ভনিতা সূত্রে মনে হয় শেখ চান্দ মোট পাঁচটি কাব্যের রচয়িতা। এগুলি হল রসুলবিজয়, শাাহাদৌলা, তালিবনামা, কিয়ামতনামা ও হরগৌরী সংবাদ। রসুলবিজয়ে কবির আদর্শ ছিল আরবী পুস্তক 'কাসাস-উল-আম্বিয়া'র ফারসী অনুবাদ। পাঁচালির ঢঙে লেখা এই বইটিতে তিনি ইবলিসের শোক, তালেব নিধন, মুরিদের কথা ও সবেমেরাজ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে আদম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হজরত মহম্মদ পর্যন্ত মহাপুরুষদের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। আর রয়েছে হজরতের জীবনে সংঘটিত যুদ্ধ কাহিনীর বিবরণ। শাহদৌলা গ্রন্থটি কবির গুরুর জীবনচরিত। কাব্যটি অনেকটা প্রশ্নোত্তরধর্মী। ইসলামের জটিল তত্ত্ব নিয়ে শিষ্যের প্রশ্নের জবাবে গুরুর উপদেশবাক্য এ গ্রন্থের কায়ানির্মাণ করেছে। ধর্মপুস্তক হিসেবে এর মূল্য যথেষ্ট। আর তালিবনামা একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান। ষোড়শ শতকে বাংলা গদ্যের কী রূপ ছিল তার কিছু পরিচয় হাজির করেছে এ গ্রন্থ। যেমন — "মুর্শিদ কে? মিহ্তর আজরাঈল। তান মুর্শিদ কে? মিহ্তর ইসরাফী। তান মুর্শিদ কে? মিহতর জিবরাঈল।" তবে বইটিতে আগাগোড়া এই ঢঙ ব্যবহৃত হয়নি। কাব্যটির বিষয়বস্তু হল সুফীতত্ত্ব ও যোগতন্ত্র। মুর্শিদ-মুরিদের কথোপকথের কৌশল গৃহীত হওয়ায় এই দুই জটিল প্রসঙ্গ খুব সহজে উপস্থাপিত হতে পেরেছে। কবির শূন্যবাদ সম্ভবত হিন্দুদর্শন প্রভাবিত। ধর্মে মুসলমান হলেও শেখ চান্দ হিন্দুধর্মের অনেক তত্ত্বের সঙ্গে

পরিচিত ছিলেন। এটি বোঝা যায় তাঁর 'হরগৌরী সংবাদ' নামক রচনা থেকে। বইটি যোগতন্ত্রমূলক। সূচনায় কবি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সহ তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেছেন। বন্দনা করেছেন চন্দ্র, সূর্য, অষ্টলোকপাল, ব্যাস, বৃহস্পতি, মহামায়া, জাহ্নবী, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রমুখ দেবদেবীদের। পরে যোগেশ্বর শিব পার্বতীর কাছে যোগের নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেছেন।

১.৪.১৪.৪.৭ : শেখ ফয়জুল্লা

আমাদের আলোচ্য ষোড়শ শতকেই বাংলা সাহিত্যের অপর এক ধারার জন্ম হয়। সেটি নাথ সাহিত্যের ধারা। এটি বিশুদ্ধ যোপন্থার সঙ্গে যুক্ত। এই ধারাতে যেমন হিন্দু কবিদের দেখা মেলে, তেমনি মুসলমান কবিরাও কাব্য লিখেছেন। শেখ ফয়জুল্লা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নাথসাহিত্যের দুই ধারা - গোরক্ষনাথ কেন্দ্রিক কাহিনীবৃত্ত ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্রকেন্দ্রিক কাহিনীবৃত্ত। শেখ ফয়জুল্লা গোরক্ষবৃত্তের কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'গোরক্ষবিজয়'। নাথযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ হলেন গোরক্ষনাথ। যিনি চিত্ত সংযমের অভ্যাস দ্বারা তাঁর গুরু মীননাথকে আত্মবিস্মৃতি ও ভোগপঙ্কিল জীবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। শেখ ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত কাহিনীকেই অনুসরণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি লেখেন গাজিবিজয়, সত্যপীর, জয়নাথের চৌতিশা ও রাগনামা। গাজিবিজয়ের উপজীব্য রংপুরের খোঁটাদুয়ার এলাকার পীর ইসমাইল গাজির কীর্তিকলাপ। আর সত্যপীর লোকায়ত মুসলমান জনসমাজে আবির্ভূত নতুন দেবতা। ইনি নাকি এককালের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সত্যপীরের জননী হুসেন শাহের বাঁদীর গর্ভজাত বলে কথিত। সত্যপীর নিজস্ব সাধনায় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। ফয়জুল্লার গ্রন্থে সেইসব কাহিনীর পল্লবিত বর্ণনা আছে। আর জয়নাবের চৌতিশা শোককাব্য হিসেবেই লেখা হয়েছিল। মহরমের পরিচিত করুণ কাহিনীটি কবির অবলম্বন। এ রচনাটিতে জরিগানের প্রাচীন রূপটি প্রতক্ষ্য করা যায়।

১.৪.১৪.৪.৮ : শেখ কবীর

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বৈষ্ণব পদাবলী। মহাপ্রভুর ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে বৈষ্ণববাদ চৈতন্যোত্তর যুগে অন্য এক মাত্রা লাভ করেছিল। তবে বৈষ্ণব পদকর্তাদের তালিকায় কেবল হিন্দু কবিদের নাম পাওয়া যায় না, রয়েছেন বেশ কিছু মুসলমান কবিও। কারণ সূফী সাধনার সঙ্গে অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বৈষ্ণব সাধনার। ফলে অনেক সূফীপন্থী মুসলমানও বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এ ধরণের বৈষ্ণবভাবাপন্ন ৫০/৬০ জন মুসুলমান কবিকে মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদ রচনায় আত্মনিয়োজিত হতে দেখা যায়, যাঁদের রচনাসম্ভার সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। যাইহোক, এই ধরণের বৈষ্ণবপদ রচয়িতা যে মুসলমান কবি চৈতন্য-সমকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন শেখ কবীর। ইনি সম্ভবতঃ সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের শাসনামলে পদ রচনা করেছিলেন। হিন্দু বৈষ্ণব মহাজনদের সাহিত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শেখ কবীর পদ লিখলেও ঠিক কতটা ধর্মগত নিষ্ঠা তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে বলা কঠিন। উল্লেখ্য, যে কবীরের একটি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিনী'তে সংকলিত হয়েছে।

১.৪.১৪.৫ : সপ্তদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

সতেরো শতকে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের চর্চা নতুন মাত্রা পেয়ে যায় আরাকান রাজসভার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় । এর আগে মুসলমান কবিরা দরবারী মানুষজন কর্তৃক এতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই শতকে যাঁদের আর্বিভাব ঘটলো তাঁদের মধ্যে দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওল ছিলেন প্রকৃত কবিত্ব গুণসম্পন্ন স্রষ্টাপুরুষ। তাঁদের বিপুল পান্ডিত্য, অগাধ রসজ্ঞান এবং নিপুণ রচনাদক্ষতা অতি সহজে তাঁদেরকে সকলের মধ্যমণি করে তুলেছে। তাঁরাই হয়েছিলেন সতেরো ও আঠারো শতকের অন্যান্য কবিদের আদর্শ। এই দুই কবির কৃতিত্বকে উদ্দেশ্য করে একজন গবেষক লিখেছেন, "ধর্মের খোলস তখনও ছিল, কিন্তু প্রণয়গাথার মধ্য দিয়ে জীবনের মাধুর্য তখন ধর্মসম্বন্ধের বাইরে অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে। সাহিত্যের রূপ ও রস কবিত্বের শাশ্বত সৌন্দর্যের স্পর্শে আরো মধুময় হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্য আপন ভুবনে লীলায়িত তরঙ্গ ভঙ্গে বিকশিত হয়ে অপরূপ যৌবনশালী হওয়ার স্পর্ধা অর্জন করে। সপ্তদশ শতক তাই মুসলিম বাঙালী সাহিত্য-প্রতিভার অনন্য দানে মহিমান্বিত। মানবীয় প্রণয়গাথা ও অধ্যাত্ম প্রেমসাধনা - দুই ধারাই নন্দিত কীর্তি বিঘোষিত হয় এই শতকে।" দৌলত ও আলাওলের কবিকৃতি আলোচনার আগে আরাকানে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চার প্রেক্ষাপটটুকু একটু জেনে নেওয়া যাক।

আরাকান নিম্ন বর্মার একটি বিশিষ্ট প্রদেশ। গৌড়ের রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে এ রাজদরবারের অবস্থান। আরাকানের অধিবাসীরা 'মগ' নামে পরিচিত। আরাকানের পূর্বনাম ছিল রোসাঙ্গ। এখানে একদা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল, রাজারাও ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে অনেক আগে থাকতেই এই মুলুকে আরবী বণিকদের আগমণ ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে পনেরো শতকের প্রথমার্ধে আরাকানরাজ নরমিখ্ল গৌড়ের মুসলমান সুলতানের সহায়তায় পিতৃরাজ্য উদ্ধা র করার সূত্রে এ অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারের ব্যাপক অবকাশ তৈরী হয়ে যায়। রাজসভায় যাঁরা গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সেই উজির সেনাপতি-কোষাধ্যক্ষরা সবাই বাঙালী মুসুলমান। তাঁরা চাইতেন নিজেরে সংস্কৃতির প্রসার। মুসলমান সমাজে শিক্ষিত কবিপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল না তখন। তাঁদের ইচ্ছানুসারে সেইসব কবিরা আরবী-ফারসী বা ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রেমকাব্যগুলির অনুবাদে তৎপর হয়েছিলেন। দৌলত কিংবা আলাওল এইরকমই রাজসভার পৃষ্ঠপোষিত কবি, যাঁরা দরবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য প্রেমকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে তাঁদের লেখাগুলি নিছক আক্ষরিক অনুবাদ ছিল না, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বকীয়তার ছাপ ছিল। এঁদের অবলম্বিত কাহিনীতে মানবিক প্রেম, নরনারীর বাস্তব রূপসৌন্দর্য, প্রিয়তমাকে পাওয়ার জন্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, জীবনপণ লড়াই, পর্বতপ্রমাণ, বাধা অতিক্রম ইত্যাদি মোটিফ পৌনঃপুনিকভাবে আবৃত্ত হয়েছে। চিরাচরিত বাংলা সাহিত্যের চেনা প্রবাহের সঙ্গে এ ধারাকে একাসনে বসানো চলবে না কোনমতেই। এ রচনায় মানুষ উপস্থাপিত নিজস্ব মহিমায়। সে মানুষ হয়তো উঁচুবর্গের মানুষ, কিন্তু বিশুদ্ধ মানুষ, কোন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম কিংবা প্রচারলোভী দেবতার কার্যসিদ্ধির প্রতিনিধি নয় সে তার প্রেম-কাম-রিরংসা-ক্ষোভ-লোভ-মিলন-বিরহ-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই প্রত্যক্ষভাবে এখানে দৃশ্যমান। এ ধরনের কাব্যে প্রেমকেই কবিরা বেশি উজ্জ্বলতা দান করতে চেয়েছেন। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রেমের রূপায়ণ এই যে প্রথম হল তা নয়। কিন্তু পুরুষের প্রেমকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুসলমান কবিরাই প্রথম প্রতিষ্ঠা দিলেন। পুরুষের প্রেম সেখানে নিছক কামনা

সঞ্জাত নয়। বরং পুরুষ নারীর প্রেমলাভের জন্য চিরপিপাসিত। এই জাতীয় কাহিনীতে একটা অনুসন্ধান রয়ে গেছে প্রথমাবধি — সেটি কোন বাঞ্ছিতার অনুসন্ধান। বরবর্ণিনী নায়িকাকে পাবার অভিলাষে শুরু হয় নায়কের অভিযান। সে যাত্রার পথ বিচিত্র প্রতিবন্ধকতায় বিপদসঙ্কুল। তবুও অভিযাত্রী পুরুষের অদম্য মন ক্লান্ত হয় না। যেভাবেই হোক বাঞ্ছিতাকে লাভ করা তখন তার জীবন-মরণ পণ হয়ে থাকে। বাঞ্ছিতা- লাভের উদ্দেশ্যে সাহসী পুরুষের বিপদকে অগ্রাহ্য করে এ হেন দুরন্ত অভিযান ও শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করা এক অর্থে পুরুষের কঠোর সাধনাকে কি দ্যোতিত করছে না? এসব আখ্যানে পুরুষ পৌরষ দেখিয়েই নারীকে জয় করেছে, কোন ছলনা-প্রতারণা-বাক্‌পটুতা দেখায়নি কিংবা নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়নি। পুরুষের প্রেমের এই বলিষ্ঠ উন্নত শ্রদ্ধাযোগ্য মূর্তি নির্মাণ করা কেবল প্রণয় আখ্যানের রচয়িতা মুসলমান কবিদের পক্ষেই সম্ভব হল।

১.৪.১৪.৫.১ : দৌলত কাজী

সাহিত্যঐতিহাসিকদের মতে, দৌলত কাজী হলেন আরাকান রাজদরবারের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর লেখা কাব্য 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'সতী ময়না' বাংলা প্রণয় আখ্যানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। অনেকের মতে, এই কাব্যে সরাসরি মানবন্দনা প্রকাশ করে কবি বাংলা সাহিত্যের এতদিনকার গতানুগতিকতা ভঙ্গ করলেন। ধর্মের চৌহদ্দির বাইরে এই প্রথম বেরিয়ে এল মানুষ। কবি লিখলেন ঃ "নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।/নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।।" বাস্তব নরনারীর প্রণয়কথাকে এতখানি গুরত্ব দিয়েও আর কেউ পূর্বে গ্রন্থ রচনা করেননি, যা ভেঙে ফেলেছিল সেদিনের কাব্য অনুশাসনের শৃঙ্খল। গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নূতন জীবনচেতনার আদর্শ প্রতিষ্ঠার কারণে দৌলতের কাব্য দীর্ঘকাল ধরে আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচিত হবে।

কাব্যে কবি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভীষণই স্বল্পবাক্। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় তিনি চট্টগ্রামের রাউজানপুর থানার অন্তর্গত সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশ কাজী বংশ, যাঁরা মুসলমান সমাজে পান্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞানের কারণে খ্যাতিমান। তিনিও অল্প বয়সে নানা বিদ্যা অর্জন করেন এবং আরাকান রাজসভায় পরম সমাদরে গৃহীত হন। তাঁর সময়কালে আরাকানের রাজা ছিলেন থিরি-থু-ধম্মা বা শ্রীসুধর্মা। এঁর রাজসভাতেই বসে রাজ্যের প্রধান অমাত্য সুলেমানের নির্দেশে রচনা করেন 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'সতী ময়না কাব্য'। ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় কাব্যটি লিখিত হয়।

দৌলতের এই গ্রন্থটি মৌলিক রচনা বলে বিবেচিত হতে পারে না, যেহেতু এর কাহিনী ভাগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন দুটি উৎস থেকে। প্রথমাংশ লোরচন্দ্রাণীর আখ্যানের পিছনে ছিল মুল্লা দাউদের লেখা 'চান্দায়ন' আর শেষাংশ 'সতীময়না' লিখেছিলেন মিয়া সাধনের 'মৈনা সৎ' গ্রন্থের অনুসরণে। গল্প দুটি ভিন্ন ধর্মী হলেও নায়ক নায়িকার নামসাদৃশ্যে কবি আখ্যানদুটিকে চমৎকার ভাবে বুনে দিয়েছিলেন। এই দুই কবির যা ছিল নীতি ও রূপক প্রধান, দৌলত যথাসম্ভব সেগুলিকে পরিহার করে রক্তমাংসের নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেমকথা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কাব্যের আখ্যানটি সংক্ষেপে এইরকম ঃ গোহারীর রাজা মোহরার চন্দ্রাণী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিয়ে হয় এক নপুংসক বামুনের সঙ্গে। রতিবিমুখ সেই পুরুষকে মেনে নিতে পারে না রাজকন্যা চন্দ্রাণী। প্রতীক্ষায় থাকে অন্য কোন বলিষ্ঠ পুরুষের। এদিকে অন্য এক দেশের রাজা লোর ময়না নামক পত্নীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করে প্রাপ্তি অনুভব করায় স্ত্রী পরিত্যাগ করে বনবিহারে চলে যান। সেখানে

সাক্ষাৎ হয় এক যোগীর সঙ্গে, যাঁর কাছ থেকে লোর চন্দ্রাণীর ছবি দেখতে পান ও পূর্বোক্ত জীবনকথা জানতে পারেন। তখন লোরের মনে জেগে ওঠে চন্দ্রাণী লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং যোগীর সঙ্গে রওনা দেন গোহারীতে। কৌশলে লোর ও চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ হয়। দুইজনে পরষ্পরের রূপমুগ্ধ হন এবং প্রবল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মিলিত হন। বামন একথা জানতে পারলে তার পরিণাম ভালো হবে না ভেবে চন্দ্রাণী লোরকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। লোরও চন্দ্রাণীকে নিয়েই পালাতে উদ্যত হন। সমস্ত সংবাদ শুনে বামন চন্দ্রাণীর প্রতি অধিকারবোধে লোরের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন এবং যুদ্ধে প্রাণ দেন। নিষ্কন্টক হয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে অন্য দেশে যাবার সময় তিনবার সর্পদংশনে প্রাণ দেন চন্দ্রাণী। একজন যোগীর সহায়তায় তার প্রাণও সঞ্চারিত হয়। পরে মোহরা সংবাদ পেয়ে লোরের হাতেই কন্যা চন্দ্রাণীকে অর্পণ করলেন এবং তাঁর রাজ্য শাসনের ভার লোরের উপর অর্পণ করলেন। লোরের মন থেকে তাঁর প্রথমা পত্নী ময়নার স্মৃতি মুছে গেল ধীরে ধীরে। কিন্তু ময়না ভুলতে পারলেন না স্বামী লোরের কথা। পতিবিরহে দিন দিন তিনি রুগ্না ও বিষণ্ণা হয়ে পড়তে লাগলেন। এমন সময় তাঁর কাছে পরপুরুষের মিলন প্রস্তাব নিয়ে এল কুট্টিনী রত্না মালিনী। সে লম্পট রাজকুমার ছাতন প্রেরিত। কিন্তু আপন সতীত্ব গর্বে গর্বিত ময়না সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বিরহিণী ব্যথিতা নায়িকার বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন কবি দৌলত। অবশ্য মাত্র একমাসের বারমাস্যা রচনার পর দৌলতের অকালপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর কাব্যটি পরবর্তীকালে সমাপ্ত করেন এই রাজসভার অপর প্রখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল।

সতেরো শতকে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের চর্চা নতুন মাত্রা পেয়ে যায় আরাকান রাজসভার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শতকের দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল ছিলেন প্রকৃত কবিত্ব গুণসম্পন্ন স্রষ্টাপুরুষ। সপ্তদশ শতকে মানবীয় প্রণয়গাথা ও অধ্যাত্ম প্রেমসাধনা মুসলিম বাঙালি সাহিত্য-প্রতিভার অনন্য দানে মহিমান্বিত। আরাকানের অধিবাসীরা 'মগ' নামে পরিচিত। আরাকানের পূর্বনাম ছিল রোসাঙ্গা। রাজসভার গণ্যমান্যরা চাইতেন নিজের সংস্কৃতির প্রসার। তাঁদের ইচ্ছানুসারে আরবী-ফারসী বা ভারতীয় ভাষায় প্রেমকাব্যগুলির অনুবাদে তৎপর হয়েছিলেন। দৌলত কাজী হলেন আরাকান রাজদরবারের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর লেখা কাব্য 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' বাংলা প্রণয় আখ্যানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরনীয় গ্রন্থ। তাঁর সময়কালে আরাকানের রাজা ছিলেন থিরি-থু-ধম্মা বা শ্রীসুর্ধমা। রাজ্যের প্রধান অমাত্য সুলেমানের নির্দেশে ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ খ্রীঃ মধ্যে কাব্যটি রচনা করেন। প্রথমাংশ লোরচন্দ্রাণীর উৎস মুল্লা দাউদের লেখা 'চান্দায়ন' আর শেষাংশ 'সতীময়না' লিখেছিলেন মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' গ্রন্থের অনুসরণে। দৌলত কাজী যথাসম্ভব নীতি ও রূপক প্রধান, পরিহার করে রক্তমাংসের নর নারীর বিশুদ্ধ প্রেমকথা রচনা করতে চেয়েছিলেন।

আলাওল কাব্যটিকে জোড়াতালি দিয়ে শেষ করেছিলেন বলে অধিকাংশ সমালোচকদের অভিমত। তাঁর অবলম্বিত কাহিনীটি এই — বারোমাসের বারোমাস্যা বর্ণনা শেষ হবার পর ময়না ক্রুদ্ধ হয়ে মালিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। তবে স্বামীবিরহের আগুনে জ্বলতে লাগলেন। সেই বিরহ-দুঃখ মোচনের জন্য তাঁর এক সখী কাহিনীর অবতারণা করলো। এ কাহিনীটি ছিল ধর্মবতী নগরের রাজা উপেন্দ্রদেব ও তাঁর পত্নী রতনকলিকার। রতনকলিকা যখন অন্তসংত্ত্বা তখন কোনো কারণে রাজা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। পরিত্যক্ত রাণী আশ্রয় পান এক ব্রাহ্মণের গৃহে এবং সেখানে তাঁর আনন্দ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। আনন্দ বড় হয়ে পিতার সাক্ষাৎ পায় এবং তারই মাধ্যমে রাজা ও রাণীর মিলন হয়। এই গল্প শুনে ময়নার পতিমিলনের বাসনা প্রবল হলে তিনি এক ব্রাহ্মণকে স্বামী লোরকের কাছে দূত স্বরূপ প্রেরণ করলেন। তখন লোরকের সব কথা মনে পড়ে গেল এবং ময়নার দুঃখ অনুভব করে ব্যথিত হলেন। ততদিনে চন্দ্রাণীর গর্ভে তাঁর সন্তান প্রচন্ড তখন জন্মলাভ করেছে এবং

সে সাবালক হয়ে উঠেছে। তখন পুত্রের উপর গোহারির রাজ্যভার অর্পণ করে চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোরক ময়নার কাছে ফিরে এলেন এবং দুই পত্নী নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগলেন। বৃদ্ধ বয়সে লোরকের মৃত্যু হলে তাঁর চিতায় তাঁর দুই পত্নী সহমৃতা হলেন।

দৌলত যে কাহিনীর সূচনা করেছিলেন আলাওল তা সমাপ্ত করলেও দুটি রচনার মধ্যে কাব্যগুণের তফাৎ দেখেছেন অনেকেই। দৌলত ছিলেন প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী। তাঁর রচনা সৃষ্টিশীলতায় উজ্জ্বল। তাঁর ভাষা, ছন্দ, অলংকার, কাহিনীবয়ন, চরিত্রনির্মাণ এতটাই প্রাতিস্বিক ছিল যা আলাওলের রচনায় সেভাবে দেখা যায় না। দৌলত সংস্কৃত সাহিত্য ও বজ্রবুলিতে লেখা পদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তার দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর লেখায় আছে। নারীর দুই ভিন্নমুখী স্বভাব অঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয়। মোহিনী নারী তার রূপলাবণ্যের বাহ্যিক আকর্ষণে, কামনাময় ছলনাময়, মদির বিলোল কটাক্ষে কখনো কখনো দেবচিত্ত উন্মাদিনী উর্বশী। আবার এই নারী সর্বংসহা, ত্যাগ তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা-একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের স্থির অকম্প দীপশিখা। তখন সে কল্যাণী। চন্দ্রাণী ও ময়না — এই বিপরীত মোটিফ নারীর ধারণাকে স্পর্শ করে আছে। বস্তুতঃ অনুভূতির গভীরতায়, মানবচরিত্রের সার্থক রূপায়ণে, প্রেমের মুক্ত মহিমা প্রচারে ও সরস রচনারীতিতে দৌলত কাজির রচনা শিল্পসৌকর্যমন্ডিত।

প্রশ্ন :

১। দৌলত কাজী কোথাকার রাজদরবারের কবি ছিলেন?
২। দৌলত কাজীর কাব্যটির নাম কি? কতসালে রচিত হয়?
৩। কবি, কার নির্দেশে কাব্যটি রচনা করেন?

১.৪.১৪.৫.২ : সৈয়দ আলাওল

দৌলত কাজীর পর আরাকান রাজসভার বিশিষ্ট কবি হলেন সৈয়দ আলাওল পান্ডিত্যে ও বহু ভাষাজ্ঞানে তাঁর তুল্য কবি এই রাজসভায় বিরল ছিল। মুস লমান কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রচারিত। ভারতীয় প্রেমকাব্যের পাশাপাশি আরবীয় প্রণয় কথাকেও ইনি সমান গুরত্ব দিয়ে অনুবাদ করেছেন। এই কবির জীবনকথা বিচিত্র। চট্টগ্রামের মুলুক ফতেহাবাদের অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে কবির জন্ম। কবির পিতা ছিলেন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের মন্ত্রী। একবার পিতার সঙ্গে জলযাত্রার সময় জলদস্যুদের হাতে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি কোনক্রমে রক্ষা পান। পিতৃহীন আলাওল জীবিকার প্রয়োজনে মগরাজের সেনাবাহিনীতে কাজ নেন। তিনি সংগীতশাস্ত্রেও নিপুণ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও সংগীত দক্ষতার কথা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি রাজসভায় সভাকবির পদ অলংকৃত হকেন। মাগন ঠাকুর, সুলেমান, মাসুদ খান প্রমুখ রাজঅমাত্যদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এঁদের নির্দেশে তিনি একাধিক কাব্য রচনা করেন। তাঁর সময়কালে আরাকানের রাজা ছিলেন খান্দ-থু-ধম্মা বা চন্দ্রসুধর্মা। রাজনৈতিক কারণে কবিকে পঞ্চাশ দিন কারাবাস করতে হয়। পরে অবশ্য রাজকর্মচারীদের আনুকূল্যে কারাগার থেকে মুক্ত হন এবং সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

রাজঅমাত্য মাগন ঠাকুর ছিলেন কাব্যমোদী মানুষ। তাঁর অনুরোধেই কবি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন। দৌলতের মতো আলাওলের গ্রন্থগুলিও ছিল অনুবাদধর্মী। আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রমুখ নানা ভাষা থেকে তিনি

কাব্যগুলি অনুবাদ করেছিলেন। 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' ও 'সপ্তপয়কর' আলাওল রচিত বিশিষ্ট প্রণয়কাব্য। অবশ্য তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি 'পদ্মাবতী'কে ঘিরে। পদ্মাবতীর মূলটি হল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য, 'পদুমাবৎ'। জায়সী কাব্যটিকে সূফী ধর্মদর্শনের ব্যাখা সূত্রে লিখেছিলেন। আলাওল যতটা সম্ভব সেই দর্শনকে পরিহার করে কাব্যটিকে মানবপ্রেমকথায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। পদ্মাবতীর কাহিনী ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে তৈরী। এই কাব্যের দুটি খন্ডে দুধরণের উপকরণ প্রেমের গল্প কাঠামোকে বেঁধে দিয়েছে। প্রথম খন্ডটি বিশুদ্ধ ভাবে রোমান্স ও কলানির্ভর। এ অংশের মূল গল্প সিংহল রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরের রাণা রত্নসেনের প্রণয় সম্পর্ককেন্দ্রিক। শুকপাখির কাছ থেকে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রাজ্যপাট ছেড়ে প্রথমা পত্নী নাগমিতর কথা ভুলে রত্নসেন সিংহল যাত্রা করেন। পথে সমুদ্রে প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। সিংহলে পৌঁছে কৌশলে দেখা হয় রাজকন্যার সঙ্গে। অবশেষে অনেক ঘটনার পর পদ্মাবতীলাভে সমর্থ হন। আখ্যানটিতে একটি মধুর সমাপ্ত মিষ্টিপ্রেমের গল্পের রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। পদ্মাবতীর দ্বিতীয় খন্ডের কাহিনী ইতিহাসের পটে কল্পনার রঙে চিত্রিত। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খল্‌জীর চিতোর আক্রমণ ও বিজয় ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত। কবির কাহিনীতেও সেই সত্যের অনুবর্তন আছে। একদা রত্নসেনের প্রতি ক্ষুব্ধ তাঁর সভাসদ রাঘবচেতন দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটকে পদ্মিনীলাভের জন্য উত্তেজিত করে তোলেন। সম্রাট দূত প্রেরণ করলে সে দূত প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে কোন নিষ্পত্তি না হওয়ায় তিনি কৌশল করে রত্নসেনকে দিল্লীতে ধরে নিয়ে গেলেন। রাণার সৈন্যসামন্তরাও আবার কৌশল করে রত্নসেনকে নিয়ে স্বদেশের পথে পাড়ি দিলেন। সেকথা জানতে পেরে বাদশাহী সৈন্যর সঙ্গে শুরু হল প্রবল যুদ্ধ। যুদ্ধে রত্নসেনের সেনাপতি বাদল প্রাণ দিল। অন্যদিকে পদ্মিনীকে লাভের উদ্দেশ্যে আসা দেবপালের সঙ্গে রত্নসেনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল। দেবপাল পরাজিত হলো। রত্নসেন আহত হলেন। আহত অবস্থায় রইলেন বারো বৎসর। ইতিমধ্যে তাঁর ইন্দ্রসেন ও চন্দ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। বারো বৎসর পরে রাণার মৃত্যু হলে তাঁর দুই পত্নী অনুমৃতা হলেন এবং সম্রাট দিল্লী থেকে এসে রাণার দুই পুত্রকে সান্ত্বনা দিলেন ও তাদের হৃতপিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। বস্তুত পদ্মাবতী ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য হিসেবে স্বীকৃত। আলাওল জায়সীকে পদে পদে অনুসরণ করেন নি। প্রয়োজনে কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তারিত কিংবা অতিরিক্ত সংযোজনও করেছেন। কবির কলমে প্রেমের মহিমা চমৎকারভাবে বিশ্লেষিত ঃ "প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।/ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হতে বশ।। প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।/প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর।।" পদ্মাবতী লিখিত হয় ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতীয় প্রেমকাব্যের পাশাপাশি আরবীয় প্রণয় কথাকেও ইনি সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুবাদ করেছেন। চট্টগ্রামের মুলুক ফতেহাবাদের অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে কবির জন্ম। মাগন ঠাকুর, সুলেমান, মাসুদখান প্রমুখদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এঁদের নির্দেশে তিনি একাধিক কাব্য রচনা করেন। তাঁর সমকালে আরাকানের রাজা ছিলেন চন্দ্রসুধর্মা। 'পদ্মাবতী' 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' ও 'সপ্তপয়কর' আলাওল রচিত বিশিষ্ট প্রণয়কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যটি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য, 'পদুমাবৎ' থেকে নেওয়া হয়েছে। রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরের রানা রত্নসেনের প্রণয় সম্পর্ক কেন্দ্রিক কাব্যটি ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে তৈরী। বস্তুত 'পদ্মাবতী' ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য হিসেবে স্বীকৃত। আলাওলের বাকি দুটি প্রেমকাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' ও 'সপ্তপয়কর'। সপ্তপয়করের বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন ইরানী কবি নেজামী সমরকন্দীর 'হপ্তপয়কর' থেকে। আলাওলের আরো দুটি রচনা— সেকেন্দারনামা, অন্যটি তোহফা। সেকেন্দার নামার মূল নিজামী সমরকন্দীর লেখা ইস্কান্দারনামা। অন্যদিকে তোহ্‌ফা ছিল শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর লেখা 'তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ' গ্রন্থের অনুবাদ।

আলাওলের বাকি দুটি প্রেমকাব্য আরব্য উপন্যাসের স্বভাববৈশিষ্ট্য। বাস্তব তাবর্জিত রোমান্সের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমালে ও সপ্তপয়করে। দোলাগাজির কবিকৃতি বিষয়ে প্রথম উপাখ্যানটি আগেই উপস্থাপিত হয়েছে। আলাওলের কাহিনী তার থেকে খুব দূরবর্তী নয়। এ কাব্যটি মুসলিম সমাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বপ্নমেদুর লোকাতীত পরিবেশ সৃষ্টিতে কবি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। সপ্তপয়করের বিষয়বস্তু কবি গ্রহণ করেছিলেন ইরানী কবি নেজামী সমরকন্দীর 'হপ্তপয়কর' থেকে। আরব অধিপতি লোসানের পুত্র বাহরামের অদ্ভুত আশ্চর্য কীর্তি এখানে গল্পাকারে বর্ণিত। পিতা বর্তমানে বাহরাম দিনরাও আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীতে নিমজ্জিত হয়ে দিন কাটাতো। হঠাৎ সংবাদ আসে, সুলতানের মৃত্যুর পর উজির রাজ্য অধিকার করে নিয়েছেন। বাহরাম তখন উজিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে অদ্ভুত শর্ত ঘোষণা করলেন। দুটি বাঘের সামনে রক্ষিত একটি বাদশাহী তাজ যে উদ্ধার করতে পারবে সেই আরবের অধিপতি। বলা বাহুল্য, উজির প্রাণভয়ে বাঘের সামনে যেতে পারলেন না, আর বাহরাম নির্বিঘ্নে তাজ নিয়ে এলেন। বাদশা বাহরাম অতঃপর পার্শ্ববতী' সাতটি রাজ্য জয় করে প্রত্যেকটি দেশের এক একটি রাজকন্যাকে বিবাহ করে সাতটি প্রাসাদ ভবনে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। সাত রাজকন্যা পালা করে বাহরামকে প্রতিদিন একটি করে গল্প শোনাতেন। গল্পগুলি বিচিত্র প্রেমকথায় পরিপূর্ণ। কবি কাব্যরচনায় রোমান্স কল্পনার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছেন। প্রেমকাব্যের বাইরে আলাওলের আরো দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি সেকেন্দারনামা, অন্যটি তোহ্ফা — এ দুটিও অনুবাদ। সেকেন্দারনামার মূল নিজামী সমরবন্দীর লেখা ইস্কান্দারনামা। ইরানে প্রচলিত আলেকজান্ডারের বিজয়াভিযানের অতিরঞ্জিত গল্প এর উপজীব্য। কবি এই অনুবাদের পিছনে যে সাহিত্যিক কারণ নির্দেশ করেছেন তা এইরকম — "নিজামীর ঘোর বাক্য বুঝিতে কর্কশ। ভাঙ্গিয়া কহিল তারে আছে বহু রস।।" কবির কলমে কাহিনীটি মোটামুটি এইরকম ঃ ইউনান প্রদেশের রাজা ফয়লকুছের পালিত পুত্র হলেন সেকেন্দার। তিনি গৃহশিক্ষক আরস্ততালিসের কাছে শিক্ষা গ্রহণান্তে দ্বিগ্বিজয়ে বের হন। প্রথমে জয় করেন মিশর। সেখানে স্থাপিত হয় ইসকান্দারিয়া নগরী। পরে পারস্যরাজ দরায়ুসকে নিহত করে তাঁর কন্যা রৌসনকে বিবাহ করেন। অতঃপর হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা। সেখানকার হিন্দু রাজা ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন ও সেকেন্দারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে সন্ধি করেন। চীন ও রাশিয়াতেও সেকেন্দারের প্রতাপ বিস্তৃত হয়। বাক্য সমাপ্তি লাভ করে সেকেন্দারের রোম হয়ে ইউনানে প্রত্যাবর্তনে। কাহিনীটি মূলতঃ যুদ্ধবিগ্রহকেন্দ্রিক। সেকেন্দারের দ্বিগ্বিজয়ের প্রসঙ্গ থাকলেও অনেক রূপকথাধর্মী গল্পের আয়োজন আছে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নেই। অন্যদিকে তোহ্ফা ছিল শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর লেখা 'তোহ্ফাতুন নেসায়েহ্' গ্রন্থের অনুবাদ। গদার বইটি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় আচার আচরণের কেতাবী নির্দেশে পরিপূর্ণ। আলাওলের বইটাও তাই। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রধান ভেদ হল এই যে, দেহলভী যেখানে আরবী মুসলমানকে শরীয়ত ও হাদিস নিষ্ঠ করে তুলেছেন, সেখানে আলাওল বাঙালি মুসলমানদের কাছে কিছু দেশজ ও লৌকিক সংস্কারকে হাজির করেছেন। রোজা, জাকাত, হজ, ইবাদাত, কোরাণ, তেলওয়াৎ, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় আলোচনা তো আলাওলের অনুবাদে আছেই,

প্রশ্ন :

১। 'পদ্মাবতী' কার লেখা? 'পদ্মাবতীর' মূল উৎস কোথায়?

২। সৈয়দ আলাওলের দুটি কাব্যের নাম কর?

এর সঙ্গে মেলে জ্যোতিষের সহায়তায় ভাগ্যনির্ণয়, পীরপ্রশস্তি, গৃহপ্রতিষ্ঠা ও বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে সংস্কার, বিবাহে নানাবিধ স্ত্রী আচার পালনের কথা। গোঁড়া মুসলিম সমাজ এগুলিকে নিশ্চয়ই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেনি। তবুও আলাওলের এই রচনা থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর সমকালে বাঙালি ধর্মান্তরিত মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোথাও কোথাও হিন্দু আচার সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

১.৪.১৪.৫.৩ : কোরেশী মাগন ঠাকুর

মাগন আরকান রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন; একই সঙ্গে ছিলেন গুণগ্রাহী, রসগ্রাহী ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী। তাঁর লেখা একটি প্রণয় কাব্য মিলেছে। কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ রচনার অব্যবহিত উৎসকি সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। গল্পের মোটিফ বিশ্লেষণ করে মনে হয়, দেশী রূপকথা ও ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে বিদেশী পুরাণের মিথ মিশিয়ে বীরভান-চন্দ্রাবতীর প্রেমকথা কবি শুনিয়েছিলেন। রাজসভার উৎসুক শ্রোতাদের। কাহিনীতে রূপকথার স্পর্শে থাকায় অনেক জায়গায় কাহিনী বাস্তবতার মাটি হারিয়েছে। রয়েছে কিছু ধ্রপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মোটিফগত প্রভাব। যেমন নায়ক বীরভানের সমুদ্রনাগকে দমন করা ও তার ফণায় আরোহন করা ভাগবতের কৃষ্ণের কালীয় দমনের ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত মালিনী চরিত্রটি এখানে ছায়া বিস্তার করেছে রাজকুমারের মালিনী গৃহে আশ্রয়লাভের ঘটনায়। তাছাড়া প্রশ্নোত্তর রাক্ষসবধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গ্রীক পুরাণের স্ফিংসের গল্পে। ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমী এবং মন্ত্রের প্রভাবে মানুষের পাখিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গ মেলে বাংলার রূপকথায়।

কোরেশী মাগন ঠাকুর আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি গুণগ্রাহী, রসগ্রাহী ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'।

সপ্তদশ শতকের অপর একজন কবি সৈয়দ সুলতান। 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-এ ডঃ এনামূল হক সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন—সেখানে নবীবংশ, সব-ই-মিরাজ, রসুলচরিত, ওফাৎ-ই-রসুল, ইবলিসনামা, জয়কুম রাজার লড়াই ইত্যাদি তিনি রচনা করেন। নবীবংশই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। সৈয়দ সুলতান নীতি ও উপদেশদানের সচেতন ইচ্ছা থেকেই গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মচেতনা জাগ্রত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সপ্তদশ শতকের অন্যান্য মুসলমান কবিরা হলেন— মুহম্মদখান, আবদুল হাকিম, নসরুল্লাহ খান, শেখ সেরবাজ চৌধুরী নাম উল্লেখযোগ্য।

১.৪.১৪.৫.৪ : সৈয়দ সুলতান

সপ্তদশ শতকে আর একজন মুসলমান কবি বেশ উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারেন। ইনি চাকলার কবি সৈয়দ সুলতান। সৈয়দ সুলতানের রচনা তালিকার ওপর চোখ বোলালে স্পষ্টতঃই ধারণা হবে যে, তিনি সেদিনের পাঠক প্রশংসিত প্রেমকাব্যের ধারা থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে এনে ইসলামী শাস্ত্রবিষয়ক রচনাতে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'- এ ডঃ এনামুল হক সৈয়দ সুলতানের যে গ্রন্থ তালিকা সন্নিবিষ্ট করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে নবীবংশ, সব-ই-মিরাজ, রসুলচরিত, ওফাৎ-ই-রসুল, ইবলিসনামা, জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞানচৌতিশা এবং কিছু মারফতী গান তিনি রচনা করেছিলেন। নবীবংশই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রন্থটি মহাকাব্যের মতো বিশাল আয়তনের। আদম থেকে শেষ নবী হজরত মহম্মদ পর্যন্ত মহাপুরুষদের জীবনকাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের মর্মকথার উপস্থাপনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন সৈয়দের বাকি বইগুলো বৃহদাকার নবীবংশেরই পূর্বাংশ মাত্র। রসুল চরিত অনেকটা জীবনীগ্রন্থের সমতুল। উন্মেষ-মিরাজ ওফাৎ পর্ব নিয়ে এর কাহিনী বিস্তৃত। সব-ই-মিরাজ হজরতের বেহেস্ত দর্শনের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। আল্লাহ ও রসুলের কথোপকথনের

অংশটি উল্লেখযোগ্য। কল্পিত কাহিনী জয়কুমরাজার লড়াই, যেখানে হজরত মহম্মদ ও হজরত আলির যুদ্ধ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মহম্মদের প্রয়াণ পাঠকে কেন্দ্র করে লেখা ওফাৎ-ই-রসুল। এ কাব্যে হজরতের প্রাণ নেবার জন্য আস্রাইলের আর্বিভাবটি চমৎকার কাব্যিকতায় চিহ্নিত। জ্ঞানচৌতিশা সূফী সাধনতত্ত্ব ও যোগকলন্দর জাতীয় রচনা। কবি বোধ হয় অল্প বয়সেই এ কাব্য লিখেছিলেন। সৈয়দ সুলতানের রচনাগুলিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে যে, তিনি নীতি ও উপদেশদানের সচেতন ইচ্ছা থেকেই গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মচেতনা জাগ্রত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। কেমন করে ইবলিস বা শয়তানের দুষ্ট প্রভাব কাটিয়ে অসহায় মানুষ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে মঙ্গল ও শান্তি আনতে পারে এটা নির্ধারণ করাটাই যেন সৈয়দ সুলতানের ধর্মগ্রন্থ রচনার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল বলে মনে করা হয়।

১.৪.১৪.৪.৫ : মুহম্মদ খান

ইনি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য বলে কথিত। ইনি সামন্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর আদিপুরুষ সাহি আসোয়ার চতুর্দশ শতকের লোক। কবির পিতার নাম মুবারিজ খান। মুহম্মদ খানের রচনা সাকুল্যে সাতটি। এগুলি যথাক্রমে 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ', 'হানিফার লড়াই', 'আসহাবনামা', 'মক্তুল হোসেন', 'কেয়ামতনামা', 'দজালনামা', ও 'কাসিমের লড়াই'। কবি মূলতঃ অনুবাদক। গবেষকদের, মতে, তাঁর প্রথম কাব্য সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ লিখিত হয় ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। রচনাটি রূপক লক্ষণাক্রান্ত। কবি ন্যায় অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা বলতে গিয়ে একদিকে সত্য ও অপরদিকে মিথ্যার প্রতিরূপ কলিকে বিপরীতধর্মী চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করেছেন। বইটি যাতে নিছক তত্ত্বকথার কচকচিতে পরিণত না হয়, সেজন্য কবি স্থানে স্থানে নতুন উপাখ্যান সংযুক্ত করে রোমান্স রসের আমদানি ঘটিয়েছেন। হানিফার বীরত্ব ও যুদ্ধে তাঁর শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের কাহিনী মোটামুটি ইতিহাস সম্মত। একইভাবে কাসিমের লড়াই-এ রয়েছে কারবালার প্রান্তরে হাসানের পুত্র কাসিমের মর্মান্তিক মৃত্যুর বিবরণ। দজ্জালনামা একটু অন্য ধরনের বই। অন্যায়ের প্রতিভূ দজ্জালের বীভৎস আকৃতি, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ও বর্বর অত্যাচারের বর্ণনা আছে এ কাব্যে। 'কেয়ামত' শব্দের অর্থ শেষ বিচার। ইসলাম ধর্মমতে, মৃত্যুর পর সব মানুষের শেষ বিচার হয় আল্লাহর দরবারে। হজরত কেমন করে পাপীতাপীদের হয়ে মহান স্রষ্টার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেন কবির কলমে সেই আশ্চর্য মানবিক সহানুভূতি শিল্পরূপ ধারণ করেছে কেয়ামতনামায়। মক্তুল হোসেন কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত। কবি স্বীকারোক্তি অনুসারে, তাঁর গুরু সৈয়দ সুলতানের নির্দেশে তিনি এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এটিকে কেউ কেউ সৈয়দের নবীবংশ গ্রন্থের পরিপূরক বলে বিবেচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বাংলা জঙ্গনামা কাব্যধারার সবচেয়ে পুরাণো রচনা এটি। কাব্য রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। কোন ফারসী রচনা থেকে কবি এটি অনুবাদ করেছেন। তবে বিষয়বস্তুতে ইতিহাসের স্পর্শে থাকলেও কবির ইতিহাসানুগত্য প্রকাশ পায়নি। আসহাবনামা লেখা হয়েছিল মক্তুল হোসেন কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে। এই দুটি অংশে মিলিয়ে আয়তনে ও বিষয়বস্তুতে রচনাটি মহাকাব্যিক বিশালতায় গিয়ে পৌঁছেছে।

১.৪.১৪.৫.৬ : আবদুল হাকিম

আবদুল হাকিম নামে আর একজন শক্তিশালী কবিকে পাওয়া যায় এই সতেরো শতকেই, যাঁর রচিত কাব্যের সংখ্যা দশ। এঁর আদি বাসস্থান কোথায় তা নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। তবে কবি তাঁর একটি কাব্যে উল্লেখ করেছেন, যে নোয়াখালি জেলার বাবুপুরে তাঁর বাসগৃহ ছিল। জনৈক পীর শিহাবুদ্দিনকে তিনি গুরু হিসেবে সম্মান জানাতেন। এই পীরের মারফতে তাঁর কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বে দীক্ষা হয়। এ ধরনে র জ্ঞানের পরিচয় বহন করে তাঁর দুটি গ্রন্থ নূরনামা ও দুররে মজলিস। এছাড়াও লিখেছিলেন ইউসুফ-জোলেখা, লালমতি-সয়ফুলমুলুক,

শিহাবুদ্দিননামা, নসীহতনামা, চারিমোকাভেদ, কারবালা, শহরনামা ইত্যাদি গ্রন্থ। নূরনামায় বিশ্বসৃষ্টির রহস্যব্যখায় কবি আল্লাহের দেহজ্যোতি থেকে দুনিয়ার সব কিছুর উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের সশ্রদ্ধ ভক্তি ঝরে পড়েছে শিহাবুদ্দিননামায়। নসিহতনামাও ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত পুস্তক। লালমতি সয়ফুলমুলুকের উৎস এক ফারসী আখ্যান। এমরাণ দেশের সম্রাট সিকান্দার শাহের পুত্র সয়ফুলের সঙ্গে মগ্রিব দেশের পরমা সুন্দরী রাজকন্যা লালমতির প্রণয়কথা এর উপজীব্য। অন্যান্য প্রেমকাহিনীগুলি যেভাবে গড়ে উঠেছে রোমান্স রসের ভিয়েনে এটিও তাই। তবে কবির ভাষা এখানে কবিত্বমন্ডিত প্রাঞ্জল।

১.৪.১৪.৫.৭ : নসরুল্লাহ খান

ইনি আরাকানের উদির বংশের সন্তান ছিলেন পেশায় খোন্দকার বা গ্রাম্য মক্তবের শিক্ষক। তাঁর নামে চারটি পুথি মিলেছে। এগুলি যথাক্রমে জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল, শরীয়তনামা ও হেদায়তুল ইসলাম। জঙ্গনামায় কাফের দর্শনের সূত্রে ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কবির বর্ণিত ঘটনায় অনেক অলৌকিক উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে। এ কাব্যে আলাদা করে নজর কাড়ে ছন্দশোভা। মুসার সওয়াল-এ আছে হজরত মুসার আল্লাহের সাক্ষাৎকার বিবরণ। কোন ফারসী বই অনুসারে এর পরিকল্পনা। নামাজ-মাহাত্ম্য এ গ্রন্থের অন্যতম প্রসঙ্গ। কাব্যের প্রকরণটি প্রশ্নোত্তরমূলক। অন্যদিকে ইসলামধর্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষজন পালনীয় ও বর্জনীয় বিধানসমূহ স্থান পেয়েছে শরীয়তনামায়। ধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কবি সমস্ত কাফেরী প্রভাব ঝেড়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। এ কারণে দেখা যায় কবর, কাফন, স্থান, ঘোমটা, পর্দা, অস্পৃশ্যতা, ধূমপান, জাতিভেদ, রজঃস্বলা নারীর কর্তব্য, যৌন অসংযম ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি শরীয়তের বিধান স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১.৪.১৪.৫.৮ : শেখ সেরবাজ চৌধুরী

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি। রচিত কাব্যের সংখ্যা তিন — 'মল্লিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা', 'কাসেমের লড়াই' ও 'ফাতিমার সুরতনামা'। এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল প্রথমটি। এটি গল্পপ্রধান রচনা। কাব্যের মধ্যে রোমান্টিকতার আভাস থাকলেও কবি কৌশলে আধ্যাত্মিকতাকে সংযুক্ত করেছেন। মল্লিকা বা মালিকা হলেন, রুমদেশের চল্লিশোর্ধ অনূঢ়া রাজকন্যা। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন যে, যিনি তাঁর হাজারটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁকে হারাতে পারবেন, তিনি তাঁকেই বরমাল্য দিয়ে বরণ করবেন। ঘোষণা শুনে আবদুল্লাহ নামে তুরস্কের এক ফকির সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রাজকন্যাকে পরাস্ত করে বিবাহ করলেন। রাজকন্যার করা প্রশ্নগুলি ছিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্পৃক্ত। সেরবাজের বিবৃতি অনুসারে মনে হয় যে, এ গ্রন্থের কোন ফারসী উৎস ছিল। কাসেমের লড়াইয়ের বিষয়বস্তু পুরাণো। হাসানের পুত্র কাসেম সখিনাকে বিবাহ করে। পরে কারবালার লড়াইয়ে সামিল হয়ে প্রচন্ড বীরত্ব দেখিয়েও পরাজিত ও নিহত হয়। সেই দুঃখজনক ঘটনার কাব্য রূপায়ণ রয়েছে এ গ্রন্থে। উপরোক্তরা ছাড়া সপ্তদশ শতকের আরো কয়েকজন মাঝারি মাপের কবি হলেন শেখ মুত্তালিব, আবদুল করিম খোন্দকার, মীরমুহম্মদ সফী, মুহম্মদ ফসীহ, মুহম্মদ আকিল, সৈয়দ মর্তুজা, শমসের আলি, মরদন, আবদুল নবী, কমর আলী, মঙ্গল চাঁদ, মুহম্মদ আকবর।

প্রশ্ন :

১। কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যটির নাম কি?

২। সপ্তদশ শতকের চারজন মুসলিম কবির নাম কর?

১.৪.১৪.৬ : অষ্টাদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য

সতেরো শতকের এই বিপুল সমৃদ্ধির পরে পরেই ভাঙন ধরেছিল ইসলামী বাংলা সাহিত্যে। একই বিষয়ের প্রায় চর্বিতচর্বণ শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে অভিনবত্বের অভাবে একঘেয়েমীর ক্লান্তি এসে তাকে গ্রাস করেছিল। প্রণয়কাহিনীর মধ্যে স্বতঃই একটা অন্য ধরণের আকর্ষণ থাকে। থাকে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরে দেবার মতো ভাবনাগত ঐশ্বর্যও। কিন্তু আঠারো শতকে এসে সেই সম্পদটুকুও সে হারিয়ে ফেলে নানাবিধ কারণে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে মুসলমান কবিরাও তাঁদের সাংস্কৃতিক কৌশল ও প্রকরণ বদলে নেন। শুরু হয় দোভাষী পুথির যুগ। কী এই দোভাষী পুথি? এর একাধিক লক্ষণগুলিকে একত্র করে সংক্ষেপে বলা যায়, আরবী ফরাসী তুর্কি উর্দু - হিন্দুস্তানী ভাষার মিশ্রণে মুসলিম জনমানসের উপযোগী করে সম্প্রদায়ভিত্তিক যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল ওপার বাংলার সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা সেগুলিকেই 'দোভাষী পুথি' বলে নির্দেশ করেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দোভাষী রীতিতে স্পষ্টত 'মুসুলমানী বাংলা' বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহে তু, ইসলাম ধর্মের আবহটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মুসলিম কবিরা তাঁদের রচিত এ ধরনের কাব্যে ব্যাপকভাবে আরবী ফারসীরাই চর্চা করেছিলেন। ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, দোভাষী রীতির উদ্ভব, পরিচর্যা ও বিকাশ ক্ষেত্র কোলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বন্দর এলাকা। এই উদ্ভব থেকে পরে তা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে পৌঁছে যায় ঢাকায়। আগে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে দোভাষী পুথির অধিকাংশ ছিল অনুবাদধর্মী রচনা। কবিরা উৎস থেকে কেবল বিষয়বস্তুই গ্রহণ করেননি, বিপুল পরিমাণে ভাষা ঋণও গ্রহণ করেছিলেন। দোভাষী পুথিকে সাহিত্যিক বিষয় ভেদে কোন কোন সাহিত্য গবেষক চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল (১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (২) জঙ্গনামা বা যুদ্ধ রচনা (৩) ইতিহাস প্রসিদ্ধ পীর পয়গম্বরদের জীবনকথা ও (৪) ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তক। এর আগেও এই চারটি ধারাতেই মুসলমান কবিরা কলম চালিয়েছিলেন। তবে আঠারো শতকে ধর্মমূলক পুস্তকে গোঁড়ামির পরিচয় বেশি ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। শাস্ত্রজ্ঞদের কট্টর হয়ে ওঠার মূলে কাজ করেছিল মাটি হারানোর আশঙ্কা। যাইহোক, এই শতকে দোভাষী পুথির রচয়িতা হিসেবে দুইজন কবি খুবই স্মরণীয়। এঁরা হলেন ফকীর গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা।

> *সতেরো শতকের ইসলামী সাহিত্যের বিপুল সমৃদ্ধির পরে পরেই অষ্টাদশ শতকে ভাঙন ধরেছিল ইসলামী বাংলা সাহিত্যের। বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে অভিনবত্বের অভাবে একঘেয়েমীর ক্লান্তি এসে গ্রাস করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে মুসলমান কবিরাও তাদের সাংস্কৃতিক কৌশল ও প্রকরণ বদলে নেন। দোভাষী পুঁথির লক্ষণ হিসেবে বলা যায়— আরবী ফরাসী তুর্কি উর্দু-হিন্দুস্তানী ভাষার মিশ্রণে মুসলিম জনমানসের উপযোগী করে সম্প্রদায়ভিত্তিক যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল, ওপার বাংলার সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা সেগুলিকেই 'দোভাষী পুঁথি' বলে নির্দেশ করেছেন। দোভাষী পুঁথির অধিকাংশই ছিল অনুবাদধর্মী রচনা। কবিরা উৎস থেকে কেবল বিষয় বস্তুই গ্রহণ করেননি, বিপুল পরিমাণে ভাষা ঋণও গ্রহণ করেছিলেন। দোভাষী পুঁথিকে কোন কোন গবেষক চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল (১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (২) জঙ্গনামা বা যুদ্ধ রচনা (৩) ইতিহাস প্রসিদ্ধ পীর পয়গম্বরদের জীবনকথা ও (৪) ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তক। অষ্টাদশ শতকে দোভাষী পুঁথির রচয়িতাদের মধ্যে ফকীর গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

প্রশ্ন :

১। দোভাষী পুঁথি কি?

২। দোভাষী পুঁথির দুজন রচয়িতার নাম কর?

১.৪.১৪.৬.১ : ফকীর গরীবুল্লাহ

অনেকে ফকীর গরীবুল্লাহকে দোভাষী পুথির দশক বলে বিবেচনা করেন। ইনি ছিলেন হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুরের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম শাহ দুন্দি। গরীবুল্লাহের নামে মোট পাঁচটি পুথি পাওয়া যায় 'সোনাভান', 'আমীর', হামজা, 'ইউসুফ-জোলেখা', 'মদন-কামদেব পালা' ও 'হোসেন' মঙ্গল। 'সোনাভান' কবির প্রথম কাব্য বলে অনুমিত। গরীবুল্লাহের খ্যাতি প্রধানতঃ এই বইটির জন্য। এটি জঙ্গ নামা গোত্রের কাব্য, বীর হানিফার সঙ্গে টুঙ্গি শহরের বীরাঙ্গনা সোনাভানের যুদ্ধবৃত্তান্ত এর উপজীব্য। তবে কাব্যটির মধ্যে ইসলাম-প্রীতির দিকটি বেশ উজ্জ্বল। গরীবুল্লাহের আমীর হামজাতেও একইভাবে ফুটে উঠেছে প্রেম ও বীরত্বের চিত্র। আমীর হামজা ছিলেন হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য। তিনি মস্ত যোদ্ধা ছিলেন, ছিলেন প্রেমিকও। কবি মেহের নিগারের সঙ্গে আমীরের প্রেমকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বর্ণন । করেছেন। এই প্রণয়পাত্রীর অপরূপ রূপের বর্ণনায় রোমান্টিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগেছে। গল্পটিকে কবি সম্ভবত ধার করেছিলেন দস্তান-ই-আমীর হামজা নামক এক ফারসী কাব্য থেকে। কবির ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বিষয়বস্তু পুরনো হলেও এটির রূপাঙ্গনে অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রণয় গল্পের আড়ালে কবি আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্য কীর্তনের চেষ্টা করেছেন। এসেছে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা। যেমন ইয়াকুপ নবীর সঙ্গে বাঘের সংলাপ। বিগত যৌবনা জোলেখার পুনর্যৌবনলাভও এ ধরনের আর এক অসম্ভব কল্পনা। হোসেন মঙ্গল তেমন গুরুত্বপূর্ণ রচনা নয়। এতে মক্তুল হোসেনকে কেন্দ্র করে কারবালার প্রান্তরে যে বিষাদ বিধুর ঘটনা ঘটেছিল তারই উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। তবে ফতিমার চরিত্রটি মানবিক রসে উজ্জ্বল। মদন-কামদেব পালাটি সত্যপীরের পুথির একটি অংশ। গরীবুল্লাহের কাব্যকৃতি বিষয়ে 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে' গ্রন্থের লেখক ডঃ আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আস্ত লক্ষ্য। তাই গরীবুল্লাহ জনপ্রিয় হলেন, কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারলেন না।'

> *ফকীর গরীবুল্লাহ ছিলেন হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুরের অধিবাসী। গরীবুল্লাহের নামে মোট পাঁচটি পুথি পাওয়া যায়- 'সোনাভান', 'আমীর', হামজা, 'ইউসুফ-জোলেখা' 'মদন-কামদেব পালা' ও হোসেন মঙ্গল। 'সোনাভান' কবির প্রথম কাব্য বলে অনুমিত। বীর হানিফার সঙ্গে টুঙ্গি শহরের বীরাঙ্গনা সোনাভানের যুদ্ধ বৃত্তান্ত এর মূল উপজীব্য। গরীবুল্লাহের কাব্যকৃতি বিষয়ে 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে' গ্রন্থের লেখক ডঃ আনিসুজ্জামান লিখেছেন—'কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আস্ত লক্ষ্য। ফকীর গরীবুল্লাহকে কাব্য গুরুরূপে বরণ করেছিলেন— কবি সৈয়দ হামজা। হুগলীর ভুরসুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত উদনাতে কবির জন্ম। সৈয়দ হামজার প্রথম কাব্য 'মধুমালতী' উপাখ্যানে। এটি সংস্কৃতানুগ বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা এবং বিষয়বস্তুর বিধানে প্রণয়কাব্য। 'হাতেমতাই' সৈয়দ হামজার শেষ রচনা। হাতেমের উপস্থিত বুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্য, যাত্রাপথে বহু নারীর সংস্পর্শ ও তাদের শরীরী সান্নিধ্যলাভ কাব্যটিতে প্রভুত পরিমানে মেলে। আঠের শতকে অন্যান্য মুসলমান কবিদের মধ্যে আছেন-মুহম্মদ উজির আলি, আলি রজা, নওয়াজিস খান, সৈয়দ নূরউদ্দিন, সৈয়দ মুহম্মদ নাসির প্রমুখ। যাইহোক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিছু পরিমাণে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল মুসলমান কবিদের দানে।*

প্রশ্ন :

১। ফকীর গরীবুল্লাহের কাব্যটির নাম কি ?

২। সৈয়দ হামজা কি কি কাব্য লিখেছিলেন ?

৩। আঠের শতকের অন্যান্য মুসলমান কবিদের নাম কর ?

১.৪.১৪.৬.২ : সৈয়দ হামজা

ফকির গরীবুল্লাহকে কাব্যগুরুরূপে বরণ করে দোভাষী পুথির জগতে পদার্পণ করেছিলেন কবি সৈয়দ হামজা। হুগলীর ভুরসুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত উদমাতে কবির জন্ম। অবশ্য দোভাষী পুথিতে হাত দেবার আগে ইনি সাধারণ ভাষারীতি অবলম্বন করেছিলেন, যার প্রমাণ রয়েছে তাঁর লেখা প্রথম কাব্য 'মধুমালতী' উপাখ্যানে। এটি সংস্কৃতানুগ বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা এবং বিষয়বস্তুর বিধানে প্রণয়কাব্য। এ কাব্যের একটি হিন্দী আদর্শ আছে। সেটি 'মধুমালতী ', লেখক হিন্দী কবি মন্‌ঝন্‌। সৈয়দ হামজার লেখায় রোমান্টিকতার সঙ্গে অল্পবিস্তর অতিপ্রাকৃতের মিশেল ঘটায় লঘুচিত্ত পাঠক উল্লাসিত হলেও এর তেমন কাব্যমূল্য নেই। গরীবুল্লাহের অসমাপ্ত আমীর হামজাকে সম্পূর্ণতা বিধানের পথ ধরে সৈয়দ হামজার দোভাষী পুথির জগতে আসা। এই কবির হাতে বীর হামদা পরিণত হয়েছেন নারীসঙ্গলিপ্সু এক পুরুষে। এছাড়া কাহিনীতে যত্রতত্র অলৌকিকতার বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যা পাঠকের বাস্তবতাবোধকে ভেঙে খান খান করে দেয়। এঁর পরের বই জৈগুনের পুথি তাই অনুবাদ শ্রেণীর রচনা। মূল গ্রন্থ নুরুদ্দীনের লেখা উর্দুকিতাব জঙ্গে যৈগুন। এটি জঙ্গনামার অন্তর্গত হলেও ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারই এর মুখ্য অভিপ্রায়। 'হাতেমতাই' সৈয়দ হামজার শেষ রচনা। বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী হাতেমকে নিয়ে ফারসী ও তুর্কী ভাষায় লেখা হয়েছিল দু'দুটি বই। কিন্তু সৈয়দ হামজার হাতেমতাই উর্দুতে লেখা 'আরায়েশ মেহফিল' থেকে কাহিনী ধার করেছে। নানা উপকাহিনীর সংযোজনে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। হাতেমের উপস্থিত বুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্য, যাত্রাপথে বহু নারীর সংস্পর্শ ও তাদের শরীরী সান্নিধ্যলাভ কাব্যটিতে প্রভুত পরিমাণে মেলে। রূপকথার মোটিফও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের মধ্যে অবলীলায় এসেছে দৈত্য-দানো-পরীরা। কুমীর কিংবা সাপ হাতেমকে গিলে ফেললেও অলৌকিক শক্তিবলে আবার তিনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এই বালসেব্য গল্পের আখ্যান রচনায় কবি যে সমকালের জনরুচিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

এই দুই জন শক্তিশালী লেখকের বাইরে আঠারো শতকে অন্যান্য মুসলমান কবিদের সংখ্যাটা কম নয়। একালেই কলম হাতে আবির্ভূত হন মুহম্মদ উজির আলি, আলি রজা, নওয়াজিস খান, সৈয়দ নূরউদ্দিন, সৈয়দ মুহম্মদ নাসির, হায়াৎ মামুদ, মুহম্মদ রাজা, মুহম্মদ জীবন, আরিফ, কাজী শেখ মনসুর, মুহম্মদ মুকীম, শেখ সাদী, বালক ফকির, মুহম্মদ আলি প্রমুখ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবিরা। কাব্যের বিষয়বস্তু ও পরিবেষণ পদ্ধতি মোটামুটি অভিন্ন। প্রণয়কাব্যের কাঠামো তো আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তাই অল্প আয়াসে একই গল্পের রকমফের এঁদের দ্বারা হাজির করা সম্ভব হচ্ছিল। গল্পগুলি প্রেমের হওয়ায় পাঠক সমাজে তাদের কাটতির কোন অভাব ছিল না। কেননা চটুল নাগরিকতার প্রভাবে আঠারো শতকের মানুষ জটিল তত্ত্বের কচকচির তুলনায় হালকা রসের আমেজ সৃষ্টিকারী গল্পের প্রতি বেশি ঝুঁকেছিল। যাইহোক, এই অধ্যায়টির আলোচনা থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিছু পরিমাণে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল মুসলমান কবিদের দানে। মুসলমান কবিদের এই অবদানটুকু যথাযোগ্য স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই হয়তো প্রাগাধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন সম্পূর্ণ হতে পারে।

১.৪.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ইসলামী বাংলা সাহিত্য — ড. সুকুমার সেন।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) — ড. সুকুমার সেন
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
৫. বাংলা সাহিত্য পরিচয় — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
৬. লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না — দৌলতকাজি — সাহিত্য সংসদ
৭. মুসলিম বাংলা সাহিত্য — ড. এনামুল হক

১.৪.১৪.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. পঞ্চদশ শতকে বাঙালি মুসলিম কবিদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।
২. ষোড়শ শতকে মুসলিম কবিদের কবি প্রতিভা সম্পর্কে আলোকপাত করো।
৩. দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওলের কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
৪. বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরাকান রাজসভার ভূমিকা আলোচনা করো।
৫. প্রণয় এবং যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য রচনায় ইসলামধর্মী কবিদের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
৬. টীকা লেখ ঃ

(ক) শাহ মহম্মদ সগীর
(খ) বাহরাম খান
(গ) দৌলতকাজী
(ঘ) সৈয়দ আলাওল
(ঙ) মাগন ঠাকুর
(চ) সৈয়দ হামজা
(ছ) আরাকান রাজসভা

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

গীতিকা (গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য)

বিন্যাসক্রম

১.৪.১৫.১ ঃ উদ্দেশ্য
১.৪.১৫.২ ঃ প্রস্তাবনা
১.৪.১৫.৩ ঃ গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
  ১.৪.১৫.৩.১ ঃ সাংগীতিক উপাদান
  ১.৪.১৫.৩.২ ঃ কাহিনীমূলক
  ১.৪.১৫.৩.৩ ঃ প্রকাশরীতির স্বাতন্ত্র্য
১.৪.১৫.৪ ঃ গীতিকার শ্রেণীবিভাগ
  ১.৪.১৫.৪.১ ঃ নাথ গীতিকা
  ১.৪.১৫.৪.২ ঃ ময়মনসিংহের গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা
১.৪.১৫.৫ ঃ কয়েকটি গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা
  ১.৪.১৫.৫.১ ঃ চন্দ্রাবতী পালা
  ১.৪.১৫.৫.২ ঃ মহুয়া পালা
  ১.৪.১৫.৫.৩ ঃ মহুয়া চরিত্র
১.৪.১৫.৬ ঃ আলোচনার নির্যাস
১.৪.১৫.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী
১.৪.১৫.৮ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৫.১ : উদ্দেশ্য

পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রামীণ জনপদে সুধী শ্রোতৃবৃন্দ গীতিকাগুলির কাহিনীরসে যুগযুগান্ত ধরে আপ্লুত ছিলেন। একাধারে কাহিনী অন্যদিকে সংগীতের আধার গীতিকাগুলি বাংলার লোকসাহিত্যের পরম্পরাবাহিত সাহিত্যিক নিদর্শন। ছাত্র-গবেষকদের গীতিকার মণিদীপ্তিতে বিভাসিত করার উদ্দেশ্যেই এই পাঠ্যসূচীর অবতারণা।

১.৪.১৫.২ : প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় প্রণয়মূলক আখ্যানকাব্যধারা গীতিকার রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত ছিল। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলের সংসর্গ ত্যাগ করে গ্রামীণ আবহে লালিত এই গীতিকাগুলি বিষয় ও সামাজিক প্রেক্ষিতগত কারণে পাশ্চাত্যের ব্যালাডে-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার জল-হাওয়াপুষ্ট এই গীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অখ্যাতির অন্তরালে বিলীয়মান রচয়িতাগণ লৌকিক উপাদানগ্রহণ করে যে গ্রামীণ কাব্যকলা গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাই ১৮৭৮ স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার শিক্ষিত মহলে গীতিকার প্রতি তুমুল মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এর পর বাংলার শিক্ষিত মহলে গীতিকার প্রতি তুমুল মনোযোগ আকর্ষিত হয়। ফলে দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, কেদারনাথ মজুমদারের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গীতিকার বিচিত্র রচনাসম্ভার উদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

> *গীতিকাগুলি পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত ছিল। গীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৮৭৮ স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার শিক্ষিত মহলে গীতিকার প্রতি মনোযোগ দেয়। দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, কেদারনাথ মজুমদার পূর্ববঙ্গ থেকে গীতিকার রচনা উদ্ধার করেন। ফলস্বরূপ মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বার উন্মোচিত হয়।*

এর ফলস্বরূপ বাঙালি পাঠকের কাছে মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার দ্বার উন্মোচিত হয়। আলোচ্য অংশে আমরা সেই গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রশ্ন :

১। গীতিকা কোথায় বেশি প্রচলিত ছিল?
২। পূর্ববঙ্গ থেকে গীতিকার রচনা উদ্ধার করে আনেন এমন দু'জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ কর।

১.৪.১৫.৩ : গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

লৌকিক কাব্যরূপে পরিচিত গীতিকাগুলি একাধারে কবিতা এবং লোকগীতি। প্রকরণের দিক থেকেও গীতিকাগুলি গীতিকবিতার স্বভাবপুষ্ট। অন্যদিকে গীতিকা লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীমূলক সংগীত। কাহিনীর উপস্থিতি যেমন গীতিকায় লক্ষণীয়, তেমনি সঙ্গীতের সুরহিল্লোল ও গীতিকায় সহজলভ্য। কাহিনীর এই সাংগীতিক বয়নের কারণেই পাশ্চাত্যের 'ব্যালাড' এর সঙ্গে বাংলা গীতিকার অন্তর্মিল লক্ষ্য করা যায়। 'ব্যালাড' সংক্রান্ত সংজ্ঞায় ড. সুর হেলেন চাইল্ড বিটরেজ গ্রিস ব্যালাডের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীতিকার প্রযোজ্য। যেমন—

সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বর্ণিত গল্পই গীতিকা

- 'A Ballad is a song that tells a story or to take other point of view-a story told in song'

◆ গীতিকা একটি সরল, ছোট ছোট স্তবক নির্মিত, জনপ্রিয় কাহিনীর লৈখিক চিত্রের আকারে সংরচনা। [A simple spirited poem in short stanzas in which some popular story is graphically fold].

নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত একক ঘটনাকেন্দ্রিক কাহিনীকে গীতিকা বলা যেতে পারে। [It deals with a ringle situation revealed dramatically]

গীতিকাগুলি সরল ছন্দ এবং সাধারণ সুরে বর্ণিত কাহিনী। [The traditional Ballad is a song that tells a story in simple verse and to a simple tune.]

গীতিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীকথক অনুপস্থিত থাকেন। মধ্যযুগে রচিত হলেও গীতিকায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ প্রায় অনুল্লেখ্য (বন্দনা অংশ ব্যতীত)। গীতিকার চরিত্রেরা প্রায় সকলেই ভূমিপুত্র ন কন্যা। এই দেশ চরিত্রের সমবায়ে রচিত গীতিকাগুলি মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী। গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত গীতিকাগুলি মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী। গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

১.৪.১৫.৩.১ : সাংগীতিক উপাদান

গীতিকা একধরনের সংগীত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন — 'গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবলমাত্র আবৃত্তি করা হয় না।' গ্রামীণ পটভূমিতে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে স্থায়ী করে রাখার জন্যই গীতিকা সংগীতের রূপলাভ করে। প্রথমাবস্থায় মৌখিক রচনা ছিল বলেই লোকগীতির মতো গীতিকাও গাওয়া হতো। সুরসহযোগে গীত না হলে গীতিকার প্রকৃত মাধুর্য উপলব্ধি করা যেত না।

অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য রচিত গীতিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণবিশিষ্ট। সঙ্গীতরূপে ব্যবহারের সুবিধার জন্যই ক্ষুদ্র চরণের অবতারণা। গীতিকায় ব্যবহৃত অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত পয়ার ছন্দও সঙ্গীতের পক্ষে উপযোগী। ব্যালাডের মতো গীতিকাগুলিও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীতি হত। কিন্তু অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতো গীতিকাগুলিতে সুরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়নি।

> "সাধারণ লোকসঙ্গীত বিভিন্ন সুরে গীত হয় তাহাতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণমাত্র, বরং কথা সুরের অধীন, কথা সুরের অধীন নহে, কিন্তু গীতিকায় ইহার বিপরীত ইহাতে কথাই মুখ্য, সুর গৌণ মাত্র।"

গতানুগতির সুরেই গীতিকাগুলি গাওয়া হয়। গীতিকাগুলির 'বন্দনাগীতি' অংশ থেকে সংগীতের গুরু শিষ্য পরম্পরার কথা জানা যায়। 'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে শিবুবায়েনের কৃত ওস্তাদের চরণ বন্দনার মধ্যেও গীতিকার সাঙ্গীতিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে—

> "খোল করতাল বন্দুক যজ্ঞ যত ইতি
> ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি।"

পালাগানের মতো গীতিকাতেও 'ধুয়া' বা একাধিক পদের পুনরাবৃত্তির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায় 'মৈমনসিংহ গীতিকার' প্রায় সমস্ত পালাতেই এই 'ধুয়া'-র প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

১.৪.১৫.৩.২ : কাহিনীমূলক

গীতিকা লোকসংগীত হলেও তা কাহিনীমূলক। গীতিকায় একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা থাকে। অবশ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনামাত্র নয়, বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। গীতিকায় উপস্থাপিত কাহিনী প্রায়শই শিথিল। পাশ্চাত্য ব্যালাডের মতো তা দৃঢ় ও সংহত নয়। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'দেওয়ানা মদিনা' ইত্যাদি পালায় কাহিনী উচ্ছাসে পরিপূর্ণ।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির মূল আখ্যান বিষয় প্রেম ও ব্যর্থতা-অভিশপ্ত প্রণয়মূলক কাহিনীই গীতিকাগুলির মূলধন। বাংলা গীতিকাগুলিতে 'চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, অবৈধ প্রণয়, হত্যা, প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন পলায়ন' ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার ঘনঘটায় ও চমৎকারিত্বে পাঠককে মোহিত করত—

'গীতিকার কাহিনীর আবেদনই শ্রোতৃমন্ডলীকে আকৃষ্ট করে।'

কাহিনী পরিবেশনের জন্যই যেন গীতিকাগুলি সৃষ্টি। মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলিতে বিধৃত কাহিনীগুলি গ্রামবাংলার লোকজীবনের সরল কাহিনীকেও তুলে ধরে।

> *গীতিকাগুলি একাধারে কবিতা এবং লোকগীতি। কাহিনীর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গীতের সুরহিল্লোলও গীতিকায় সহজলভ্য। পাশ্চাত্যের 'ব্যালাড' এর সঙ্গে বাংলা গীতিকার অন্তর্মিল লক্ষ্য করা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—'গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবলমাত্র আবৃত্তি করা হয় না।' গীতিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণবিশিষ্ট ও গতানুগতির সুরেই গাওয়া হয়। গীতিকা লোকসংগীত হলেও তা কাহিনীমূলক। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি লোকজীবনের সহজ-সরল প্রেম ও ব্যর্থতা- অভিশপ্ত প্রণয়মূলক কাহিনী। গীতিকাগুলির মধ্যে নাট্যগুণ লক্ষ্য করা যায়। গীতিকাগুলিতে সংলাপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।*

প্রশ্ন :

১। গীতিকার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ ?
২। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার মূল বিষয় কি ?

১.৪.১৫.৩.৩ : প্রকাশরীতির স্বাতন্ত্র্য

গীতিকাগুলির মধ্যে নাট্যগুণ লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীতে উপস্থিত চরিত্রগুলির মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। তাই গীতিকাগুলিতে সংলাপের প্রাধান্য। যেমন— 'মহুয়া'র ৭৮৯ পঙ্‌ক্তির মধ্যে ৩৫৯ পঙ্‌ক্তি, চন্দ্রাবতীর ৩৭৯ পঙ্‌ক্তির মধ্যে ১৬৭ পঙ্‌ক্তি পাত্র-পাত্রী মধ্যেকার সংলাপ 'মহুয়া' পালার এইরকম কথোপকথনের উদাহরণ—

"শুন শুন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই।।
কি করবো ভাই বাড়ীঘরে খাইবাম ভিক্ষামাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে।"
(হুমরা ওমাইন কিয়ার পরামর্শ)

তবে পারিপার্শ্বিক ঘটনার বাহুল্য ও দীর্ঘ শাখানির্ভর কাহিনীর কারণে প্রায়শই গীতিকাগুলির নাট্যগুণ ব্যাহত হয়েছে। ইউরোপীয় ব্যালাডের নাটকীয়তা, সংহতির অভাবে, বাংলা গীতিকাগুলিতে অনুপস্থিত।

গীতিকাগুলি খণ্ড খণ্ড স্তবকে নির্মিত। সাংগীতিকগুণ সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট অবয়ব নির্মাণ। ছন্দের নির্মিতেও এই সারল্য চোখে পড়ে। তাই গীতিকার মূল স্বরটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

১.৪.১৫.৪ : গীতিকার শ্রেণীবিভাগ

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাপ্ত গীতিকাগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গগীতিকা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক এই শ্রেণীবিভাজনের সঙ্গে ঈষৎ মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, ড. বহ্নিকুমার ভট্টাচার্যের মতে, বাংলা গীতিকাগুলি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক বা ইতিহাস মিশ্রিত, ধর্মাশ্রিত গাথা, নীতিকথাশ্রিত গাথা এবং বারমাসীগাথা।

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকার বত্রিশটি পালাকে ড. বহ্নিকুমার প্রণয় গাথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়াও খলিল রচিত চন্দ্রমুখীর পুঁথি, সৈয়দ হাজমার 'মধুমালতী', ফকিররাম কবিভূষণের 'সঙ্গীসোনা' প্রভৃতি কাব্যও প্রণয় গাথার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক গীতিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে বারোটি পালা। এর মধ্যে চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যুকেনারাম', 'নিজাম ডাকাতের পালা' উল্লেখযোগ্য। ধর্মাশ্রিত পালাগুলির মধ্যে নাথগীতিকা এবং বারমাসী গাথার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মলয়ার বারমাসী', 'বগুলার বারমাসী' ইত্যাদি পালা।

অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী তাঁর 'গীতিকা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে গীতিকাগুলিকে তেরোটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন—

(ক) অলৌকিক কাহিনীকেন্দ্রিক গীতিকা
(খ) ধর্মীয় গীতিকা
(গ) রোমান্টিক বিয়োগান্তক
(ঘ) প্রেমকেন্দ্রিক গীতিকা
(ঙ) রাখালী গীতিকা
(চ) গৃহবিবাদ সংক্রান্ত গীতিকা
(ছ) ঐতিহাসিক গীতিকা
(জ) অর্ধ ঐতিহাসিক গীতিকা
(ঝ) অপমৃত্যু ও বিপদ বিষয়ক গীতিকা
(ঞ) চর্যা
(ট) আঞ্চলিক গীতিকা

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গীতিকাগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা — নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ডঃ বহ্নিকুমার ভট্টাচার্যের মতে বাংলা গীতিকাগুলি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী তাঁর 'গীতিকাস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে গীতিকাগুলিকে তেরোটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। অধিকাংশ গীতিকার বিষয় যেহেতু প্রণয় ও প্রণয়কেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহ, তাই ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী প্রণয়মূলক গীতিকাগুলিকে উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

নাথ গীতিকার মূল বিষয় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ ও নাথ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। নাথগীতিকার দুটি ভাগ — একটি গোর্খানাথ-মীননাথের কাহিনী, অন্যটি গোপীচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী।

১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পালাগুলির মধ্যে 'মহুয়া', 'মলুয়া' 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর পালা', 'দেওয়ান ভাবনা', 'কঙ্ক ও লীলা', 'দস্যুকেনারামের পালা' উল্লেখযোগ্য।

(ঠ) লোক - নায়ক

(ড) ধাঁধাকেন্দ্রিক গীতিকা

(ঢ) হাসির কাহিনী

অধিকাংশ গীতিকার বিষয় যেহেতু প্রণয় ও প্রণয়কেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহ, তাই ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রণয়মূলক গীতিকাগুলিকে কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন— খাঁটি প্রেম কাহিনীমূলক, ধর্মভিত্তিক প্রেম, রূপক প্রণয়গীতিকা, বিবাহোত্তর প্রেম। মহুয়া, মলুয়া, সুরৎ জামাল, ভেলুয়া, আয়নাবিবি, দেওয়ান ভাবনা— প্রভৃতি খাঁটি প্রেমকাহিনীমূলক গীতিকা পর্যায়ের। ধর্মবিষয়ক প্রেমমূলক গীতিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রাবতীর পালা। 'দেওয়ানা মদিনা বিবাহোত্তর প্রেম নিয়ে রচিত গীতিকার দৃষ্টান্ত।

ধর্মীয় ও আঞ্চলিকতার বিচারে গীতিকাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা—

নাথগীতিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা

পূর্ববঙ্গগীতিকা।

প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশে প্রাপ্ত গীতিকাগুলি কটি শ্রেণীতে বিভক্ত ও কি কি ?

২। নাথ গীতিকার কটি ভাগ ও কি কি ?

৩। মৈমনসিংহ গীতিকা কতসালে, কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ?

১.৪.১৫.৪.১ : নাথ গীতিকা

নাথ গীতিকার মূল বিষয় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ ও নাথ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। নাথগীতিকাগুলির দুটি প্রধান ভাগ লক্ষ্য করা যায়, — একটি গোর্খানাথ-মীননাথের কাহিনী, অন্যটি গোপীচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী। গীতিকাগুলির মধ্যে নাথ গীতিকাগুলিই সর্বাধিক প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। রায়দুর্লভ রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীত পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একমাত্র নাথ গীতিকা। অন্যান্য নাথ গীতিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মানিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের পাঁচালি, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ইত্যাদি।

১.৪.১৫.৪.২ : ময়মনসিংহের গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চন্দ্রকুমার দে, কেদারনাথ মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলি ময়মনসিংহের গীতিকা পরিচিত। এই পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর পালা', 'দেওয়ান ভাবনা', 'কঙ্ক ও লীলা', 'দস্যুকেনারামের পালা' ইত্যাদি। ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চারখণ্ডে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পালা প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডের নামই কেবল রাখা হয়েছে— যথাক্রমে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। মূলতঃ প্রেম ব্যর্থতা অভিশপ্ত প্রণয়ই এই গীতিকাগুলির কাহিনী নির্মাণ করেছে।

১.৪.১৫.৫ : কয়েকটি গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা

পাশ্চাত্যের 'ব্যালাড' ও বাংলার 'গীতিকা' প্রায় সমধর্মী রচনা। সঙ্গীতের আঙ্গিকে পরিবেশিত প্রেম-বিরহমূলক কাহিনীও গীতিকা। তবে পাশ্চাত্যের 'ব্যালাড' একদিকে যেমন সুবিন্যস্ত, তেমনি নাট্যগুণও উপস্থিত সেখানে। তুলনায় বাংলা গীতিকাগুলিতে ঘটনার পরিবর্তে বর্ণনার প্রাধান্য পাওয়া যায়। গীতিকায় পরিবেশিত কাহিনীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিথিলভাবে বিন্যস্ত। অতিকথনের ফলে প্রায়শই কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। যে কয়টি গীতিকা এই বাহুল্যদোষ মুক্ত, সংহত ও দৃঢ় কাহিনীতে ঋদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম 'চন্দ্রাবতী' পালা। ইতিহাস ও কিংবদন্তীর গর্ভগৃহ থেকে উঠে আসা কাহিনী নিয়ে কবি নয়নচাঁদ ঘোষ যে পালা লিখলেন আকারে সংক্ষিপ্ত হওয়ায়, তা একদিকে যেমন মনোগ্রাহী হয়েছে, তেমনি নির্মেদ অবয়ব লাভ করেছে। চন্দ্রাবতীর কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যই মূর্ত হয়ে উঠবে।

বাংলাসাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের প্রণয়, পরে জয়চন্দ্রের পদস্খলন এবং পরিণামে মৃত্যু ও চন্দ্রাবতীর ট্র্যাজিক উপলব্ধি এই পালার মূল বিষয়। পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাগুলির মতো এই পালাও বিয়োগান্তক। চন্দ্রাবতী পালার প্রথম পরিচ্ছেদে বাল্য প্রেমের বর্ণনা। পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেমের বর্ণনা।

১.৪.১৫.৫.১ : চন্দ্রাবতী পালা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। চন্দ্রাবতী রামায়ণ ও চন্দ্রাবতী — উভয়ের কাহিনীই চন্দ্রাবতীর পালার কেন্দ্রে অবস্থিত। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের প্রণয় — জয়চন্দ্রের পদস্খলন এবং পরিণামে তাঁর মৃত্যু ও চন্দ্রাবতীর ট্র্যাজিক উপলব্ধি এই পালার মূল বিষয়। অন্যান্য পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাগুলির মতো এই পালাও বিয়োগান্তক। তবে অন্যান্য পালার মতো এই করুণ পরিণতি অশ্রুবহুল নয়, বরং সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আরও ব্যাপক ও বেদনা সঞ্চারী।

সপ্তম পরিচ্ছেদে - চন্দ্রাবতীর পিতার নিকট, জয়ানন্দের বিবাহের প্রস্তাব। কিন্তু জয়ানন্দ এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করল। পরিণামে চন্দ্রাবতীর জীবনে দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এল। তারপর চন্দ্রাবতী অনূঢ়া থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় ও 'রামায়ণ' রচনায় মনোনিবেশ করে। দ্বাদশ অর্থাৎ অন্তিম পরিচ্ছেদে জয়ানন্দের তীব্র আত্মদহনে এই পালার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল।

চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র বাল্য সহচর। চন্দ্রাবতী পালার প্রথম পরিচ্ছেদে সেই বাল্য প্রেমের বর্ণনা। শিবপূজার জন্য ফুল তুলতে গেলে জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীকে সহায়তা করে। লেখক এই ফুল তোলার সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সন-বৎসর তারিখকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—

"এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়।
সকাল সন্ধ্যা ফুল তুলে কেউ না দেখতে পায়।।
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী।
একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি তায়।
সেইত না মালা দিয়া নাগরে সাজায়।।"

ফুল সজ্জার মধ্য দিয়ে চন্দ্রাবতী তার প্রেমাস্পদকে অন্তরে বরণ করে নেয়।

পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছদে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেমের স্লোগান তৈরি হল। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছে একটি চিঠি লিখে প্রেম নিবেদন করে। দ্বাররুদ্ধ ঘরে বসে সেই পত্রপাঠ করে চন্দ্রাবতীর দুটি আঁখি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কেননা—

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।।"

সপ্তম পরিচ্ছদে ঘটক চন্দ্রাবতীর পিতার নিকট উপস্থিত হলো, চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। চন্দ্রাবতীর পিতা এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি জানালে, বিবাহের আয়োজন শুরু।

মসৃণগতিতে এগিয়ে চলা এই প্রণয়কাহিনীতে হঠাৎই পরিবর্তন এল জয়ানন্দের আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। জয়ানন্দ এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করল। মাত্র-দুটি পরিচ্ছেদে (নবম ও দশম) কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতির পটভূমি তৈরি হলো। জয়চন্দ্রের সঙ্গে মুসলমান কন্যার প্রণয় ও বিবাহ চন্দ্রাবতীর জীবনে চূড়ান্ত দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এল। ঘটনার আকস্মিকতায় চন্দ্রাবতী পাষাণ হয়ে গেল যেন—

"শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন।।
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।"

কন্যার এই অসহনীয় বিরহ দূর করতে পিতা বংশীদাস চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ অনুবাদের নির্দেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রেমে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আজীবন অনূঢ়া থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

দ্বাদশ অর্থাৎ অন্তিম পরিচ্ছেদে এই পালার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল। জয়ানন্দ তার স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হল। চন্দ্রাবতীকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়ে পত্র দিল। চন্দ্রাবতী সে কথা পিতাকে জানালে, তিনি তাকে শিবপূজায় একাত্ম হতে বললেন। অনেক সাধ্য সাধনা করেও জয়ানন্দ চন্দ্রার দেখা পেল না। জয়ানন্দ তীব্র আত্মদহনে জর্জরিত হয়ে মন্দিরের দ্বারে বিদায়বাণী লিখে নদীর জলে প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রাণ ত্যাগের পূর্বে সে উপলব্ধি করে—

"অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল - হলাহল।।
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাচ্ছি অকালে।।"

মন্দিরে যবন স্পর্শ লেগেছে, তাই চন্দ্রাবতী কাঁদতে কাঁদতে তর্পণ করতে গেলো। সে সেখানে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখল— জয়ানন্দের মৃতদেহ নদীতে ভাসছে—

প্রশ্ন :

১। বাংলাসাহিত্যের প্রথম মহিলা কবির নাম কি ?
২। চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কি ?
৩। চন্দ্রাবতী পালাটি কতগুলি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত ?

"দেখিতে সুন্দর নগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান।।"

এই দৃশ্য দেখে চন্দ্রাবতী বাক্যহারা হয়ে গেল —

'আখিতে পুলক নাহি সুখে নাই যে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদার কামিনী।।
স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান চান্দে গায়।
নিজের অন্তরের দুক্কু পরকে বুঝান দায়।।'

'চন্দ্রাবতী'র এই কাহিনী প্রচলিত গীতিকাগুলির চেনা কাহিনী বৃত্তের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, ট্র্যাজিক রস এবং মৃত্যুর মতো করুণ পরিণতি এই পালাতে উপস্থিত। বরং 'মহুয়া', 'মলুয়া প্রভৃতি পালাতে যে চমৎকার নাট্যগুণ পরিলক্ষিত হয়, 'চন্দ্রাবতী'তে তার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আধুনিক কবিতাসুলভ বাক্ সংক্ষিপ্ততা চন্দ্রাবতীকে নির্মেদ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পরিচ্ছেদ ও পঙক্তির বিচারে অন্যান্য 'ময়মনসিংহ' গীতিকাগুলির তুলনায় 'চন্দ্রাবতী' ক্ষুদ্রায়তন—

পালার নাম	পরিচ্ছদ সংখ্যা	পঙক্তিসংখ্যা	বন্দনা অংশ
মহুয়া পালা	২৪	৭৮৯	উপস্থিত
মলুয়াপালা	১৯	১২৫৭	উপস্থিত
কঙ্কলীলা	২৩ (উপ-পরিচ্ছদযুক্ত)	১৮০৪	উপস্থিত
চন্দ্রাবতী	১২	৩৭৯	অনুপস্থিত

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে কবি এই পালায় বর্ণনা বাহুল্য পরিত্যাগ করেছেন। সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত বাক্যগুলি ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রণয় লীলাও বিরহ করুণ পরিণতির গীতিভাষা রচনা করেন তিনি মাত্র ১২টি পরিচ্ছেদে। তার কাহিনীর অগ্রগতির জন্য তিনি যেভাবে পরিচ্ছেদ বিন্যাস করেছেন তা নিম্নরূপ—

চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেম ঃ ১ থেকে ৬ পরিচ্ছেদ। তাদের বাল্যকালের সখ্যতা, প্রেমের প্রস্তাব এবং নীরব হৃদয় দানের প্রসঙ্গ।

বিবাহ ঃ ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদ। বিবাহের প্রস্তাব ও বিবাহের আয়োজন।

নাটকীয় বাঁক ঃ ৯ম, ১০ম পরিচ্ছেদ জয়ানন্দের পদস্খলন, মুসলিম কন্যাকে বিবাহের প্রসঙ্গ।

ট্রাজিক পরিণতি ঃ ৯ম ও ১২তম পরিচ্ছেদ দুঃসংবাদ শ্রবণ ও চন্দ্রার মানসিক অবস্থা, জয়ানন্দের আত্মদহন এবং মৃত্যু।

কবি সতর্কতার সঙ্গে বহুল বর্ণনা বর্জন করেছেন। চন্দ্রাবতী এই কাহিনীর নায়িকা অথচ তার শারীরিক বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। শুধু প্রেমের অঙ্কুর হৃদয়ে মুকুলিত হলে অথবা প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভূত হলে এই নায়িকার অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। প্রেমে ব্যর্থ নায়িকার অস্থির মানসিকতারও প্রকাশ ঘটেছে সংক্ষিপ্তভাবে—

পাতেতে রাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায়।
রাত্রিকালে শর শয্যা বহে চক্ষের পানি।।

বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি,
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুমে রজনী।
ভোর হইতে উঠে কন্যা যেমন পাগলিনী।।

জয়ানন্দের মৃতদেহ দেখার পর চন্দ্রাবতীর উত্তাল হৃদয়ের প্রতিক্রিয়াও মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তিতে বিধৃত।

"আখিতে পলক নাহি মুখে নাহি যে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কাহিনী।।"

'উমেদা' শব্দটির মধ্যেই যেন যাবতীয় শোকের উপাদান নিহিত। কাহিনীর গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাসের। কিন্তু কাব্যেও তার জন্যও কোনো বর্ণনামূলক বাক্য ব্যয়িত হয়নি। যেমন শিবপূজার উল্লেখ থাকলেও শিবপূজার কোনো বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বর্ণনাও ব্রাত্য থেকে গেছে, গতিময়তা প্রদানের জন্যই যেন এই বাকসংযম। গীতিকাতে কাব্যসুষমা প্রদানের জন্য তিনি যে প্রকৃতির বর্ণনা করেন, সংযম সেখানেও। ভোরের বর্ণনা দেন মাত্র দুটি পঙক্তি—

"আবে করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে মাইল অরুণ গায়ে হলুদমাখা"

আবার উপমা রূপক নির্মাণেও সংহতির লক্ষণস্পষ্ট—

'জৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি।'

উদ্ভিন্ন যৌবনা নায়িকার দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনা এর থেকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ বোধ হয় অসম্ভব।

এইভাবে সমগ্র গীতিকাটি কবির কবিত্বময় বাকবিন্যাস ও সংহত অবয়বের কারণে **'Compact'** রূপলাভ করেছে। কাব্যে কাহিনীবস্তু সংক্ষিপ্ত হলেও তা আকর্ষক ও মনোগ্রাহী হয়েছে, কবির পরিমিতি বোধের জন্য। তাই 'চন্দ্রাবতী' পালার সার্থকগীতিকা হয়ে ওঠার জন্য তার সংক্ষিপ্ত আকারও সদাসক্রিয়।

১.৪.১৫.৫.২ : মহুয়া পালা

'মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখের প্রেরণায়' লিখিত ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমের কথাভাষ্য। লোক আঙ্গিকে লেখা দ্বিজকানাই প্রণীত 'মহুয়া' পালাটিও গ্রামীণ মানবিক প্রেম-বিরহের অশ্রুজলে লিখিত। নায়িকা ভাগ্যবিড়ম্বিতা 'মহুয়ার' অপূর্ণ প্রেম ও মৃত্যু এই পালার মূল কথাবস্তু। সর্বমোট চব্বিশটি পরিচ্ছদ ও ৭৮৯টি পঙ্‌ক্তিতে নাটকীয় ভঙ্গিতে মহুয়ার নাটকীয় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত। জীবনরসের প্রাচুর্যে ভরপুর এই কাহিনীকে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন— তাকে কেবল 'মহুয়া' পালার নিটোল কাহিনীর জন্যেই।

গারো পাহাড়ের বেদে সর্দার হুমরা ধনু নদীর তীরের কাঞ্চনপুর গ্রাম থেকে এক ছ মাসের ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করে। হুমরা

> *লোক আঙ্গিকে লেখা দ্বিজকানাই প্রণীত 'মহুয়া' পালাটিও গ্রামীণ মানবিক প্রেম-বিরহের অশ্রুজলে লিখিত। নায়িকা ভাগ্যবিড়ম্বিতা 'মহুয়া'র অপূর্ণ প্রেম ও মৃত্যু এই পালার মূল কথাবস্তু। সর্বমোট চব্বিশটি পরিচ্ছেদ নাটকীয় ভঙ্গীতে মহুয়ার নাটকীয় জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত। কাহিনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি কথোপকথনের রীতি প্রায়ই অনুসরণ করেছেন। এই করুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর মর্মে মর্মে ঔপন্যাসিকের প্রতিভার ঝলক দেখা গেছে। বিশেষ করে 'মহুয়া' পালায় বাস্তবজীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়।*

ডাকাত তার নাম রাখল 'মহুয়া সুন্দরী'। ষোল বছর বয়সী সেই মেয়ের শরীরে রূপে অপূর্ব লাবণ্য দেখা দিল।

"সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।।"

বেদের দলের সঙ্গে সে খেলা দেখাত।

ভ্রাম্যমাণ বেদের দল একদিন এসে উপস্থিত হলো বামনকান্দা গ্রামে। সেখানে গ্রামের তালুকদার ব্রাহ্মণতয় নদ্যার চাঁদঠাকুর মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। প্রেমের 'পরবশ' হয়ে সে হুমরাবেদের দলকে নিজ গ্রামে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। অতঃপর নদীর ঘাটে নদ্যার চাঁদ ও মহুয়ার দেখা—

"কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাট গেল সেই না সন্ধ্যাকালে।

প্রেমের মাধুর্যে ভেসে গেল দুজন। তাদের অন্তরঙ্গ সহায়ক পালঙে মহুয়ার সখী।

কাহিনী বাঁক নিল হুমরাবেদের আচরণে। দলের খেলা দেখানোর প্রধান আকর্ষণ 'মহুয়া' নদ্যার চাঁদের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিহ্বল— এই খবর শুনে হুমরা, তার ভাই 'মাইনকিয়া বেদে'র সঙ্গে পরামর্শ করে দেশত্যাগ করতে মনস্থির করে। এই খবর শুনে অস্থির নদ্যার চাঁদ মহুয়ার সঙ্গ নিতে চাইলে মহুয়া তাকে নিবৃত করে। হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে দুই বিরহী হৃদয়ের বিচ্ছেদ ঘটল।

বেদের দল বামনকান্দা ত্যাগ করে চলে যাবার পর উন্মাদবৎ নদ্যার চাঁদ মহুয়ার সন্ধানে দেশান্তর হয়। অবশেষে কংসাই নদীর তীরে মহুয়ার দেখা পেল। দীর্ঘদিন অদর্শনের পর প্রেমিকের সঙ্গ পেয়ে মহুয়া যেন নবজীবন লাভ করলো—

"ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা।"

দীর্ঘদিন পর প্রাণচঞ্চল মহুয়াকে দেখে সন্দেহ হয় হুমরার, সে নদ্যার চাঁদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে মহুয়ার হাতে তুলে দেয় বিষ মাখানো ছুরি। সুপ্ত নদ্যার চাঁদকে হত্যা করা অসম্ভব কাজ, তাই মহুয়া আত্মঘাতিনী হতে চাইলে সদাজাগ্রত নদ্যার চাঁদ তাকে নিবৃত্ত করে। বলে—

"তোমার যদি না পাই কন্যা আর না যাইবধাম বাড়ী।
এই হাতে মারলো কন্যা আমর গলায় ছুরি।।"

মহুয়া নদ্যার চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দেশান্তরি হয়। শুরু হয় বিপদশঙ্কুল পদযাত্রা।

পথে তাদের সামনে মূর্তিমান বিপদ হয়ে উপস্থিত হয় সাধু। তার ডিঙ্গায় চড়ে মহুয়া ও নদ্যার চাঁদ নদী অতিক্রমের সময় মহুয়ার রূপে প্রলুব্ধ হয়ে সেই সাধু কৌশল করে নদ্যার চাঁদকে নৌকা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। মহুয়া বিলাপ শুরু করলে, সাধু তাকে অন্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করে তাকে প্রচুর ধনরত্নের

প্রশ্ন :

১। 'মহুয়া' পালায় নায়িকার নাম কি ?

২। 'মহুয়া' পালায় একজন ডাকাতের নাম পাওয়া যায়, তার নাম কি ?

প্রলোভন দেখায়। কিন্তু প্রেমের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে। পাহাড়ী তক্ষকের বিষ মেশানো পান খাইয়ে সে হত্যা করল সাধু ও তার সঙ্গীদের।

এরপর মহুয়া উন্মাদিনীর মতো নদ্যার চাঁদ ঠাকুরের সন্ধানে জঙ্গলে ঘুরতে থাকে। শেষে এক ভাঙা মন্দিরের কাছে নদ্যার চাঁদকে অচৈতন্য অবস্থায় পেল সে—

"শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড়।
মন্দিরের মাঝে দেখে মড়ার আকার।।"

এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বনের জড়িবুটির সাহায্যে বাঁচিয়ে তুলল তাকে। এই অলৌকিক চিকিৎসার পরিবর্তে সন্ন্যাসী মহুয়ার কাছে 'যৌবন ঐশ্বর্য' কামনা করে। এই কাজ মহুয়ার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই সে ফন্দী করে সন্ন্যাসীর নজর এড়িয়ে নদ্যার চাঁদকে কাঁধে চাপিয়ে বনের পথে পালিয়ে গেল।

পরবর্তী ছয়মাস তাদের সংসারে সুখের বান ডাকলো। বনের ফলমূল সংগ্রহ করে 'মালাম পাথার' শুয়ে সুখে দিন অতিবাহিত করল। কিন্তু এই সুখ তাদের কপালে সইল না। হুমরা বেদে যমের মতো উপস্থিত হল তাদের জীবনে। বজ্রকঠোর কণ্ঠে মহুয়াকে আদেশ দিল, বিষ মাখানো ছুরি দিয়ে নদ্যার চাঁদকে হত্যা করার। আর নির্দেশ দিল তার পালিত পুত্র সুজন খেলোয়াড়কে বিবাহ করতে। নিরুপায় মহুয়া সেই বিষ মাখানো ছুরি বুকে বসিয়ে আত্মঘাতিনী হল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হুমরার আদেশে নিহত হল নদ্যার চাঁদ। শেষপর্যন্ত হুমরার ইচ্ছানুসারে একই কবরে শান্তির নিদ্রায় একহল মহুয়া ও নদ্যার চাঁদ। তাদের কবর আগলে রইল পালঙ। তার চোখের জলে ভিজে গেল মাটি — সাঙ্গ হল মহুয়া পালা—

"পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এই খানে হইল সাঙ্গা নদীয়ার চান্দের কথা।।"

বাংলা গীতি কবিতার বিরুদ্ধে ওঠা শিথিল কাহিনী বিন্যাস ও বর্ণনার বাহুল্যের যে অভিযোগ, 'মহুয়া' পালা সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। অনাবশ্যক বিবরণের পথ পরিহার করে লেখক নির্মেদ কাহিনী নির্মাণে মনোযোগ করেছেন। এক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার আবেগ অনুরাগের প্রকাশও ঘটেছে সংহত মার্জিত ভাষায়—

"কও কও কও পক্ষী আরে বকও তরুলতা।
ঢেউয়ের কূলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা।।
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমায় খাও।
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পর খাইয়া জানাও।।"

(মহুয়া ব্যাকুলতা)

কাহিনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি কথোপকথনের রীতি প্রায়শই অনুসরণ করেছেন। এই পালার ৭৮৯ পংক্তির মধ্যে ৩৫৯টি কথোপকথনে রচিত।

এই করুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর মর্মে মর্মে ঔপন্যাসিকের প্রতিভার ঝলক দেখা গেছে। দৈব নিয়ন্ত্রিত সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যহীনতায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ময়মনসিংহ গীতিকা— বিশেষ করে মহুয়া পালায় বাস্তবজীবনের সম্মুখীন হই আমরা।

ড. বরুণ চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> "আমরা এই বাস্তবতার সন্ধান পাই নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায় এবং সর্বোপরি নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র-চিত্রণে। 'মহুয়া' আখ্যানটি একটি সার্থক উপন্যাস রচনার উপযোগী।"

তবে কাহিনী বর্ণনায় চমক থাকলেও ঘটনা বিন্যাসের দ্রুততা ও আকস্মিকতায় এই পালার নাট্যগুণ ব্যহত হয়েছে।

১.৪.১৫.৫.৩ : মহুয়া চরিত্র

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ব্যক্তিক অস্তিত্বে অনুৎসাহী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাই প্রায় অস্বীকৃত এখানে। মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি চরিত্র ছাড়া এই বিশেষ গুণ যখন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিরল, তখন ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। শুধুমাত্র নারীচরিত্ররূপে নয়, নিজভাগ্য নিয়ন্ত্রকের এইরকম আপ্রাণ চেষ্টার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। দৈবী প্রভাব নয়, নিষ্ঠুর মানবিক প্রতিহিংসা এই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণীর সামনে যতই বাধার প্রাচীর তুলুক না কেন, সে বার বার স্বীয় বুদ্ধি ও আন্তরিক সাহসে তা অতিক্রম করেছে, যখন ব্যর্থ হয়েছে নতি স্বীকার না করে আত্মঘাতিনী হয়েছে। এই হার না মানার মানসিকতাতেই সে উজ্জ্বল - ব্যতিক্রমী।

> ***মহুয়া চরিত্র শুধুমাত্র নারীচরিত্ররূপে নয়, নিজভাগ্য নিয়ন্ত্রকের আপ্রাণ চেষ্টার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। কবি দ্বিজকানাই 'মহুয়া' নামটি ব্যবহার করলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'বাদ্যানীর গানে' 'মহুয়া'র পরিবর্তে 'মেওয়া' নামটি প্রচলিত ছিল। হুমরার শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও সে নদ্যার চাঁদকে নিয়ে সংসার পেতেছে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও সে যথার্থভাবে অনার্য নায়িকা, সমগ্র গীতিকাগুলির মানস কন্যা।***

কবি দ্বিজকানাই 'মহুয়া' নামটি পালাতে ব্যবহার করলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'বাদ্যানীর গানে' মহুয়ার পরিবর্তে 'মেত্তয়া' নামটি প্রচলিত ছিল। কবি 'মহুয়া'র মাদকতাময় সৌন্দর্যের জন্যই বোধহয় এই নামটি চয়ন করেছেন। শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, আত্মিক প্রাণ প্রাচুর্যেও সে ভরপুর। উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শী মহুয়া লজ্জাবতীও, তাই প্রথম সাক্ষাতে নদ্যার চাঁদকে সে বলে—

> "তুমিতো ভিন্ন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
> তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি।।"

এই লজ্জা বেদিনীসুলভ নয়। হুমরা ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া যে প্রেমের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে অন্যান্য নারীর মতোই চরিত্রগুণের অধিকারী তা এখানে প্রকাশিত। একইসঙ্গে নিঃসঙ্গতার অভিমানেও সে অভিমানিনী। তাই বলে

> "এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
> কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা।।"

প্রশ্ন :

১। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'বাদ্যানীর গানে' 'মহুয়া'র পরিবর্তে কি নামটি প্রচলিত?

২। মহুয়া কাকে নিয়ে সংসার পেতেছে ?

গ্রাম্য কিশোরী হলেও মহুয়া মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছে। হুমরার শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও সে নদ্যার চাঁদকে নিয়ে সংসার পেতেছে। বিপদের উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অসহায় হলেও তার প্রত্যুৎপন্নমতি নষ্ট হয়নি। তাই সাধুকে সে বিষ মেশানো পান খাইয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে পারে, একইসঙ্গে ফন্দী করে 'বেউকুব' বানাতে পারে সন্ন্যাসীকে। তবে এই সাহসী মহুয়ার তুলনায় প্রেমিকা মহুয়া কাহিনীতে অধিকমাত্রায় সক্রিয়। সে তার প্রেমিক নদ্যার চাঁদের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত —

'তোর সঙ্গে যাইবাম রে বন্ধু হইয়া দেশান্তরী।'

এমনকি হুমরা বেদে নদ্যার চাঁদকে হত্যা করার জন্য মহুয়াকে নির্দেশ দিলে সে প্রাণত্যাগের পরিকল্পনা করে। এই মানসিকতাই তাকে মানসিক শক্তি প্রদান করেছে। অসুস্থ নদ্যার চাঁদের সেবা করার সময় তার এই মানসিক দৃঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়—

"নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাঁটা
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালাধলা পাঠা।।
নদ্যার চাঁদের জ্বর উঠছে মাথায় বেদনা তাত।
বাদ্যার ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায় হাত।।"

এই মানসিক দৃঢ়তা নিয়েই সে সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করে, রক্ষা করে নদ্যার চাঁদকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হুমরার প্রতিহিংসা থেকে বাঁচাতে পারে না তার প্রেমিককে। তাই সে আত্মঘাতিনী হল—

"কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মারি।।"

এইভাবে করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে মহুয়ার জীবন সূর্যের। কিন্তু স্থৈর্য, ধৈর্য— প্রেমের যে দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে তা ট্রাজিক নায়িকার শিরোপায় তাকে ভূষিত করেছে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও সে যথার্থভাবে অনার্য নায়িকা সমগ্র গীতিকাগুলির মানসকন্যা।

১.৪.১৫.৬ : আলোচনার নির্যাস

পাশ্চাত্যের **'Ballad'** এর মধ্যবর্তী বাংলা গীতিকাগুলি মূলত প্রণয়মূলক গীতিকবিতা। প্রণয় ব্যর্থতা এবং অভিশপ্ত প্রণয়ই গীতিকাগুলির প্রধান বিষয়। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ সন্নিহিত অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল বলেই এই গীতিকাগুলি পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা নামে পরিচিত। গীতিকাগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত — নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা। নাথ গীতিকাগুলিতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ ও নাথধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। অন্যান্য গীতিকাগুলি মূলত প্রণয়মূলক অথবা ধর্মীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতলগ্ন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রাবতীর পালা, মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যুকেনারামের পালা প্রভৃতি।

১.৪.১৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গীতিকাস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য — ড. বরুণ চক্রবর্তী।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩। মৈমনসিংহ গীতিকা — দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৪। মৈমনসিংহ গীতিকা — সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৫। বাংলা গাথা কাব্য— ড. বহ্নিকুমার ভট্টাচার্য

৬। পূর্ববঙ্গ গীতিকা — দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৭। লোকসাহিত্য — ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

১.৪.১৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। 'গীতিকাগুলি সংগীত ও কাহিনীর যুগলবন্দী' আলোচনা করো।

৩। গীতিকার শ্রেণীবিভাগ করে যে কোনো একটি গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। 'চন্দ্রাবতী' পালাটির প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা - 'চন্দ্রাবতী' পালাটির আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্যটির যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। ময়মনসিংহ গীতিকা কাকে বলে? মহুয়া পালাটির কাহিনী আলোচনা করে গীতিকারূপে এর সার্থকতা আলোচনা করো।

৬। মহুয়া চরিত্রটি 'মহুয়া' পালা অবলম্বনে আলোচনা করো।

৭। 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটি আলোচনা প্রসঙ্গে কঙ্কচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক : ১৬

লোকসাহিত্য (ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন)

বিন্যাস ক্রম

১.৪.১৬.১ উপস্থাপনা

১.৪.১৬.২ সাহিত্য ও লোকসাহিত্য : মিল ও স্বাতন্ত্র্য

১.৪.১৬.৩ লোকসাহিত্যের প্রকারভেদ কেন্দ্রিত আলোচনা

- ১.৪.১৬.৩.১ ছড়া
  - ১.৪.১৬.৩.১.১ ছড়ার শ্রেণীবিভাগ
  - ১.৪.১৬.৩.১.২ কয়েকটি ছড়া সম্পর্কে আলোচনা
  - ১.৪.১৬.৩.১.৩ ঘুম পাড়ানি ছড়া
  - ১.৪.১৬.৩.১.৪ ছেলে ভুলানো ছড়া
  - ১.৪.১৬.৩.১.৫ ব্রতের ছড়া
- ১.৪.১৬.৩.২ ধাঁধা
- ১.৪.১৬.৩.৩ প্রবাদ-প্রবচন
  - ১.৪.১৬.৩.৩.১ নানা বিষয়ক বাংলা প্রবাদ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.২ বাংলা প্রবাদে দেব-দেবী প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৩ বাংলা প্রবাদে ফলমূল প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৪ বাংলা প্রবাদে পাখ-পাখালী প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৫ বাংলা প্রবাদে মাছ প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৬ বাংলা প্রবাদে ফুল প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৭ বাংলা প্রবাদে শাকসবজি প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৮ বাংলা প্রবাদে বৃক্ষ প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.৯ বাংলা প্রবাদে জীবজন্তু প্রসঙ্গ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.১০ বিচিত্র বিষয়ক বাংলা প্রবাদ
  - ১.৪.১৬.৩.৩.১১ প্রবচন

১.৪.১৬.৪ আদর্শ প্রশ্নমালা

১.৪.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১.৪.১৬.১ : উপস্থাপনা

আমরা জানি 'সাহিত্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ রচনা বা রসরচনা। এখন কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমকে একত্রে সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য অনুযায়ী—"বস্তুত বহিঃ প্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।" (রবীন্দ্র—রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সাহিত্য প্রবন্ধ, পৃ-৬২১) সাহিত্যের নানাবিভাগ। এই সূত্রে 'লোকসাহিত্য' বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত।

১.৪.১৬.২ : সাহিত্য ও লোকসাহিত্য : মিল ও স্বাতন্ত্র্য

'লোকসাহিত্য' সম্পর্কে বলা যায় যে, যে সাহিত্য লোকেদের জন্য, লোকেদের দ্বারা ও লোকেদের নিয়ে সৃষ্টি, তাই হল লোকসাহিত্য। ইংরাজীতে যাকে 'Folk' বলা হয়, বাংলায় তাকেই বলা হয় 'লোক'। 'লোক' অর্থাৎ জন বা মানুষ। 'Folk' শব্দটির দ্বারা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, অনগ্রসর জন সমাজ ইত্যাদি নির্দেশিত হয়। সুতরাং সাহিত্য লোকজীবনের সংযোজক মাধ্যম। লোকসাহিত্য সংহত লোক সমাজের সৃষ্টি। সেখানকার মানুষজন লেখাপড়া কম জানে অথবা জানেই না। তবে পড়াশোনা কম জানলেও তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সৃজন ক্ষমতা প্রচুর। তারা সমাজের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই সেই শ্রেণীর মানুষ মুখে মুখে যা রচনা করে তাই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে যায়। সেইজন্য লোকসাহিত্যকে মৌখিক সাহিত্যও বলা হয়।

বাংলার 'লোকসাহিত্য' লোক সাধারণের হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাই সেখানে গ্রামীণ বাঙালী সমাজের মানস-প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। লোকসাহিত্য মূলতঃ লোকায়ত গ্রাম সমাজ থেকে উদ্ভুত বলেই সেখানে গ্রামের মানুষ যেমন আছে তেমনি এককালে নানা প্রয়োজনে গ্রাম থেকে আগত শহরে বসবাসকারী মানুষজনও আছে। লোকায়ত জনগণের অবস্থান গ্রামীণ বা শহরে যেখানেই হোক না কেন, তারা সুখে-দুঃখে লোকায়ত ঐতিহ্যের ধারাটিকে বহন করেই বেঁচে থাকতে চায়। তাই তাদের জীবন বীক্ষা ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন লোকসাহিত্যে সুলভ।

বস্তুত ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচিত এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলার 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক সুদীর্ঘ আলোচনাকে কেন্দ্র করেই বাংলা লোকসাহিত্য আলোচনার যথার্থ সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে। তবে বাংলা লোকসাহিত্যের চর্চার প্রচলন করেন ১৮১২ সালে উইলিয়াম কেরী 'ইতিহাসমালা' গল্পের সংকলনের মধ্য দিয়ে। আবার অন্যদিকে একই সময়ে (১৮১২) জার্মানীতে গ্রীম ভাইদের দ্বারা লোককথা সংগ্রহের ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। সেই সংকলন গ্রন্থেই লোকসাহিত্য চর্চার বোধন ঘটেছিল বলে অনেক বিদগ্ধ সমালোচকের ধারণা।

বলাবাহুল্য, লোকসংস্কৃতি বা 'Folklore' শব্দটি ১৮৪৬ খ্রীঃ William John Thoms কর্তৃক 'Ambrosemerton' (এ্যমব্রসমেরটন) ছদ্মনামে লণ্ডনের 'এথেনিয়াম' (The Athenaeum) পত্রিকাতে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

আমরা জানি উচ্চতর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক একটা কালের পরিচয় দেন। এমনকি সেই সময়ের জীবন যন্ত্রণাকে তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চান। ফলে সেইসব সাহিত্যে যুগ জিজ্ঞাসার সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার মেল বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লোকসাহিত্য সুশিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মননশীল মানুষের সৃষ্টি। তাই এই সমাজের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান লোক সাধারণই এর স্রষ্টা। আবার উচ্চতর সাহিত্য প্রথম থেকেই লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে লোকসাহিত্য মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়। মৌলিক সৃজনশীলতার এই ধারাটি (Tradition) শ্রুতি পরম্পরার মধ্যে দিয়ে লোকসাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অতঃপর পরিশীলিত বা অভিজাত লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে লোকায়ত সাহিত্যের পার্থক্যটুকু বুঝে নিতে হয়। পরিশীলিত সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলে তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী। যেমন রবীন্দ্রসাহিত্য একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও মানসিকতার প্রতিচ্ছবি কিন্তু লোকসাহিত্যে সংহত সম্প্রদায় বা সমাজের মানসিক বোধের প্রতিফলন। তা কিছুতেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সংহত সমাজ একত্রে বসে একসঙ্গে একই সময়ে লোকসাহিত্য রচনা করেছে। প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কিছু রচিত হয়, পরে তা নানা জনের দ্বারা নিত্য প্রবাহিত হয়ে পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়। তারপর লোকসাহিত্য সংযোজিত হয়ে একটা বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হয়।

লোকসাহিত্যের মধ্যে সহজ-সরল ভাবই প্রধান, এমনকি স্বতঃস্ফূর্ততা হল লোকসাহিত্যের মূল আকর্ষণ। জটিলতা বর্জিত বলে সাধারণ মানুষ তা সহজেই উপভোগ করতে পারে। আবার গ্রামে যারা বসবাস করে, তারা চিন্তায়, ধ্যান-ধারনায় ও মানসিকতায় খুবই সাধা-সিধে। তাই লোকসাহিত্যের মধ্যে কোন দুরূহ বিষয় স্থান পায়নি।

লোকসাহিত্য সৃষ্টির অবলম্বন সরলতা ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ প্রতীক ধর্মিতা। প্রতীক বা ব্যঞ্জনার আড়ালে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ক্রীড়া ও নাটক প্রভৃতি লোকসাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সৃষ্টি করেছে বৃহত্তর লোকায়ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মৌখিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত মাধ্যমের দ্বারা ঘটেছে এই সংস্কৃতির বিকাশ।

বলাবাহুল্য, আধুনিক পণ্ডিতগণ শুধুমাত্র অলিখিত নয়, অনেক লিখিত সাহিত্যকেও লোকসাহিত্য বলে গণ্য করেছেন। যেমন—'ঝুমুর গান', 'বাউল গান', 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি লিখিত সাহিত্য। এগুলিকে লোকসাহিত্য বলে গণ্য করা হয়। কেননা লোকসাহিত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এগুলির মধ্যে বর্তমান রয়েছে। আবার আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন—'লোক' বলতে কেবলমাত্র কৃষিজীবী পল্লীসমাজের জনগোষ্ঠীকেও নির্দেশ করে। সেই জনগোষ্ঠী, অঞ্চলগত জনগোষ্ঠী, বয়সগত, ধর্মীয় জনগোষ্ঠী, পেশাগত জনগোষ্ঠী প্রভৃতি।

১.৪.১৬.৩ : লোকসাহিত্যের প্রকারভেদ কেন্দ্রিত আলোচনা

অতঃপর লোকসাহিত্যকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। সেগুলি হল—ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোকনাট্য, লোকপুরাণ, লোকভাষা, রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে আমরা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করে কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীতে গৃহীত বিষয়গুলির সমালোচনায় অগ্রসর হব।

১.৪.১৬.৩.১ : ছড়া

লোকসাহিত্যের কথা বললেই আমরা তিনটি উপাদানকে স্মরণ করি, সেগুলি হল—'ছড়া', 'ধাঁধা' ও 'প্রবাদ'। লোকসাহিত্যে এই উপাদানগুলিতে কোন মহান আদর্শের কথা নেই—একান্ত সাধারণ মানুষের ঘরের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচর্যার পরিচয় পাওয়া যায় বলে—প্রবাদকে 'জ্ঞানের ভাণ্ডার' বলা হয়। আর ধাঁধা হল প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ছন্দোময় প্রকাশ স্বরূপ। তাই ধাঁধা হল 'বুদ্ধির ভাণ্ডার'। ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। সমাজের সব স্তরে ছড়া সমানভাবে আকর্ষণীয়। সেইজন্য ছড়াকে অভিহিত করা হয় 'রস ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার' হিসাবে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা শব্দ কোষ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে 'ছড়া' পদটি সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে বলে জানিয়েছেন।

'ছড়া' শব্দটি দেশজ হলেও ছড়ার রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল আনন্দ দান। মূলতঃ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যেগুলি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল সাধারণত সেগুলিকেই বলা হত ছড়া। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন—'ছড়া ছন্দোবদ্ধ পদ, বিশেষ ছন্দে গাঁথা পদ্যকথা গ্রাম্য কবিতা।' আবার ছড়া প্রসঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন—ছড়া হল 'কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা।' 'ছড়া' সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—"ছড়াগুলি এমন জিনিস যে তাদের যে ভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়ত রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখা নানা রকম আলোতে ধরে।" বলাবাহুল্য, ছড়ার মধ্যে লোকমুখিনতা আছে। সেইজন্য সুখ-দুঃখময় লোকায়ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে 'ছড়া' অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১.৪.১৬.৩.১.১ : ছড়ার শ্রেণীবিভাগ

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ছড়াকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—(ক) ঘুমপাড়ানি ছড়া (খ) ঘরোয়া খেলার ছড়া (গ) বাইরে খেলার ছড়া (ঘ) মেয়েলি ছড়া (ঙ) ঐন্দ্রজালিক ছড়া। আবার ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন ছড়াকে ভাগ করেছেন তিনভাগে—(ক) ঘুম পাড়ানি ছড়া (খ) মন ভোলানি ছড়া (গ) খেলা চালানি ছড়া। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. সুকুমার সেন ছড়াকে যেভাবে শ্রেণী বিভাজিত করে দেখিয়েছেন, তাকেই আরও সংক্ষেপে, সহজে প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক। তাঁর মতে ছড়াগুলি মূলত দুই শ্রেণীর, যথা—(ক) আনুষ্ঠানিক ছড়া (খ) অনানুষ্ঠানিক ছড়া।

১.৪.১৬.৩.১.২ : কয়েকটি ছড়া সম্পর্কে আলোচনা

'ছড়া'কে যেহেতু গ্রাম্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেইজন্য সেখানে গ্রামীণ লোকায়ত নর-নারীদের অংশ গ্রহণ জরুরী। আবার শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য সহজ সরল ভাষায় রচিত ছড়াগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সর্বোপরি ছড়া পাঠের মধ্যে দিয়ে শিশু ও নারীগণ যেমন মজা অনুভব করেন তেমনি খুশিতে উজ্জ্বল উপভোগ্য আনন্দ রসের অনুভব করেন।

১.৪.১৬.৩.১.৩ : ঘুম পাড়ানি ছড়া

এই ছড়াগুলি শিশুদেরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। শিশুটির মা কিম্বা যিনি শিশুটির পরিচর্যা করেন তিনি ঘুম পাড়ানোর সময় এই শ্রেণীর ছড়া বলে থাকেন। মূলতঃ শিশুটিকে ঘুম পাড়ানোর সময়, বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে, তার চোখে ঘুম নিয়ে আসাই হল ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলির মূল উদ্দেশ্য। যেমন, এই ছড়াটি—

"দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।।
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর।।"

উপরোক্ত ছড়াটি থেকে বোঝা যায়, শিশুরা যেহেতু দোলনা চড়তে ভালোবাসে, তাই দোলনার দুলুনিতে তাদের ঘুম পাড়ানোই হল সহজ উপায়। অনুরূপভাবে সুপ্রচলিত ও সুব্যবহৃত আরেকটি ছড়া এইরূপ—

"ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি।
মোদের বাড়ি এস।।
খাট নাই পালং নাই।
চোখ পেতে বসো।।
বাটা ভরা পান দিব গাল ভরে খেয়ো।
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেয়ো।।"

১.৪.১৬.৩.১.৪ : ছেলে ভুলানো ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ছড়ার এই বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—"বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী—তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৭৪৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদেরকে 'প্রকৃতির সৃজন' বলে মনে করতেন। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তিনি যে রসাস্বাদ করতেন, তা থেকেই বোঝা যায় ছড়ার মাধুর্য কত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ছড়াগুলির বয়স অনেক হলেও তা প্রতি মুহূর্তে নতুন

বলে মনে হয়। বিশেষতঃ লোকায়ত মানুষও প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। এখন আমরা কয়েকটি ছেলেভুলানো ছড়ার নিদর্শন তুলে ধরব—

"খোকন খোকন ডাক পাড়ি।
খোকন গেছে কার বাড়ি॥
আয়রে খোকন ঘরে আয়।
দুধ মাখা ভাত বিড়ালে খায়॥"

তেমনি—

"আয় রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥"

ছেলেভুলানো ছড়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এলো বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥"

তেমনি—

"আয় আয় চাঁদ মামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেব॥
ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেব॥
কালো গোরুর দুধ দেব।
দুধ খাবার বাটি দেব॥
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।"

ঘরের খেলার ছড়ার একটি উদাহরণ হল—

"ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর॥

দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।।
হিঙুল করে কড় মড়।
দাদা দিলে জগন্নাথ।।
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।।
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাও সে দুপুরবেলা।।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি।।
কোদাল হল ভোঁতা
খা ছুতরের মাথা।।"

১.৪.১৬.৩.১.৫ : ব্রতের ছড়া

আমরা জানি, বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ। সেইজন্য প্রতিটি উৎসবে বাড়ির মেয়েদের অনেক নিয়ম কানন মেনে চলতে হয়। মূলতঃ নারীরা তাদের সুখ-দুঃখময় জীবনকে ব্রতের ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেন। পরিবারের পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে আট-নয় বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা যে ব্রতগুলি পালন করে, তাদেরকে বলা হয় 'কুমারী ব্রত'।

একটি কুমারী ব্রতের উদাহরণ হল—

"শুষনী কলসী ল ল করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুকোয় বিল।
সোনার কৌটা রূপার খিল।।
খিল খুলতে লাগল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক্ লক্ষেশ্বর।।"

আর পরিবারের বড় মেয়েদের বিয়ের পর যে ব্রতগুলি করে, সেগুলি হল 'নারী ব্রত'। যেমন—

'অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা।।

অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥"

বৈশাখ মাসের সকালে প্রতিদিন মহিলারা যে ব্রত পালন করেন তাকে বলা হয় "পুণ্যিপুকুর ব্রত।' এই ব্রতের একটি দৃষ্টান্ত হল—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমেলা,
কে পূজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।"

সর্বোপরি একই ছড়ার অনেক পাঠ লক্ষ্য করা যায়। তবে কোনটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ—"ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্যে হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগঠিত হয় না।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী—তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৭৭০) যাইহোক, নারী সমাজের রক্ষণশীলতাই ছড়ার প্রাচীনতাকে ধরে রেখেছে। তাই ছড়ার যেমন সামাজিক মূল্য আছে, তেমনি এর মধ্যে নান্দনিকতাও বর্তমান।

১.৪.১৬.৩.২ : ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেননা তা জীবন-ভিত্তিক রচনা। যেগুলি মূলতঃ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত একপ্রকার 'গাথা' ভাষায় রচিত। এতে প্রায়শঃই হেঁয়ালি ভাষা ব্যবহৃত হয় বলে মানুষ ধন্দে পড়ে, তাই ধাঁধা। সংস্কৃত প্রহেলিকা শব্দ ধাঁধার সমার্থক। আসলে ধাঁধা একাকি বলা যায় না। ধাঁধার উত্তর দেওয়ার জন্য এক বা একের বেশী মানুষের প্রয়োজন। কেননা এক পক্ষ প্রশ্ন করবেন, আর অন্যপক্ষ তার উত্তর দেবেন। সর্বোপরি ধাঁধার উত্তর মনের কৌতূহল ও রহস্যময়তা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

তবে লক্ষ্যণীয় যে ছোটনাগপুরের ওঁরাও গোষ্ঠীর আদিবাসীরা, তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ধাঁধা ব্যবহার করে থাকে। কেননা ধাঁধার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বিবাহের পাত্রী বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কীনা তা কৌশলে যাচাই করে নেওয়ার জন্যই ধাঁধার অবতারণা। লোকায়ত সমাজে স্ত্রী জাতি বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পিছিয়ে থাকে বলে, তারা ধাঁধার প্রশ্ন-উত্তরে কম অংশ গ্রহণ করেন।

আবার ধাঁধার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সংকেত বা প্রতীকী ব্যঞ্জনার ব্যবহার দেখা যায়। সেখানে প্রতীকধর্মিতা ব্যক্তি বা বস্তুর বর্ণ, চিহ্ন, আচার-আচরণ, গুণধর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যাইহোক প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় ধাঁধার অভ্যন্তরীণ বাক্য বিন্যাস গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে বুদ্ধি মত্তার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ হয় বলে এতে আবেগের কোন জায়গা নেই। মূলতঃ লৌকিক মানুষের চিন্তার রাজ্যে পশ্চাৎপরতা থেকে অগ্রগমনের চিহ্ন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধাঁধা।

এখন আমরা কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে পদ্যে রচিত ধাঁধার উদাহরণ তুলে ধরব—

(ক) প্রশ্ন— "দু'পুকুর মামাদের জল টলটল
পড়িলে একটি কুটা উপচায় জল।"

উত্তর—চোখ।

(খ) প্রশ্ন— "দেশ আছে, মানুষ নেই, সমুদ্রতে জল নেই,
পাহাড়েতে পাথর নেই, রেল-লাইনে গাড়ি নেই,
বন্দরেতে জিনিস নেই।"

উত্তর—মানচিত্র।

(গ) প্রশ্ন— "দোল দোল দোলানি,
ছোটবেলার খেলানি।
পাকলে সুন্দর হয়,
ন্যাংটা হয়ে হাটে যায়।"

উত্তর—তেঁতুল।

(ঘ) প্রশ্ন— "কাছে আছে কাছে নাই
হাত বাড়ালে পাই নাই।"

উত্তর—কনুই।

প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে গদ্যে রচিত ধাঁধার উদাহরণ।

(ক) প্রশ্ন— 'কথায় আছে, কাজে নাই।'

উত্তর—ঘোড়ার ডিম।

(খ) প্রশ্ন— 'খুললে ঘর, বন্ধ করলে লাঠি।'

উত্তর—ছাতা।

(গ) প্রশ্ন— 'কোন ড্রাইভার গাড়ী চালায় না।'

উত্তর—স্ক্রু ড্রাইভার।

(ঘ) প্রশ্ন— 'কোন চিল উড়ে না।'

উত্তর—আঁচিল/পাঁচিল।

বলাবাহুল্য, লোকশিক্ষার প্রয়োজনে ধাঁধা বা হেঁয়ালির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা ধাঁধার মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের আধারে জীবন অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করা হয়েছে। সেইজন্য চিত্তচমৎকারী ধাঁধাগুলি শিক্ষিত—অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রসবোধে নাড়া দিয়ে একটি স্থায়ী আসন লাভ করে এসেছে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে।

১.৪.১৬.৩.৩ : প্রবাদ-প্রবচন

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রবাদ। ইংরাজীতে যে 'Proverb' শব্দটি আছে, বাংলায় তাকে আমরা বলি প্রবাদ। 'Proverb' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'প্রবাদ' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় জেমস লঙের রচনায়। প্রবাদ সম্পর্কে ইউরোপের স্পেনদেশীয় একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—'A Proverb is a short sentence based on long experience.' এর থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকসাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার আছে।

প্রবাদ বাক্যের স্রষ্টা হল সাধারণ মানুষ। বলাবাহুল্য, প্রবাদের উপর নির্ভর করে মানব জীবনের অনেক অধ্যায় গড়ে উঠেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—'প্রকৃত পক্ষে সমাজ যাহা আচরণ করে এবং সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহাদের মধ্যে যাহা নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে নিতান্ত তিক্ত, প্রধানতঃ তাহার দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মধুর বচন নহে তাহা সংসার সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র। আবার ড. সুকুমার সেন প্রবাদ শব্দটির স্থানে 'প্রগল্প' শব্দটির ব্যবহার করেন। এর অর্থ হল—প্রকৃষ্ট গল্প।

১.৪.১৬.৩.৩.১ : নানা বিষয়ক বাংলা প্রবাদ

বাংলা প্রবাদের মধ্যে নানা বিষয়ের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দেব-দেবী, প্রকৃতি, মানবেতর প্রাণী ও জড় জগতের নানাবিধ উপাদান মিলে-মিশে থাকতে পারে। মূলতঃ লোকসাহিত্যে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে প্রবাদের যে যোগসূত্র তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

১.৪.১৬.৩.৩.২ : বাংলা প্রবাদে দেব-দেবী প্রসঙ্গ

(ক) 'আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত'—প্রবাদটিতে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) 'এক ঝাড়ের বাঁশ কোনটিতে দুর্গার কাঠামো,

কোনটিতে হাঁড়ির ঝুড়ি'—প্রবাদটিতে উপাদান একটা, কখনো ভালো কাজে লাগছে, আবার কখনো মন্দ কাজে লাগছে।

(গ) 'জন্মে হয়নি ঘেঁটু পূজো, একেবারে দশভুজো'—প্রবাদটিতে খুব অল্প আয়োজন যে করেনি, তারপক্ষে দুর্গাপূজোর মতো ব্যয় বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যে খুবই কঠিন ব্যাপার, তা বোঝা যায়।

১.৪.১৬.৩.৩.৩ : বাংলা প্রবাদে ফলমূল প্রসঙ্গ

মানবজীবনে প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতার কথা যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি বিভিন্ন ঋতুতে মানবজীবনে প্রকৃতির অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। যেমন—

(ক) 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'—প্রবাদটিতে একটা গৌণ বক্তব্য হলেও মুখ্য বক্তব্য হল—প্রাপ্তির আশায় হাস্যকর রকমের প্রস্তুতি।

(খ) 'শেয়াল কাঁঠাল খায় বকের মুখে কাঁটা'—অর্থাৎ একজন কাজ করে, অন্যজন তার ফল ভোগ করে।

(গ) 'ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল'—প্রবাদটিতে আমের সুস্বাদ সবার নজর কাড়ে বলে সবাই তা পছন্দ করে। আসলে ভোজন রসিক না হলে এই ফলের যোগ্য মর্যাদা থাকে না।

১.৪.১৬.৩.৩.৪ : বাংলা প্রবাদে পাখ-পাখালী প্রসঙ্গ

(ক) 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?' প্রবাদটিতে বক্তব্য—লোভনীয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণের জন্য বহু সংখ্যক মানুষকে কাছে পাওয়া যায়।

(খ) 'বেল পাকলে কাকের কি,

ঠোকরালে আর পাবে কি?' অর্থাৎ যা সাধ্যের বাইরে, তার থেকে বেশি পাওয়ার আশা বৃথা।

(গ) 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা'—একই প্রয়াসে দুই কাজ সিদ্ধ করা।

১.৪.১৬.৩.৩.৫ : বাংলা প্রবাদে মাছ প্রসঙ্গ

(ক) 'কই মাছের প্রাণ অল্পেতে না যান'—প্রবাদটিতে শত অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরও যে মানুষ অনেকদিন বাঁচে তারই অভিব্যক্তি।

(খ) 'চুনো পুঁটি রাঘব বোয়ালের খাদ্য'—প্রবাদটিতে সবল মানুষ কিভাবে দুর্বল মানুষকে অত্যাচার করে, তার কথা বলা হয়েছে।

(গ) 'ইলিশ, কাঁচাকলা দিয়ে গিলিশ'—এখানে কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্নার স্বাদুতা ও উপাদেয়তা নির্দেশ করা হয়েছে।

(ঘ) 'মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই'—অর্থাৎ মাছের মধ্যে রুইমাছের শ্রেষ্ঠত্বের অনুষঙ্গে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি 'আমি'র অস্মিত্বের অহংকার এখানে পরোক্ষে প্রকাশিত হল।

১.৪.১৬.৩.৩.৬ : বাংলা প্রবাদে ফুল প্রসঙ্গ

(ক) 'গোবরে পদ্মফুল'—নিকৃষ্ট পরিবেশে উৎকৃষ্ট গুণের মানুষের বসবাস।

(খ) 'চোখে সরষে ফুল দেখা'—বিপন্নতা বোধ অর্থে।

(গ) 'ডুমুরের ফুল'—যা চোখে দেখা যায় না অর্থাৎ অদৃশ্য ও অধরা।

(ঘ) 'চাপা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে'—এখানে সৌগন্ধ ও পুষ্পপ্রীতি জামাইয়ের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও ভালোবাসার ভাবকে প্রকাশ করেছে।

১.৪.১৬.৩.৩.৭ : বাংলা প্রবাদে শাক-সবজি প্রসঙ্গ

(ক) 'তেলের পরীক্ষা বেগুনে

সোনার পরীক্ষা আগুনে'—খাঁটিত্ব যাচাই করার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

(খ) 'ঝোলে ঝালে অম্বলে, সর্বত্র বেগুন চলে'—সর্ব কাজে লিপ্ত থাকার ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে সর্বজনের গ্রহণ যোগ্যতায়।

১.৪.১৬.৩.৩.৮ : বাংলা প্রবাদে বৃক্ষ প্রসঙ্গ

(ক) 'গাছেরও খায়, তলার কুড়োয়'—দু'তরফ থেকেই প্রাপ্তির ভাবটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) 'বটের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া'—বটবৃক্ষের ছায়া যেমন শীতল, যেন মায়ের স্নেহ মাখানো, তেমনি মাতৃস্নেহ মায়া-মমতা মিশ্রিত স্নেহাদরে পূর্ণ। এই ভাবটি ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হল।

(গ) 'বড় গাছে ঝড় লাগে'—বড় গাছের মতোই মনুষ্য জীবনে বড় হয়ে উঠার দায়-দায়িত্ব অনেক। বড় হওয়ার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ঝড়ঝঞ্ঝা রূপ বিপদ-বাধা সঙ্কুল। তাই বড় হতে গেলে অনেক সইতে হয়, এই ভাবটি বড় গাছের অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

১.৪.১৬.৩.৩.৯ : বাংলা প্রবাদে জীবজন্তু প্রসঙ্গ

(ক) 'শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখলেই চেনা যায়'—মানুষের প্রকৃতি যে তার চরিত্রগত আচার-আচরণের মধ্যেই ফুটে ওঠে সে কথাই বলা হয়েছে এখানে।

(খ) 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?'—ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া যে দুষ্কর তা এখানে বোঝানো হয়েছে।

১.৪.১৬.৩.৩.১০ : বিচিত্র বিষয়ক বাংলা প্রবাদ

এছাড়া বিচিত্র বিষয়ক বাংলা প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) 'খাই দাই কাঁসি বাজাই'—নিষ্কর্মা মানুষ বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী'—মূল কাজের চেয়ে উপলক্ষ বড় হয়ে উঠলে, এ জাতীয় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

(গ) 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—কোন সম্পদ না থাকার চেয়ে, কিছু সম্পদ থাকাও যে ভালো—ব্যবহারিক জীবনের এই সার কথাটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) 'ময়রা মুদি কলাকার, তিন নিয়ে বাগবাজার'—বাগবাজার অঞ্চলে ময়দার কারখানা, মুদির দোকান, ডাকের কাজের শিল্পীদের ও নানা কলাকারের বাস একথা বোঝাতে, একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঙ) 'বাপ কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া
কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া'—এই হিন্দী প্রবাদটি মানব জীবনে বংশগতি ও তার টানা পোড়েনের ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে সর্বজনের গ্রহণযোগ্যতায়।

১.৪.১৬.৩.৩.১১ : প্রবচন

আবার অনেক সমালোচক মনে করেন প্রবাদে ও প্রবচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ প্রবাদ ও প্রবচন একই। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই প্রবচন বলতে—'ব্যক্তি বিশেষের সাহিত্যিক প্রয়োগকেই বুঝিয়েছেন।" অর্থাৎ প্রবচন হল—"ঐতিহ্য মুক্ত কোনো কৃতী মানুষের বক্তব্য যা পরবর্তীকালে প্রবাদের মর্যাদা লাভ করে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রামনিধি গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। রামনিধি গুপ্তের মাতৃভাষা প্রীতি সূচক পৌঢ়োক্তি—'বিনে স্বদেশী ভাষা মেটেনি কি আশা?' অথবা ভারতচন্দ্র রায়ের রচনায়—'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'—এ জাতীয় প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাক্যের সদুত্তর আমাদের অনেকেই জানা। তৎসত্ত্বেও প্রবাদ-প্রবচনগুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে অর্থাৎ সেগুলির উৎস ও স্রষ্টাদি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়; কেননা কাল প্রবাহে সেগুলির অধিকাংশই নামগোত্রহীন হয়ে হয় হারিয়ে গেছে, নয়তো বা চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে।

লোকসাহিত্য লোকমানসের সৃষ্টি। তাই স্বাভাবিক কারণেই আবহমান পল্লী বাংলার প্রবহমান পার্বণের স্পষ্ট চিত্র আমরা লোকসাহিত্যে পাই। লোকসাহিত্য আলোচনায় আমরা লোকসংগীত, লোকভাষা, লোককথা, গীতিকা, লোকপুরাণ ও লোকনাটক প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু বিষয়গুলি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বাহুল্যবোধে তাদের আলোচনা এখানে বর্জিত হল।

১.৪.১৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। বাংলা লোকসাহিত্যের ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করো।
৩। ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করে তার গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিভাগ করো।
৪। বাংলা ছড়ায় সমাজ চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।
৫। ধাঁধা কি? বিভিন্ন ধরনের ধাঁধার বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
৬। প্রবাদ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।
৭। সমাজজীবনে বাংলা প্রবাদের উপযোগিতা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

১.৪.১৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, লোকসাহিত্য)—বিশ্বভারতী।
২। লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান—ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়।
৩। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ—সম্পাদক ড. দুলাল চৌধুরী।
৪। লোকসংস্কৃতির গবেষণা (রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা) (বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০২) সম্পাদক সনৎ কুমার মিত্র।
৫। বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র—ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৬। লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ—ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৭। লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান—ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৮। লোকসংস্কৃতি গবেষণা (সংখ্যা-ছড়া)—সম্পাদক সনৎকুমার মিত্র।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-102

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আধুনিক যুগ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি

২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়— প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

শ্রী হরেন ভৌমিক — প্রাক্তন অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. পীযূষ পোদ্দার — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শান্তনু মণ্ডল— সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০২১

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) **Manas Kumar Sanyal**, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান- ১০০

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) এম.এ
প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-102

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় ৩ ঘণ্টা)

একক - ১ উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য
একক - ২ পর্তুগীজ মিশনারিদের বাংলা গদ্য
একক - ৩ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০-১৮৬০)

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ৪ রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব
একক - ৫ বঙ্গদর্শন ও প্রাবন্ধিক গদ্য
একক - ৬ রবীন্দ্র যুগ
একক - ৭ স্বামী বিবেকানন্দ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় ৩ ঘণ্টা)

একক - ৮ বাংলা সাময়িক পত্র
একক - ৯ উনিশ শতকের বাংলা নাট্য সাহিত্য
একক - ১০ উনিশ শতকের কাব্য সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় ৫ ঘণ্টা)

একক - ১১ বিশ শতকের বাংলা নাট্য সাহিত্য
একক - ১২ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কাব্য সাহিত্য
একক - ১৩ বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য
একক - ১৪ বাংলা ছোট গল্প ও গল্পকার পরিচিতি
একক - ১৫ প্রাক্-বঙ্কিম নক্‌শা ও বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস

সূচিপত্র

B-CORE-102

প্রথম পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	ড. পীযূষ পোদ্দার	উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য	১-৬
	২	অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল	পর্তুগীজ মিশনারিদের বাংলা গদ্য	৭-১৪
	৩	ড. শান্তনু মণ্ডল	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০-১৮৬০)	১৫-২২
পর্যায় গ্রন্থ-২	৪	শ্রী হরেন ভৌমিক	রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব	২৩-২৪
	৫	শ্রী হরেন ভৌমিক	বঙ্গদর্শন ও প্রাবন্ধিক গদ্য	২৫-২৭
	৬	শ্রী হরেন ভৌমিক	রবীন্দ্র যুগ	২৮-২৯
	৭	শ্রী হরেন ভৌমিক	স্বামী বিবেকানন্দ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ	৩০-৩২
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৮	শ্রী হরেন ভৌমিক	বাংলা সাময়িক পত্র	৩৩-৩৮
	৯	অধ্যাপক ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়	উনিশ শতকের বাংলা নাট্য সাহিত্য	৩৯-৫২
	১০	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	উনিশ শতকের কাব্য সাহিত্য	৫৩-৭১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১১	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	বিশ শতকের বাংলা নাট্য সাহিত্য	৭২-৭৯
	১২	অধ্যাপক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কাব্য সাহিত্য	৮০-১১০
	১৩	অধ্যাপক ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য	১১১-১১৬
	১৪	অধ্যাপক ড. কেকা ঘটক	বাংলা ছোট গল্প ও গল্পকার পরিচিতি	১১৭-১২৬
	১৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	প্রাক্-বঙ্কিম নক্‌শা ও বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস	১২৭১৪০

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-১

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.১.১.১ ভূমিকা

২.১.১.২ উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের বাংলা গদ্যচর্চা ও রামমোহন রায়

২.১.১.৩ উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের বাংলা গদ্য : বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

২.১.১.৪ উনিশ শতকের বাংলা গদ্যচর্চায় রবীন্দ্র যুগ

২.১.১.৫ আদর্শ প্রশ্নমালা

২.১.১.৬ সহায়ক গ্রন্থ

২.১.১.১ : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আঠারো শতকে শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণভাবে এই সময়কালে বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক সময় রূপে বিবেচিত হয়। এই সময়ের পূর্বে দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র বাংলা গদ্যের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৫৫৫ খ্রি: অহোমরাজ চুকাম্ মা কে লিখিত কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে মনে করা হয়। তবে বাংলা মান্য গদ্যের সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের সূচনায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গের রচনার দ্বারা।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যচর্চায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান স্বীকার করে নিয়েও মনে রাখতে হবে মিশন বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চর্চা ছিল উদ্দেশ্যমূলক—ধর্মপ্রচার অথবা ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছিল। বাইরের বিপুল জনসমাজের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল সামান্য। উনিশ শতকের নব জাগৃতির চেতনার আলো বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম দেখা গিয়েছিল রামমোহন রায়ের রচনায়। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সর্বসাধারণের ব্যবহারের ভাষা রূপে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম কারিগর রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, প্রয়োজন নিরপেক্ষ কিন্তু ভাষ্যনিপুণ যুক্তিনিষ্ঠ বিচারপ্রধান গদ্য রচনা প্রকাশ করেন।

২.১.১.২ : উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের বাংলা গদ্যচর্চা ও রামমোহন রায়

ম্যারি কার্পেন্টার তাঁর গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেছেন 'The Raja Rammohan Roy was in the land of his birth, a man greatly before his age' বস্তুতপক্ষে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

বঙ্গদেশের সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের রামমোহন রায় ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত ভারতপথিক অভিধাটি রামমোহন রায়ের কর্ম ও চেতনায় সত্য হয়ে উঠেছিল। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, অন্যদিকে মিশনারী সম্প্রদায় রামমোহনের সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে। রামমোহন রায় প্রতি পদে এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্রসর হয়েছেন।

শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্যমূলক রচনা তথা পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডী ভেঙে বাংলা গদ্য রামমোহনের প্রচেষ্টায় সাধারণের সামনে উপস্থিত হল। একদিকে দেশের ঐতিহ্য পরম্পরার যা কিছু সারবস্তু তা উদ্ধার করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর সার সংগ্রহ করেছেন, অন্যদিকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তাকে সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের বিচার বিতর্ক করতে হয়েছে। অন্যদিকে 'ব্রাহ্মণ সেবাধি', 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রভৃতি সাময়িক পত্র প্রকাশ করে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি উচ্চতর মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য 'বেদান্তসার', 'ব্রহ্মসূত্র', 'উপনিষৎ', প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হল 'বেদান্তগ্রন্থ', (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫)। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে রামমোহন রায়ের যুগান্তরকারী প্রতিভার ফলেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিচার ও বিতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধের সূচনা হয়েছিল। রামমোহনের এই শ্রেণির রচনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল; 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রভৃতি।

রামমোহন রায় নিজের রচনার দ্বারা বাংলা গদ্যের সূচনা করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্ষেত্র প্রসারণে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাঁর সময়কালে বা অব্যবহিত পরের রচনার গৌরব সম্ভব হয়েছিল তাঁর রচনাকে কেন্দ্র করে। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের রচনার দ্বারা রামমোহন পরবর্তীকালে বাংলা গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যহিষয়ক প্রস্তাব', 'ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'সামাজিক প্রবন্ধ', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখান', প্রভৃতি গ্রন্থে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপরীতির সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তিধারার পারম্পর্য, তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় ও পরিচ্ছন্ন গদ্যশৈলীর গুণে উনিশ শতকের প্রথম অর্ধ ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্য স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতায় এই সময়ের গদ্য সাহিত্য চর্চার সাক্ষ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে।

২.১.১.৩ : উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের বাংলা গদ্য : বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

মানুষের ভাবপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা। কোনো জাতির উন্নত ও বিশিষ্ট সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচায়ক হতে পারে উন্নত ভাষা। বাঙালী জাতির সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ-সাধনে বাংলা ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। এই ভাষা গঠনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিভা-প্রয়াস, শিল্প নৈপুণ্য এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে আলোড়িত হয়েছিল। এই

যুগের বাংলার সর্বায়ত সামাজিক পরিমণ্ডল ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রভাব অপরিসীম। যুগনায়করূপে তিনি একটি জাতির জীবনধারার গতি পরিবর্তন করে গেছেন। বাংলা গদ্যকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তর তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। উন্নত ভাষা সৃষ্টির জন্য যে পরিণত শিল্পজ্ঞান ও রসরুচি প্রয়োজন বিদ্যাসাগর সে শিল্পগুণের অধিকারী ছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। এই সূত্রে তাঁর গদ্য-ভাষা হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। পূর্ববর্তী শৃঙ্খলাহীন গদ্যকে তিনি সুবিন্যস্ত ও সুসংহত রূপে প্রকাশ করলেন অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ পরিহার করে প্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ, ক্রিয়া-পদের বৈচিত্র, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহকে পর্বে পর্বে ভাগ করে ছন্দ প্রবাহ সৃষ্টি, বাক্যের সুসমঞ্জস রূপ নির্মাণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের বিশিষ্টগুণ। বিদ্যাসাগরের মৌলিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', 'বিদ্যাসাগর চরিত', প্রভৃতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে গোপাল হালদারের মন্তব্য খুব স্মরণীয় মনে হয়—'বাঙলা গদ্য ১৮৪৩-৫৭ এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ একা সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না, তথাপি বিদ্যাসাগরকেই বাংলাগদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে; আর কেউ তা নন, কেরী নন, রামমোহন নন, মৃত্যুঞ্জয়ও নন। বিদ্যাসাগর শিক্ষার পুস্তক রচনায় ও প্রচার গ্রন্থ রচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দান উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তা নীরস পাঠ্যপুস্তক নয়, যুক্তিসমৃদ্ধ পরিচ্ছন্ন রসাভিষিক্ত চমৎকার রচনা—এই কারণেও তিনি এই কালের যুগপ্রধান হতে পারতেন।'

রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রবন্ধ সাহিত্যের যে ভিত গড়ে তুলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাকে স্বাদু, রসগ্রাহী ও শিল্পসম্মত সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রবন্ধ রচনা শুধু বিদ্যা প্রদর্শন বা জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয়ের জন্য মনে হয়নি। প্রবন্ধ ছিল তাঁর মনন ও চিন্তার বাহন। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগরের বর্ণনাত্মক গদ্যকে বাংলা কথ্য ভাষার তীক্ষ্নতা ও ঔজ্জ্বল্যের সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অন্বয়ে তিনি প্রাঞ্জলতা এনেছেন। অসমাপিকা ক্রিয়া যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের সম্বোধন করে নিবিড়তর ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। বর্ণনায় নৈব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের স্পর্শবোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষার অসাড়তা ঘুচে গিয়ে সচল প্রাণাবেগ দেখা দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয়গতভাবে বিভক্ত করলে পাওয়া যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত রচনা, সমাজ ও ইতিহাসমূলক প্রবন্ধ, ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসমূলক রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রধান হল 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৫৭), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১, ২—১৮৮৭-১৮৯৩), 'সাম্য' (১৮৭৯)। বঙ্গদেশের মানুষের মনে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি হল, 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রভৃতি। তাঁর ধর্ম ও দর্শন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব', গ্রন্থে। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বাধীন যুক্তির দ্বারা তিনি কৃষ্ণচরিত্রের অলৌকিক অংশ পরিবর্তন

করে চরিত্রটিকে আপন আদর্শের প্রতিভূরূপে মহত্তর মানুষরূপে চিহ্নিত করেছেন। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মানুষের শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, স্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্বলাভ সম্ভব। এই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। এই সকল রচনার বাইরে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল—'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৪) প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের রচনার দ্বারা শুধু বঙ্গের গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন এমন নয়, তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রযত্নে কয়েকজন প্রাবন্ধিক সে সময়ে গদ্য সাহিত্য রচনায় বিশেষরূপে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধকারেরা হলেন—'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।' আবার বঙ্গদর্শন পত্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বল্পসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করলেও তাঁর মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের জ্ঞানবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ 'পালামৌ' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। মানব জগৎ ও প্রকৃতিতে তিনি অসামান্য পর্যবেক্ষণে মিলিয়ে দিয়েছেন নিপুণ চিত্রশিল্পীর দক্ষতায়। সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে আর একজন প্রবন্ধকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য—তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ছাত্রাবস্থায় হরপ্রসাদের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল বঙ্গদর্শনের পাতায়। হরপ্রসাদের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'ভারত মহিলা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনে। সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব নানা বিষয়ে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সাহিত্য পরিষৎ', পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদের বিশিষ্টতা নির্দেশ করে বলেছেন—"শাস্ত্রী মহাশয় বাঙলা ভাষায় একজন প্রধান নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি কেবল ইতিহাস ও সাহিত্য লইয়াই নহে, উপরন্তু আধুনিক বাঙালির জীবনের ছোটোখাটো নানা সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষণীয় তাঁহার বিচারশৈলীর যৌক্তিকতা, তাঁহার রচনাভঙ্গির সাবলীলতা এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার রোচকতা এবং সর্বোপরি, তাহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বাঙলার এক অপূর্ব সম্পদ। যতই গভীর বিষয় হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গি এমনই স্বচ্ছ, সহজ ও সর্বজনবোধ হওয়া উচিত ... শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রসাদগুণ প্রাঞ্জলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"

মীর মশারফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক প্রবন্ধকারদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। বঙ্গদেশের সমাজ ইতিহাস ও ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। মীর মশারফের প্রধান প্রবন্ধগুলি হল—'আমার জীবনী', 'গোজীবন', 'হজরত বেলালের জননী' প্রভৃতি। রচনার স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও সহজ বর্ণনা গুণে পাঠকদের সমাদর লাভ করেছিল। এই সময়ের আর একজন স্বতন্ত্র প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রধান প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল—'রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'প্রবন্ধাবলী', 'ধর্মজীবন' প্রভৃতি।

২.১.১.৪ : উনিশ শতকের বাংলা গদ্য চর্চায় রবীন্দ্র যুগ

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়পর্বে বাংলা প্রবন্ধচর্চায় যে চিন্তাধারা বা ভাবধর্মের প্রকাশ সূচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পর সেই চিন্তন নূতন ভঙ্গিতে আকারে ও রূপে প্রকাশিত হয়ে অনেক বেশি পূর্ণতা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি মানব সভ্যতার প্রতিটি শাখা সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তাঁর গদ্যগ্রন্থের বিষয় বৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলতা প্রবন্ধসাহিত্যের

এক নবতম সংযোজন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে মনন ও কল্পনার গভীরতায়, সর্বসঞ্চারী আবেগ, উপমা ও চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ, প্রকাশকলার ঐশ্বর্যে তাঁর প্রবন্ধগুলি অতুলনীয়। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি—সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্র সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ উল্লেখ করা যায়—'প্রাচীন সাহিত্য' 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', প্রভৃতি। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থগুলি। প্রাচীন, আধুনিক, দেশ-বিদেশের সাহিত্যতত্ত্ব ও সেই প্রসঙ্গে নিজের ভাবনার গভীর রসোপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে এই গ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ। ভারতীয় অধ্যাত্ম বিশ্বাস সত্য, শিব ও সুন্দরের সম্মিলনের আদর্শকেই তিনি সাহিত্যের প্রাণবস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির অবসরে রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, সমাজ শিক্ষা ও সংকট নিয়েও চিন্তা ভাবনা করেছেন। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিল্প সকল বিষয়েই তিনি উদার, সর্বজনীন মানবতার আদর্শকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ—'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'সঞ্চয়' (১৯০৬), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'বিশ্ব বিদ্যালয় রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), 'শান্তিনিকেতন' (১৯৩৫), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)। শুধু দেশ বা রাষ্ট্রনীতি নয় শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে সকল অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাম্প্রতিক কালেও সেই চিন্তনের উপযোগিতা সমানভাবে স্বীকৃত। শিক্ষার সহজগম্যতা ও শিক্ষার্থীর চিত্তমুক্তির অবাধ পথ রচনা করতে হবে, আনন্দের ক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির উদ্বোধন সাধন করতে হবে। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ও পত্রসহিত্যের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য রচনা—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'জাপান যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানে', 'পারস্যে', 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'পথের সঞ্চয়।'

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। স্বামী বিবেকানন্দ সচেতনভাবে সাহিত্য সাধনা করেন নি। তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনাগুলি তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ, দু'একটি তাঁর নিজের লেখা। ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতীয় জীবনাচরণের আদর্শ বিষয়ক তাঁর মননশীল প্রবন্ধগুলি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত', 'পত্রাবলী', উল্লেখ্য। রবীন্দ্র-যুগের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রচনার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে তিনি সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, স্মৃতি, পুরাণ, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না কিন্তু তাঁর রচনা পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে। তাঁর প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—'জিজ্ঞাসা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'মায়াপুরী', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'নানা কথা', 'জগৎ কথা।' এই গ্রন্থগুলি রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান বিষয়ক ভাবনার সংকলন 'প্রকৃতি'। এই সংকলনে তিনি কোন মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা না করলেও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে সহজ সরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত শিল্পী। তাঁর শিল্পীসত্তার প্রধানতম প্রকাশমুখ অনিবার্যভাবেই চিত্রকলা। রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনায় অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃজনে প্রাণিত হন। তবে তাঁর প্রথম দুটি রচনা 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল'

এ নরম অনুভবের ছোঁয়া জুড়ে থাকে বা তার চিত্রশিল্পীর সত্তাকে যেন প্রকাশ করতে চায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—শিল্পতত্ত্ব, স্মৃতিকথা এবং বিচিত্র গল্প। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রি: পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প অধ্যাপক রূপে ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি পরবর্তীকালে 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ—'ভারত শিল্প', 'ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ', 'ভারত শিল্পে মূর্তি', রাজকাহিনী।

বাংলা গদ্য সাহিত্যচর্চায় প্রমথ চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও প্রমথ চৌধুরী নির্মাণে, আঙ্গিক সচেতনভাবে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন। 'সবুজ পত্র' সম্পাদনা এবং বাংলা গদ্যে চলিত ভাষার ব্যবহারের কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর স্বীয় নির্মাণ। জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় ও গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ঘন চিন্তা প্রকাশ যে চলিত ভাষাতে সম্ভব প্রমথ চৌধুরীর বহুমুখী প্রবন্ধগুলি তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত হতে পারে। ভাষা, সাহিত্য, সমালোচনা, রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, ইতিহাস সহ সমকালের যাবতীয় সংকটদীর্ণ বিষয়ের উপর তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'Paradox' বা আপাত-অসম্ভব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়েছে 'বীরবলী ঢঙ'। তাঁর বর্ণনা কৌশল, উপমা-অলংকরণ, চাতুর্যময় বাচনভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তায় অনেকেই তাকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করতে চান। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যগত রসরুচি ছিল অনেক মার্জিত, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। তাঁর সম্ভারের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ—'তেল নুন লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা চর্চা', 'ঘরে বাইরে', 'আত্মকথা', প্রভৃতি।

২.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য চর্চায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান আলোচনা কর।

২। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা কর।

৩। বাংলা গদ্য সাহিত্য ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। প্রবন্ধকার হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান আলোচনা কর।

২.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, অষ্টম খণ্ড)

২। উনিশ শতক—অলোক রায়

৩। প্রবন্ধের ভুবন : ব্যক্তি ও সৃষ্টি—তপোধীর ভট্টাচার্য

৪। বাংলা প্রবন্ধে সাহিত্যের ধারা—ড. অধীর দে (প্রথম খণ্ড)

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-২

পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা গদ্য

বিন্যাস ক্রম

২.১.২.১ ভূমিকা

২.১.২.২ বাংলা গদ্যের উৎস সন্ধানে

২.১.২.৩ পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমন ও ধর্মপ্রচার, পুস্তক রচনা ও প্রকাশ

২.১.২.৪ দোম আন্তানিও এবং গদ্যরচনার প্রয়াস

২.১.২.৫ মনোএল-দ্য-আসসুম-সাম ও বাংলা গদ্য

২.১.২.৬ পর্তুগীজ মিশনারীদের অবদান ও তাদের প্রভাব

২.১.২.৭ আদর্শ প্রশ্নমালা

২.১.২.৮ সহায়ক গ্রন্থ

২.১.২.১ : ভূমিকা

মনের ভাব প্রকাশের দুই মাধ্যম—পদ্য ও গদ্য। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র লিখিত হয়েছে পদ্য মাধ্যমে, পয়ার জাতীয় ছন্দে। তা কাহিনীকাব্যই হোক বা ঘটনাবিবৃতি। অবশ্য পদ্যমাধ্যমেই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন কবিসাহিত্যিক। তবে তার পরিসর ছিল স্বল্প বিস্তৃত। নতুন নতুন ভাবের আমদানী হলো, বিভিন্ন জনজাতি, সংস্কৃতির আগমন ঘটল বাংলায়, ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর ভারতবর্ষে। সেই নতুন নতুন ভাব, উদ্দেশ্য, সংস্কৃতিকে রূপদানের তাগিদে অনিবার্য ছিল বিকল্প ভাবপ্রকাশ মাধ্যমের। তারই অবশ্যম্ভাবী ফসল গদ্য, গদ্যসাহিত্য, গদ্যমাধ্যম। যদিও এই গদ্যের নক্ষত্র পতনের মতো হঠাৎ আবির্ভাব ঘটেনি। তারও একটি বিস্তৃত ইতিহাস আছে। সেই বাংলা গদ্যের সরণীতে পর্তুগীজ মিশনারীদের অবদান যথেষ্টই বলা যায়। যে পথের সূচনা করেছেন, যে পথ নির্মাণের প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই পথ ধরেই আজকের বাংলা গদ্যসাহিত্য নানা বাঁকবদলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

২.১.২.২ : বাংলা গদ্যের উৎস সন্ধানে

উৎস সন্ধানে যাত্রা করলে দেখা যায়, 'চৈতন্যচরিতামৃত' পদ্যমাধ্যমে রচিত হলেও গদ্যাত্মক গ্রন্থ, তাতে দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখিত হয়েছে পদ্যমাধ্যমে, পয়ার ছন্দে। এমনকি আয়ুর্বেদগ্রন্থও পয়ায়ের বন্ধন স্বীকার করেই লিখিত হয়েছে। মধ্যযুগের

সাধারণ সংস্কারই ছিল সাহিত্যকর্মে শুধু পয়ার ও অন্যান্য ছন্দের ব্যবহার—গদ্যের ব্যবহার ছিল খিড়কীর দুয়ারপথে সঙ্কুচিতভাবে। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা গদ্যের একটি আদল নির্মিত হতে শুরু করেছিল। অবশ্য তার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যই আছে, আর তেমন সাহিত্যিক মূল্য নেই। সাহিত্যকর্ম, গম্ভীর বিষয়ক আলোচনাতে পদ্যই ব্যবহৃত হত, নেহাত দায়ে পড়ে চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে, লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদিতে ব্যবহৃত হত গদ্য। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের একখানি চিঠি প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত বলা যায়। এর ভাষা আধুনিক যুগের উপযোগী না হলেও দুর্বোধ্য নয়। যথা—'তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।' সময়ের প্রেক্ষিতে এই বয়ানে যে বিশুদ্ধ গদ্যের ঠাঁট, ভঙ্গিমা রয়েছে তার মূল্য কম নয়।

অথচ সপ্তদশ শতাব্দীতে চিঠিপত্র ও দলিলে বাংলা গদ্যে প্রবিষ্ট হলো অযথা ফারসী শব্দ। যথা—'আসামী মজুকরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়।' অর্থ করা গেলেও ফারসী শব্দের আধিক্যে বাংলা ভাষার আদলটিই বদলে গেল। অবশ্য বক্তা ও শ্রোতা তথা প্রেরক ও প্রাপকের অবস্থান বিচার করলে বিষয়ানুসারী শব্দ নির্বাচন যুক্তিযুক্ত মনে হতেই পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আদালতের ভাষা দলিল, ক্রয়-বিক্রয়পত্র প্রভৃতিতে ইসলামী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হলেও গঠনভঙ্গিমা দুর্বোধ্য নয়। যেমন—"এগার রূপাইয়া পাইয়া স্ব-ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম। তোমরা পুত্র-পৌত্র আদিক্রমে আমার পুত্র পৌত্র আদিক্রমে গোলামি করিব।" বর্ণনাভঙ্গিটি সাধুগদ্যের। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্নাভাবের দিনে আত্মবিক্রয় করে এই চুক্তিপত্র তৈরি হয়েছিল। এর ভাষা আধুনিক কালের মতো, তাৎপর্যও বেদনাদায়ক। অন্নের জন্য পরিবার-গোষ্ঠীর সকলকেই বংশানুক্রমিকভাবে ক্রীতদাস করার এই নিষ্ঠুর ঘটনার দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহারাজ নন্দকুমার বিপন্ন হয়ে পুত্র গুরুদাসকে লিখেছিলেন—'অদ্য চারিরোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যতযত পাইলাম তাহা কত লিখিব। ..... এসময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার জান লোপ হইল।"

এ ভাষার সুগঠিত পদ্যবিন্যাস দেখে কি মনে হয়, মিশনারী সম্প্রদায় বাংলা গদ্য প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরকম বহু চিঠি-পত্র ও দলিল পাওয়া গেছে, যার গদ্যের অন্বয় একালের মতো—শুধু কিছু ইসলামী শব্দের বাহুল্য আছে। এসময় সহজিয়া বৈষ্ণবদের নিজ নিজ সাধন ভজন সংক্রান্ত কতগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে যার গদ্য পঙক্তি সংলাপ ধরনের, কিন্তু অন্বয়বন্ধন স্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

> স্বয়ং ভগবান থাকেন কোথা।
>
> অখণ্ড পদ্মের উপর। শ্রীবৃন্দাবন স্থান সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ।
>
> অখণ্ড পদ্মের উপরে পৃথিবী। [শিক্ষা পটল]

'জ্ঞানাদি সাধনা' নামক আর একখানি সহজিয়া গদ্যগ্রন্থের দৃষ্টান্ত, আরও সুগঠিত। যথা—'অজ্ঞানী জীব কহেন যখন আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা হইয়াছেন, এখন বুঝিলাম ঐ বেদাদিশাস্ত্র মিথ্যা হইয়াছে এবং

বেদাদি শাস্ত্রের ধর্ম অধর্ম মিথ্যা হইয়াছে এবং ঐ শাস্ত্রেতেই লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদির ধর্মই মিথ্যা এবং পিতৃ মাতৃ আদি মিথ্যা এবং আমিহ মিথ্যা এবং আমার কথাহ মিথ্যা।"

দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ, অসংখ্য সংযোজক অব্যয় যোগে অনেকগুলি বাক্য নিয়ে যেন একটি পূর্ণবাক্যের মাল্য গাঁথা হয়েছে। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গদ্যের কার্যক্ষম ও ভাবপ্রকাশক চেহারা গড়ে উঠেছিল। তবে সামান্য কাজকর্ম ব্যতিত—সাহিত্যকর্মে তার ব্যবহার ছিল না। আসলে তখন গদ্য ছিল, গদ্যসাহিত্য বা সাহিত্যিক গদ্য ছিল না। সেই গদ্যসাহিত্য, সাহিত্যিক গদ্যের জন্য বাঙালী পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় আরও কিছুদিন। সেই সময়ের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা গদ্যচর্চা এক অন্যমাত্রা যোজনা করেছে বলা যায়। বাংলা গদ্যের ইংরেজ লেখকরা এই গদ্যকে আরোপিত কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে বাস্তব প্রয়োজনের অনুমত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের জ্ঞান বিশ্বাসের অনুসারে। এখানেই তাঁদের সার্থকতা। তাহলেও ইংরেজরাও বাংলা গদ্যের প্রথম বিদেশী সাধক নন—এপথে সর্বপ্রথম এসেছিলেন পর্তুগীজ মিশনারীরা, ধর্মযাজকেরা।

পর্তুগীজদের বাংলা গদ্যরচনার স্বল্পস্থায়ী প্রয়াসকে সজনীকান্ত দাস ভূমিকম্পের আকস্মিকতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন—'আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।' তা সত্ত্বেও পর্তুগীজদের আওতায় বাংলা গদ্যরচনা চর্চার একটা মূল্য ছিল। এঁরা ব্যবহারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে গদ্যের প্রযুক্তিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথমে ভারতে এসেছিল (১৪১৭ খ্রি:)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার নানা জায়গায় তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এদের অধিকাংশ ছিল জলদস্যু। যারা জলদস্যু ছিল না, তাদের মধ্যেও এদেশীয় ভাষা চর্চার আগ্রহ একেবারে ছিল না। বাংলা ভাষা চর্চার প্রচেষ্টা আগাগোড়াই পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের। তাঁরা বুঝেছিলেন এদেশের লোকেদের ধর্মান্তরিত করতে গেলে তাদের নিজেদের ভাষাতেই বুঝিয়ে বলতে হবে। আর তার ফলেই পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের মধ্যে বাংলা ভাষাচর্চার আয়োজন।

২.১.২.৩ : পর্তুগীজ মিশনারিদের আগমন ও ধর্মপ্রচার, পুস্তক রচনা ও প্রকাশ

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবেই আকবর হুগলী ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফরমানি দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের অবাধ অধিকারও লাভ করেন। শুধু তাই নয়, ষোড়শ শতকসীমার মধ্যেই পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক গীর্জা পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্তুগীজদের বাংলা চর্চারও প্রথম ফসল ষোড়শ শতক শেষ হবার পূর্বেই ফলেছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজক সানফ্রানসিসকো ফেরনানদেস ঢাকা জেলার সোনার গাঁ-র নিকটবর্তী শ্রীপুর থেকে ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্ডাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তিনি খ্রিস্ট ধর্মের সার ব্যাখ্যা করে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করেছিলেন। আর তাঁর সহকর্মী দোমিনিক দেসুজা ঐ দুখানা বইয়ের বাংলা তর্জমা করেন। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৩ জানুয়ারি বাংলার রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অধ্যক্ষ ফাদার মারকোস এনোতোনি ও সাঁ সুচির লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেছে। বস্তুত পর্তুগীজ ধর্মযাজক তথা তাঁদের দ্বারা ধর্মান্তরিত বাঙালি যাজকের রচিত

তিনখানি মাত্র বই নির্ভরযোগ্য। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন থেকে একসঙ্গে তিনখানি বই মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম মুদ্রিত বই এর লেখক দোম আন্তনিও মতান্তরে এন্তোনিও। ইনি আসলে বাঙালি। ঢাকা ভূষণা অঞ্চলের জমিদার পুত্র ছিলেন। শৈশবে (১৬৬৩) পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে পর্তুগীজ পাদ্রীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হন। পরবর্তীকালে নিজ জন্ম মাটিতে ফিরে সেখানে এবং তার আশেপাশে বহু লোককে খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যেসব বক্তৃতা দিতেন—পরধর্মের ওপরে নিজের ধর্মের গ্রহণীয়তা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক সময় প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা ফাঁদতে হতো। বস্তুত ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ঐরকম একটি কথোপকথন ভিত্তিক রচনারই লিখিত রূপ। মানোএল-দ্য-আসসুম-সাম এই বইটি মুদ্রিত করেন রোমান হরফে। সঙ্গে ছিল পর্তুগীজ অনুবাদ। রোমান হরফে রূপান্তরীকরণে পর্তুগীজ উচ্চারণ রীতির প্রভাব পড়েছে প্রচুর। যথা—

Bramane—Tomi care bhoso?
ব্রাহ্মণ—তুমি কারে ভজো?
Rom—Poromexorere purno Bromere.
রোম—পরমেশ (শ্ব) রেরে পুর্ণোব্রমে (হ্ম) রে!

২.১.২.৪ : দোম আন্তানিও এবং গদ্যরচনার প্রয়াস

গ্রন্থটিতে পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষার ছাপ থাকলেও দোম আন্তনিওর নিবন্ধের ভাষা সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা। আরবী-ফরাসী শব্দ অত্যন্ত কম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে patixa (পাতিসা) amexa (হামেসা) xacor nofore (চাকর নফরে) bodoria (ব-দরিয়া) bade (বাদে) rae (রাহে)। রামায়ণ কাহিনির সংক্ষিপ্তসারটুকু দোম্ আন্তনিওর রচনার নিদর্শনরূপে বাংলা অক্ষরে উদ্ধৃত হল—

রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ
তাহান ভাই লকন, রাজা অযোদ্যা বাপের সত্য পালিতে বন্‌বাসী
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন,
তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুর্দ
করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সসিবেরে দিলেন, সে
বালির ভাই, তাহারে রাজ্‌খণ্ড দিলেন :—আর রামের দুইপুত্র
লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর, যুর্দ করিলেন পুত্র না চিনিয়া
শেষে মুনি সিয়া পরাজয় (পরিচয়) করিয়া দিল,
প্রচাতে (পশ্চাতে) সকল প্রথথ (প্রত্যয়) হইল শেষ রাজ্‌খণ্ড
অযোদ্যাতে করিতেন; প্রচাতে (পশ্চাতে) তাহান পরলোক
হইল। তাহান আতুআঁ পরমেশরেতে
মিশিল গিয়া।

বইটির ভাষাবিশ্লেষণ করে তার গদ্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়। যথা: দ্বিতীয়া-চতুর্থীর সাধারণ বিভক্তি—'রে' বা—'এরে'। কখনও বা—'কে'—'একে'—'এক'। যেমন পরমেশয়ে, তাহারে, পরাৎপরেকে, পরাৎপরেক, পরাৎপরকে। কর্তৃকারক ব্যতিত অন্য কারকে বহুবচনের বিভক্তি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যথাঃ আমারদিগের, তাহারদিগের, তাহানদিগের, মালারদিগের। দুটি ক্ষেত্রে ষষ্ঠীর 'র' প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়নি—তোমাদিগের, আপনাদিগের। 'ঘরে' বিভক্তি একবারমাত্র পাওয়া গেছে—আমার ঘরে শাস্ত্রে। ন-কারান্ত সর্বনাম পদ সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হয়েছে—ইহানা, এহানা, তাহানা, যাহানে। আমরা, তোমরা, তাহারা—এই তিন পদের বাইরে প্রথমার বহুবচনে 'রা' বিভক্তি মিলছে না। নিষেধার্থক 'না' শব্দ ক্রিয়া পদের পূর্বে এবং পরে উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এছাড়া মহাপ্রাণ ধ্বনির তুলনায় অল্পপ্রাণধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা বেশি—লকন, অযোদ্যা, ততাচ ইত্যাদি।

২.১.২.৫ : মনোএল-দ্য-আসসুম-সাম ও বাংলা গদ্য

লিসবন থেকে প্রকাশিত—বাংলায় লেখা রোমান হরফে লিপ্যন্তরিত আর দুটি বই পাওয়া গেছে—'Creper xaxter orth Bhed or Cathecismo da Doutrino Christea. রোমান হরফের প্রতিরূপ অনুসরণ করলে বাংলায় বইটির নাম হয় 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ'। দ্বিতীয় বইটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। নাম—Vocabulario em Idiomae Bengalla'e Portuguez'। বই দুটি মানোএল-দ্য-আসসুম-সামের নামে প্রচলিত। কিন্তু পরে প্রমাণিত, অনুমিত দ্বিতীয় রচনাটি দোম আন্তনিও এর মৌলিক পরিকল্পনা ও দুরূহশ্রমের ফসল। অন্তত গ্রন্থটি রচনার সম্ভাব্য সময়ে মানোএল এর জন্ম হয়নি। যাই হোক 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ভাওয়াল পরগণায় লিখিত হয়। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে এই বই এ খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সজনীকান্ত দাস অনুমান করেন—'মূল পর্তুগীজ অংশ মানোএল এর লেখা। তিনি সম্ভবত কোনো দেশীয় খ্রীস্টান দিয়া অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন।" এ অনুমান নিরর্থক নয়, তা হলেও বইটির গ্রন্থকার হিসাবে শুধুই মানোএল এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। 'কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ' এর মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা (৩৯১)। বাঁদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা আর ডানদিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ মূল উপস্থিত। এর গ্রন্থের বাংলা ভাষা চরিত্র সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'যে বাঙালা ঐ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বাঙালা, দুইশত বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত বাঙালা। এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌলিক ভাষা নহে। সাহিত্যিক ভাষার, সাধুভাষার আধারের উপরও এই ভাষা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত।"

একথা স্মরণ করতে হয় যে, লিখিতব্য বাংলা গদ্যভাষা বিষয়ে সপ্তদশ শতকে দোম আন্তনিওর প্রচেষ্টায় পরিকল্পনার পরিচ্ছন্নতা ছিল না কিন্তু তিনিই কথিত ভাষা থেকে এ ভাষার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভেবেছিলেন। তার প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ। সম্ভবত এ বাংলা ভূষণারই কোনো পর্তুগীজ বাঙালির লেখা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান হরফে ছাপা সে বাংলার লিপ্যন্তর করেও দেখিয়েছেন—Pita amardiguer poromoxorge assa : tomar Xiddhi namere 'পিতা আমারদিগের পরমস্বর্গে আছ, তোমার সিদ্ধি নামেরে'।।

xeba hauq

সেবা হউক।

রোমান হরফে বাংলা লেখার পর্তুগীজ উচ্চারণের প্রভাব এখানেও লক্ষণীয়। রচনারীতির প্রধান দোষ, মাঝে মাঝে পর্তুগীজ রীতি অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ এবং কখনও কখনও সেই অনুযায়ী অনুবাদ। অবশ্য তাতে বাক্যের অর্থপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটেনি। সম্ভবত রচনায় দেশী লোকের হাত ছিল তার প্রমাণ আছে। যেমন নিবিয়া (libia), আছিল (axin), তিয়াসের (tiraxer) ইত্যাদি। তাঁর লেখা দোম আন্তনিওর লেখার মতো। পুরোপুরি সাধুভাষার ছাঁদে নয়। প্রধানত পর্তুগীজ থেকে অনুবাদ বলে এবং পর্তুগীজ পাদ্রির রচনা বলে বাক্যস্থিত পদসমূহের সিদ্ধ প্রয়োগ আছে। বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মিশ্রণ এবং 'ইয়া' প্রত্যয়ন্ত অসমাপিকার অসম্বন্ধ প্রয়োগ তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি। তবুও মানতে হয় কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদের ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি আছে। প্রমাণস্বরূপ—

> হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শুহরে দুই গালিম পুরুষ শএ আছিল;
> বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ
> তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা
> জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল
> খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত সে আরো
> এক চোট দিল সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল।"

পর্তুগীজ বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ মূলতঃ পর্তুগীজ শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত 'মানোএল দ্য আসসুমপসাম—এর বাংলা ব্যাকরণ' এ জানানো হয়েছে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে বইটি লেখা হয়েছিল। বইয়ের পুথিটির কাগজের উৎপাদন সময়ের হিসবে ধরে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের উপেক্ষিত বই' এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছেন—'বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষের লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা নেই।" সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন সেন এর সম্পাদনা সূত্রে জানা যায় ছাপা বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা (১০) + ৫৯২। এর প্রথমাংশ ব্যাকরণ এবং পরের অংশ বাংলা—পর্তুগীজ, পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ। ব্যাকরণ অংশ পর্তুগীজ ভাষাতে লেখা। প্রিয়রঞ্জন সেন মূলের সঙ্গে বাংলা লিপ্যন্তরও যোগ করে দেখিয়েছেন—

Number Singular	একবচন
Nominativo—Loha; Fero	কর্তৃকারক—লোহা, লৌহ
Genitivo—Lohar	সম্বন্ধ—লোহার
Dativo—Lohare	সম্প্রদান—লোহারে
Accusativo—Lohare vei Lohaque	কর্ম—লোহারে বা লোহাকে
Vocativo—o Loha	সম্বোধন—অ (ও) লোহা
Ablativo—Lohate	অপাদান—লোহাতে

পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যরূপের গঠনে পর্তুগীজদের আওতায় গড়া রচনাবলীর কোনো প্রভাবই পড়েনি। কর্তৃপক্ষের চাহিদা যতই থাক, নিজের স্তরের যাজকেরা এ উদ্যমকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেননি।

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত নতুন তথ্যের মাধ্যমে একটা সত্যই সুনিশ্চিত হতে পায়—বাঙালি যাজক দোম আন্তনিও ধর্মপ্রচারে তাঁর আগ্রহ বশে একাই ভাষা রচনায়, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ নির্মাণে অসাধ্যসাধন করেছিলেন। আর তারই কল্যাণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদে' এর ভাষা সম্পর্কে যাকে 'সাহিত্যিক', 'সাধু' ভাষার আদিল বলতে চেয়েছিলেন। অপরিচ্ছন্নভাবে হলেও তাঁর সূত্রপাত দোম আন্তনিওরই হাতে। আর তার ভিত্তি ছিল পূর্ববঙ্গাঞ্চলেরই ভাষা।

২.১.২.৬ : পর্তুগীজ মিশনারীদের অবদান ও তাদের প্রভাব

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের সূচনা। কোম্পানীর কর্মচারীরাও তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা গদ্যের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারী বাংলা ভাষায় দক্ষ হালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'ফিরিঙ্গিনামু-পরকার্থং', 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং অর্থাৎ A Grammar of the Bengali Language রচনা ও মুদ্রিত করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য রচিত হয়েছিল। এর ভাষা ইংরাজী, দৃষ্টান্তগুলো বাংলা। এতেই প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়। হালহেড বাংলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আটটি অধ্যায়ে তিনি এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার অক্ষর ও বানান থেকে শুরু করে ছন্দ পর্যন্ত ব্যাকরণের যাবতীয় বিষয় আলোচনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুঁথিপত্র থেকে বাংলা পয়ার পঙক্তি উদ্ধৃত করেন, একস্থলে বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন—'আমার জমিদারি পরগণে কাকাজোল—তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশী কিস্তী হইয়াছে—সেই দুই গ্রাম পয়োস্তী হইয়াছে। চাকলে একবালপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে।' বইটি পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণের থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেও এর ভাষা ইংরেজী, কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য রচিত বলে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক নামমাত্র। তার পর শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্টউইলিয়াম কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাংলা গদ্যকে, বাংলা গদ্যসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য অগ্রসর হয়। তারাও যে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়। কিন্তু বাংলা গদ্যের যাত্রাপথ সুগম করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পর্তুগীজ মিশনারীদের ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্য হলেও তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে ততটা যোগ না থাকলেও উৎস সন্ধানে যাত্রা করে সেই অবদানকে আমরা ভুলে যেতে পারি না।

২.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা গদ্য চর্চার পূর্বে মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে—সেই গদ্যাঙ্গিকের পরিচয় দান করুন।

২। পর্তুগীজ মিশনারী দোম আন্তনিও বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে কিভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে মনোএল-দ্য-আস্‌সুমসামের অবদান কতটা সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। বাংলা গদ্যের ভিত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পর্তুগীজ মিশনারীদের হাতে, তাদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২.১.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬ কলিকাতা-৭৩।

২। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস—ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, আগস্ট, ২০০০, কলিকাতা-৯।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মে, ১৯৩৪ কলিকাতা-৯।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, আনন্দ, ১৩৫০, কলিকাতা-৯।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) শ্রীভূদেব চৌধুরী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

৬। কালান্তরে বাংলা গদ্য—গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স।

৭। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত (সম্পাদিত) মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭।

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-৩

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০-১৮৬০)

বিন্যাস ক্রম

২.১.৩.০ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা

২.১.৩.১ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার

২.১.৩.১.১ উইলিয়াম কেরী

২.১.৩.১.২ রামরাম বসু

২.১.৩.১.৩ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

২.১.৩.১.৪ গোলকনাথ শর্মা

২.১.৩.১.৫ তারিণচরণ মিত্র

২.১.৩.১.৬ চণ্ডীচরণ মুন্সি

২.১.৩.১.৭ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

২.১.৩.১.৮ হরপ্রসাদ রায়

২.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নমালা

২.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থ

২.১.৩.০ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা

গদ্য সাহিত্যের বিকাশ বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। পদ্যের বাহুল্য ও প্রাচুর্য ছেড়ে বাংলা সাহিত্য ভবিষ্যৎ গদ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলা ভাষায় গদ্য ব্যবহারের এই আধুনিক প্রবণতাকে ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষায়তনের যুগ বলা যেতে পারে। এই প্রবণতা শুরু করেছিল প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শ্রীরামপুর মিশন। কিন্তু এই সংস্থাটি বিলোপিত হয়েছিল মিশনারি সংঘের পারস্পরিক ঈর্ষাদ্বন্দ্বের জন্য। তারপরেই যে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা যুগান্তকারী তা হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশীয় আচার আচরণ, সংস্কৃতি ও দেশীয় ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এদেশীয় মানুষের শিক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই তারা করেননি। বরং সনাতনী শিক্ষা পদ্ধতি তাদের চেতনাকে সুপ্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে 'কলকাতা মাদ্রাসা' ও কাশীতে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়েছিল যে সমস্ত তরুণ সিভিলিয়ানরা এদেশে শাসন করতে আসবেন তাদের

এদেশীয় মানুষদের সংস্কৃত, কথ্যভাষা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ৪ঠা মে ওয়েলেসলির নির্দেশে কলকাতায় লালবাজারের কাছে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"A college is here be founded at Fort William in Bengali for the better instruction of the junior civil servants of the Company, in such branches of literatures, science and knowledge as may be deemed necessary to quality them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the Government of the British perversions in the East Indies." লর্ড ওয়েলেসলির দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্ভবত তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ অধ্যাপক পাওয়া যায়নি। ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর মিশনে বাইবেলের অনুবাদের ফলে কেরীর নাম লোকসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। সেইজন্য উইলিয়াম কেরী ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা, মারাঠি ও সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যক্ষ মনোনীত হন। শিক্ষক রূপ কেরীর বেতন ছিল ১০০০ টাকা। বিভাগীয় প্রধান হয়ে কেরী প্রথমেই ছাত্রদের শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করেন, এবং পূর্ববর্তী বাইবেলের অনুবাদের ফলে তিনি এও বুঝেছিলেন যে দেশীয় ভাষার কথ্য রীতি গদ্যে প্রযুক্ত করতে গেলে এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী কেরী এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়াই বাইবেল অনুবাদের ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে যান। তাই তারই প্রচেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কয়েকজন পণ্ডিত ও মুন্সী নিযুক্ত হন। কেরীর সহকর্মী পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মাসিক ২০০ টাকা ও রামরাম বসু মাসিক ৪০ টাকা বেতনে বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। এছাড়া ছিলেন রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি, রামজয় তর্কালঙ্কার, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, পদ্মলোচন চূড়ামণি, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, হরপ্রসাদ রায়, রামচন্দ্র রায়, গদাধর তর্কবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিতগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বেতনভোগী পণ্ডিত মুন্সীরা বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন সম্ভবত দুটি কারণে : "১) ইংল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহেব কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য, সাহিত্য সৃষ্টির জন্যও নয়, দেশীয় ছাত্রদের পাঠদানের জন্যও নয়। ২) এই কারণে এসব বই দুর্মূল্য হত, দেশীয় সাধারণ লোক তা কিনতও না পড়তও না।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থগুলি হল—'কথোপকথন' (১৮০১), 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২), 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩), 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩), 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), 'ইংরেজী বাংলা শব্দকোষ' (১৮১০), 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫), 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অনূদিত হয়। কারণ শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষ উভয়েই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা বুঝেছিলেন ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান করাতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান তথা ভাষা শিক্ষার। তাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—বাল্মীকির 'রামায়ণ' (১৮০৬-১৮১০), জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' (১৮০৮), মাঘের 'শিশুপালবধ' (১৮১৫), কালিদাসের 'মেঘদূত' (১৮১৩), ভারবীর 'কিরাতার্জুনীয়ম' (১৮১৫)।

এছাড়া পাঠ্যপুস্তকরূপে 'ভগবৎগীতা' (১৮০৯), 'মনুসংহিতা', 'দায়ভাগ', 'বীরমিত্রোদয়', 'দত্তকচন্দ্রিকা' প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেরীব 'A Grammar of Sanskrit Language (১৮৫৬)। কেবলমাত্র ধর্মেষনার সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির এষণাতেই কেরী সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করেননি, তৎসম শব্দ বহুল সংস্কৃত অনুরাগী রীতি, রোমান্টিকতা, ভাবের অতলস্পর্শী গভীরতা ও অন্তর্নিহিত ধ্বনি ঝংকারের লাবণ্য মণ্ডিত মাধুর্যের সঙ্গেও বিদেশী সিভিলিয়ানদের পরিচয় ঘটিয়ে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাদের চিত্তে অনুরাগ সঞ্চয় করেন। একদিকে ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতিশাস্ত্র সমন্বিত নীরস পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা জ্ঞানের বিষয়, অপরদিকে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার (মেঘদূত) মাধ্যমে রস সাহিত্য তথা ভাবের বিষয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। এবিষয়ে কেরীর আন্তরিক প্রয়াসলভ্যতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

২.১.৩.১ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান লেখকবর্গ বাংলা গদ্যের গঠনে এবং বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভাবনে যে ধরনের তৎপরতা দেখিয়েছেন তাতে মনে রাখতে হবে যে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে চলিত বাংলা ভাষা শেখাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রথম দিকে তাঁরা কোনো আদর্শ গদ্যের সন্ধানও করেননি। উপরন্তু তাঁরা সদাসর্বদা বিভাগের প্রধান এবং তাদের সহায়ক কেরী সাহেবের দ্বারা চলিত হতেন। স্বাধীনভাবে লেখার তাঁদের বিশেষ কোনো অধিকার ছিল না। ফলে তাঁদের অধিকাংশের রচনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে পারেনি। কিন্তু তবু এই কলেজের পণ্ডিত-মুন্সিরা কখনো অনুবাদের দ্বারা, কখনো কাল্পনিক আখ্যানের মারফতে এবং কখনো বা ইতিহাস ঘটনা নিয়ে যে সমস্ত গদ্যপুস্তিকা রচনা করেছিলেন, সেকালের কলকাতার শিক্ষিত বাঙালির কাছে নিশ্চয় তা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। আমরা বাংলা ভাষার গুরুত্ব বিচার করে এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে এই কালজয়ী গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার আলোচনা করে কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি লেখকদের গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

২.১.৩.১.১ : উইলিয়াম কেরী

কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রথমে যোগ দেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে ; এবং ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ঐ বিষয় সমূহের অধ্যাপক ও সর্বাধক্ষ্য নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে কেরীর কর্ম-প্রচেষ্টার যথোচিত মূল্য নির্ণয়ের জন্যেও একথা স্মরণীয় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবীন পাঠকদের জন্য বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কারণ পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল প্রবল। তাই বাংলা বিভাগের শিক্ষকরূপে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়ে কেরীর প্রথম কাজ হল পাঠ্য তালিকা নির্মাণ করা নয় বরং পাঠ্যযোগ্য পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করা। এই সব শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপনিয়ামকের পথিকৃৎ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে কেরীর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—১) কথোপকথন (১৮০১), ২) ইতিহাসমালা (১৮২২)। কথোপকথন সমকালে চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নামকরণের মধ্যেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিহিত। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন—"It is supposed that all those who attempt that Bengalee Language are, or ought to be, previously acquainted with grammar...... The Bengalee comprehenes

the dialects of Midnapore, Duddea, Dinagepore, Coochbehar and that spoken about Dacea and Chitagung which all differ from each other and yet preserve the some formation and genius." কথোপকথন গ্রন্থটি মোট একুশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের ব্যবহৃত কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। মজুরের কথাবার্তা, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রী লোকের হাট করা, মাইয়া কোন্দল, চাকর ভাড়া করা, ভিক্ষুক, বিবাহ রাত্রির খাওয়া দাওয়া, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম আচার ব্যবহার কোনকিছুই এই গ্রন্থ থেকে বাদ যায় নি। বিশেষ করে কথোপকথনের ঢঙে কেরী এমন অনেক নাটকীয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন যাতে বিদেশী তরুণরা সহজেই এভাষা শিখতে পারে। বিদেশী কেরী এদেশীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় এতটাই এদেশীয় হয়ে উঠেছিল যে বাঙালী গৃহস্থের রন্ধনশালার ও রন্ধনশিল্পের কলা নৈপুণ্যের বিবরণও দিয়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে কেরীর সম্পাদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে বিষয় নির্দেশিত হয়েছে—'ইতিহাসমালা বা Collection of stories in the Bengali Language collected from various sources." গ্রন্থটি কেরীর রচনার নয়, সম্পাদনা মাত্র। দেশী ও বিদেশী ভাষা থেকে সংগৃহীত নানা রকমের প্রায় ১৫টি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থের গঠন। 'কথোপকথনে' যেমন কথ্য ঢং—এ লেখা, ইতিহাসমালা'র ভাষা তেমনি স্বচ্ছ প্রাঞ্জল সাধু গদ্যের নির্দশন। এর বাকরীতি প্রতিস্তরেই বিষয়ানুগ। এভাষা কেবল সুগঠিত নয়, পরিণত কল্পনাশক্তিরও পরিচয়বহ।

'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনার পরিণত পর্যায়ের রচনা। রামরাম রচিত 'প্রতাপদিত্য চরিত্র'র ভাষার প্রস্তুতি পর্যায় পেরিয়ে নির্ভুল গদ্য রচনার যে পরিণতি সীমাতে এই ভাষা এসে পৌঁছেছে, তা তুলনা করলে বিস্মৃত হতে হয়। ডঃ সুশীলকুমার দে বোঝাতে চেয়েছিলেন, প্রায় বারো বছর ধরে বাংলা গদ্যভাষা রচনার পথে ফোর্ট উইলিয়াম—এ যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল, তারই চূড়ান্ত পরিণত লক্ষ করা যায় 'ইতিহাস মালা'র গদ্যে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠভূমি,—'ইতিহাসমালা'র গদ্য সেই পরীক্ষার সফল উত্তরণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ।

২.১.৩.১.২ : রামরাম বসু

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে কালের বিচারে প্রথমতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) তাঁর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ফোর্ট উইলিয়াম থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ। রামরাম বসু প্রথম জীবনে জন টমাসের বাংলা শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে চেম্বার্স তাঁর নাম সুপ্রিম কোর্টে ফরাসি দোভাষী হিসাবে সুপারিশ করেন। টমাসের পরে রামরাম বসুর প্রখ্যাত ছাত্র হলেন উইলিয়াম কেরী। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে রামরাম বসুকে কেরী মুন্সি হিসাবে গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের রামরাম বসুর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারি পণ্ডিত রূপে কাজ করেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৪০ টাকা। এখান থেকেই তাঁর প্রথম গদ্য গ্রন্থ 'রাজাপ্রতাপাদিত্য' চরিত্র প্রকাশিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রামরাম বসুর 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গদ্যে রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি সর্বপ্রথম বর্ণনামূলক গ্রন্থ। ফলে বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এই গ্রন্থের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আরবী ফারসী ভাষার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে

অনেক তহশীল, কাজিয়া এ ভাষার শৈল্পিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘ কয়েকশো বছর এদেশে মুসলমান রাজত্ব বলবৎ থাকায় আইন আদালত থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও কথোপকথনের ক্ষেত্রে আরবী ফরাসী শব্দ ব্যবহৃত হত। রামরামের কাছে গদ্যের কোন আদর্শরূপ না থাকার জন্য নিজের পথ তাকে নিজেই প্রস্তুত করতে হয়েছিল। তাই ভুল বানান, ভুল সমাস, ভুল সংস্কৃত পদ, ছেদ চিহ্নের অভাব প্রভৃতি ত্রুটি নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য কিন্তু প্রথম রচনাকালের এইরূপ দোষ ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া যায়।

পত্রাকারে লিখিত রামরাম বসুর দ্বিতীয় মৌলিক গ্রন্থ 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে প্রায় চল্লিশটি পত্র সমন্বিত এই গ্রন্থটি। বিদেশী তরুণ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় চলিত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত লিপিমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত বিষয়ী লোকের ভাষায় দেশী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ ও প্রয়োজন স্থলে ফরাসী শব্দ সমন্বিত যে গদ্যরীতি লিখিত। ফলে এ গ্রন্থের ভাষা অনেকটা কথ্য ভাষা অনুযায়ী নাটকীয় সুলভ কথকতা ও কবিত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য রামরাম বসুর পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—এর আরবী ফারসীর দৈরাত্ম বাক্য অন্বয়হীনতার ত্রুটি বহুলাংশে অবসান ঘটেছে 'লিপিমালা'য়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বেতনভোগী পণ্ডিতদের মৌলিক গ্রন্থকার রূপে রামরাম বসুর স্থান সর্বাগ্রে। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রসাদগুণ সম্পন্ন সুপাঠ্য ভাষা রচনার প্রয়াসে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টির প্রকৃতি অনুভব করেছিলেন ঠিক, কিন্তু সৃজন শক্তির গভীরতর অভাবে তিনি তা কার্যে রূপায়িত করে বাংলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টার কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেননি।

২.১.৩.১.৩ : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম প্রধান শিক্ষক সংস্কৃতে সুপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই বাংলা গদ্য সৃষ্টির ইতিহাসে সৃজনশীল গদ্যরচনার প্রথম পথিকৃৎ। তিনি কলেজের বাংলা লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ২০০ টাকা বেতন কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এখানে অবস্থান কালে তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হয়। যার মধ্যে চারখানিই প্রকাশক ও পোষক ছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। সেই গ্রন্থ চারটি হল—'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ (১৮০৮), 'রাজাবলী' (১৮০৮), 'প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮১৩) ও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রথম গ্রন্থ সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' থেকে অনূদিত 'বত্রিশ সিংহাসন।' এ ভাষা মূলানুগ অনুবাদের নয়, তাহলেও সংস্কৃত বাগবিন্যাসের প্রতি আনুগত্য রক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহে মাঝে মাঝে বিন্যাস আড়ষ্ট হয়েছে, তা না হলে এই গ্রন্থেরই অনেক জায়গায় উল্লেখ্য সার্থকতার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য বিদ্যাসাগরের রচনার গদ্যরূপের যে পরিমাণ সুসিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম চেষ্টাতেই তার আংশিক আভাস অন্তত রূপ রেখায়িত যে হয়েছিল তাতে সংশয় নেই।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' এ বিদ্যালঙ্কারের কৌতুক প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কৌতুককর গদ্যশৈলীর উৎস আর কিছুই নয় তা হল সংস্কৃত। বাংলা গদ্যের একটি সাধারণ কাঠামো তাঁর মনে মুদ্রিত হয়েছিল ; কিন্তু সেই গদ্যরীতির নির্ভুল স্বাধীনতা প্রকৃতিটি আয়ত্তগম্য হয়ে ওঠেনি এই গ্রন্থটিতে।

'রাজাবলী' গ্রন্থে বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে ভাবের অখণ্ডতা প্রকাশে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন বিদ্যালঙ্কার। হিন্দু রাজাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে সংস্কৃত শব্দ পাঠান রাজরাজাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে ফরাসী শব্দ আর ইংরেজ রাজশক্তির আবির্ভাব উপলক্ষ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শিল্পাদর্শের দিক দিয়ে রাজাবলীর ভাষা এতটাই প্রাঞ্জল উচ্চমার্গের যে তার প্রাঞ্জলতায় সজনীকান্ত দাস বঙ্কিম রীতির সন্ধান পেয়েছেন। সংস্কৃত প্রধান সৃজনশীল বাংলা গদ্যে, পদ্যের মত যে ছন্দ ঝংকার আছে, তার স্পন্দন স্পর্শে গদ্য সাহিত্য সাহিত্যকে গদ্যের মর্যাদায় রমণীয় ও প্রাণের ভাষা হয়ে উঠতে পারে, সেই ভাষার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির প্রথম আবিষ্কর্তা হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থ তিনি কথ্য রীতি, সাধ্ রীতি ও সংস্কৃতানুসারী রীতির ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তা পরবর্তী স্বতন্ত্র রীতিতে নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষাশৈলীর দিক থেকে বাংলা গদ্যে এটি এক বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা। চারটি 'স্তবক' ও বহু সংখ্যক 'কুসুম' এ বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও লিপিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতি বিজ্ঞান, রাজনীতি, আইন প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই গ্রন্থে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আওতার বাইরে লেখা মৃত্যুঞ্জয়ের বিশ্রুত গ্রন্থ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা।' এটি তার সর্বশেষ গদ্য গ্রন্থ। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও শেষ রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দেই। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র প্রকাশকাল ১৮১৭, রচনা কালও তার পূর্ববর্তী নয়। অতএব এই গ্রন্থেই সাধারণভাবে লেখকের ভাষাবৃত্তির অন্তিম পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে; অথচ সেদিক থেকে পাঠককে তিনি অনেকটাই নিরাশ করেছেন। তবুও এতৎসত্ত্বেও বলা যায় বাংলা গদ্যে প্রথম অচেতন স্টাইলিস্টের পথশীলতায় শতাব্দীর পাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব পথ কুসুমাকীর্ণ হয়ে ওঠে, তিনি আর কেউ নন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

কেরী, মৃত্যুঞ্জয় এবং রামরাম বসু ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীতে আরও একাধিক গ্রন্থাগার ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রবর্তিত গদ্যরচনার ধারা তাঁদের প্রচেষ্টা মাধ্যমে অল্পবিস্তর প্রসার লাভ করেছিল, কেবল এই কারণেই আদি যুগের কারুকৃৎ হিসেবে গদ্য ভাষার ইতিহাসে তাঁরা উল্লেখনীয়।

২.১.৩.১.৪ : গোলকনাথ শর্মা (১৮০৩)

গোলকনাথ শর্মার অনূদিত 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়।

'হিতোপদেশ' এর আর একটি অনুবাদ করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অস্থায়ি পণ্ডিত রামকিশোর তর্কচূড়ামণি; গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল (১৮০৮) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষণে। কিন্তু এ বইয়ের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২.১.৩.১.৫ : তারিণচরণ মিত্র (১৭৭২-১৮৩৭)

হিন্দি বিভাগের দ্বিতীয় মুন্সি হিসাবে ফোর্ট উইলিয়ামে যোগ দিয়েছিলেন, পরে প্রধান মুন্সির পদে উন্নীত হন। তারিণীচরণ বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে জন গিলক্রাইসটের গ্রন্থ 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' অনুবাদ করেন।

২.১.৩.১.৬ : চণ্ডীচরণ মুন্সি (১৮০৮)

চণ্ডীচরণ মুন্সির 'তোতা ইতিহাস' কাদির বখস-এর লেখা ফরাসী 'তুতিনামা'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ কাল ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ। চণ্ডীচরণ মুন্সি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন এবং বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লন্ডন থেকেও এই গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে ভাষার প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করা গেলেও বিশুদ্ধ রীতিবোধের অভাব এখানে অনেকাংশে ধরা পড়েছে। ভাগবদ্গীতা-র একটি পদ্য অনুবাদও করেন চণ্ডীচরণ।

২.১.৩.১.৭ : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিও লন্ডনে পুনর্মুদ্রিত হবার বৈশিষ্ট্যতা অর্জন করেছিল। গঠনভঙ্গির দিক থেকে তাঁর গদ্য রচনা যুগের অন্যান্য রচনার তুলনায় সরল। একারণেই গ্রন্থটিতে অধিকতর বিশুদ্ধতা লক্ষিত হয়।

২.১.৩.১.৮ : হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদ রায় বিদ্যাপতির লেখা 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বইটি লন্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

এছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'ন্যায় দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষাতে সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে অর্থপ্রকাশ পূর্বব্দ 'পদার্থ কৌমুদি' প্রকাশ করেছিলেন ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে। এছাড়া 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদি' (১৮২২) ও 'পাষণ্ড পীড়ন' নামক একটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তর্কপঞ্চাননের গদ্যের ভাষা তার্কিক পণ্ডিতের জ্ঞানোচিত জটিলতার বিসর্পিল ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে আরো নানা পুস্তক রচিত এবং প্রকাশিত হওয়ার আরও সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশরই কোনো নিদর্শন রক্ষিত নেই। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বিদেশী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রচনার দ্বারা সৃজনশীল দক্ষতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও ১৮০০ থেকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত, মনীষী ও বিশিষ্ট ভাষাবিদদের সহযোগিতায় নানা প্রতিকূলতার দুর্গম শিখরকে অগ্রাহ্য করে কেরীর একনিষ্ঠ পরিচালনা দক্ষতায় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সৃষ্টি হয়নি ঠিকই, কিন্তু প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্য ও দীর্ঘ পনেরো বছরে বহতা নদীর মত তাঁর বিবর্তনের যে ইতিহাস আমরা পাই তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার্য। কিন্তু বলাবাহুল্য এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মৌলিক প্রত্যাশাকে সর্বাংশে সার্থক করে তুলতে পারেনি। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী এই কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে—"It had no revenues and no system of instruction, no teachers and, as a college, in reality no pupils".

২.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান আলোচনা কর।

২। উইলিয়াম কেরীর গদ্য বাংলা গদ্য সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত কর।

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্যের কাঠামোটিকে প্রাথমিক ভাবে তৈরি করেছিল—এই মতটির যথার্থতা বিচার কর।

৪। তোমার মতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপ্রধান গদ্য রচয়িতা কারা? তাদের গ্রন্থগুলি আলোচনা করে বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে এগুলির অবদান আলোচনা কর।

২.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), সুকুমার সেন, ১৯৭০, আনন্দ পাবলিশার্স।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (পঞ্চম খণ্ড), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৫, মর্ডান বুক এজেন্সী।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড), ভূদেব চৌধুরী, ১৯৮৪ দে'জ পালিশিং।

৪। বাংলা ইতিহাস সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, ১৯৭৫, ছিবায়ত প্রকাশন।

৫। বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৪, ক্লাসিক প্রেস।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫, মর্ডান বুক এজেন্সী।

৭। বাংলা সাহিত্যে গদ্য, সুকুমার সেন, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক-৪

রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব

বিন্যাস ক্রম

২.২.৪.১ রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব

২.২.৪.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৪.১ : রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব

রামমোহন যে নবযুগের অগ্নিময় বাণী পরিবেশন করেছেন, পরবর্তীকালের প্রাবন্ধিকেরা তাঁকে আশ্রয় করেই নানা চিন্তা, অনুশীলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে উদ্যোগী হয়। ঈশ্বর গুপ্ত মূলত কবিতা লিখলেও গদ্যও লিখেছেন এবং সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গিয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের সার্থক পথনির্দেশের নিশানা প্রধানত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও বাংলা সাহিত্যচর্চা পত্রিকাটি নবকলেবর ধারণ করে। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা রসসাহিত্য রচনার দিকে অগ্রসর না হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যই এঁদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল। তাঁর বাংলা গদ্যরচনায় একটা স্বতন্ত্র রীতি লক্ষণীয়। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা উন্নত হবার পথে চলতে আরম্ভ করে। তাঁর রচিত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" (২ খণ্ড), 'চারুপাঠ' (৩ ভাগ), 'ধর্মনীতি' উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা "ভারতবর্ষীয় উপাসক 'সম্প্রদায়' (২ খণ্ড), উইলসনের Essays and Lecturers on the religion of the Hindus অবলম্বনে গ্রন্থটিতে তিনি বহু তথ্য ও নতুন বস্তু সংযোজন করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ অবশ্যই আলোচ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির। অনুবাদ কর্মে লিপ্ত থাকলেও কিছু প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন — সেগুলিকে মূলত "প্রস্তাব" বলেই অভিহিত করা হয়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আছে — "সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব", " বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে যেমন তাঁর অসামান্য সাহিত্য রসবেত্তার

পরিচয় আছে, তেমনি গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও প্রগাঢ় বিচার শক্তির পরিচয়ও আছে। কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যেরও একটি বিশিষ্ট রূপরীতি আছে, যা তাঁর গ্রন্থাদিতে দুর্লভ।

পরবর্তীকালে প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। রাজনারায়ণ বসুর "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব", "ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতা" পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার ভাষা ছিল আবেগবর্জিত যুক্তিবিচারের ভাষা। তিনি আলোচ্য বিষয়ের সমগ্র দিক বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে নিজের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা প্রবন্ধের একটা পরিচ্ছন্ন সুগঠিত রূপ তাঁর হাতে সুসংহত হয়ে ওঠে। তাঁর তথ্যবহুল যুক্তিতে পরিপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ' — এই তিনটি গ্রন্থই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি সদাচার ও গৃহধর্মের ওপর ভিত্তি করেই রচিত।

১৮৫১ সালে যে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর সম্পাদনায় "বিধিধার্থ সংগ্রহ"-এর প্রকাশ বাংলা দেশের পক্ষে এক মহান অবদান। পত্রিকাটিতে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রাজেন্দ্রলাল রচনা করেন।

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের যখন পুনর্জাগরণ হলো, তখনই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা শুরু হয়। রামমোহন নবযুগের বাণী পরিবেশন করেছেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালের প্রাবন্ধিকেরা নানা চিন্তা, অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উদ্যোগী হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের সার্থক পথ নির্দেশের নিশানা প্রধানত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'চারুপাঠ', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও প্রগাঢ় বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়- 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে। রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা' পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ' উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২.২.৪.২ : সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস
২। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন
৩। কালান্তরে বাংলা গদ্য—গোলাম মুরশিদ

২.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নমালা

১। অক্ষয়কুমার দত্তের দুটি গ্রন্থের নাম কর?

২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নাম কর?

৩। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ পর্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক-৫

বঙ্গদর্শন ও প্রাবন্ধিক গদ্য

বিন্যাস ক্রম

২.২.৫.১ বঙ্গদর্শন ও প্রাবন্ধিক গদ্য

২.২.৫.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৫.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৫.১ : বঙ্গদর্শন ও প্রাবন্ধিক গদ্য

এরপর ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করে আধুনিক শৈল্পিক দৃষ্টিতে প্রবন্ধ রচনা করতে উৎসাহী হন। তখনই যথার্থ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্কিমের পূর্ব পর্যন্ত প্রবন্ধের সংজ্ঞা সচেতন না হয়েও প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রবন্ধসাহিত্য নবরূপে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। তবে এই বৈচিত্র্যের জন্য দীর্ঘকালীন সাধনা বঙ্কিম-প্রতিভাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। তবুও প্রাক্-বঙ্কিম যুগের প্রবন্ধকে একেবারে অবহেলাও করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যের বিষয়বস্তু গভীর বিশ্লেষণপূর্ণ ও দার্শনিক মননধর্মিতায় অত্যুজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয়গতভাবে যেভাবে বিভাজন করা যেতে পারে তা হলো : সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, সমাজ ও ইতিহাসমূলক প্রবন্ধ, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধ, অর্থ-নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর দুটি খণ্ডে আছে সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, সম্পর্কিত। 'বিজ্ঞান রহস্য'-এ দেখতে পাই প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে বঙ্কিমের নতুন চিন্তাভাবনা। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচিত্রধর্মী বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় 'লোকরহস্য'; 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থাদিতে। প্রকৃতপক্ষে 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-কে সঠিক প্রবন্ধসাহিত্য বলা যায় না। 'লোকরহস্য' সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত হলো যে, কৌতুক বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এ গ্রন্থে পাওয়া গেলেও শ্রেণিবিশেষ বা সাধারণ মানুষ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। আবার 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটির অসাধারণত্ব স্বীকার করে সমালোচক গোপাল হালদারের মতে — 'কমলাকান্ত বিশ্বসাহিত্যের ইউনিক সৃষ্টি, কারণ এক ইউনিক প্রতিভার সে প্রতিভূ'। প্রসঙ্গত, গ্রন্থটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একইসঙ্গে দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতি, স্বদেশ প্রেমিক এবং Humourist-এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের বিবিধ রূপের মধ্যে প্রবন্ধসাহিত্যও রসরূপযুক্ত শিল্পগত প্রকরণ, উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রই তা প্রকৃষ্টরূপে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লালনে ও প্রযত্নে কয়েকজন প্রাবন্ধিক সেযুগে প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চিন্তাশীল প্রবন্ধকার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর প্রথম গ্রন্থ ''প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'' ছাত্রপাঠ্য পুস্তক। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। ''নানা-নিবন্ধ'' নামক প্রবন্ধ সঙ্কলন গ্রন্থটি ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তৎকালীন 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশ প্রীতি ও দেশাত্মবোধ। বঙ্কিম-প্রভাবিত অক্ষয়কুমার রচিত 'চন্দ্রালোক' প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্ভুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হলো— ''সমাজ সমালোচনা'', ''আলোচনা'', ''সনাতনী'' এবং ''রূপক ও রহস্য''।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বল্পকাল তিনিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। স্বল্পসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করলেও তাঁর মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যনিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ও স্বীয় রচনাসৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনন্য। বলা বাহুল্য সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ একান্তভাবেই বঙ্কিম-প্রভাব মুক্ত। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ছাড়া ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ 'পালামৌ' বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে অনন্য সাধারণ। নিপুণ চিত্রশিল্পী ও পর্যবেক্ষকের মতো মানব ও প্রকৃতি জগৎকে অঙ্কন করেছেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যে চিরআসন লাভ করে আছে।

> *বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রবন্ধ সাহিত্য নবরূপে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে দার্শনিক ও মননধর্মিতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধসাহিত্যের বিচিত্রধর্মী বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' গ্রন্থাদিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্র-ছায়ায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যনিষ্ঠা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ও স্বীয় রচনাসৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অনন্য। সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'পালামৌ', বাংলাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসকে কেন্দ্র করে মীর মশারফ হোসেন, 'গো-জীবন', 'আমার জীবনী', 'হজরত বেলালের জননী, রচনা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', 'প্রবন্ধাবলী'তে সামাজিক ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠেছে।*

চন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। দেশ-বিদেশের দর্শন চিন্তা তাঁর রচনাধারার এক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর দার্শনিক মনোভাব বিদ্যমান। 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'সাবিত্রীতত্ত্ব' প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধসমূহ। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সরাসরি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রায়শই পাশ্চাত্যরীতির অনুবর্তী হয়ে সাহিত্য সমালোচনা করতেন। সামাজিক ন্যায়নীতি নয়, বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করাই ছিল তাঁর স্বকীয় পদ্ধতি। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর একমাত্র গ্রন্থ ''সাহিত্যমঙ্গল'' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অন্যান্য রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয় যা পাঠকমহলে সমাদর লাভ করতে পারেনি। ঠাকুরদাসের পরবর্তী প্রবন্ধকার হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবস্থায় তিনি বঙ্কিমের সংস্পর্শে থাকাকালীন বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। পান্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম শৈল্পিক মনোভাব, রসবোধ, এবং উন্নত সাহিত্যরুচি তাঁর জীবন তথা রচনা সমূহে সঞ্চারিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার মূল সংযোগ ঘটানোর যে সামগ্রিক পরিচয় তাঁর রচনাতে লক্ষ করা যায়, সেটা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শায়িত মনোভাবের দ্বারা তিনি অনুসৃত হয়েছিলেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি তাঁর প্রবন্ধাবলীকে এক অত্যুজ্জ্বল মহিমায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কোনো একটি যুগের মানুষের জীবনাচরণের বৈচিত্র্য, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বা তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেই তিনি ইতিহাস চর্চার আদর্শ মনে করতেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত থাকার পর ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় দুটি খণ্ডে বহু প্রবন্ধ সঙ্কলিত সম্ভব হয়েছিল।

মীরমশারফ হোসেন বঙ্কিমসমসাময়িক প্রাবন্ধিক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রধানত সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। রচনার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। মশারফ রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'গো-জীবন', 'আমার জীবনী', 'হজরত বেলালের জননী' প্রভৃতি প্রধান। বঙ্কিম-বলয়ের বহু প্রাবন্ধিক বাংলা গদ্যে প্রাণময়তা ও রসপ্রবাহের গতির প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়কার একজন বলিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সামাজিক ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো — 'আত্মচরিত', 'রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'প্রবন্ধাবলী', 'ধর্মজীবন' ও 'বক্তৃতাস্তবক'।

২.২.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্র — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
২. বাংলা সাময়িক পত্র — শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য — শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধের নাম কর?

২। 'পালামৌ' কার রচনা?

৩। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' কে রচনা করেছিলেন?

৪। মীর মশারফ হোসেনের দুটি প্রবন্ধের নাম কর?

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক-৬

রবীন্দ্র যুগ

বিন্যাস ক্রম

২.২.৬.১ রবীন্দ্র যুগ

২.২.৬.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৬.১ : রবীন্দ্র যুগ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলতা প্রবন্ধসাহিত্যের এক নবতম সংযোজন। তাঁর প্রবন্ধাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — সাহিত্য সমালোচনা; রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা; ব্যক্তিগত প্রবন্ধ; চিঠিপত্র; ভ্রমণকাহিনি ও ডায়েরী। সাহিত্যালোচনার মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন, আধুনিক, দেশী-বিদেশী, সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমাজ ও শিক্ষা রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান উপাদান — এই ভাঁবধারা তিনি বহু আলোচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ — 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সর্ভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধগুলিতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থগুলির তথ্যতত্ত্ব ও তাৎপর্য চিন্তাশীল মানুষের চিরকালীন সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থে ব্যক্তি মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণির রচনায় ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রবন্ধের বস্তুভারকে লাঘব করার ফলে প্রবন্ধের সাহিত্য রস আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। এই লক্ষণটি বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় তাঁর রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মদর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহে। ব্যক্তিগত মানসিকতার পরিচয় পাই তাঁর 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ দুটিতে। রবীন্দ্রনাথ জগৎ, জীবন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছেন, পঞ্চভূতের পরিহাসমুখর আলাপচারিতায় তার স্বরূপ ব্যাখা করেছেন। জগৎ ও জীবনের যে প্রতিচ্ছায়া রবীন্দ্রনাথের মানসপটে বিরাজ করেছে - তার দৃষ্টান্ত অবিসংবাদিতভাবেই বিচিত্র

> *বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থের বিষয় বৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলতা প্রবন্ধসাহিত্যের এক নবতম সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীনসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন, আধুনিক, দেশী-বিদেশী, সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ-'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধগুলিতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ দুটিতে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, ভ্রমণ কাহিনি, ডায়েরী, জাপান-যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, ছিন্নপত্র গ্রন্থে জীবন কথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।*

প্রবন্ধ গ্রন্থের রচনাসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, ভ্রমণকাহিনি, ডায়েরী, জাপান-যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, ছিন্নপত্র প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর জীবন কথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্র অধিকার করে বিরাজ করছিল, ঠিক সেই সময়ে বহু যশস্বী লেখক তাঁদের স্বকীয় ধারায় স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতিঃপুঞ্জে এই নব্য লেখকবৃন্দ কিছু পরিমাণে ম্লান হয়ে গেলেও ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে এঁদের কৃতিত্ব মোটেই বর্জনীয় নয়।

২.২.৬.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন

২. রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা — লায়েক আলি খান

৩. রবীন্দ্র চিত্ত লোক — জ্যোতির্ময় ঘোষ

৪. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন — বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

২.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রবীন্দ্রনাথের দুটি রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের নাম কর।

২। রবীন্দ্রনাথের দুটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নাম কর।

৩। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক-৭

স্বামী বিবেকানন্দ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ

বিন্যাস ক্রম

২.২.৭.১ স্বামী বিবেকানন্দ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ

২.২.৭.২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৭.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৭.১ : স্বামী বিবেকানন্দ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ

স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', এবং 'পত্রাবলী' অতুলনীয় প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের 'বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও সাহিত্য বিষয়ক তাঁর রচনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সেই শ্রেণির। বলেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় 'চিত্র ও কাব্য' নামে একটা সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল — এগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে তাঁর বহুসংখ্যক রচনা সঙ্কলন করে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিজ্ঞানশাখার অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কেবল বিজ্ঞানচর্চায় আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রচনা করেছিলেন সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ, প্রভৃতি। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে - 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'মায়াপুরী', 'কর্মকথা' 'চরিতকথা', 'যজ্ঞকথা', 'জগৎকথা', 'নানাকথা', 'শব্দকথা', 'বিচিত্রজগৎ', 'বিচিত্রপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি। তত্ত্বকথায় তিনি যেমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি ভাষা ও রচনারীতিকে কৌতুকরসোচ্ছল করে প্রবন্ধের সীমা বিস্তৃত করেছেন। এককথায় বলা যেতে পারে যে, মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সমকক্ষ প্রতিভা বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য চর্চায় প্রাণিত হন। গদ্যভাষার ক্ষেত্রে তিনি সেই চিত্রশিল্পীর রং ও তুলি ব্যবহার করেছেন। পটের ওপরে রেখা এবং রং-এর সাহায্যে যেমন প্রত্যক্ষ রূপ সৃষ্ট হয়, শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠিক সেই রূপই সৃষ্টি করেছেন। গল্প, স্মৃতিকথা বা প্রবন্ধ রচনাতে তিনি কথকতার রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধসমূহ মূলত শিল্পতত্ত্ব, স্মৃতিকথা এবং বিচিত্র গল্প এই তিনটি শ্রেণিতে বিভাজিত হতে পারে। বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে তিনি শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা ''বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভারত শিল্প'

এবং 'ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ' নামে দুটি পুস্তিকা শিল্পতত্ত্বের আলোচনা সমৃদ্ধ। তাঁর তিনটি স্মৃতিকথামূলক রচনা — 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', এবং 'রাজকাহিনি'তে এক নতুন রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

পরবর্তীকালে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রযুগের লেখক হয়েও নিজের মানস ও রচনাস্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট, রবীন্দ্র-প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে চলিতভাষাশ্রয়ী বুদ্ধিমান, আঙ্গিক সচেতন প্রবন্ধের যে ধারা প্রবর্তন করেন, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা প্রবন্ধের রূপনির্মিতিকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঋজু, কঠিন, তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দেয়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন — "প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশ, ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি।" বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষারীতি প্রবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' যে ভূমিকা নিয়েছিল, পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "পরিচয়" পত্রিকার মাধ্যমেও মননশীলতার ক্ষুরধার দীপ্তিতে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় বাস্তবতা ও প্রগতিবাদের উগ্র ঝঞ্ঝা দেখা গেলেও নবতর চিন্তাজগৎ নির্মাণে তাঁরা তেমন সফলতা অর্জন করেননি। প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের আকষর্ণে তাঁকে ঘিরে একটা শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এঁরা ছিলেন প্রধানত বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ মননশীল লেখক সম্প্রদায়। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গদ্যরচনা 'বীরবল' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর "তেল-নুন-লকড়ী"; 'বীরবলের হালখাতা', "নানা কথা", "নানা চর্চা" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরবর্তী ধারায় রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

> *স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' অতুলনীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের 'বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' চরিতকথা উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রশিল্পীর রং ও তুলি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা প্রবন্ধের রূপনির্মিতেকে প্রমথ চৌধুরী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর 'তেল-নুন-লকড়ী', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'নানাচর্চা' প্রভৃতি গ্রন্থে ঋজু, কঠিন, তীক্ষ্ণ ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', যে ভূমিকা নিয়েছিল, পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাও ক্ষুরধার দীপ্তিতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।*

প্রশ্ন :

১। স্বামী বিবেকানন্দের দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম কর?

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গ্রন্থের নাম কর?

৩। প্রমথ চৌধুরীর দুটি গ্রন্থের নাম লেখ?

২.২.৭.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা — ড. অধীর দে (প্রথম খণ্ড)

২. সাহিত্য সম্পুট — প্রমথ চৌধুরী
৩. বাংলা সাহিত্যে গদ্য — ড. মনিলাল খান
৪. গদ্যের সৌন্দর্য — ড. গুণময় মান্না

২.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও বিকাশে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান আলোচনা করো।
২. গদ্য রচনাকার রামমোহন রায়ের ভূমিকা আলোচনা করো।
৩. 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' — এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার করো।
৪. প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব আলোচনা করো।
৫. প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলী আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৮

বাংলা সাময়িক পত্র

বিন্যাস ক্রম

২.৩.৮.১ : ভূমিকা

২.৩.৮.২ : তত্ত্ববোধিনী পর্ব

২.৩.৮.৩ : বঙ্গদর্শন পর্ব

২.৩.৮.৪ : সবুজপত্র

২.৩.৮.৫ : সবুজপত্র-উত্তর

২.৩.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.৮.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.৮.১ : ভূমিকা

দিগ্‌দর্শন-সমাচারদর্পণ-সম্বাদকৌমুদী-সমাচারচন্দ্রিকা-বঙ্গদূত-সংবাদ প্রভাকর-জ্ঞানান্বেষণ-জ্ঞানোদয়-তত্ত্ববোধিনী-বিবিধার্থ সংগ্রহ-সবুজপত্র-আধুনিক পর্যায়ভুক্ত।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্যভাষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রধান হোতা মার্শম্যান 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিকীও প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলাভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। সমাচারদর্পণের সাফল্য পরবর্তী সময়ের অন্যান্য সাময়িক পত্রের প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে সাময়িক পত্রকেই আশ্রয় করে বাংলা গদ্যভাষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৮১৯ সালে শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রধান মার্শম্যান 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'সমাচারদর্পণ'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। রামমোহন রায় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ-কৌমুদী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর'। দেশবিদেশের সংবাদ ছাড়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পেত।

সমাচার দর্পণে হিন্দু সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য থাকার কারণে রামমোহন রায় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ-কৌমুদী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত। সমাজসংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে মতভেদের কারণে ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন ১৮২১ সালে।

সমাচার চন্দ্রিকার পর নীলরতন হালদারের সম্পাদনায় ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির পরিচালকমন্ডলীতে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। 'বঙ্গদূত' পত্রিকাতেই অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা বিশেষ লক্ষণীয়।

১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রথম অবস্থাতেই এটি ছিল সাপ্তাহিক এবং পরে দৈনিক রূপ লাভ করে, বাংলাভাষায় এটিই প্রথম প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র। 'সংবাদ প্রভাকর' দীর্ঘ স্থায়িত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। দেশবিদেশের সংবাদ ছাড়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পেত। বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের প্রথম বয়সের রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদ-প্রভাকরের পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকা অল্পবিস্তর সমাদর লাভ করেছিল।

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি?

২। 'সংবাদ প্রভাকর' কার সম্পাদনায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?

২.৩.৮.২ : তত্ত্ববোধিনী পর্ব

সাময়িকপত্রের গতানুগতিক ধারার অবসান ঘটে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকেই। এই পত্রিকাটি ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্ররূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ধর্মব্যাখ্যান ছাড়া নীতিগর্ভ বিজ্ঞানবিষয়ক এবং অধ্যাত্মবিষয়ক জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ ছাড়াও সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হোত। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর রচনামণ্ডিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা সাময়িকপত্রের যে আদর্শ স্থাপন করেছিল, পরবর্তীকালে তাই বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন ও ভারতীতে অনুসৃত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভূগোল-ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জনমানসকে উদ্দীপিত করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিভিন্ন সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভূগোল-ইতিহাস সম্বন্ধে জনমানসকে উদ্দীপিত করেছিল। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধাচরণ শিকদারের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে এতে প্রকাশিত হয়।

১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। বহুবিধ রচনা সম্বলিত — পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রাচীন তীর্থবর্ণনা, জীবসংস্থার বিবরণ, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিমূলক উপন্যাস, গ্রন্থাদির সমালোচনা — বিবিধার্থ সংগ্রহ সেকালের একটি পূর্ণাঙ্গ সাময়িকপত্র।

১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধাচরণ শিকদারের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে এতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে, বিশেষত পুরনারীদের শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্যরসাস্বাদনে আগ্রহী করে তোলা।

এরপর ১৮৪৫ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় 'বিদ্যোৎসাহিনী', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ', রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'রহস্যসন্দর্ভ' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "Education Gazette" প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে।

প্রশ্ন :

১। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা কার সম্পাদনায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?
২। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি কার রচনা? কোন পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়?

২.৩.৮.৩ : বঙ্গদর্শন পর্ব

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। কর্মে, জ্ঞানে ও চিন্তায় শিক্ষিত বাঙালিকে জাগ্রত করার অভিপ্রায় এবং সর্বোপরি দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনার দ্বারা শিক্ষিত বাঙালির অন্তরে যাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয় — এটাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নিরন্তর অধ্যবসায়। 'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন — "বঙ্গদর্শন আষাঢ়ের প্রথমে বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" বঙ্গদর্শনে রচনা ও সমালোচনা ছাড়াও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যঙ্গকৌতুক, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হত। বঙ্গদর্শনের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রতিভাসে বাংলা গদ্যের প্রসার ত্বরান্বিত হয়। তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশলাভ করে। অল্পকথায় বলা যায় যে, বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য-কর্ম প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন — রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। কর্মে, জ্ঞানে ও চিন্তায় শিক্ষিত বাঙালিকে জাগ্রত করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নিরন্তর অধ্যবসায়। 'বঙ্গদর্শনে' ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা সঙ্গীত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যঙ্গকৌতুক ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ রচনা প্রকাশ করেন।

"শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত যখন সুপ্তিসঙ্কীর্ণ গ্রামের বেড়া ভাঙিয়া বঙ্গদর্শনেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। তখন রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার তরুণ বন্ধুরা অখণ্ড ভারতের জাতীয় আদর্শখানি তুলিয়া ধরিলেন।" ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হলো 'ভারতী'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনায় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় পত্রিকাটির লেখকগোষ্ঠীর তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে 'ভারতী' সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

এরপরে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় "নবপর্যায় বঙ্গদর্শন" এবং ১৯০১ সালে 'যমুনা' প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন :

১। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কার সম্পাদনায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?

২। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন এমন দু'জনের নাম লেখ?

২.৩.৮.৪ : সবুজপত্র

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' নামে সাময়িকপত্রের আর্বিভাব ঘটে। সম্পাদক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, সম্পাদকীয়তে লিখেছেন — "বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করার জন্যেই সবুজপত্রের আবির্ভাব।" রচনার প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে চলিত রীতির সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। সবুজপত্রেই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস এবং কয়েকটি গল্প ও কবিতা প্রকাশ পায়। চলিত গদ্যরীতির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় 'সবুজপত্রে'র অবদানের জন্য পত্রিকাটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে অনন্যরূপে বিরাজিত।

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করার জন্যেই সুবজপত্রের আর্বিভাব।" 'সবুজপত্রেই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চলিত গদ্যরীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় 'সবুজপত্রে'র অবদান অনন্য। বাংলা গদ্য সাহিত্য, সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রধানত- গদ্যকে জড়তামুক্ত করা, লেখক গোষ্ঠী তৈরি করা, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতীয় চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছিল।

সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য সর্ম্পকে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন — "১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে আজ অবধি দেখিতেছি যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্য (এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িকপত্রের আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাহিত্য, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।" দলিল-দস্তাবেজ তর্কাতর্কি ধর্মপ্রচার পুস্তিকা ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি 'কেজো' রচনার বাইরে প্রকৃত সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার কিছুটা আস্বাদ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রথম এনে দেয় সাময়িকপত্র। সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদি সাময়িকপত্রের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এইসকল পত্রিকাগুলি প্রধানত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। ১) গদ্যকে জড়তামুক্ত করা, ২) লেখকগোষ্ঠী তৈরি করা, ৩) সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ৪) জাতীয়-চেতনার ক্রোমোম্মেষে সহায়তা।

তবে একথা স্মর্তব্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সাময়িকপত্রে বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হলেও, "চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া তুলিলে" সত্যকার সাহিত্য রচনা প্রায় নেই বললেই চলে। সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টির গুণও আছে, ত্রুটিও আছে, একদিকে এগুলি যেমন সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে তুলে সাহিত্যকে গঠন করতে উৎসাহিত করে, অপর দিকে আবার সেগুলি সাময়িক-সাহিত্যই গড়ে তোলে। যথার্থ সাহিত্য গড়ে ওঠে না। ইংরেজ সমালোচক রবার্ট লিন্ড বলেছেন — "......... distinction between journalism and literature is that literature lasts. Literature that does not least is journalism. Journalism that lasts is literature."

তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, হিতবাদী, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকার রচনার কথা বাদ দিলে খুব বেশি সাময়িক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দুর্লক্ষ একথা সত্য। তথাপি "এ জগতে কিছুই নিস্ফল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও...... নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে" — বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি যথার্থ সমীনযোগ্য।

প্রশ্ন :

১। সবুজপত্র কার সম্পাদনায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?

২। সবুজপত্রের মূল লক্ষ্য কি ছিল?

২.৩.৮.৫ : সবুজপত্র-উত্তর

সবুজপত্রের পর যে সাময়িক পত্রগুলির কথা সর্বপ্রথমেই স্মরণযোগ্য — সেগুলি হলো প্রবাসী, ভারতবর্ষ, যমুনা, নারায়ণ প্রভৃতি। শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন প্রমুখ মনীষীরা এই সকল পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতম যুগ শুরু হলো বিশ শতকের তিরিশ দশকে। যে সমস্ত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এ যুগের সূচনা হলো, তাদের মধ্যে কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি, পূর্বাশা, প্রগতি, ধূমকেতু প্রভৃতি প্রধান। এই পত্রিকাগুলিতে যে সমস্ত কবি ও ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধ স্যানাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, সজনীকান্ত দাস প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃসাহসে ভর করে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, সেদিনটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক শুভদিন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও প্রাবন্ধিকদের আর্বিভাব ঘটে।

সাহিত্যে বিশেষ মতবাদ, রীতি প্রকরণ প্রভৃতি প্রচারের জন্য সাময়িকপত্রগুলি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের যা কিছু নবতম রূপরীতি উপস্থিত হয়েছে, তা সমস্তই প্রায় সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে হয়েছে।

সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার বা প্রাবন্ধিক সকলেই এই সামযিক পত্রিকাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

২.৩.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় পর্ব) — সুকুমার সেন
৩. বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রেখা — গোপাল হালদার (১ম, ২য় খণ্ড)
৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ড. ক্ষেত্র গুপ্ত
৫. উনিশ-বিশ — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

২.৩.৮.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে প্রথম দিকের বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা পর্যালোচনা করো।
২. 'দিগ্‌দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন'— এই পর্বে সাময়িক পত্র-পত্রিকার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।
৩. 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'সবুজপত্র'— পর্বের ধারাবাহিক আলোচনা করো।
৪. 'ভারতী' পত্রিকার গুরুত্ব নিরূপণ করো।
৫. রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দাও। বাংলা সাহিত্যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির গুরুত্ব আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ৯
উনিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.৩.৯.১ : প্রস্তাবনা : প্রাক্-রামনারায়ণ বাংলা নাটক

২.৩.৯.২ : নাট্যকার রামনারায়ণ

২.৩.৯.৩ : নাট্যকার মধুসূদন

২.৩.৯.৪ : দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

২.৩.৯.৫ : অন্যান্য নাট্যকার - প্রাক্ গিরিশচন্দ্র

২.৩.৯.৬ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২.৩.৯.৭ : অমৃতলাল বসু

২.৩.৯.৮ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্যালোচনা অনুল্লেখের কারণ

২.৩.৯.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.৯.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.৯.১ : প্রস্তাবনা : প্রাক্-রামনারায়ণ বাংলা নাটক

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ছাত্রদের হাতে বাংলা নাটকের সূচনা হলেও একজন বিদেশী (রুশ দেশীয়) হেরাসিম বা গেরাসিম লেবেডেফই প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৫ খ্রি: দেশীয় নটনটীদের নিয়ে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রযোজনা করেন। ডোমতলা লেনে বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করে তিনি Disguise (ছদ্মবেশী কাল্পনিক সংবদল) ও Love is the Best Doctor (প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক) এই দুখানি অনুবাদ নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসকদল এদেশে নিজেদের আমোদ প্রমোদের প্রয়োজনে প্লেহাউস তৈরি করে যে নাট্যাভিনয়ের সূচনা করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তারই অনুকরণে দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা নাট্যমঞ্চ স্থাপন করে নাটকাভিনয়ের কথা চিন্তা করেন। ১৮৩১ খ্রি: প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলকাতার শুঁড়া অঞ্চলে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ অভিনয় করান। এরপর ১৮৩৩ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রেরা ওরিয়েন্টাল থিয়েটার গড়ে সেখানে ইংরেজি নাটকের অনুবাদ মঞ্চস্থ করে। কিন্তু এই দুটি থিয়েটারই অকালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৫ খ্রি: শ্যামবাজার নবীন বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর-এর অভিনয় হয়। কারও কারও মতে এইটিই যথার্থ বাংলা নাটক যা প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এর বেশ কিছুকাল

পরে ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায় রচিত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। সমাজের অর্থবান ব্যক্তিরা নানা নাট্যশালা স্থাপন করেন যেমন — বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এই সব নাট্যশালায় অভিনয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন নাট্যকারগণ যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) রচয়িতা জি.সি. গুপ্ত, 'ভদ্রার্জুন'-এর (১৮৫২) লেখক তারাচরণ সিকদার, ভানুমতী চিত্তবিলাস-এর (১৮৫৩) রচনাকারী হরচন্দ্র ঘোষ ও 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র, লেখক (১৮০১) রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম। এছাড়া স্বয়ং অভিনেতা স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বেশ কয়েকটি পৌরাণিক ও অনুবাদ নাটক এবং প্রহসন রচনা করেন, তাদের মধ্যে আছে 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮); 'মালতীমাধব' (১৮৫৯)। এগুলি তারই স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য প্রথম যুগের অনেক নাটকেরই বিশেষ নাট্যগুণ ছিল না এবং তাদের অভিনয় যোগ্যতাও ছিল খুবই কম।

২.৩.৯.২ : নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)

প্রাক্ মধুসূদন-দীনবন্ধু পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে এবং সমকালীন সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে প্রহসন রচনা করে একযুগের কলকাতা ও শহরতলিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অনুবাদ নাটকের মধ্যে আছে 'বেণীসংহার' (১৮৫৩) 'রত্নাবলী'

> *রুশ দেশীয় হেরাসিম বা গেরাসিম লেবেডেফই ১৭৯৫ খ্রি: বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রযোজনা করেন। **'Disguise'** (ছদ্মবেশী কাল্পনিক সংবদন) ও **'Love is the Best Doctor'** (প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক) অনুবাদ নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন।*
> *১৮৩৫ খ্রি: শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর প্রথম অভিনয় হয়।*
> *জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বেলগাছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় অভিনয় হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ নাটকের মধ্যে 'বেণীসংহার' (১৮৫৩), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' (১৮৬০) ইত্যাদি। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে — 'রুক্মিনীহরণ' (১৮৭২), 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৬) উল্লেখযোগ্য। কৌলিন্য প্রথার কুফল দেখিয়েছেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে। তাঁর প্রহসনের মধ্যে - 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয়সঙ্কট' উল্লেখযোগ্য।*

(১৮৫৮) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (১৮৬০) 'মালতী মাধব' (১৮৬৭)। এদের মধ্যে দু-একটি নাটকের অভিনয়ও হয়েছিল, তবে তা কতদূর সার্থক হয়েছিল সন্দেহ আছে। রত্নাবলীর অভিনয় দেখে মধুসূদন বাংলা নাটকের দৈন্যদশার কথা ভেবে নিজেই নাট্যরচনায় ব্রতী হন। রামনারায়ণ পৌরাণিক বিষয় নিয়েও তিনখানি মৌলিক নাটক লিখেছিলেন — 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭২) 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্ম বিজয়' (১৮৭৬)। তবে নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রধানত নির্ভর করছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকখানির জন্য। এই নাটকের অভিনয় দেখে কুলীনেরা তাঁর উপর চটে গিয়েছিলেন আর শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়েছিল কৌলীন্য প্রথার কু-ফলের দিকে। তুলনায় বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখা 'নবনাটক' (১৮৬৫) তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। যদিও এই দুটি নাটক লিখে প্রতিযোগিতার আসরে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর প্রহসনগুলি — 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১২৭৯), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯) যথাক্রমে পরদারাসক্তির জন্য শাস্তি, লাম্পট্য ও সতীন সমস্যা নিয়ে সরস নাট্যরচনা। প্রাক্-মধুসূদন নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে লোকে তাঁকে জানত 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য ইংরেজি

জানতেন না তাই তাঁর নাটক প্রহসনে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির কোন প্রভাব নেই, প্রাচ্যের নাট্যকলারই অনুসরণ লক্ষণীয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও এবং উত্তরগুলি আলোচনার সঙ্গে মিলিয়ে নাও :

১. বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় কখন? প্রথম নাটকের নাম কী?
২. 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' নাটক কার লেখা?
৩. রামনারায়ণ তর্করত্নের শ্রেষ্ঠ নাটক কোন্‌টি এবং কত সালে লেখা?
৪. 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কী বিষয়ে লেখা?
৫. রামনারায়ণ তর্করত্নের পৌরাণিক নাটকগুলির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।
৬. রামনারায়ণ কোন রীতিতে নাটক লিখতেন?
৭. মধুসূদনের আগে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দাও।

২.৩.৯.৩ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মহাকবি মধুসূদনের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবির্ভাব আকস্মিক। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে ও অভিনয় দেখে তাঁর মনে হয়েছিল —

> 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
> নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

শুধু আক্ষেপ করাই নয়, তিনি সংকল্প নিলেন বাংলায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শে যথার্থ নাটক তিনিই রচনা করবেন। তখনও পর্যন্ত তিনি বাংলায় একছত্রও কবিতা লেখেন নি, যা কিছু লিখেছেন তা ইংরেজিতে, যেমন 'Captive Ladie' যা রামায়ণ আশ্রয়ে লেখা। এবারে মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির আখ্যান অবলম্বনে নাটক লিখলেন 'শর্মিষ্ঠা'। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে তা প্রকাশিত হ'ল। ঐ বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে তার অভিনয়ও হ'ল। 'শর্মিষ্ঠা' বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক নাটকের প্রথম সূচনা। কিন্তু মধুসূদনের প্রথম রচনা বলে তাঁর নাট্য প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় এতে নেই, এই বৎসরই তিনি লেখেন 'পদ্মাবতী' যা পর বৎসর (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। এটি শর্মিষ্ঠার চেয়ে অধিক 'সুশ্রাব্য ও সুখপাঠ্য' সন্দেহ নেই। গ্রীক পুরাণের Apple of Discord গল্প অবলম্বনে ভারতীয় পুরাণ আশ্রয়ী চরিত্র শচী (ইন্দ্রাণী), মুরলা, রতি, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে নিয়ে একখানি 'কমেডি' রচনা

> *১৮৫৮ খ্রি: বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে' বাংলা নাটকের দৈন্যদশার কথা ভেবে নিজেই নাট্যরচনায় ব্রতী হন। ১৮৫৯ খ্রি: মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির আখ্যান অবলম্বনে লেখেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। গ্রীক পুরাণের* ***Apple of Discord*** *গল্প অবলম্বনে লেখেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। মধুসূদন টডের* ***'Annals and Antiquities of Rajasthan'*** *থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে ১৮৬১ খ্রি: লেখেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। ট্র্যাজেডি রচনায় মধুসূদনের দক্ষতার পরিচয় আছে এই নাটকে। মধুসূদন দু'খানি প্রহসন রচনা করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। শেষ বয়সে ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় রচনা করেন 'মায়াকানন' নাটক।*

করেন। এই সময়েই দুখানি প্রহসনও তিনি লিখেছিলেন — 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'পদ্মাবতী'র অভিনয় হলেও প্রহসন দুটির অভিনয় বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে হয়নি। কারণ প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবসম্প্রদায়ের সমালোচনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধদের অনাচারকে আক্রমণ করা হয়েছে। বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্য সত্ত্বেও একই সঙ্গে নবীন ও প্রবীণ দু-পক্ষই এর মঞ্চায়নের বিরোধিতা করেন। অবশ্য পরে দেশের নানা স্থানে নাটক দুটি অভিনীত হয় ও প্রশংসা অর্জন করে। স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র প্রথম প্রহসনটিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে তাঁর 'সধবার একাদশী' রচনা করেন।

১৮৬১ সালে মধুসূদন টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক নাটক ''কৃষ্ণকুমারী'' প্রকাশ করেন। এতে রাণা ভীমসিংহের কুমারী কন্যা কৃষ্ণা বা কৃষ্ণকুমারী রাজ্যের কল্যাণে ও পিতার সঙ্কটমোচনে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান দেন। জগৎসিংহ ও মানসিংহ দুজনেই কৃষ্ণাকে বিবাহ করতে চান — যে কেউ ব্যর্থমনস্কাম হলে ভীমসিংহের সর্বনাশ করবেন বলে জানালে উভয় সঙ্কটে পতিত পিতাকে ও পিতৃরাজ্যকে বাঁচাতে কৃষ্ণা আত্মহত্যা করে তার সমাধান করেন। যদিও কন্যাকে হারিয়ে ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে যান। এটিও গ্রীক নাটকের (ইফিগেনিয়া এ্যাক্ট তৌরিস' - ইউরপিদেস) আদর্শেই রচিত, তবু ট্র্যাজেডি রচনায় মধুসূদনের দক্ষতার পরিচয় আছে এই নাটকে। মূল কাহিনি এবং উপকাহিনি ধনদাস, মদনিকা ও বিলাসবতীর উপাখ্যান-রচনা, গ্রন্থ এবং সংলাপ সংযোজন — সব দিক থেকেই এ নাটক মধুসূদনের নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। চরিত্র চিত্রণে ট্র্যাজিক দৃঢ়তার পরিচয় যথাযথভাবে দিতে না পারায় এই নাটকটি বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি না হয়ে করুণরসাত্মক এবং অতিনাটকীয় হয়ে পড়েছে।

শেষ বয়সে মধুসূদন যখন ব্যাধিগ্রস্ত, অভাবক্লিষ্ট তখনই একখানি কাল্পনিক কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন 'মায়াকানন'। হাতে লেখার মতো অবস্থা তখন তার ছিল না, তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন অন্যে তা লিখে নিত। এই নাটকের মুদ্রণ বা অভিনয় তিনি দেখে যেতে পারেন নি। 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কিছু অংশ লিখে অসমাপ্ত রেখে দেন। ১৮৭৩ সালে ২৯ জুন মধুসূদনের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৭৪ সালে 'মায়াকানন' নাটকটি প্রকাশিত হয় ও ১৮ই এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারে তা অভিনীত হয়। 'বিষ না ধনুর্গুণ'-এর পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত রূপ কোনটিরই খোঁজ পাওয়া যায় নি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ও আলোচনার সঙ্গে তোমার উত্তর মিলিয়ে নাও :

১. কোন্ পরিস্থিতিতে মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হন?

২. মধুসূদনের প্রথম নাট্যরচনা কোনটি এবং ঐ নাটকের প্রকাশকাল উল্লেখ করো।

৩. মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক কোনটি, সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটির নাম করো এবং ঐ দুটির বিষয়বস্তুর উল্লেখ করো।

৫. কৃষ্ণকুমারী নাটকটি ট্র্যাজেডি হয়েছে কি?

৬. মধুসূদনের শেষ নাটকের নাম করো এবং তার প্রকাশকাল উল্লেখ করো।

৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের স্থান নির্ণয় কর।

২.৩.৯.৪ : দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

মধুসূদনের পরেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে দীনবন্ধু মিত্রের অবির্ভাব হয়। মধুসূদন মূলত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর প্রহসনে কিছু বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে বটে, কিন্তু দীনবন্ধু একেবারে সমাজজীবন থেকে বাস্তব উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছেন। *তিনি পেশায় ছিলেন ডাক বিভাগের কর্মচারী, তাঁর বদলির চাকরিতে তাঁকে বাংলা দেশের নানাস্থানে যেতে হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, তাঁর নাটক ও প্রহসন সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। 'নীলদর্পণ' তাঁর প্রথম নাটক যা মধুসূদনের 'পদ্মাবতী'র সমকালেই প্রকাশিত (১৮৬০), অথচ বিষয়বস্তুতে একেবারে অভিনব। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটকের জন্যই বিখ্যাত। এই নাটক নীলকর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত — তৎকালীন বাঙালি কৃষক ও মধ্যবিত্তদের প্রতি নীল চাষ উপলক্ষে নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার জীবন্তভাবে এতে উপস্থাপিত হয়েছে। ছদ্মনামে ছাপানো এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ "The Indigo Planting Mirror" (সেটাও নামহীনভাবেই ছাপা হয়, মধুসূদন দত্ত বা অন্য কেউ এটি অনুবাদ করেন) পার্লামেন্টে পাঠানো হলে ইণ্ডিগো কমিশন বসে ও আইন করে নীলকর সাহেবদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। 'নীলবাঁদরেরা' সোনার বাংলা এতদিন 'ছারখার' করছিল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ রচনার ফলে তার প্রতিকার হ'ল (এই নাটক দিয়েই ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় (ন্যাশানাল থিয়েটার) তার যাত্রা শুরু করে।)*

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এদেশে নীলকর সাহেবরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে চাষীদের দিয়ে জোর করে চাষের জমিতে নীল উৎপাদন করাত। নীল চাষ না করলে তাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার করত। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার কৃষকেরা একত্রিত হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দেশনেতারা বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। এই সব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের খবর পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে 'ইণ্ডিগো কমিশন' এদেশে এসে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে নীলকর সাহেবদের শাস্তি দানে উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যে জার্মানীতে আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত নীল বাজারে আসায় নীলকর সাহেবেরা নীলকুঠি বন্ধ করে আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেয় এবং সেখানে গিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করে। সুতরাং সাহিত্যমূল্য যাই হোক না কেন নীলদর্পণ নাটকের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মার্কিনী ঔপন্যাসিক স্টো প্রণীত Uncle Tom's Cabin (১৮৫২) যেমন নিগ্রো দাসত্বের মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখে আমেরিকায় জনমত গঠন করে নিগ্রো নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই দাসব্যবস্থা কালক্রমে বন্ধ করার কাজে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটক মারফৎ নীলকর অত্যাচার বন্ধ করাই শুধু নয়, দীনবন্ধু মিত্র স্বাদেশিক গণআন্দোলনের ভিত্তিভূমিও রচনা করে গেছেন।

নীলকর সাহেবদের কোপে পড়ে গোলোক বসুর সম্পন্ন নিরীহ পরিবার এবং সাধুচরণ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্র রায়তের বংশ কীভাবে ধ্বংস হ'ল - তারই বাস্তব চিত্র অঙ্কন করে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম রচনা বলে নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি হিসাবে তেমন সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। ভদ্র চরিত্র অঙ্কন ও তাঁদের ভাষা ব্যবহারে কিছু আড়ষ্টতা দেখিয়েছেন, কিন্তু ভদ্রেতর চরিত্র অঙ্কন ও তাদের ভাষা চয়নে অসাধারণ বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াও ছিল সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি দীনবন্ধুর অসাধারণ

সহানুভূতি; আর এ দুয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট তাঁর এই নাটকখানি সে যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এ যুগেও এই নাটকটি মাঝে মাঝে অভিনীত হয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

দীনবন্ধু শুধু বাস্তব ঘটনা আশ্রয়ে ট্র্যাজিক নাটকই রচনা করেননি (যেমন নীলদর্পণ) তাঁর নাট্যপ্রতিভার প্রধান লক্ষণ কমেডি বা হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় প্রকাশিত। যে নাটকে শোকদুঃখ মৃত্যুর বর্ণনা বেশি তা বিষাদান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি — নীলদর্পণে তাই মৃত্যুর বর্ণনার আধিক্য, কিন্তু 'যে নাটকের পরিণাম হয় সুখ, আনন্দ ও মিলনে তাকে বলা যাবে কমেডি বা সুখান্ত নাটক।' দীনবন্ধু বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক - তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০) ও 'কমলেকামিনী' দুখানি সামাজিক কমেডি। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যকার হিসাবে সার্থকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর প্রহসন জাতীয় রচনায়। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) দুটিই সামাজিক প্রহসন। শেষোক্ত প্রহসনটি ঘরজামাই প্রথার ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা। এই প্রহসনে "জামাই বাবাজীদের মর্কটলীলা, বগীবিন্দী দুই সতীনের 'হাড়াই ডোমাই' ঝগড়া, দু সতীনের জ্বালায় পদ্মলোচনের বিড়ম্বনা ইত্যাদির রসিকতা বাংলাদেশে প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে উঠে গেছে।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

> *দীনবন্ধু মিত্র সমাজজীবন থেকে, বাস্তব উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে, দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের জন্যই বিখ্যাত। নাটকটি নীলকর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার এতে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মধুসূদন দত্ত* **"The Indigo Planting Mirror"** *নামে। দীনবন্ধু বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক। তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) ও 'কমলেকামিনী' দুখানি সামাজিক কমেডি। দীনবন্ধুর নাট্যকার হিসাবে সার্থকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'বিয়ে পাগল বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) সামাজিক প্রহসন রচনায়। তাছাড়াও 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য নাটক। দীনবন্ধুর শেষ রচনা 'কমলে-কামিনী' (১৮৩৮) নাটকটি রোমান্টিক নাটক।*

দীনবন্ধুর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নামক প্রহসনধর্মী রচনায় ধরা পড়েছে। 'এতে সে যুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্র ভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ নাটক মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত। মাইকেলের প্রহসনটি যথার্থ প্রহসন, চরিত্র বা ঘটনার বিশেষ কোন বিকাশ নেই। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন হলেও পুরোপুরি নাটকের রীতিতে রচিত। মূল চরিত্র নিমচাঁদ দত্তের সুখদুঃখ, মাতলামির ঝোঁকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। নিমে দত্ত সে যুগের প্রতীক চরিত্র।" (ঐ) নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদনের আদলে গড়া বলে সেকালে অনেকের ধারণা হয়েছিল কিন্তু দীনবন্ধু বলেছিলেন 'মধু কখনও নিম হয়?' মধুর ভ্রষ্টতা নিমচাঁদে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা কখনও নিমচাঁদে থাকা সম্ভব? ইংরেজি শিক্ষিত এ ভদ্র সন্তান মদপানাসক্তিতে অধঃপতিত হয়েছে - মদ সংগ্রহের জন্য সে অপমান গঞ্জনা সব সহ্য করেছে, তবে শিক্ষার গৌরবে সে চারদিকের তুচ্ছতার মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। সে মদ্যপ কিন্তু ভদ্রলোক - এবং ভদ্রলোকের ঔচিত্যবোধবর্জিত নয়। তার প্রলাপ উক্তির মধ্যেও এমন কিছু গভীর কথা আছে যাতে পাঠকমন তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তার বাইরে হাসির ছটা থাকলেও ভিতরে যে চোখের জল ছিল তা তার একটি উক্তিতে ফুটে উঠেছে—

"ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।" কখনও সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে, "রে পাপাত্মা, রে দুরাশয়। রে ধর্ম-লজ্জা - মান মর্যাদা - পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।" নায়ক না হয়েও নিমচাঁদ এই নাটকে আদ্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে।

দীনবন্ধুর শেষ রচনা 'কমলে-কামিনী' (১৮৭৩) নাটক রোমান্টিক নাট্যরচনা। কাহিনি অনেকটা নবীন তপস্বিনীর মত। কিন্তু তাঁর খ্যাতি ট্র্যাজেডিধর্মী নীলদর্পণ ও প্রহসনধর্মী সধবার একাদশীর জন্য। তাঁর রচনাগুলি নিয়েই উনিশ শতকে কলকাতায় সাধারণ ও শৌখিন রঙ্গমঞ্চগুলি জমে ওঠে। মাত্র সাতখানি নাটক প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু স্মরণীয় স্থান অধিকার করেছেন। সেখান থেকে প্রায় আশিটা নাটক রচয়িতা গিরিশচন্দ্রও তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারেন নি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ও আলোচনার সঙ্গে তোমার উত্তর মিলিয়ে নাও :

১. দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির প্রকাশকাল অনুযায়ী নাম উল্লেখ করো ও তাদের জাতি নির্ণয় করো।

২. নীলদর্পণ নাটকটির বাংলা নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব কোথায়?

৩. নীলদর্পণ নাটকটি ইংরেজি অনুবাদ কে করেন, ইংরেজি নাটকের নাম কী ও নীলকর আন্দালনে তার গুরুত্ব কোথায়?

৪. 'সধবার একাদশী' কোন্ শ্রেণির নাটক? এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫. নিমচাঁদ চরিত্রটি কোন্ নাটকের অন্তর্ভুক্ত? এই চরিত্রটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬. দীনবন্ধুর শেষ নাট্যরচনার নাম করো।

৭. দীনবন্ধুর নাট্যরচনার বিশিষ্টতা কোথায়?

২.৩.৯.৫ : অন্যান্য নাট্যকার - প্রাক্ গিরিশচন্দ্র

২.৩.৯.৫.১ : মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

দীনবন্ধুর পর মনোমোহন বসু বাংলা নাট্যসাহিত্যকে একটু ভিন্ন পথে পরিচালিত করেন। কবিগান ও পাঁচালী রচনায় যিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তিনি যখন নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন স্বভাবতই তাঁর নাটকে দেশীয় যাত্রা পাঁচালী যাত্রাগানের প্রভাব এসে পড়ে; ফলে সৃষ্ট হয় 'গীতাভিনয়' জাতীয় রচনা। "এই গীতাভিনয় নাটক অভিনয়েরই মত, তবে কথকথার মত বক্তৃতাবহুল এবং প্রাচীন যাত্রা অনুসারে গীতপরিপূর্ণ। স্টেজের প্রয়োজন নাই।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য়) - সুকুমার সেন) এর ফলে গ্রামগঞ্জেও অভিনয় যোগ্য 'গীতাভিনয়' কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭) পৌরাণিক ও করুণরসাত্মক রচনা এতে ন'টি গান আছে। দ্বিতীয় রচনা 'প্রণয়পরীক্ষা নাটক' (১৮৬৯) রামনারায়ণের 'নবনাটকে'র মতো বহুবিবাহের দোষ দেখাতে

লেখা। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সতী নাটক' (১৮৭৩)। বিষয়বস্তু হল দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ - কিন্তু বিষাদান্ত নাটক যেহেতু দর্শকের পছন্দ নয় তাই নাট্যকার পরে 'হরপার্বতীর মিলন' নামে একটি অঙ্ক 'সতীনাটকে'র শেষে যোগ করে দেন। সতী নাটকে দশটি গান আছে। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে লেখা হলেও তাতে সমকালীন স্বাদেশিক অনুভূতির সুরও শোনা যায়। মনোমোহন সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং 'হিন্দুমেলা'য় গীত তাঁর একটি গান 'দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন' এই নাটকেও যুক্ত হয়েছে। তাঁর 'পার্থ পরাজয়', 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব' (১৮৮১)-এ নাটক ও অর্থাৎ গীতাভিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'রাসলীলা নাটকে'ও অনুরূপ সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তাঁর 'আনন্দময়' নাটক (১৮৯০) সমাজ সমস্যামূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। তাঁর 'নাগাশ্রমের অভিনয়' (১৮৭৫) প্রহসন জাতীয় রচনা।

২.৩.৯.৫.২ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)

'রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ তাঁর সাহিত্য কর্মের নিত্যসঙ্গী 'জ্যোতি দাদা' অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর বাড়ির নাটুকে আবহাওয়ার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন সুতরাং নাটক লেখা বা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করাটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর রচনা ও অভিনয় দক্ষতা জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না — তাঁর রচনা শৌখিন ও নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত ও কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক নাটক এবং মার্জিত রুচির লঘু নক্‌শা ও প্রহসন গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যামোদী শৌখিন সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সর্বোপরি অনেক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি সাধারণের অগম্য ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতিকে বাঙালি পাঠক সমাজে উপস্থিত করেন।' (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাস, কল্পনা ও স্বাদেশিকতা মিশিয়ে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'সরোজিনী' (১৮৭৯) 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। প্রথম নাটকে পুরু ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনি বর্ণিত, দ্বিতীয়টিতে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনি। তৃতীয়টিতে প্রতাপসিংহ ও মানসিংহের বিরোধ এবং চতুর্থ নাটকে বাংলাদেশে শোভা সিংহের বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রেম ও স্বদেশভাবনার কাল্পনিক উপাখ্যান বর্ণিত।

স্বদেশপ্রেমমূলক এই সব নাটক সে যুগে যতটা জনপ্রিয় হয়েছিল একালে তেমন নয়, কিন্তু তাঁর লঘুচালে লেখা প্রহসনগুলি আজও অভিনীত হলে দর্শককে তৃপ্ত করে। 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্য বিষয়, সংলাপ ও চরিত্রগুলি বেশ কৌতুকাবহ এবং স্থূল রসিকতা, ভাঁড়ামি না থাকায় লোকরুচিকর। তবে নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদি এই সব নাট্যরচনায় আরও কিছুটা সতর্ক ও সংযত হতেন তা হলে এই প্রহসনগুলি নাটক হিসাবে আরও উন্নত হতে পারত। অবশ্য গিরিশচন্দ্র বা অপর নাট্যকারেরা ভক্তিরসের প্লাবনে যখন গা ভাসিয়ে ছিলেন তাঁদের কিছু পূর্বে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশপ্রেমের নাটক লিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নামটি রেখে যেতে পেরেছেন।

২.৩.৯.৫.৩ : রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪)

কবি রাজকৃষ্ণ রায় মনোমোহন বসুর সমকালীন হয়েও পৌরাণিক নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ফারসী বিষয় নিয়ে চুটকি ধরনের নক্‌শা রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর লায়লামজনু (১২৯৮) এবং 'বেনজীর বদরে মুনির' (১৩০০) একদা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু পৌরাণিক নাটক রচনাতেই তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), 'তারক সংহার' (১৮৮০) 'হরধনুভঙ্গ' (১৮৮২), 'যদুবংশধ্বংস' (১৮৮৪), 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১৮৮৪), 'তরণীসেন বধ' (১৮৮৪), 'চন্দ্রহাস' (১৮৮৮), 'নরমেধ যজ্ঞ' (১৮৯১) প্রভৃতি সেকালে পৌরাণিক নাটক হিসেবে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। তাঁর এইসব নাটকে যাত্রার প্রভাব আছে। সুলভ ভক্তিরস, অতিনাটকীয়তা, হাস্যরস, ভাঁড়ামি — যাত্রার মতই তাঁর পৌরাণিক নাটকেও এসে গেছে। এইসব যাত্রাধর্মী নাটক একালে হয়তো আর তেমন জনপ্রিয় নয়, কিন্তু বাংলা গদ্যকবিতার ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব 'পদ্য পংক্তি গদ্য' রচনায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ সৃষ্টির অনেক আগেই তিনি এই ছন্দ রচনার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেছিলেন - 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪), 'মীরাবাঈ' (১৮৮৯), 'বণবীর' (১৮৯২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকখানি প্রহসনও রচনা করেছিলেন - 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'কলির প্রহ্লাদ' (১২৯৫), 'কানাকড়ি' (১২৯৫), 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০), 'বউবাবু' (১২৯৭), 'জগা পাগলা' (১২৯৭), 'জুজু' (১৮৯০) প্রভৃতি। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে ও প্রহসনে অসাধারণ উৎকর্ষের কোন পরিচয় নেই তবে তাঁর রচনা গ্রাম্যতাহীন। তাঁর নাটকে কিছু ভালো গান আছে, তাঁর হাতেই পৌরাণিক নাটকের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল সন্দেহ নেই।

> *মনোমোহন বসুর নাটকে দেশীয় যাত্রা, পাঁচালী ও যাত্রাগানের প্রভাব এসে পড়ে, ফলে সৃষ্ট হয়, 'গীতাভিনয়' জাতীয় রচনা। তাঁর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭), দ্বিতীয় রচনা 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯)। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সতীনাটক' (১৮৭৩)। অবশ্য তাঁর 'আনন্দময়' নাটক (১৮৯০) সমাজ সমস্যামূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'সরোজিনী' (১৮৭৯), 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য নাটক। প্রহসনের মধ্যে 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' ও 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) দর্শককে তৃপ্ত করে। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লায়লামজনু' ও বেনজীর বদরে মুনির' বেশ জনপ্রিয় নাটক। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) বিখ্যাত। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' (১৮৭৫) তে ইংরেজ বিদ্বেষ আছে। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) দুটি ছোট নাটক লেখেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত ছিলেন।*

২.৩.৯.৫.৪ : কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালে নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরও কিছু অপ্রধান নাট্যকার। এদের মধ্যে আছেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২)-এর নাটক রাজরোষে পড়েছিল বলে স্মরণীয় হয়ে আছে। রোমান্টিক নাটকে রোমহর্ষক উদ্দীপনার নূতনত্ব এনে খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিস্তল - বন্দুক - লাঠির হুড়াহুড়ি, দেশপ্রেমের উদ্দীপনা এবং সেই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার ইঙ্গিত দিয়ে সেকালে নাটুকে দর্শকদের তিনি আনন্দিত করেছিলেন। তার প্রথম নাটক 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪), পরবর্তী নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫), 'দাদা ও আমি' (১৮৮৮)। প্রথম দুটিতে ইংরেজ বিদ্বেষ আছে, তৃতীয় নাটকটি লঘু হাস্যরসের রচনা।

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত মাতা' (১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) নামে দুটি ছোট নাটক লেখেন। এই দুটি নাটক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আন্দোলনের সূচনা সূত্রে রচিত। দীন ভারত সন্তানদের দুঃখে নাট্যকারের মন কাতর হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে ভারতবাসীর স্বস্তির কথা বলেছেন প্রথম নাটকে। দ্বিতীয় নাটকে (ভারতে যবন) মুসলমানদের নানা অত্যাচারের কথা বলা হলেও নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীকে উদ্দীপ্ত করতে ভারতলক্ষ্মী বলেছেন, "যদি কখন ভারতমাতার দুঃখ দূর হয় আমারও হবে" এবং তাতে তারা উৎসাহিত হয়েছে।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) অভিনেতারূপেই খ্যাত ছিলেন। তবে তাঁর রচিত একখানি নাটক "আচাভুয়ার বোম্বাচার্য" (১৮৮০) 'নাদাপেটা হাঁদারাম' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। পরে 'অহল্যাহরণ' (১৮৮১) গীতনাট্য, 'রাবণবধ' (১৮৮২) নাটক, 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' (১২৯১), 'রাজসূয় যজ্ঞ', 'সীতা স্বয়ম্বর', 'নন্দবিদায়', 'প্রভাসমিলন', 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ', 'জন্মাষ্টমী', 'নরোত্তম ঠাকুর', 'ধ্রুব' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাঁর পৌরাণিক নাট্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য — সুকুমার সেনের মতে তাঁর 'যাত্রার ধরণের দীর্ঘ বক্তৃতা ও স্বগত উক্তি'। 'মিলন' (১৩০০) গার্হস্থ্য রোমান্টিক নাটক। তিনি গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে কয়েকখানি পঞ্চ রং বা নক্‌শাও রচনা করেন, যথা — 'মুই হ্যাঁছ' (১৮৯৪), 'খণ্ড প্রলয়' (১৩০০) 'যমের ভুল' (১৩০২), 'রক্তগঙ্গা' (১৩০২) প্রভৃতি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও এবং আলোচনা থেকে উত্তরের অংশ মিলিয়ে নাও :

১. দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যবর্তীকালের কয়েকজন নাট্যকারের নাম করো।

২. মনোমোহন বসুর কয়েকখানি নাটকের নাম করো এবং তাঁর নাটকে বিষয়বস্তু প্রধানত কোথা থেকে নেওয়া তা বলো।

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় দাও। তাঁর নাটকগুলি কোন শ্রেণির?

৪. রাজকৃষ্ণ রায় কী জাতীয় নাটক লিখেছেন? তাঁর নাটকের গুরুত্ব কোথায়?

৫. উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য কী? কেন তাঁর নাম নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে?

৬. কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি নাটকের নাম করো। এই দুটি নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য কোথায় দেখাও।

৭. নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কী জানো বলো।

২.৩.৯.৬ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

বাংলা নাট্যসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিসম্পন্ন নট, নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক ও নটনটীদের গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে অন্যতম। নট হিসাবে তাঁর খ্যাতি যখন অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই নাট্যমঞ্চের চাহিদা মেটাতে তিনি নাটক রচনায় হাত দেন এবং প্রায় আশিখানির মতো নাটক রচনা করেন। প্রথম দিকে 'অপেরা' ধর্মী গীতিনাট্য 'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকাল

বোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮), 'মায়াতরু' (১৮৮১) ও 'মোহিনী প্রতিমা' (১৮৮১) রচনা করেন। তার পরে কিছু মৌলিক নাট্যরচনায় হাত দেন। ১৮৮১ থেকে '৮৪ সালের মধ্যে এগুলি রচিত হয়। 'আনন্দ রহো' 'ঐতিহাসিক নাটক' ছাপ যুক্ত হলেও ঐতিহাসিকত্ব এতে কিছুই নেই। তিনি বরং পৌরাণিক নাটক রচনায় কিছুটা সার্থক; যেমন 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'সীতাহরণ', 'লক্ষ্মণ - বর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বসবাস' প্রভৃতি। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নামেও তিনি একখানি নাটক লিখে অভিনয় করান গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে। তারপর এই নাট্যমঞ্চ ছেড়ে দিয়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। এখানে তাঁর 'দক্ষযজ্ঞে'র অভিনয় হয় ৬ই শ্রাবণ ১২৯০। এরপর 'ধ্রুব চরিত্র', 'নলদময়ন্তী', 'কমলেকামিনী', বৃষকেতু', 'শ্রীবৎস-চিন্তা' প্রভৃতি তাঁর পুরাণাশ্রিত রচনা। গিরিশচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব ভক্তিরস প্রধান পৌরাণিক নাটক রচনায়। তাঁর 'অভিমন্যুবধ' (১৮৯৪), 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০) একসময় অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, এখনও 'জনা' নাটক জনপ্রিয়তা হারায়নি। 'জনা'য় একই সঙ্গে হরিভক্তি, গঙ্গাভক্তি ও মাতৃভক্তি এই ত্রিবিধ ভক্তির সাক্ষাৎ পাই; শত্রুরূপে নারায়ণ ভজনায় তেজস্বিনী রমণী জনার ভূমিকা সত্যই প্রশংসনীয়। কৃষ্ণের আচরণ এই নাটকে ততটা প্রশংসনীয় নয়।

মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে,
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।

মহাভক্ত প্রবীর হত্যার এই যুক্তি খুবই দুর্বল।

নাট্যজীবনের মধ্যসীমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য হয়ে স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল গিরিশচন্দ্রের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়, সেই সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনাতেও ভক্তির বাণ ডাকে। তাঁর 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) ও 'বিল্বমঙ্গলে' (১৮৮৮) এই ভক্তিরসের আধিক্য লক্ষণীয়। 'চৈতন্যলীলা' নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই নাটকে নিমাই এর ভূমিকায় নটীবিনোদিনীর অসামান্য অভিনয়। একজন পণ্যা-রমণীকেও যে সার্থক অভিনেত্রীতে পরিণত করা সম্ভব নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র তা প্রমাণ করে গেছেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে তিনি আরও দেখিয়েছেন পণ্যা রমণী চিন্তামণির চিন্তা কিভাবে বিল্বমঙ্গলকে প্রকৃত ভক্তে পরিণত করেছিল। তিনি শুধু চৈতন্যকে নিয়েই নয় বুদ্ধ অবতারকে নিয়েও 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৭) রচনা করেছেন যা বিল্বমঙ্গলের আগেই রচিত হয়।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে খ্যাতিসম্পন্ন নট, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও নটনটীদের গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর গীতিনাট্য 'আগমনী' (১৮৭৭), অকাল বোধন (১৮৭৭), দোললীলা (১৮৭৮) উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যুবধ', 'সীতাহরণ' উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব ভক্তিরস প্রধান পৌরাণিক নাটক রচনায়। তাঁর 'অভিমন্যুবধ' (১৮৯৪), 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) ও 'জনা' (১৮৯৩) জনপ্রিয়তা হারায়নি। 'জনা'-য় একই সঙ্গে হরিভক্তি, গঙ্গাভক্তি, ও মাতৃভক্তি এই ত্রিবিধ ভক্তির সাক্ষাৎ পাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য হয়ে স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল গিরিশচন্দ্রের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়, নাট্যরচনাতেও ভক্তির বাণ ডাকে। তার মধ্যে 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) ও বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি' (১৮৯০) ও 'মায়াবসান' ও 'বলিদান' গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), প্রভৃতি রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের রঙ্গব্যঙ্গ নাটিকার মধ্যে 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', উল্লেখযোগ্য রচনা।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গার্হস্থ্য বিষয়ক সামাজিক নাটকও লিখেছেন। তার মধ্যে 'প্রফুল্ল' অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাগবাজার নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ দুঃখের অনেক খবরই রাখতেন, বিশেষ করে মদ্যপানাসক্তি ও চারিত্রিক অধোগতি কীভাবে সম্পন্ন পরিবারের ধ্বংসের কারণ হয়, সেই সঙ্গে অকস্মাৎ প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ফেল করার সাধারণ ঘটনা কীভাবে জনসাধারণের গার্হস্থ্য জীবনকে বিপন্ন

করে তোলে, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তার ছবি তিনি এঁকেছেন এই নাটকে। সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। যদিও অতিনাটকীয়তার জন্য 'প্রফুল্ল' বিষাদাত্মক নাটক হলেও ট্রাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় সামাজিক নাটক 'হারানিধি' (১৮৯০), তৃতীয় নাটক 'মায়াবসান' (১৮৯৮); 'বলিদান' ও 'শাস্তি কি শাস্তি' বিশ শতকে লেখা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র স্বদেশী ভাবনা নিয়ে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক — 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম', (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৩৯১), 'সৎনাম' (১৯০৪) প্রভৃতি রচনা করেন।

গিরিশচন্দ্র কতগুলি রঙ্গব্যঙ্গ নাটিকা 'সপ্তমীতে বিসর্জন' 'বেল্লিক বাজার', 'বড়দিনের বখশিস্', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি রচনা করেন এবং সেযুগে এই পঞ্চরঙ্গগুলি অভিনীতও হয়েছিল।

"অভিনয় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন মধুসূদনের চৌদ্দমাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ অভিনয়ে বড়ো দুরূহ হয়ে পড়ে। তখন তিনি উচ্চারণ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য চৌদ্দ মাত্রার পংক্তিকে ভেঙে ছোট ছোট ছত্র সাজিয়ে নিলেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁরই নামানুসারে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়েছে। অভিনেতা ও অভিনয় - শিক্ষকরূপে তিনি এই যে নতুন ছন্দের উদ্ভাবন করলেন, পরবর্তী কালেও অন্যান্য নাট্যকার তা গ্রহণ করেছিলেন।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে কেউ কেউ শেক্সপীয়রের পাশে বসাতে চান, অভিনেতা হিসাবে তাঁকে কেউ কেউ গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন, কিন্তু ভক্তির এতটা আতিশয্য গিরিশ প্রতিভার মূল্যায়নে বাধার সৃষ্টি করলেও একথা অনস্বীকার্য বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একাধারে নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উনিশ শতকে তাঁর প্রভাব ও দানে বাংলা নাটক যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ও মূল আলোচনার সঙ্গে তোমার উত্তর মিলিয়ে নাও :

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের গুরুত্ব কোথায়?

২. কোন্ পরিস্থিতিতে গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় হাত দেন?

৩. নাট্যরচনার প্রথমদিকে গিরিশচন্দ্র কী জাতীয় নাটক লেখেন?

৪. গিরিশচন্দ্রের নাটকের শ্রেণিবিভাগ করো ও প্রত্যেকটি শ্রেণির কয়েকখানি নাটকের নাম করো।

৫. কোন্ শ্রেণির নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে?

৬. গিরিশ - নাটকে ভক্তিভাবের প্রাধান্যের কারণ কী?

৭. গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতার সুর কতখানি ছিল?

৮. গৈরিশ ছন্দ বলতে কী বোঝায়?

৯. নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২.৩.৯.৭ : অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

গিরিশচন্দ্রের মতো রসরাজ অমৃতলাল বসুও স্বয়ং অভিনেতা ছিলেন। তবে তাঁর নামের আগে 'রসরাজ' বিশেষণটি তাঁর অভিনয় ও নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়ে দেয়। আসলে তিনি ছিলেন উত্তম একজন কমেডিয়ান, রঙ্গরসের বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর সহায়তায় গিরিশচন্দ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে অমৃতলাল ইতিহাস পুরাণ ও সমাজকে অবলম্বন করে কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন, যথা - 'তরুবালা' (১৮৭১) 'হীরকচূর্ণ' বা 'গায়কোয়াড় নাটক' (১৮৭৫), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৯৯) 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির কোনোটিতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নেই। প্রহসন রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব। সেদিক থেকে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬), 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজা বাহাদুর' (১৮৯১), 'বাবু' (১৮৯৩), 'একাকার' (১৮৯৫), 'বৌমা' (১৮৯৭), 'গ্রাম্য বিভ্রাট' (১৮৯৮), 'সাবাস আটাশ' (১৯০০), 'কৃপণের ধন' (১৯০০) প্রভৃতির নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে - 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' (১৮৮৬), 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০) 'অবতার' (১৩০৮), 'বাহবা বাতিক'। অধ্যাপক সুকুমার সেন অমৃতলালের নাট্যরচনাকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, 'বিশুদ্ধ প্রহসন, শিক্ষাত্মক প্রহসন - নকশা, বিদ্রূপাত্মক প্রহসন - নকশা, চিত্রনাট্য ও গীতিনাট্য।' তিনিও প্রহসন রচনাতেই অমৃতলালের কৃতিত্বের কথাই বলেছেন। আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রসরাজ তাঁর রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিংশ শতকে লেখা তাঁর 'ব্যাপিকা বিদায়' এখনও পর্যন্ত অভিনীত হয়। তাঁর 'খাসদখল' (এটিও বিংশ শতকের রচনা ১৯০৫) সামাজিক ব্যঙ্গ নাটক হিসাবে একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল, এখনও ছাত্র পাঠ্য পুস্তিকারূপে নাটকটির নাম শোনা যায়। আসলে সে যুগে ব্রাহ্মসমাজ, বিলেতফেরতা ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রী-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, ভোটরঙ্গ , শূন্যগর্ভ স্বদেশী আন্দোলন — এসব বিষয়ই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছে এবং তাঁর নানা প্রহসনে তিনি এইসব বিষয় নিয়েই ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর "বিদ্যুৎ কষাঘাত, বাগ্ ভঙ্গির এতটা অট্টরোল মাঝে মাঝে নাটকীয় কাহিনি গ্রন্থনে আশ্চর্য নিপুণতা আর কোন বাংলা নাটক ও প্রহসনে দেখা যায় না। তাঁর 'কৃপণের ধন' এবং 'চাটুজ্যে- বাড়ুয্যে' প্রহসনে ব্যঙ্গের তীব্রতা কিছু কম বলে অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে।" (বাংলাসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

> *অমৃতলাল বসু একজন কমেডিয়ান, রঙ্গ রসের বিখ্যাত নাট্যকার। অমৃতলালের গম্ভীর ভাব ও গভীর জীবনরসের পরিচয় পাওয়া যায়- 'তরুবালা' (১৮৭১), 'হীরকচূর্ণ' বা 'গায়কোয়াড়' (১৮৭৫) ও 'হরিশচন্দ্র' (১৮৯৯) নাটকে। হিন্দুধর্মের সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথার বিলোপ নিয়ে 'বিবাহবিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজা বাহাদুর' (১৮৯১) 'বাবু' (১৮৯৪), 'একাকার' (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য। রসরাজের রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনা 'ব্যাপিকাবিদায়' ও 'খাসদখল' জনপ্রিয় ছিল। তাঁর নানা প্রহসনের মধ্যে 'কৃপণের ধন' এবং 'চাটুজ্যে-বাড়ুয্যে' অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে। অমৃতলাল বসু প্রহসন রচয়িতা রূপেও সফল হয়েছেন।*

২.৩.৯.৮ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্যালোচনা অনুল্লেখের কারণ

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) প্রমুখ খ্যাতনামা নাট্যকারগণ উনিশ শতকে আবির্ভূত হলেও তাঁদের নাট্যরচনার প্রায় সবই বিংশ শতকে

প্রকাশিত হয়েছে। তাই উনিশ শতকের নাটকের ইতিহাসে তাঁদের নাটকের আলোচনা করা হ'ল না - যথাস্থানে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে। উনিশ শতকে আরও যে সব নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের খ্যাতি নট ও নাট্যাধ্যক্ষ রূপেই, যথা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬)। নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে দু-চারখানি নাটক তাঁরা লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

২.৩.৯.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক — রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিতকুমার ঘোষ

৪. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা — বৈদ্যনাথ শীল

২.৩.৯.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. অমৃতলাল বসুকে 'রসরাজ' বলা হয়েছে কেন?

২. অমৃতলাল কোন্ শ্রেণির নাট্যরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন- এই শ্রেণির কিছু নাটকের পরিচয় দাও।

৩. রসরাজ অমৃতলালের নাটকে মুখ্যত কাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হয়েছে?

৪. অমৃতলালের নাট্যরচনার কৃতিত্ব বিচার করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

উনিশ শতকের কাব্যসাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.৩.১০.১ : ভূমিকা

২.৩.১০.২ : যুগবিভাগ

২.৩.১০.৩ : ঈশ্বর গুপ্ত

২.৩.১০.৪ : রঙ্গলাল

২.৩.১০.৫ : মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

২.৩.১০.৬ : বিহারীলাল ও অন্যান্য গীতিকবি

২.৩.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.১০.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.১০.১ : ভূমিকা

বাঙালির সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভাব বিশ্বে উনিশ শতক এক স্মরণীয় কাল। যার অভিঘাতে বাংলা ও বাঙালি আধুনিকতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। কিভাবে ঘটল এই রূপান্তর? বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"উনবিংশ শতাব্দীর বড় কথা পুঁথির যুগের অবসান, মুদ্রণের যুগের সূচনা। মুদ্রাযন্ত্র য়ুরোপীয় রেনেসাঁস-কে ত্বরান্বিত করেছিল ......।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)

পদ্যবাহন সাহিত্য গদ্যবাহন হওয়ায় বাঙালির আত্মপ্রকাশ সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠল। দেবমহিমামূলক সাহিত্য রচনার স্থলে এলো মানুষের কথা। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি পেলো বিশ্বসাহিত্যের

পরিচয় ও স্বাদ। এলো 'আধুনিকতার বাণী'। অসিতবাবুর বিশ্লেষণী আলোচনায় এই যুগের অন্তঃস্বরূপ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে —

> "উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনের আগল ঘুচে গেল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশাল বিশ্বের ছায়া পড়ল, বিচিত্র জীবনের কল্লোল ধ্বনিত হল, পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে মুক্তির ঝড়ো হাওয়া এসে খাঁচার পাখীর দুর্বল পাখার মধ্যে সাগর সঙ্গীত শুনিয়ে গেল। তারপর খাঁচার শলা ভেঙে গেল, হংস বলাকা পাখা থেকে নীল আকাশের বুকে উড়ে গেল। .... এককথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু দেবদেবীর কথা নয়, জীবনের বিশাল প্রত্যয় বিচিত্র বর্ণসুষমায় ফুটে উঠল। ..... বাঙালির জীবন থেকে মধ্যযুগ স্খলিত হয়ে পড়ল।" (তদেব)

২.৩.১০.২ : যুগবিভাগ

সুধী গোপাল হালদার তাঁর "বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা" গ্রন্থে মধ্যযুগের অবসান ও উনিশ শতকের সূচনাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

১৮০০ - ১৯৪৭ ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যুগ
১৮১৭ - ১৯১৮ জাগরণের যুগ বা রিনাইসেন্স

ব্যক্তির নামে কালপর্বকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন —

রামমোহন - বিদ্যাসাগরের যুগ (১৮০০ - ১৮৫৮)
মধুসূদন - বঙ্কিমের যুগ (১৮৫৯ - ১৮৯৩)
রবীন্দ্রযুগ (১৮৯৪ - ১৯৪২)

এগুলিকে প্রস্তুতিপর্ব, বিকাশ পর্ব, প্রতিষ্ঠাপর্ব রূপেও চিহ্নিত করা যায়।

উনিশ শতকের সবচেয়ে আলোচিত সাহিত্যশাখা হলো কাব্য-কবিতা। এতদিন যে গীতিকবিতা অস্ফুট আকাশে বৈষ্ণব পদে ও মঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদে ছিল, তার সম্যক বিকাশ ঘটল এই শতকে। বিষয় নয়, বিষয়ীর আত্মতা দেখা গেল। ভারতচন্দ্র তাঁর "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে বলেছিলেন :

নিত্য তুমি খেলো যাহা   নিত্য ভালো নহে তাহা
আমি যা খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।।

এই 'আমি' বা অহংকে প্রতিষ্ঠিত করল গীতিকবিতা। যেখানে পাওয়া গেল /an intense personal feeling" পাশাপাশি আখ্যান কাব্য, মহাকাব্য যে লেখা হলো না, তা নয়। তবে মধুসূদন দত্ত ছাড়া যথার্থ মহাকাব্যের আত্মা আর কারো কাব্যে পাওয়া গেল না।

মধ্যযুগের খোলস ছেড়ে, আধুনিকতার প্রকাশ ঘটল কম্পাস, ছাপাখানা ও বারুদের ব্যবহারে। আম্রবনচ্ছায়া লালিত শান্ত জীবন ও জনপদ ছেড়ে, অকূলে বা অজানার দিকে পাড়ি দেবার ভরসা দিল কম্পাস। বারুদ বা গান পাউডার মানুষের শক্তির উৎস হলো। আর ছাপাখানার মাধ্যমে ঘটল জ্ঞানের বিস্তার। পুথির সংকীর্ণ পরিধি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আধিপত্য ছেড়ে শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি 'বহুজনহিতায় চ' হলো। যদিও আধুনিক কি বা কোনটা তা নিয়ে মতান্তর অন্তহীন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিকতা সময়নির্ভর নয়, মর্জি নির্ভর। নদীর মতো চলমান

সাহিত্য যখন বাঁক বদল করে, সেটাই আধুনিকতা। আর বৈদেশিক বা ইংলন্ডীয় প্রথায় কবিতা (বা সাহিত্য) রচনার মধ্যে আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে আছে, প্রথম ঘোষণা করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর-রবীন্দ্রযুগের কবি ও কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আধুনিকতার মধ্যে দেখেছিলেন, 'বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা ও সংস্কাররাহিত্য' (কল্লোলযুগ)। আরো পরে আধুনিক কবিতার প্রমাণী সংকলন করতে গিয়ে সম্পাদক (অন্যতম) আবু সয়ীদ আইয়ুব জানান,

> "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

পাশ্চাত্যে আধুনিকতার যে ধারণা, তাকে আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। যেমন ট্রিলিং এর মতে, 'modern literature has elevated individual existence over social man.' বাংলা কবিতার বিবর্তন কালগত ও বিষয় বা ভঙ্গিগত কেমন, তা দুটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়।

চিত্র : ১

কালগত বিবর্তন

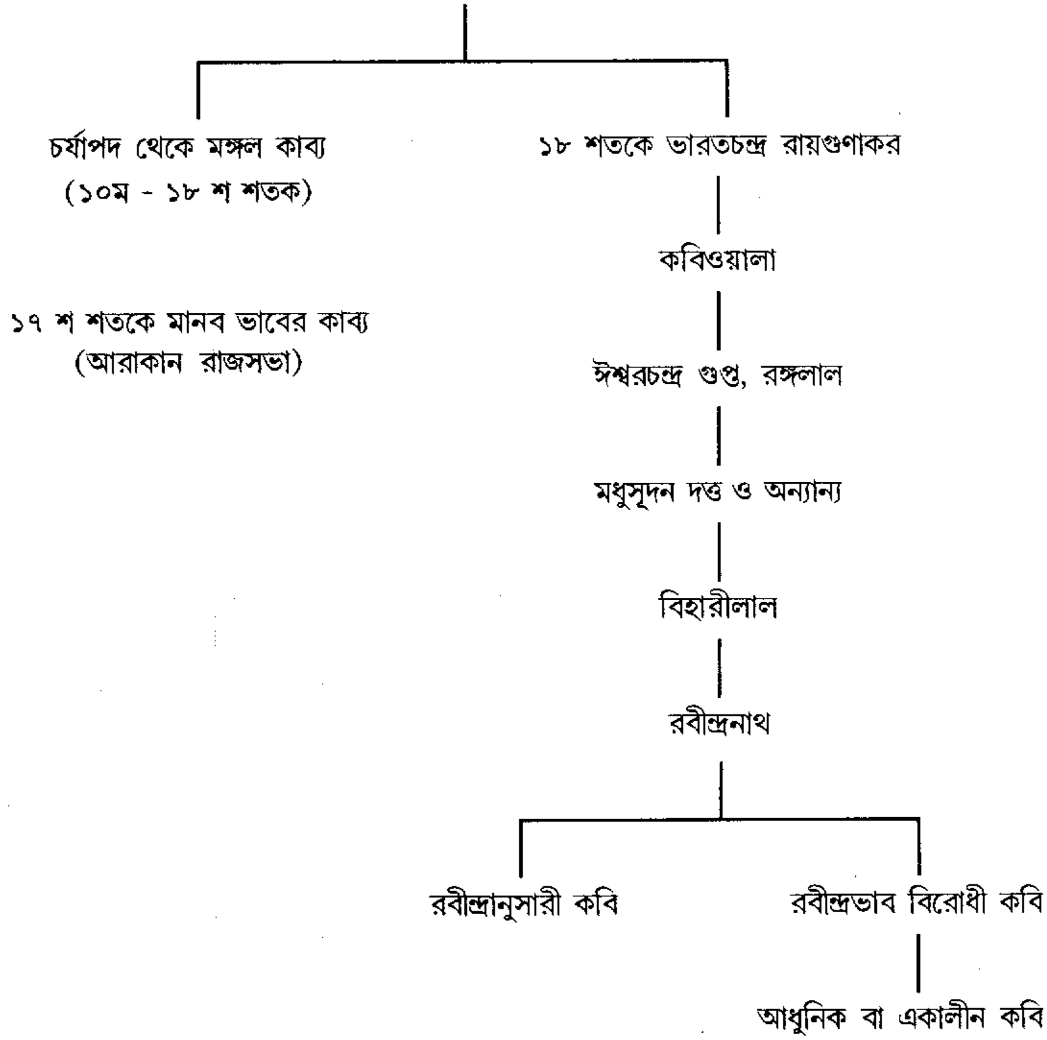

চিত্র : ২

বিষয় ও ভঙ্গিগত বিবর্তন

ঈশ্বর ও আধ্যাত্মভাব; প্রাচীন প্রথার, শাস্ত্রের ও দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ

প্রথাভঙ্গ ১৭ শতকে; দেবতার বদলে মানবভাব নরনারীর প্রেমের প্রাধান্য —আলাওল ও দৌলত কাজীর রচনার পাশে ময়মনসিংহ গীতিকার কথা ও উল্লেখ্য।

অমঙ্গল বোধ, কাম (sex), অসুন্দর, ব্যঙ্গ

১৮ শতকেই ভারতচন্দ্রের 'নূতন মঙ্গল' রচনা ভাবে, ভাষায়, ছন্দে।

১৯ শতকে বস্তুতান্ত্রিক কবিতা লেখা শুরু; দেশপ্রেম ও ব্যঙ্গমূলক কবিতা লেখা; রঙ্গলাল জানালেন পাশ্চাত্য প্রকরণ কাব্যে নিতে হবে। মধুসূদন প্রকরণগত বৈচিত্র্য আনলেন - ওড, সনেট, পত্র-কাব্য ইত্যাদি।

আত্মগত কবিতা বা যথার্থ গীতিকবিতার সূত্রপাত বিহারীলালের মুখের ভাষায় ব্যবহার ঘটল।

রবীন্দ্রকাব্যে এলো দর্শন ও তত্ত্বের মিশ্রণ এবং বিশ্ববীক্ষা

উত্তররবীন্দ্রযুগের কাব্যে এলো বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ। প্রাধান্য পেল রূঢ় বাস্তব,

বিদ্রূপ ও অবিশ্বাস। গদ্যছন্দ ও গদ্যকবিতার বিস্তার ঘটল। বিজ্ঞানের ছায়া পড়ল। নাগরিক মনোভাবের প্রাধান্য দেখা গেল। বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ, নিঃসঙ্গতা হতাশা যুদ্ধোত্তর কবিতার অবলম্বন হলো। ফ্রয়েড ও মার্কসের তত্ত্ব অনুসৃত হলো ব্যাপকভাবে।

আধুনিক সাহিত্যের এই ভঙ্গিগত ও ভাবগত পরিবর্তন সম্পর্কে টমাস মানের ভাষ্যে বলা যায় — 'Art is becoming criticism (Doctor faustus)।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী / রাজদণ্ডরূপে'। সে হলো সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) অব্যবহিত পর। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড ভেঙে সৃষ্টি হয় নতুন India council. বড়লাটরূপে নিযুক্ত হন প্রথম Viceroy লর্ড ক্যানিং (১৮৫৯)। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে (১লা নভেম্বর) সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জানিয়ে দেন নতুন শাসননীতি চালু হলো। এর আগে ১৮৫৭ তে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ (অধুনা মুম্বাই) তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। শাসকরূপে ক্যানিং কিছু সংস্কার করেন। যার মধ্যে নীলকর পীড়ন ও জমিদারদের অত্যাচার নিরাকরণ অন্যতম। তাঁর শাসন কালের শেষ বছরে (১৮৬১) ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁর চলে যাবার পরে আসেন লর্ড এলগিন। এভাবেই ভারতবর্ষে পর পর নানা Viceroy এর আগমন ঘটে। যার মধ্যে লর্ড লিটন অন্যতম (১৮৭৬)। যাঁর আমলে দুর্ভিক্ষ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, Vernacular Press Act প্রচলন, Armes Act প্রয়োগ ইত্যাদি ঘটে। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এইসময়, ভারতবাসী ও বঙ্গবাসী দেশকাল সচেতন হয়েছিল। রাজনৈতিক অধিকার বিষয়েও সজাগ হয়। সংবাদপত্র যে প্রতিবাদের ভাষা তাও প্রমাণিত হয় এই সময়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ক্যানিং-এর মতো কিছু ভালো কাজে ব্রতী হন। যেমন, মহীশূররাজকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। Vernacular Press Act তুলে দেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। বিচারশালায় দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ইলবার্ট বিলের সাহায্যে রিপন এই বৈষম্য দূর করতে চান। কিন্তু নানা বিক্ষোভের ফলে এই বিল পরে ভারত সরকার প্রত্যাহার করেন। তবু সংবাদপত্র যে মতপ্রকাশের শক্তিশালী অস্ত্র হয়েছিল, তা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠে জানা যায় —

বাঙ্গালি অপূর্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সংবাদপত্র লেখে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাও বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে সচেতন করেছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় — "The inspiring influence of a western Education reached a larger circle of the population. Indian society responded to this stimulus." (India in the Victorian Age)

ইতালির রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ঢেউ বঙ্গদেশে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল এতে সন্দেহ নেই। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এর ফলে সম্ভব হয়েছিল। দেবতার বদলে এলো মানুষ। শাসক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরূপে ধিকৃত হলেও, ইংরেজি কাব্য সাহিত্য বাঙালির মনোলোক উদ্ভাসিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজ হলো 'চিত্তদূত'। বাংলার ডোবায় এসে পড়ল মহাসাগরের নোনাজল। শুরু হয়ে গেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। জন্ম নিল ইয়ংবেঙ্গল সমাজ। এই টানাপোড়েন ও ভাঙচুরের ফলে শেষপর্যন্ত বাঙালি লাভ করল মানস-উৎকর্ষ। সংকীর্ণতা মুক্ত হলো; বিশ্বদুয়ার খুলে গেল। 'এক পলকে রাত্রি হলো ভোর।' চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলো গদ্যভাষা। পদ্যবাহন সাহিত্য প্রসারতা পেলো গদ্যে। ভাবের ভাষা থেকে চিন্তার ভাষায় বাঙালির উত্তরণ ঘটল। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ রেনেসাঁস ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব নিয়ে যা বলেছেন, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ সংগত মনে করি। তিনি রেনেসাঁসের চরিত্রবিচার ও আন্দোলনের মূল লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন,

> সেগুলি হইতেছে : স্বতঃস্ফূর্ততা, জগৎ ও জীবনকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, অফুরন্ত উৎসাহ ও চাঞ্চল্য নিত্য নিত্য নব নব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, প্রচলিত কোনো ধারায় উৎকর্ষলাভের অপেক্ষা

> নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবণতা সংস্কারমুক্তি ও মোহমুক্তি; সর্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের মনোভাব, অভিলাষ ও সে সম্ভাবনায় বিশ্বাস। (উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য)

বাংলার রেনেসাঁস যদিও সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচের নয়, তবু যেসব পরিবর্তন ও যে জাগরণ ঘটেছিল তার মূল্য অপরিসীম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত "বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন —

> বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানা পথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণ শক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে।

উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য ও কাব্যসাহিত্যে সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক স্মরণীয় এইজন্যই, এই সময় থেকে বাংলা 'পদ্য' রূপ নিলো 'কবিতা' আকারে। বৈষ্ণবপদ বা বিষ্ণুপদ ছিল গেয় পদ (চর্যাপদও তাই)। কিন্তু যা গেয় হলো না, পাঠ্য ও শ্রব্যগুণ অর্জন করল, তার নতুন নাম হলো 'কবিতা'। যে কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। এছাড়াও কবিতা হলো ব্যক্তিমনের ভাব প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষারূপ। মানবরসই দেখানো মুখ্য।

উনিশ শতকের সবচেয়ে আলোচিত সাহিত্যশাখা হলো কাব্য-কবিতা। আমি বা অহংকে প্রতিষ্ঠিত করল গীতি কবিতা। মধুসূদন দত্ত ছাড়া যথার্থ মহাকাব্যের আত্মা আর কারো কাব্যে পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিকতা সময় নির্ভর নয়, মর্জি নির্ভর। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পেল, দেবতার বদলে এলো মানুষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সংকীর্ণতা মুক্ত হলো; বিশ্বদুয়ার খুলে গেল। ভাবের ভাষা থেকে চিন্তার ভাষায় বাঙালির উত্তরণ ঘটল। পদ্যবাহন সাহিত্য প্রসারতা পেল গদ্যে। বাংলার রেনেসাঁস যদিও সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচের নয়, তবুও যে সব পরিবর্তন ঘটল, উনিশ শতকের বাংলা গীতি কাব্য ও কাব্যসাহিত্যে তা প্রাণ শক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব না হওয়ায় ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কবিওয়ালারা বাংলা কবিতার আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের ক্ষণজীবী ও পঙ্গপাল রূপে অভিহিত করেছেন। বঙ্গসরস্বতীর বীণা যাঁদের হাতে লাঠি হয়ে উঠেছিল। কাব্যরসের নামে আদিরস বা খেউড় পরিবেশনই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। শহুরে বাবুরা সান্ধ্য আসরে এতে আমোদ পেতেন। তবু ওরই মধ্যে গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর নাম উল্লেখ করা যায়। যাঁদের ভাষা, ভঙ্গি কিছুটা অনুসরণ ও আত্তীকরণ করে উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রশ্ন :

১। 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' কার লেখা?

২। মধুসূদন দত্তের একটি মহাকাব্যের নাম লেখ?

৩। গীতিকবিতা কাকে বলে?

২.৩.১০.৩ : ঈশ্বর গুপ্ত

গুপ্তকবি ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক রূপে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২ — ১৮৫৯) স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁকে 'যুগসন্ধির কবি' বলা হয়। তাঁর শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সেকাল আর একালের সন্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব।" ছেলেবেলা থেকে তাঁর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মুখে মুখে ছড়া বাঁধতেন। দারিদ্র্যের কারণে উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হন। নিজ উদ্যোগে ও কবিত্বের গুণে তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত হন। তাঁর বিশেষ কীর্তি "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদনা। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রাচীন কবিদের কাব্য ও জীবনী যেমন প্রচার করেন, তেমনি নবীন প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'যুগসন্ধির কবি' বলা হয়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নিজ উদ্যোগে ও কবিত্বের গুণে তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত হন। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন ও কৃত্য তাঁর লেখায় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রাচীন কবিদের কাব্য ও জীবনীর সঙ্গে নবীন প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেন। বস্তুতন্ত্র তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেজন্য কাব্যের আসরে পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠেপুলি ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর দ্বিধার পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে ও আচরণে পাওয়া যায়। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন ও কৃত্য তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্ম সভার একেশ্বরবাদেও তিনি বিশ্বাসী। অন্যদিকে সভ্যতার ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে তিনি বিরক্ত। ঐতিহ্য ও প্রথার প্রতি অনুরাগ দেখাতে গিয়ে নব্যপন্থা ও নবযুগের ধর্মকে মানতে পারেননি। রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক কবিতার মাধ্যমে তাঁর বিরাগ প্রকাশ করেছেন।

১। সোনার বাঙাল করে বাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা।

২। যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ.বি.শিখে বিবি সেজে
বিলিতী বোল কবেই কবে।।

৩। জেতে আর কাজ নাই ঈশগুণ গাই।
খানাসহ নানা মুখে বিবি যদি পাই।।

৪। অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গতায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেলনা।।

এই ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাশে আছে স্বজন-স্বদেশ-স্বভাষা প্রীতি।

১। মিছা মণিমুক্তা হোক স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

২। মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।

৩। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা

বস্তুতন্ত্র তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেজন্য কাব্যের আসরে তিনি নিয়ে আসেন পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠেপুলি ইত্যাদি। স্বদেশবাসীর ইংরেজপ্রীতি ও বিদেশিয়ানাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। ধর্ম নিয়ে ব্যবসাও তাঁর বিদ্রূপের বিষয়।

১। বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে।

২। কসাই অনেক ভালো গোঁসাইয়ের চেয়ে।

৩। ধর্মতলা ধর্মহীন গোহত্যার ধাম।

৪। আমরা ভূষি পেলেই খুশি হবো ঘুঁষি খেলে বাঁচব না।

৫। দিশিকৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ঈশ্বর গুপ্ত Realist ও Satirist তবে শেষপর্যন্ত তিনি 'বাঙ্গালা সমাজের কবি'। তাঁর কবিতায় আমরা পাই প্রগতিশীল সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ; নারী ও প্রেম বিষয়ে রুচিহীন ও অগভীর অনুভব; স্থূল হাস্যরসের প্রয়াস; বস্তুবাদী চেতনা; রচনা প্রকরণে ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের অনুসরণ। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বলেছেন, "তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এসব সামগ্রী বড় বেশি নাই।" গুপ্তকবির কবিকৃতির মূল্যায়নে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য —

> "জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি অম্লমধুর ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপে তিনি ছিলেন সব্যসাচীর মতো অব্যর্থলক্ষ্য। ভাবাবেগে আর্দ্র বাংলা সাহিত্যে তিনি বুদ্ধির চমক এনেছেন, এলায়িত প্রেম - প্রণয়ের স্থলে সামাজিক জীবনের হাস্যকর চিত্র এঁকেছেন — এজন্য তিনি বাংলা কাব্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

প্রশ্ন :

১। গুপ্তকবি কাকে বলা হয়?

২। 'সংবাদ প্রভাকর' কে সম্পাদনা করেছিলেন?

২.৩.১০.৪ : রঙ্গলাল

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ৮৭) সেই কবি যিনি বাংলা কবিতার মুক্তি কিসে, তার পথ জেনেছিলেন। বীটন সোসাইটি হলে "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব" প্রবন্ধ (১৮৫২) পাঠের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, "ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতালাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক।" কিছুদিন "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তবু পরিহাস এই, তিনি নিজে 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে' কোনো কাব্য লিখতে পারেননি। গুরু গুপ্তকবির প্রকরণের বাইরে প্রায় বেরোতেই পারেননি। মধুসূদন দত্তের প্রতিবেশী হয়েও নবযুগের বার্তা ধ্বনিত হয়নি তাঁর কবিতায়। গোপাল হালদার সংগত কারণে লক্ষ করেছেন,

> "তিনি লিখতে চাইছেন ম্যুর, স্কট, বায়রণের মত আখ্যানকাব্য, কিন্তু তা লিখছেন বাঙলা পদ্যের পুরাতন ধারায়।"

ফলে সমালোচক তাঁকে 'যুগসন্ধিস্থলেরই কবি' রূপে চিহ্নিত করেছেন।

রঙ্গলাল রচিত কাব্যগুলি হলো — পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। এছাড়াও অনুবাদমূলক কাব্য আছে।

প্রাক্-মধুসূদন পর্বে রঙ্গলালই বুঝেছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিতে রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতা বা খণ্ডকাব্য নয়, দরকার আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য। তিনি সাফল্য না পেলেও মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার পথ তিনিই দেখিয়েছেন বলা যায়। কবি ও প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ মিত্র বলেন,

> দেশপ্রেমের প্রেরণায় উনিশ শতকের বাংলায় তিনিই প্রথম রোমান্টিক উপাখ্যানকাব্য রচনা করলেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন এদিক দিয়ে তাঁরই উত্তরসাধক। (বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র)

কর্ণেল টডের 'রাজস্থান' (Annals and Antiquities of Rajasthan) অবলম্বনে তিনি 'পদ্মিণী উপাখ্যান' লেখেন। যেখানে রাণী পদ্মিণীর রূপমুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করলে রাণী আগুনে আত্মাহুতি দেন। সতী নারীর এই জহরব্রত পালনের গৌরবগাথা রাজস্থানে সুপ্রচলিত। রঙ্গলাল ইতিহাসের গন্ধমাখা জনশ্রুতি অবলম্বনে আখ্যান কাব্যটি লেখেন। যেখানে রাণা ভীমসিংহের বাণী আজও স্বদেশ প্রেমের বার্তা বহন করে চলেছে।

> *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) বাংলা কবিতার মুক্তি কিসে, তার পথ জেনেছিলেন। রঙ্গলাল রচিত কাব্যগুলি হলো—'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) ইত্যাদি। কর্নেল টডের 'রাজস্থান'* ***(Annals and Antiquities of Rajasthan)*** *অবলম্বনে তিনি 'পদ্মিনী 'উপাখ্যান' লেখেন। 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' রাজপুত কাহিনি আশ্রিত। 'কাঞ্চীকাবেরী' উড়িষ্যার ভক্তিরসের কাহিনি নিয়ে লেখা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতেই হয়।*

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বলো, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

প্রধানত এই কাব্যই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করেছিল। তাঁর অন্যান্য আখ্যানকাব্যের মধ্যে 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' রাজপুত কাহিনি আশ্রিত; 'কাঞ্জী কাবেরী' উড়িষ্যার ভক্তিরসের কাহিনি নিয়ে লেখা। 'উৎকল দেশ ঘৃণার্হ নয়' বোঝাতেই তিনি এই কাব্যটি লেখেন। এছাড়া "নীতি কুসুমাঞ্জলি" নামে ছোট কবিতাও লেখেন — যেখানে কবিত্বরস নয়, জ্ঞানদানই মুখ্য। ছন্দ ব্যবহারে তিনি পুরাতনপন্থী। "কর্মদেবী" কাব্যে মালঝাঁপ ব্যবহার করেছেন ভারতচন্দ্রের অনুসরণে —

চলে যায়, পদ-ঘায়, বসুধার কম্প।
কভু ধায় ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প।।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁকে 'সেযুগের ভারতচন্দ্র' আখ্যা দিয়েছিলেন — 'You fully deserve the title of the Bharat Chandra of this century' একজন আধুনিককালের কবির পক্ষে এই অভিধা গৌরবের হতে পারে না। কিন্তু রঙ্গলাল যুগের দাবি মেনেছিলেন; যুগোত্তীর্ণ হতে পারেন নি। যদিও সেই স্বপ্ন তাঁর মনে ছিল। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন তাই প্রাসঙ্গিক মনে হয় —

খাঁটি বাঙালি গুপ্তকবি এবং 'ডাহা ইংরেজ' মধুসূদনের মাঝখানে রঙ্গলাল দাঁড়িয়ে আছেন অনেকটা রাজনীতির 'বাফার স্টেটে'র (Buffer State) মতো। (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)

উনিশ শতকের কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের শুভাগমনের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরেকজন কবিকে পাই। স্বল্পখ্যাত কবিটি হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭ - ১৮৫৮)। বিদ্যাসাগরের আধুনিক চিন্তাচেতনার প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকলেও, কাব্যকলায় তিনি ছিলেন পুরাতন পন্থী। প্রথম যৌবনে আদিরসাত্মক কাব্য লিখেছিলেন (রসতরঙ্গিণী; বাসবদত্তা)। যেখানে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ছায়া আছে। তবে তাঁর "শিশু শিক্ষা" আজও পাঠযোগ্য। পদ্যছন্দে লেখা তাঁর এই কবিতাটি সর্বজন পরিচিত —

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেসব গৌণ কবিদের নাম, লেখা পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬), অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (১৮৪৬-১৯১৭), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। কাঙাল হরিনাথ বাউল গানের রচয়িতা; 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র দুটি কাব্য লিখেছিলেন। ইন্দ্রনাথ ছিলেন রঙ্গব্যঙ্গমূলক গদ্যের লেখক। পঞ্চানন্দ তাঁর ছদ্মনাম। "ভারত উদ্ধার" নামে ব্যঙ্গকাব্য লিখে বিশেষ খ্যাতি পান। উনিশ শতকের কাব্য ইতিহাসে প্রথম পর্বে গুপ্তকবি ও রঙ্গলাল-ই উল্লেখযোগ্য। যাঁরা মধুসূদনের এবং পরবর্তী কবিদের আগমন ত্বরান্বিত করেছিলেন।

প্রশ্ন :

১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি কাব্যের নাম কর?
২। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর মূল উৎস কোথায়?

২.৩.১০.৫ : মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

বাংলা কাব্যের আমূল পরিবর্তন যাঁর হাতে ঘটেছিল, তিনি শ্রীমধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যপাঠে ঋদ্ধ এই কবি মধ্যযুগীয় কাব্যের বাতাবরণ ছিন্ন করেছিলেন। বাংলা কবিতার ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর কাব্যভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ দুই-ই ছিল অভূতপূর্ব ও অভিনব। তিনি যেমন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ' থেকে বাংলা নাটককে উদ্ধার করেন, তেমনি যাত্রা-পাঁচালির-পয়ারের নবনির্মিত ছন্দের আবেশ মুছে দিয়ে অমিল পয়ার (Blank Verse) সৃষ্টি করেন। ভাষায় ও ছন্দে নিয়ে আসেন ওজস্বিতা। একদিকে দেশবিদেশের কাব্যকুল মধু নিয়ে 'মধুচক্র' রচনা করেছেন। অন্যদিকে 'ভাষাপী খননি স্ববলে' যে রস সৃষ্টি করেন, তাতে গৌড়জন তৃপ্তি পায়।

প্রথম যৌবনে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে মধুসূদন ভেবেছিলেন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনাতে অমর হবেন। সে ভুল তাঁর ভেঙে যায়। সনেটে আত্মবিলাপ করে বলেন,

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি, অবহেলা করি
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ ....

কখনো গীতিকবিতায় লেখেন —

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।

যার ফলশ্রুতি মাত্র সাতবছর বাংলা সাহিত্যচর্চা। অসামান্য প্রতিভার এই কবি বাংলা সাহিত্যের মানচিত্র বদলে ছিলেন ভাবে ভাষায় প্রকরণে। লেখা হলো মহাকাব্য, পত্রকাব্য, ওড বা গাথাকাব্য, সনেট।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য। যা তৎকালীন বিদগ্ধজনেরা সাদরে গ্রহণ করেন। সুন্দ-উপসুন্দর কাহিনি নিয়ে লেখা এই কাব্যে মিল্টনের Blank verse অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ যেমন পাই, তেমনি আছে কবির সৌন্দর্য চেতনার প্রকাশ। অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন বলেন, 'বঙ্গে রোমান্টিক কবিতার আদিগ্রন্থ তিলোত্তমা সম্ভব' (মধুসূদন)। আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানান (১২৮৭ র ৩০ চৈত্র) —

> "আমরা মাইকেলের তিলোত্তমা সম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।"

তবে মধুসূদনের অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। যা প্রকাশমাত্র বাঙালি পাঠককে চমকিত ও চমৎকৃত করেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা দেন। মানপত্রে লেখা হয় —

> "আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অত্যুত্তম, অশ্রুতপূর্ব, অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে ....।"

বাংলা কবিতার ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর কাব্যভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ দুই-ই ছিল অভূতপূর্ব ও অভিনব। লেখা হলো মহাকাব্য, পত্রকাব্য, ওড বা গাথাকাব্য, সনেট। ১৮৬০ খ্রি: প্রকাশিত হয় 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে মধুসূদন রচনা করেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। মহাকাব্যের শর্ত মেনে অষ্টাধিক সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত হয়েছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১) বৈষ্ণবীয় ভক্তি নয়, প্রেমই কাব্যের মুখ্য বিষয়। পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) এগারো জন পৌরাণিক নারীর প্রেম, বিরহ, ক্রোধ নিয়ে প্রকাশিত। মধুসূদনের শেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রচিত।

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে শ্রীমধুসূদন 'মেঘনাদবধ' রচনা করেছেন। যেখানে একদিকে তাঁর প্রতিজ্ঞা — 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'। অন্যদিকে দেশবিদেশের কবিদের কাব্য কুলমধু নিয়ে রচনা করতে চান সেই 'মধুচক্র' যার মধুপানে গৌড়জন তৃপ্তি পাবে। মহাকাব্যের শর্ত মেনে অষ্টাধিক সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত হয়েছে। যেখানে নয় রসই ব্যক্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন। চতুর্থসর্গে সীতা প্রাচ্যকবির মানস প্রতিমা; অষ্টম সর্গ (প্রেতপুরী) মিল্টন ও দান্তের নরক বর্ণনার ছায়ায় রচিত। বীর মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যু আর পিতা ও রাজা রাবণের বাৎসল্য কাব্য শেষে করুণ রস সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরাঙ্গ না মূর্তি উনিশ শতকের নারীজাগরণের দৃপ্ত রূপ বলা যায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে জানান, তিনি ওড জাতীয় একটি কাব্য লিখেছেন — "They are all about poor old Radha and her বিরহ"। এই কাব্যই 'ব্রজাঙ্গনা"

(১৮৬১)। বৈষ্ণবীয় ভক্তি নয়, প্রেমই কাব্যের মুখ্য বিষয়। যদিও বিরহিণী রাধাকে তিনি 'পদাঙ্কদূত' অনুসরণে চিহ্নিত করেছেন।

সহসা হইনু কালা জুড়াও এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন রোমান কবি ওভিদের Heroides কাব্য অনুসরণে পত্রকাব্য "বীরাঙ্গনা" (১৮৬২) লেখেন। যেখানে এগারো জন পৌরাণিক নারী তাঁদের প্রেম, বিরহ, ক্রোধ, বেদনা পত্রাকারে প্রকাশ করেছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই চরিত্রগুলিতে কামনার রক্তরাগ এবং চরিত্রের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত) নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার বোধ পত্রকাব্যকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। একালীন নারীবাদী আন্দোলনের ভূমিকা রূপে আমরা "বীরাঙ্গনা" কে গ্রহণ করতে পারি। কেকয়ী বা গঙ্গার উক্তি সেই যুগেও ছিল দুঃসাহসিক। 'পতি পরমগুরু' যেকালে নারীদের শেখানো হতো, সেই কালে জাহ্নবী স্বামী শান্তনুকে বলেছে, 'পত্নী ভাবে তুমি ভেবোনা আমারে।' কাব্যটি কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো।

মধুসূদনের অন্তরঙ্গজীবনের প্রতিলিপি তাঁর "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" (১৮৬৬) — যা তাঁর শেষ কাব্যও বটে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বে কেউ সনেট লেখেননি। পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় রীতিতে তিনি সনেটগুলি রচনা করেন। যার মধ্যে তাঁর বাল্য স্মৃতি, অগ্রজ কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিদেশিয়ানার প্রতি লুব্ধতার জন্য আত্মবিলাপ, আশার ছলনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অধিকাংশ সনেট তিনি লেখেন। স্বদেশ স্বজনের জন্য ব্যাকুলতা সেখানে ধরা পড়েছে। শেক্সপীয়রের মতো তিনিও সনেটে 'Unlocked his heart' বলা যায়। ধর্ম বদল করলেও মনে প্রাণে তিনি যে ভারতীয় তথা বাঙালি ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর প্রার্থনায় — 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গে, ভারত রতনে।' আগমনী বিজয়াগানের স্মৃতিতে লেখেন 'বিজয়া দশমী' সনেট —

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে,
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

তখন মনে হয় সত্যই সুপবনে পতাকায় উড়িয়ে যায় নাম 'শ্রীমধুসূদন'।

প্রশ্ন :

১। মেঘনাদবধ কাব্য' কে, কতসালে রচনা করেন?
২। মধুসূদনের একটি পত্রকাব্যের নাম কি?
৩। মধুসূদনের শেষ কাব্যটি কতসালে প্রকাশিত হয়েছিল?

মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হন। যদিও প্রথম জীবনে তিনি খণ্ড কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর "চিন্তাতরঙ্গিণী" (১৮৬১) যদিও তাত্ত্বিক, তবু কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। দেশাত্মবোধের ভাব জাগাতে আখ্যানমূলক কাব্য "বীরবাহু" রচিত

হয় ১৮৬১ খিস্টাব্দে। তাঁর "কবিতাবলী"তে গীতিকবির আবেগ খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' অবলম্বনে "ছায়াময়ী" (১৮৮০) ও ভারতীয়, শক্তিতত্ত্ব অবলম্বনে "দশমহাবিদ্যা" (১৮৮২) কাব্যও তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তবে বাঙালি পাঠকের কাছে হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" মহাকাব্যের জন্যই পরিচিত। ১৮৭৫-১৮৭৭ সময়সীমায় দুখণ্ডে বইটি প্রকাশিত হয়। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ ও স্বর্গরাজ্য উদ্ধার এই মহাকাব্যের বিষয়। এক সময় "বৃত্রসংহার" সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কিশোর বয়সে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নিন্দা করে হেমচন্দ্রের কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন। যদিও কালের বিচারে মধুসূদনই যথার্থ মহাকবির মর্যাদা পেয়েছেন। চব্বিশ সর্গে, নানা ছন্দে বিন্যস্ত "বৃত্রসংহার" কাব্যে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও ঔদার্য পাওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু সর্গ ও চরিত্র পাঠকের ভালো লাগে। যেমন দধীচি, ইন্দুবালা চরিত্র। বিশ্বকর্মার কর্মশালার বর্ণনাও চমৎকার। "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ছায়া প্রায় সর্বত্র অনুভব করা যায়। যেজন্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মধুসূদনকে গুরুরূপে স্বীকার করেও হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে খণ্ড কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১) যদিও তাত্ত্বিক, তবু কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। দেশাত্মবোধের ভাব জাগাতে আখ্যানমূলক কাব্য 'বীরবাহু' রচিত হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' অবলম্বনে ছায়াময়ী (১৮৮০) ও ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব অবলম্বনে 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) কাব্যও তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তবে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫-১৮৭৭) কাব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন :

১। 'বীরবাহু' কে রচনা করেন?
২। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য কটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল? কোন সময়ে?

উনিশ শতকে মহাকাব্য রচনার উদ্দীপনার যুগে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) অন্যতম কবি। তাঁর "অবকাশ রঞ্জিনী" (১৮৭১) তাঁকে কবিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর লেখায় উল্লাস ও আত্মঘোষণা তাঁকে বায়রণের সঙ্গে তুলনীয় বলে সমালোচকেরা মনে করেছেন। ১৮৭৭ এ প্রকাশিত আখ্যানকাব্য "পলাশীর যুদ্ধ" নবীনচন্দ্রকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। দেশাত্মবোধক এই কাব্য ইতিহাসের পটভূমিতে অত্যন্ত বিশ্বাস্য ও জীবন্ত হয়েছিল। বাঙালির জাতীয়তাবোধ এই কাব্যে উদ্দীপিত হয়।

তবে "ত্রয়ী" কাব্যই নবীনচন্দ্রের গৌরব ও খ্যাতির নিদর্শন। "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" তিনখণ্ডে — 'ত্রয়ী' কাব্য প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৮৯৬ এ। তাঁর "আমার জীবন" গ্রন্থে কবি কাব্যগুলি রচনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল অখণ্ড ভারত রচনায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাষ্যে বলেন —

উনিশ শতকে মহাকাব্য রচনার উদ্দীপনার যুগে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) অন্যতম কবি। তাঁকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৭ খ্রি: দেশাত্মবোধক কাব্যরূপে বিশ্বাস্য ও জীবন্ত হয়েছিল। তাঁর 'ত্রয়ী' কাব্য 'রৈবতক' ১৮৮৬ খ্রি: 'কুরুক্ষেত্র' ১৮৯৩ খ্রি: ও 'প্রভাস' ১৮৯৬ খ্রি: গৌরব অর্জন করেছিলেন। 'ত্রয়ী' কাব্য ছাড়াও 'রঙ্গমতী', 'খৃষ্ট', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' ইত্যাদি আখ্যান ও জীবনীকাব্য তিনি রচনা করেছেন।

একধর্ম, এক খ্যাতি
একই সাম্রাজ্যনীতি,
সকলের এক ভিত্তি — সর্বভূতে হিত

এই তাঁর উদ্দেশ্য ও সাধনা। 'ত্রয়ী'কে 'উনিশ শতকের মহাভারত' আখ্যা দেওয়া হলেও নবীনচন্দ্র সেন মহাকবির সংযম, গাম্ভীর্য দেখাতে পারেননি। পরিকল্পনা বৃহৎ ও মহৎ হলেও, রূপায়ণে ত্রুটি ছিল। ভাবাবেগই এই দুর্বলতার হেতু। পারিবারিক জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি যত দক্ষ, মহাভারতীয় চরিত্রগুলির বিশালতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টিতে তেমন পারদর্শী নন। 'অমিত্রাক্ষর লক্ষণাক্রান্ত পয়ার' রচনায় তাঁর কৃতিত্ব কেউ কেউ প্রশংসা করেছেন। ''ত্রয়ী'' কাব্য ছাড়াও রঙ্গমতী, খৃষ্ট, অমিতাভ, অমৃতাভ ইত্যাদি আখ্যান ও জীবনীকাব্য রচনা করেছেন। যদিও মহাজীবনের মূর্তিগুলি 'বহ্নিময় হতে পারে নি, হয়েছে অঙ্গারম্লান' বলেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে,

'যুগের প্রভাবেই তিনি মহাকবি হবার দুঃসাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন গীতি-প্রতিভার অধিকারী।' (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)

প্রশ্ন :

১। 'পলাশীর যুদ্ধ' কার রচনা? কতসালে প্রকাশিত হয়েছিল?

২। নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ী' কাব্যের নাম লেখ।

২.৩.১০.৬ : বিহারীলাল ও অন্যান্য গীতিকবি

বলা বাহুল্য বাঙালি মানসেই ছিল এই গীতিকবিতার সুর। তাই মহাকাব্যের দামামা ধ্বনি অচিরেই স্তব্ধ হয়ে যায়। গীতিকাব্যের বীণা সপ্তস্বরা হয়ে ওঠে। বাংলা গীতিকবিতার আকাশে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ - '৯৪) 'ভোরের পাখি'। যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় — নব্য শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না — তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। (আধুনিক সাহিত্য)

গীতিকবিতা কবির আত্মভাষণ intense personal feelings - বিহারীলালের পূর্বে মধুসূদনের কিছু খণ্ড কবিতায় ও সনেটে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু 'নিজের মনের কথা' বিহারীলালের মতো নিষ্ঠাভরে আগে কেউ বলেন নি। যেজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাব্যগুরুরূপে বরণ করেছিলেন। বিহারীলালের কবিতায় পাওয়া গেল নিসর্গ ও মানবপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ রূপ; মানসীর বন্দনা; সৌন্দর্য পিপাসা; বিষাদ ও নিঃসঙ্গতার কাব্যরূপ - যা তৎকালীন বাংলাকাব্যে অভাবিত ছিল বলা যায়। এছাড়া বাংলা ছন্দের পয়ারপ্রথা ভেঙে মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের প্রচলন তিনি করেন। কাব্যভাষায় সাধুশব্দ বর্জন করে নিয়ে আসেন লৌকিক ও কথ্য শব্দ।

বাংলা গীতিকবিতার আকাশে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) হলেন 'ভোরের পাখি'। 'নিজের মনের কথা' বিহারীলালের মতো নিষ্ঠাভরে আগে কেউ বলেননি। যে জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কাব্য গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। নির্সগ ও মানবপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ রূপ; মানসীর বন্দনা, সৌন্দর্য-পিপাসা বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০); 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০) 'প্রেম প্রবাহিনী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), ও 'সাধের আসন' (১৮৮৮) কাব্যে প্রকাশিত। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবী সারদাকে নারী রূপে ও প্রিয়ারূপে কল্পনার দু:সাহস তিনিই প্রথম দেখান। এক রোমান্টিক কবির স্বপ্নচারিতা, সৌন্দর্য ও প্রেম অন্বেষণই বিহারীলালের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী কবির 'সারদামঙ্গল' পাঠে তৃপ্ত হয়ে কবিকে একটি পশমের আসন বুনে উপহার দেন। আকস্মিকভাবে কাদম্বরী দেবী মারা গেলে, কাব্যরসিকা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিহারীলাল 'সাধের আসন' রচনা করেন।

বিহারীলালের কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০), 'প্রেম প্রবাহিনী' (১৮৭০), 'বন্ধু বিয়োগ' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৮৮)। তাঁর কবিত্বের কিছু নিদর্শন দিই —

১। বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন। (বঙ্গসুন্দরী)

২। আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে অতি মনোহর
পরিয়াছে পাঁচরঙা সুন্দর অম্বর। (সঙ্গীতশতক)

৩। ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণনলিনী। (সারদামঙ্গল)

৪। কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানবমনের তুমি উদার সুষমা। (সাধের আসন)

"সারদামঙ্গল" কাব্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবী সারদাকে নারীরূপে ও প্রিয়ারূপে কল্পনার দুঃসাহস তিনিই প্রথম দেখান। এছাড়া সৌন্দর্যপ্রতিমারূপে, কবিপ্রিয়ারূপে তাঁর সারদা পরিকল্পনাও অভিনব। রবীন্দ্রনাথ সারদার মধ্যে শেলির 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতার ছায়া দেখেছেন। তাঁর 'চিত্রা' কাব্যের 'বিচিত্ররূপিণী' বা 'সোনার তরী' কাব্যের 'মানসসুন্দরী' তো এই সারদার প্রতিচ্ছায়া। এক রোমান্টিক কবির স্বপ্নচারিতা, সৌন্দর্য ও প্রেম অন্বেষণই বিহারীলালের লক্ষ্য। কিন্তু "সাধের আসন" কাব্যে মিস্টিসিজম্ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী কবির "সারদামঙ্গল" পাঠে তৃপ্ত হয়ে কবিকে একটি পশমের আসন বুনে উপহার দেন। জানতে চান —

হে যোগেন্দ্রর! যোগাসনে ঢুলুঢুলু দু'নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

কবি এর উত্তর তৎক্ষণাৎ দিতে পারেন নি। আকস্মিক ভাবে কাদম্বরী দেবী মারা গেলে শোকার্ত কবি এই কাব্যরসিকা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও প্রত্যুত্তর দিতে "সাধের আসন" রচনা করেন। যেখানে জানান, তাঁর

প্রশ্ন :

১। বিহারীলালকে কে ভোরের পাখি বলেছিলেন?

২। বিহারীলালের দুটি বিখ্যাত কাব্যের নাম কর।

৩। কার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, কবি 'সাধের আসন' রচনা করেন?

আরাধ্যাকে তিনিও ভালোভাবে বোঝেন না। শুধু জানেন — 'কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারি নে।' সৌন্দর্য ও রহস্যের মায়া জালে কবির সারদা আজও কাব্যরসিকের কাছে বিস্ময় ও কৌতূহল জাগায়। রোমান্টিক গীতিকবি রূপে তাঁর ভূমিকা আজও তাই স্মরণীয়।

উনিশ শতকে আরেকজন কবি প্রতিভাবান হলেও গৃহিণীপনার অভাবে আলোচিত হল না। ইনি হলেন রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মানুষটি আসলে কবি। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও গ্রন্থাদি পাওয়া যায়। তবে বাঙালি পাঠক তাঁকে "স্বপ্নপ্রয়াণ" (১৮৭৫) কাব্যের কবিরূপেই চেনেন। এও এক রোমান্টিক আখ্যানকাব্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'রূপকের রাজপ্রসাদ'। স্পেন্সারের, 'ফেয়ারি কুইন' ও দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র ছায়াও এই কাব্যে অনুভূত হয়। হিমালয় ও স্বর্গবর্ণনায় কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব দেখা যায়। মেঘদূত সহ অন্যান্য কবিতা অনুবাদেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে যেসব কবির আবির্ভাব ঘটে তাঁদের সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। এঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমুখ। আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথও উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি। কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিশ্ববোধ তাঁকে বিশ্বকবি করে তুলেছিল। যেজন্য তাঁর কাব্য ও কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবি করে।

বিহারীলালের ভাবশিষ্যরূপে আমরা কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর দুটি আখ্যানকাব্য সবিতা সুদর্শন (১৮৭০) ও ফুলরা (১৮৭০)। যদিও "মহিলা" (১৮৮০) কাব্যের জন্যই তিনি প্রতিষ্ঠা পান। এই কাব্যে কবি নারীর জননী-জায়া-ভগিনী-কন্যা চারটি রূপ কল্পনা করেছেন। প্রথম দুটি নারীমূর্তি নিয়ে লেখা হলেও, আকস্মিক মৃত্যুতে বাকি দুটি শেষ করতে পারেন নি। বিহারীলালের "বঙ্গ সুন্দরী" কাব্যের প্রভাব তাঁর "মহিলা" কাব্যে পাওয়া যায়। গৃহচারিণী নারীকে নিয়ে এমন কাব্য রচনার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্র-সমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। ইনিও বিহারীলালকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবিতার মূল সুর—প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭)। তবে পত্নীবিয়োগ ব্যথায় কাতর কবির 'এষা" (১৯১২) শোককাব্যটি-ই তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। বাংলা সাহিত্যে তিনিই যথার্থ এলিজি রচনা করেছেন। চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত এই কাব্যে (মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সান্ত্বনা) কবির মৃত্যুচেতনা ও আস্তিক্যচেতনা যেমন পাই, তেমনি পাই তাঁর প্রবল প্রেমের আবেগ। একদিকে তিনি বলেন, 'তুমি নাই, হয় না বিশ্বাস' অন্যদিকে জানান 'মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা।' জীবন ও জীবনাতীতের অনুভবে গাঁথা এই কাব্য। টেনিসনের In Memorium কাব্যের প্রভাব এষায় থাকলেও কবির স্বকীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

ঢাকার ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর স্বভাবকবিত্বের জন্য উনিশ শতকে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে ব্যক্ত প্রচণ্ড আবেগ প্রবণতাকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'একটি অভিনব আগন্তুক' বলে মনে করেছেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবিদের আগমনের বহু পূর্বে তাঁর কাব্যে দেহকল্পনার ও দেহবন্দনার অলজ্জিত বলিষ্ঠ ছবি পাওয়া যায়। তাঁর 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুমকুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য কাব্য। অকুণ্ঠিতভাবে তিনি বলেন —

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংসসহ।
আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ।

অভাব - দারিদ্র্যে জর্জরিত কবি শেষ বয়সে অভিমানে লিখেছিলেন —

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

রবীন্দ্রপ্রীতিভাজন 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন সৌন্দর্যরসিক, রোমান্সপ্রিয় কবি। জীবনের প্রথম পর্বে মধুসূদনের প্রভাবে লিখেছিলেন 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২), 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩) ইত্যাদি। পরে তাঁর নিজস্বতা প্রকাশ পায় 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২), 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২), ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দেবেন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন তন্ময় দৃষ্টি।" সম্ভবত তাঁর কবিপ্রকৃতির মূল সুর এটাই —

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।

তাঁর সনেটগুলিও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করে।

একালে নাট্যকাররূপে পরিচিত হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডি. এল. রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কবি ও হাসির গানের স্রষ্টারূপে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবিকে বাংলা কাব্যে পৌরুষ আনার জন্য অভিনন্দিত করেন। বলেন, ('মন্দ্র' কাব্য - প্রসঙ্গে)

ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে, ইহার হাস্য বিষাদ বিদ্রুপ বিস্ময় সমস্তই পুরুষের।

তাঁর রচিত কাব্যগুলি হলো— 'আর্য্যগাথা' (১৮৮২/১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) 'হাসির গান' (১৯০০), 'মন্দ্র' (১৯০২), 'আলেখ্য' (১৯০৭) ইত্যাদি। কবি অকালে পত্নীকে হারিয়ে শোকগ্রস্ত হন। নাবালক পুত্রকন্যাদের গভীর স্নেহে প্রতিপালন করেন। "আলেখ্য" কাব্যে কবির ব্যক্তিজীবন ও পরিবার জীবন চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। হাস্যরসাত্মক গানের ও কবিতার পাশে তাঁর দেশাত্মবোধক গান ও কবিতাগুলি আজও রসিক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

উনিশ শতকের কাব্য আলোচনায় মহিলা কবিদের ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তিনিই তাঁর "সংবাদ প্রভাকরে" অখ্যাত মহিলাকবির অনেক ছড়া, কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের উৎসাহ দিতে। এঁরা ছিলেন অক্ষম কবি। কিন্তু উনিশ শতকে বেশ কিছু প্রতিভাময়ী মহিলা কবি জন্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮ - ১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪ - ১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ - ১৯৩২), প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১ - ১৯৩৫)।

মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের চেষ্টায় তিনি ঘরে বসেই লেখাপড়া শেখেন। তাঁর কবিতার বিষয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন। স্বামীহারা নারীর যন্ত্রণা "অশ্রুকণা" (১৮৮৭)

কাব্যে পাই। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলি হলো — 'আভাস' (১৮৯০), 'শিক্ষা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২) ইত্যাদি। তাঁর কবিতার এই সুরই প্রধান — "দুঃখ সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গুনি।"

অন্যদিকে মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কবিত্ব শক্তি বিকশিত হয়েছিল। নারী জীবনযাপনের যন্ত্রণা, ব্যর্থতা তাঁরও কাব্যের মূল সুর। উনিশ শতকের মহিলাকবিদের মতোই বিষন্ন সুরে তিনি বলেন —

একা আমি, চিরদিন একা,
সে কেন দুদিন দিল দেখা?

মহিলাকবিদের মধ্যে কামিনী রায় বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। কবিত্ব ও শিল্পরীতিতে তাঁর কবিতাগুলি বেশ উন্নতমানের। সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা তাঁকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন। আধুনিক শিক্ষায় কবি শিক্ষিতা ছিলেন। পারিবারিক সাহায্যও পেয়েছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ তাঁর কাব্যের বিষয়। ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, কামিনী রায়-ই প্রথম কবি যিনি "মেয়েলি ধরনের ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে উদারতার কাব্যাঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন।" তাঁর লেখা মাল্যনির্মাল্য (১৯১৩), দীপধূপ (১৯২৯) উল্লেখযোগ্য। যদিও "আলো ছায়া" (১৮৮৯) কাব্য লিখেই তিনি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর 'গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি' কিংবা 'নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ / এধরা কি শুধু বিষাদময়" একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল।

উনিশ শতকের আরেকজন কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্য বিখ্যাত। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা সুদর্শন', 'ফুলরা' ও 'মহিলা কাব্য' প্রতিষ্ঠা পায়। অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতার মূল সুর প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য। উল্লেখযোগ্য কাব্য 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলী' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭) কিন্তু 'এষা' (১৯১২) শোককাব্যটি শ্রেষ্ঠকীর্তি। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুমকুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য কাব্য। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা', 'গোলাপগুচ্ছ' ইত্যাদি কাব্য স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি রাখে। উনিশ শতকের প্রতিভাময়ী মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যে ভারতী পত্রিকার সম্পাদকরূপে ও ঔপন্যাসিকরূপে পরিচিতা। তবে গান ও কবিতা রচয়িতা রূপেও কিছু খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর 'গাথা' ও 'বসন্ত উৎসব' কাব্যগ্রন্থের নাম এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তাঁর কবিতার দৃষ্টান্ত —

হাস একবার সখি সে মোহন হাসি!
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি। (হাস একবার)

সুলেখিকা প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা প্রিয়ংবদা দেবী বি.এ. পাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল মৃত্যু শোকে পূর্ণ। স্বামী ও পুত্র দুই হারান। ফলে তাঁর কবিতায় দুঃখ, বিষাদ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর "রেণু" (১৯০০) কাব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যেখানে তিনি লেখেন —

দিন পরে দিন যায়, মাস পরে মাস,
এ চিরজীবনে তাই আঁধার আকাশ।

তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলি হলো — তারা, পত্রলেখা, অংশু ইত্যাদি।

এঁরা ছাড়াও উনিশ শতকে স্বল্প প্রতিভাসম্পন্না বহু মহিলা কবি এসেছিলেন, যাঁদের আলোচনা এখানে করা সম্ভব হলো না। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম — কুসুমকুমারী দাশ, পঙ্কজিনী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী ধর, মৃণালিনী সেন, লজ্জাবতী বসু, হিরন্ময়ী দেবী, সরলাবালা সরকার, সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রমুখ।

উনিশ শতকের ব্যাপ্ত কাব্য সাহিত্যের পটভূমিতে এইসব গৌণ কবিরাও একটি মাত্রা যোগ করেছিলেন। এঁদের সকলের সমবেত কাব্য প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যভুবন দৈগন্তিক মহত্ত্ব পেয়েছিল।

প্রশ্ন :

১। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কে রচনা করেছিলেন?
২। 'মহিলাকাব্য' কার রচনা?
৩। 'এষা' কি বিষয়ক কাব্য, কত সালে, কে রচনা করেন?
৪। উনিশ শতকের চারজন মহিলা কবির নাম উল্লেখ কর।

২.৩.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী — আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়
২. গোপাল হালদার — বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা
৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত — আধুনিক কবিতার ইতিহাস
৪. ড. অশোককুমার মিশ্র — আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা

২.৩.১০.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. শ্রী মধুসূদন পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।
২. বাংলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে যা জান লেখো।
৩. 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে আলোচনা করো।
৪. আখ্যানকাব্য রচনায় রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ভূমিকা আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১১

বিংশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.৪.১১.১ : ভূমিকা

২.৪.১১.২ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

২.৪.১১.৩ : অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

২.৪.১১.৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

২.৪.১১.৫ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

২.৪.১১.৬ : মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)

২.৪.১১.৭ : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য (১৯০৭-১৯৮৬)

২.৪.১১.৮ : জলধর চট্টোপাধ্যায়

২.৪.১১.৯ : গণনাট্য

২.৪.১১.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৪.১১.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১১.১ : ভূমিকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে উনিশ শতকীয় সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল তার উত্তরাধিকার বিশ শতকের নাট্যসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ উনিশ-বিশ শতকের যোগসূত্র রচনা করেছেন। এই ধারার পরিণতি গণনাট্যের পূর্ব পর্যন্ত। তার পরে আর এক যুগ।

২.৪.১১.২ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ - ১৯১১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় যে নাট্যআন্দোলন ও নাট্যাভিনয় আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অজস্র নাটকের পরিচালক, রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার, নট-নটীদের অভিনয় শিক্ষক এবং নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র সমকালে বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বাংলা উপন্যাস ও আখ্যানকাব্যের নাট্যরূপ দেন। পূর্ণাঙ্গ নাটক

ও বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র নাটক মিলিয়ে প্রায় আটানব্বইটি বই তিনি লিখেছিলেন। ধর্মপ্রবণ বাংলাদেশে বাঙালির হৃদয় জয় করতে হলে পৌরাণিক নাটক লেখা দরকার তা গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, সেজন্য তিনি অজস্র পুরাণাশ্রিত নাটক লেখেন। এছাড়া ঐতিহাসিক নাটকেও তিনি তার স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন।

গিরিশচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ নাটক ও বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র নাটক মিলিয়ে প্রায় আটানব্বইটি বই তিনি লিখেছিলেন। ধর্মপ্রবণ বাংলাদেশে বাঙালির হৃদয় জয় করার জন্য পৌরাণিক নাটক যেমন লিখেছিলেন তেমনি ঐতিহাসিক নাটকেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) ও 'জনা' (১৮৯৩) প্রধান। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা ধর্মমূলক নাটক-চৈতন্যলীলা (১৮৮৪), রূপসনাতন (১৮৮৭), বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮), করমেতিবাঈ (১৮৯৪), শঙ্করাচার্য (১৮৯০) উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), সৎনাম (১৯০৪) বিখ্যাত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে, কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। তার মধ্যে 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো 'সীতার বনবাস' (১৮৮১) 'সীতার বিবাহ' (১৮৮২), "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), 'নলদময়ন্তী' (১৮৮৩), 'কমলেকামিনী' (১৮৮৪), 'জনা' (১৮৯৩), 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০)।

ঐতিহাসিক ও আধা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা ধর্মমূলক নাটকগুলিকেও পৌরাণিক শ্রেণিভুক্ত করা চলে। যেমন 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'রূপসনাতন' (১৮৮৭), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮), 'করমেতিবাঈ' (১৮৯৪), 'শঙ্করাচার্য' (১৮৯০)।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'পাণ্ডব গৌরব' এবং 'জনা' ই প্রধান। 'পাণ্ডব গৌরবে' আশ্রিত পালনের কর্তব্যে পাণ্ডবেরা ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হয়েও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। রাজা দণ্ডী ইন্দ্রের কোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাণ্ডবদের স্মরণ নেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপক্ষ গ্রহণ করেন। দুর্যোধনাদি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দেন। এই নাটকে ভীমকে নায়করূপে বরণ করা হয়েছে। চিরশত্রু দুর্যোধনের সহায়তা নিতে তাঁর যেমন চরম আত্মগ্লানি, তেমনি পরমবন্ধু এবং আশ্রয়স্থল কৃষ্ণের বিরুদ্ধতা করতে তাঁর মর্মদীর্ণ ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। 'জনা' নাটকে নীলধ্বজের পত্নী জনা মহাবীর প্রবীরের মাতা। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া সে আটকায়। মাতার আদেশে প্রবীর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয়। জনা পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণ তা ব্যর্থ করে দিলে পাগলিনী জনা গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই নাটকে কৃষ্ণভক্তির সুরটিকে বড় করে তুলেছেন গিরিশচন্দ্র। জনা চরিত্রের অতিনাটকীয়তা এবং অর্থহীন উচ্ছ্বাস-আধিক্য তার স্বাভাবিক মানবত্ব বিনষ্ট করেছে।

গিরিশচন্দ্র রচিত ঐতিহাসিক নাটকরূপে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'অশোক' (১৯০৪) উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এই নাটকগুলিতে স্বাদেশিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে তৎকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। তাঁর রচিত বিখ্যাত সামাজিক নাটকগুলি হল 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫)। এই নাটকগুলির মধ্যে 'প্রফুল্ল' শ্রেষ্ঠ নাটক। যোগেশ নিজের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় তার পরিবার গড়ে

তুলেছিল। রমেশের অমানুষিক লোভ ও ষড়যন্ত্রে পরিবারের সম্পদ ও প্রীতি সবই নষ্ট হয়। তৎকালীন নীচুতলার কলকাতার মানুষের চরিত্র খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ফুটেছে এই নাটকে।

প্রশ্ন :

১। গিরিশচন্দ্রের দুটি পৌরাণিক নাটকের নাম কর?

২। দুটি ঐতিহাসিক নাটকের প্রকাশকাল সহ নাম উল্লেখ কর?

৩। 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রকাশ কাল কত? দুটি চরিত্রের নাম কর?

৪। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি কোন শ্রেণির নাটক। দুটি চরিত্রের নাম কর?

২.৪.১১.৩ : অমৃতলাল বসু (১৮৫৩ - ১৯২৯)

অমৃতলাল বসু অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক হিসাবে দীর্ঘকাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাটকীয় প্রতিভা ছিল প্রহসনকারের। তিনি 'খাসদখল' (১৯১২), 'নবযৌবন' নামে দুটি পূর্ণাঙ্গ কমেডি নাটক লিখেছিলেন। অমৃতলালের অতিরঞ্জন বাস্তবতা স্বাভাবিকতাকে সমূলে অস্বীকার করেছে। কোথাও কোথাও এই অতিরঞ্জন উদ্ভটের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। অমৃতলালের অতিরঞ্জন ও উদ্ভটত্ব উভয়ের মূলে তীক্ষ্ণ সমাজ ব্যঙ্গ সক্রিয়।

অমৃতলালের 'বাবু' (১৮৯৩), 'বৌমা', 'বিবাহবিভ্রাট' (১৮৪৪), 'একাকার' (১৮৯৪), প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গাত্মক ধিক্কার লাভ করেছে। 'চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে', (১৮৮৪) কিংবা 'তিলতর্পণকে' সফল প্রহসন বলা যেতে পারে। 'চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে' তে ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির কৌশল হাস্যরসের কারণ হয়েছে। 'তিলতর্পণ' আজগুবি কল্পনার সংযোগে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। অমৃতলাল রচিত 'ব্যাপিকা বিদায়' একটি উচ্চমানের প্রহসন। অপরের ঢঙ, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপের ব্যবহার, গাঢ়বদ্ধ গল্প এবং মধুর রোমান্টিকতা এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

২.৪.১১.৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ সামান্য হলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যকে তিনি জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় কিনা বাংলার মঞ্চাভিনয়ের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু আসলে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের একটি থিয়েটারের সৃষ্টি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নাটককে উচ্চসাহিত্যকর্মে উন্নীত করেছেন এবং নবীন ইউরোপীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে বাংলা নাটকের সামীপ্য বিধান করেছেন। অপরিণত কৈশোরের রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীতিনাট্য ও কাব্য নাট্য রচনা করেন। 'রুদ্রচন্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা, (১৮৮১-১৮৮৪) সালের মধ্যে প্রকাশিত। 'বাল্মীকি প্রতিভায়' দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতের সম্মিলন চেষ্টা লক্ষ করা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ' 'মালিনী' কাব্য নাট্য উভয় গুণেই সমৃদ্ধ। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তি সংবাদ'-এ রবীন্দ্রনাথ মহাভারতীয় কাহিনির অনুসরণ করেছেন প্রাচীন বীর্যদৃঢ় মনুষ্যমহিমার দিক থেকে। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধনের চরিত্রে

পাপের বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য চিত্রিত হয়েছে। 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' নিয়তি লাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের হাহাকার নিখিলকে ভেদ করেছে। 'নরকবাসের' নাট্যবলয়েও দেখা দিয়েছে অভিনবত্ব। 'মালিনী'তে পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্যের রীতি লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ সালে 'রাজা ও রাণী' এবং ১৮৯০ সালে 'বিসর্জন' নামে দুটি নাটক রচনা করেন। 'রাজা ও রাণী'তে প্রেম ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে। রাজা বিক্রমদেব রাজকর্তব্য ভুলে রাণী সুমিত্রার প্রণয়ে ডুবে থাকতে চান। কিন্তু নিজেকে লোকমাতা মনে করা রাণী সুমিত্রা রাজাকে স্ববোধে জাগ্রত করার চেষ্টা করছেন। সুমিত্রা পিতৃদেশে পালিয়ে যান রাজা বিক্রমদেব আত্মবোধে জেগে না উঠে, হয়ে ওঠেন হিংস্র। সুমিত্রাকে প্রাণ দিয়ে তা নিভাতে হয়। সুমিত্রার প্রাণদানেই রাজার চেতনা ফিরে আসে।

'বিসর্জন' নাটকের কাহিনি আবর্তির্ত হয়েছে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ রাজশক্তি ও পুরোহিত শক্তির দ্বন্দ্বকে নিয়ে। মানুষের প্রতাপ বড় না প্রেম বড় এই ভাবনা নাটকে আছে। রঘুপতির হৃদয় পরিবর্তনে আসলে গোবিন্দমাণিক্যেরই জয়। রঘুপতি ও জয়সিংহের চরিত্র সুঅঙ্কিত। জয়সিংহের অর্ন্তদ্বন্দ্ব, আত্ম অবক্ষয় এবং তারই পরিণতিতে আত্মহনন ট্র্যাজিক তীব্রতা নিয়ে এসেছে।

প্রতাপাদিত্যের কাহিনি নিয়ে রচিত নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে ভিন্ন সুরের চর্চা করেছে। 'তপতী' (১৯২৯) 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত সংস্করণ হলেও নূতন নাটক হয়েছে। 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর হিসাবে রচিত হয়েছে। ১৯৩৩ সালে রচিত 'বাঁশরি' সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও সমস্যার আধুনিকতার জন্য উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিতে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিবিধ দুর্বলতা এবং ঘটনা অপেক্ষা ভাষার ঈষৎ বক্রতা হাস্যরসের কারণ হয়েছে। 'গোড়ায় গলদের' মার্জিতরূপ হিসাবে রচিত হয়েছে 'শেষরক্ষা' (১৮২৮) 'বৈকুন্ঠের খাতা' (১৮৯২) এবং 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) ও 'পূর্ণাঙ্গ রঙ্গনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যসাহিত্যকে জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা' (১৮৮১-১৮৮৪) সালের মধ্যে প্রকাশিত। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী' উল্লেখযোগ্য নাটক। 'গান্ধারীর আবেদন' ও কর্ণকুন্তীসংবাদ'—এ রবীন্দ্রনাথ মহাভারতীয় কাহিনির অনুসরণ করেছেন। 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) তে প্রেম ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। মানুষের প্রতাপ বড় না প্রেম বড় এই ভাবনা 'বিসর্জন' নাটকে আছে। প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), তপতী (১৯২৯) পরিত্রাণ (১৯২৯) উল্লেখযোগ্য নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা' প্রহসনটিতে ব্যক্তিগত চরিত্রের নানা দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। 'শেষরক্ষা' (১৯২৮), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) বিখ্যাত নাটক। রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকের মধ্যে 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬) সমাদৃত হয়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকে যন্ত্রযুগের মানবসভ্যতায় প্রভুতশক্তি ও চিত্তদীর্ণ সঙ্কট হাহাকার করে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', চণ্ডালিকা, নৃত্যনাটক লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে একটি অভিনব নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন। 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০) (রাজার পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' ১৯২০), 'অচলায়তন' (১৯১২) (পরিবর্তিত রূপ 'গুরু' ১৯১৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসে র দেশ' (১৯৩৩), প্রভৃতি নাটক রূপক সাংকেতিক নাটক হিসাবে স্বতন্ত্র নাটকরূপে সমাদৃত।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনার রূপাকাঙ্ক্ষা থেকে রূপাতীতের চেতনায় উত্তরণের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এ নাটকের গূঢ় অর্থ হল জীবাত্মার পরমাত্মা-সন্ধান, যে সন্ধানের অপর নাম জীবন সাধনা।

'ডাকঘরে' - গৃহবন্দী রোগার্ত বালক অমলের প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যে মুক্তির সুতীব্র কামনার মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন মুক্তির আকুতি।

'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতির সৃষ্ট মন্ত্র প্রকৃতির সদামুক্তি প্রাণনির্ঝরকে বেধেছে। যন্ত্রকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মানবপ্রাণকে যে লাঞ্ছনা করেছে, নাটকে তার অবসান চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'রক্তকরবী' নাটকে যন্ত্রযুগের মানবসভ্যতায় প্রভূতশক্তি এবং চিত্তদীর্ণ সঙ্কট হাহাকার করে উঠেছে। নন্দিনীর চরিত্রে প্রাণের ধর্ম তরঙ্গিত। রঞ্জন চরিত্রে যৌবনের তত্ত্ব ও তার উল্লসিত ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। রাজা সর্বদা জালের আড়ালে বন্দী। প্রাণের ও সৌন্দর্যের কাছে যন্ত্রের নতিস্বীকারে এই নাটকের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে অর্থাৎ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য লিখেছেন।

প্রশ্ন :

১। দুটি গীতিনাট্যের নাম লেখ?
২। 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকের প্রকাশ কাল কত?
৩। রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রহসনের নাম কর?
৪। দুটি রূপক সাংকেতিক নাটকের নাম লেখ?
৫। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রকাশকাল কত? দুটি চরিত্রের নাম কর?

২.৪.১১.৫ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সেদেশের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং কবিত্বের অধিকার নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের নাট্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখেছিলেন। এই গানের সূত্র ধরেই তিনি নাটকের জগতে প্রবেশ করেন।

'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'এ্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১৯), প্রভৃতি প্রহসন রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক কুসংস্কারের জন্য সমাজব্যঙ্গ তাঁর প্রহসনের বিষয় হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাব নিয়ে আসতে চেয়েছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮), 'ভীষ্ম' (১৯১৪) প্রভৃতি নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারে' (১৯১২) 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামে দুটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্যে ও নাটকীয় উৎকর্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঐতিহাসিক নাটকগুলি। 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকের চাণক্যের চরিত্র তাঁর অমর সৃষ্টি। মুঘল ও রাজপুত

যুগের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। 'তারাবাঈ' (১৯০৩) 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'মেবারপতন' (১৯০৮) প্রভৃতি নাটকে তিনি রাজপুত ইতিহাসের কাহিনি বিবৃত করেছেন।

মুঘল জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর 'নূরজাহান' (১৯০৮) নাটকে। 'সাবিত্রী', 'মন্দাকিনী', 'ভীষ্ম' 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট পৌরাণিক নাটক দুটি হল 'ভীষ্ম' এবং 'নরনারায়ণ'। 'ভীষ্ম'-এর মধ্যে দূরাগত স্বপ্নের মতো বাস্তব জীবনতৃষ্ণার সন্ধান তিনি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কাহিনিতে নাট্য সংহতি বিধান করতে পারেননি। 'নরনারায়ণ' নাটকে কর্ণের দৈবলাঞ্ছিত পৌরুষের চিত্র তিনি অঙ্কিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কাহিনিতে নাট্যসংহতি বিধান করতে পারেননি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'বাঙালার মসনদ' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'বঙ্গের রাঠোর', 'আলমগীর' (১৯২১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গান রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রভৃতি প্রহসন রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮), 'ভীষ্ম' (১৯১৪) বিখ্যাত হয়ে আছে। 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' দুটি সামাজিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পদ্মিনী' 'চাঁদবিবি', 'বাঙালার মসনদ', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'আলমগীর' (১৯২১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন :

১। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি পৌরাণিক নাটকের নাম লেখ। প্রকাশকাল কত?
২। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি ঐতিহাসিক নাটকের প্রকাশকাল সহ নাম উল্লেখ কর?
৩। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম উল্লেখ কর?

২.৪.১১.৬ : মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)

একালের বাংলা নাটকে মন্মথ রায় সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখকদের অন্যতম। তাঁর রচিত নাটকগুলি হল — 'কারাগার' (১৯৩০), 'মুক্তির ডাক' (১৯২৪), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'শ্রীবৎস' (১৯২৯), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'একাঙ্কিকা' (১৯৩১), 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি। ২০০টির উপর একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন তিনি। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির বিশেষত্ব হল ভক্তিরসের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। মূলচরিত্রগুলি একান্ত মানবিক, তারা প্রায়ই জটিল এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের পাত্র। এমনকি পুরাণ কাহিনিতে তিনি এনেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বদেশপ্রেমের মেজাজ।

২.৪.১১.৭ : বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬)

বিধায়ক ভট্টাচার্য পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিগত চরিত্রদোষে সংসারের বিপর্যয়, নায়ক নায়িকার জীবন সমস্যা, কখনও বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা নিয়েও নাটক লিখেছেন। তাঁর রচিত প্রধান নাটকগুলি হল - 'মেঘমুক্তি'

(১৯৩৮), 'মাটির ঘর' (১৯৩৯), 'বিশ বছর আগে' 'নটীবিনোদিনী' 'এন্টানি করিয়াল', 'সেতু' 'লগ্ন', 'উজানযাত্রা' প্রভৃতি। তাঁর সংলাপের ভাষামাধুর্য ও নাট্য চমৎকারিত্ব প্রশংসনীয়।

২.৪.১১.৮ : জলধর চট্টোপাধ্যায়

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি নাটক দর্শকদের অসামান্য প্রশংসা ও সমাদর অর্জন করলেও তাঁর নাটকের মধ্যে কোন লক্ষণীয় উৎকর্ষ দেখা যায় না। দুই একটি অভিনব ভূমিকার জন্যই দুটি বিখ্যাত নাটক 'রীতিমত নাটক' ও 'পি.ডব্লিউ.ডি.'। দুটি নাটকেই তাঁর সরল ব্যঙ্গ পরিহাস দর্শকদের হৃদয় আমোদিত করে রাখে। অতিসাধারণ স্তরের নাটক অভিনয় দক্ষতায় কী রকম অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে 'পি.ডব্লিউ.ডি.' তাঁর উদাহরণ।

২.৪.১১.৯ : গণনাট্য

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের যাঁরা বড় লেখক তাঁরা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তাই গ্রুপ থিয়েটারের বিশেষ ভূমিকা আছে। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সংস্থা হলেও অনেক লেখক ও বুদ্ধিজীবী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের চেষ্টায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কলকাতা শাখা ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক মঞ্চস্থ করেন। দীর্ঘকাল গণনাট্য তার রাজনৈতিক এবং থিয়েটারী আদর্শ নিয়ে চলতে থাকে।

গণনাট্য কাররা বামপন্থায় বিশ্বাসী ঠিকই, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকতে চান না। গণনাট্য ছিল একটা আন্দোলন-রাজনৈতিক তথা নাট্যিক। বিশিষ্ট গণনাট্যকারদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন প্রমুখ বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার ও সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' উল্লেখযোগ্য নাটক।

কিছুকালের মধ্যে এই সংস্থা থেকে গুণী শিল্পীরা বেরিয়ে এসে নতুন গ্রুপ বা নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করতে থাকে। এরা অনেকেই বামপন্থায় বিশ্বাসী, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকতে চান না। বামপন্থী নয় এমন নাট্যকর্মীদের দলও গড়ে উঠতে থাকে। অনেকে একে নবনাট্য আন্দোলন নাম দিতে চান। নামটা বহুল প্রচারিত, কিন্তু তাৎপর্যহীন, গণনাট্য ছিল একটা আন্দোলন - রাজনৈতিক তথা নাট্যিক।

বিশিষ্ট গণনাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজন ভট্টাচার্য (জবানবন্দী, নবান্ন, দেবীগর্জন), তুলসী লাহিড়ী (ছেঁড়া তার, পথিক), দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় - (বাস্তুভিটা), বীরু চট্টোপাধ্যায়ের - সংক্রান্তি, সলিল সেনের, নতুন ইহুদী প্রভৃতি।

প্রশ্ন :

১। গণনাট্য কাররা কোন পন্থায় বিশ্বাসী?
২। দু'জন গণনাট্যকারের নাম লেখ?
৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি কতসালে মঞ্চ স্থ করা হয়?

২.৪.১১.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য
২. বাংলা নাটকের কথা — অজিতকুমার ঘোষ

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন
৪. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত
৫. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৪.১১.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. অমৃতলাল বসুর নাট্য কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য, সৃজন প্রতিভা ও কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৪. ঐতিহাসিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিচয় দাও।

৫. রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখো।

৬. গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. নবনাট্য আন্দোলন কাকে বলে? নবনাট্য আন্দোলনের প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলা রাজনৈতিক নাটকের পরিচয় দাও।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১২

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কাব্যসাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.৪.১২.১ : কাব্য-কবিতা : বিংশ শতাব্দী

২.৪.১২.২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.৪.১২.২.১ : স্বদেশ পর্ব

২.৪.১২.২.২ : আধ্যাত্মিক পর্ব

২.৪.১২.২.৩ : বলাকা পর্ব

২.৪.১২.২.৪ : প্রেম ও স্মৃতিচারণ পর্ব

২.৪.১২.২.৫ : অন্তিম পর্ব

২.৪.১২.৩ : রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

২.৪.১২.৩.১ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

২.৪.১২.৩.২ : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)

২.৪.১২.৩.৩ : যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

২.৪.১২.৩.৪ : কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)

২.৪.১২.৩.৫ : কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)

২.৪.১২.৪ : রবীন্দ্রযুগে স্বকীয় চিন্তার কবি

২.৪.১২.৪.১ : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

২.৪.১২.৪.২ : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

২.৪.১২.৪.৩ : মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

২.৪.১২.৪.৪ : নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

২.৪.১২.৫ : রবীন্দ্রোত্তর কবিতা

২.৪.১২.৫.১ : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

২.৪.১২.৫.২ : অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

২.৪.১২.৫.৩ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)
২.৪.১২.৫.৪ : প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)
২.৪.১২.৫.৫ : অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯)
২.৪.১২.৫.৬ : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)
২.৪.১২.৫.৭ : বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)
২.৪.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
২.৪.১২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১২.১ : কাব্য-কবিতা : বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ভারতের প্রাক্ স্বাধীনতা কালসীমা পর্যন্ত কাব্যকবিতার ইতিহাসকে রবীন্দ্রযুগের কবিতা বলাই ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর কাব্যপ্রতিভা এই সময়েই কাব্যকবিতায় সোনার ফসল ফলিয়েছেন এবং ১৯১৩ সালেই তিনি এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ অবশ্য অনেক আগেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর নিজস্বতা কিছু কিছু দেখা যেতে থাকে। এরপর 'প্রভাত সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থের পর 'মানসী'তেই কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিয়েছে এরকম বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ নিজের কাব্যসাধনা এই প্রথম পরিণত হল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এর পরে শিলাইদহে জমিদারি কাজকর্ম দেখার জন্য যখন ছিলেন তখন একদিকে যেমন নিয়মিত ছোটগল্প লিখেছেন, অন্যদিকে সৌন্দর্যের জগতে নিমগ্ন থেকে একে একে লিখেছেন 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) এবং 'চৈতালি' (১৮৯৬)। এরপর রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য-অনুধ্যানের পরিবর্তে মানসিকতায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, বিশ শতকের রবীন্দ্রকাব্য চর্চায় সেটাই হবে আমাদের আলোচ্য এবং সেই মানসিকতার বিবর্তন শেষ পর্যন্ত কীভাবে হয়েছিল তাও আমাদের দেখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সম্মান-প্রাপ্তির কথা মনে রেখেও আমরা বলতে পারি, শতাব্দীর প্রথমার্ধকে কেবলমাত্র রবীন্দ্রযুগ বলে অভিহিত করা সঠিক হবে না। কারণ রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগেই কিছু কবির স্বকীয় চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে এবং তারপর সুস্পষ্টভাবেই একটি রবীন্দ্রোত্তর কবিতার ধারা উদ্ভূত হয়েছে যেটি এখনও আধুনিক কবিতার ধারা নামে পরিচিত। এই কাব্য আন্দোলনের সাহিত্যিক কারণ তো ছিলই, কিন্তু এর জন্য রাজনৈতিক কিছু কার্যকলাপ, এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধও অনেক পরিমাণে দায়ী। সেইজন্য বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক পটভূমিটি আমাদের সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার।

১৯০৫ সালে বাংলাকে শেষপর্যন্ত দুভাগে বিভক্ত করেন লর্ড কার্জন, কিন্তু এই ধরনের কিছু করে হিন্দু মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার পরিকল্পনা তাঁর অনেকদিনের। লক্ষ্য করা দরকার, এই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল সেরকম আন্দোলন সাহিত্যে অন্তত কমই দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বচেতনাসম্পন্ন এবং ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল মানুষও স্বদেশী সমাজ গড়েছেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব

দিয়েছেন এবং যে কটি স্বদেশগীতি তিনি লিখেছেন সেগুলি প্রায় সবই লিখেছেন এই সময়। রাজনৈতিক আন্দোলনও কম হয়নি। একদিকে যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুটি শিবির পৃথক হয়ে গেল, অন্যদিকে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগেই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের কাছে উল্লেখিত হয়েছিল এবং তা হল প্রায় তুচ্ছ বলে গণ্য জাপানের কাছে দুধর্ষ শক্তিধর দেশ রাশিয়ার পরাজয়। আমাদের পক্ষে ইংরেজকে হারানো যে একেবারে অসম্ভব নয় অন্তত এই প্রেরণা আমরা এ থেকে পেয়েছি। তাও অবশ্য ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে মৌখিক আশ্বাসে আমরা ইংরেজকেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। কিন্তু সে আশ্বাস নির্মমভাবে পদদলিত করেছে ইংরেজ, পরাধীনতা আমাদের ওপর ভালো করে চাপিয়ে দেওয়া এবং আন্দোলনের সব রকম অধিকার কেড়ে নেবার জন্য প্রবর্তিত হল রাওলাট অ্যাক্ট। এর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে গেলে ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্বিচার গণহত্যা। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' পদবী ত্যাগ করেছেন, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইংরেজ সরকার কিছুটা নতি স্বীকার যে করেছিল, তার প্রমাণ ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হল না, বরং পৃথক ভাবে নিজেদের দেশ পাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন অনেক মুসলমান। ফলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আরো খারাপ হয়ে গেল। খিলাফত আন্দোলন সেই সম্পর্ক অত্যন্ত সাময়িকভাবে ভালো করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের পৃথকীকরণ আটকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সর্বনাশ আটকাতে পারত কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দল, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কায় তারাও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। যে জন্য বাংলা ও পঞ্জাব বুঝেছিল বলেই এ দুটি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারল না, কিন্তু অন্য সর্বত্রই ১৯৩৬-৩৭ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৮ সালে। পরাধীন ভারতবর্ষকে নিরুপায় হয়েই যুদ্ধে যোগ দিতে হল। ফলে এক ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এল ভারতবর্ষের ওপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সাহিত্যে তেমন পড়েনি, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাসের জগৎ এবং সাহিত্য মানসিকতাকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটল। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯৪২ সালে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করল, ইংরেজের দমন নীতি মাত্রাহীন হয়ে উঠল। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আক্রমণ করে ভারতকে স্বাধীন করার প্রয়াস। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী আপস আলোচনায় বসলেন মুসলিম লীগের কর্ণধার মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে। ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দু টুকরো হয়ে গেল - মুসলিম ভারত বা পাকিস্তান এবং অ-মুসলিম ভারত বা আমাদের ভারতবর্ষ। এই বছরের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা এল বটে কিন্তু এক অপূরণীয় ক্ষতি এবং চিরকালীন কলঙ্করেখা স্বীকার করে নিতে হল আমাদের। এর প্রতিক্রিয়াতেই পরের বছর আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন মহাত্মা গান্ধী। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় কাব্যসাহিত্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

২.৪.১২.২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের সূচনা, পরিণত শক্তির রচনা এবং সৌন্দর্য উপভোগ-মূলক কবিতা যে উনিশ শতকেই লেখা হয়ে গিয়েছে, সে কথা আমরা বলেছি, এর পরবর্তী যে স্তরগুলি বিশ শতকে আমরা পাই, সেগুলিই একে একে জানানো হবে এবার।

২.৪.১২.২.১ : স্বদেশ পর্ব

প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমা এবং তার ঐতিহ্য যে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, বিশশতকের একেবারে প্রথম দিককার কাব্যগুলি থেকেই সে কথা আমরা বুঝতে পারি। ত্যাগের ও ক্ষমার যে মহৎ আদর্শ ভারতবর্ষ শিক্ষা দিয়েছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তার কাহিনি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ দুটি কাব্য রচনা করেন - 'কথা' এবং 'কাহিনি'; দুটিরই প্রকাশকাল ১৯০০ সাল। পরে অবশ্য এই দুটি কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনি' নামে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এখানে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ পুরাণ, বৈষ্ণব জীবনী, মারাঠা ইতিহাস প্রভৃতি অনেক উৎস থেকেই কাহিনি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতাই আখ্যানধর্মী। এর মধ্যে কিছু কবিতা আবার সংলাপের রীতিতে রচিত যেগুলিকে পরে নাম দেওয়া হয়েছে নাট্যকাব্য, যেমন 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ', লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রভৃতি। একই বছর প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আরো দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ক্ষণিকা' এবং 'কল্পনা'।

> *'কথাকাহিনি'র প্রকাশ কাল ১৯০০ সাল। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বৌদ্ধপুরাণ', 'বৈষ্ণবজীবনী' প্রভৃতি থেকে কাহিনি সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের উন্নত আদর্শের জয়গান এবং ইংরেজের অমানবিক আচরণের নিন্দা প্রকাশিত হতে দেখি 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থে। স্ত্রীর মৃত্যুতে অভিনব স্বাদের কিছু স্মৃতির সংকলন 'স্মরণ' (১৯০৩) কাব্যগ্রন্থ এবং শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে অসাধারণ কবিতা সম্বলিত কাব্য 'শিশু' (১৯০৬)। এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমমূলক গান।*

একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষে উন্নত আদর্শের জয়গান এবং ইংরেজের অমানবিক আচরণের নিন্দা আমরা প্রকাশিত হতে দেখি 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থে। কোনো কবিতারই পৃথক নামকরণ নেই, প্রত্যেকটিই সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ যে কবির অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা বুঝতে পারি এই রকম কবিতায়—

> 'হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
> বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
> দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
> তাহার ঐশ্বর্য যত।' (৯৫)

এই সময়ে কবির অন্যান্য যে কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি হল, স্ত্রীর মৃত্যুতে অভিনব স্বাদের কিছু স্মৃতির সংকলন, 'স্মরণ' (১৯০৩) এবং শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু অসাধারণ কবিতা সম্বলিত কাব্য 'শিশু' (১৯০৬)। এই পর্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমমূলক গান। ১৯০৪ সালের শেষের দিক থেকে ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পঁচিশটি গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন যার বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়। অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' ও অন্যান্য পত্রিকাতেও কিছু প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গানগুলি - 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'বাংলার

মাটি, বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি', 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' ইত্যাদি এই সময়েই লেখা। 'গীতবিতান' গ্রন্থে 'স্বদেশ' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মোট গানের সংখ্যা ছেচল্লিশ, এ কথা যদি মনে রাখি তাহলে এই সামান্য সময়ে তার অর্ধেকেরও বেশি গান লেখাকে গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে।

প্রশ্ন :

১। রবীন্দ্রনাথের 'কথাকাহিনি'র প্রকাশকাল কত ?

২। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ কবে প্রকাশিত হয় ?

৩। রবীন্দ্রনাথের শিশু মনস্তত্ব বিষয়ক কাব্যটির নাম কি ?

২.৪.১২.২.২ : আধ্যাত্মিক পর্ব

বঙ্গভঙ্গের অগ্নিগর্ভ সময়ে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছেন, নিজে স্বদেশী সমাজ গঠন করেছেন, দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন, কিন্তু অচিরেই নিজেকে তিনি সরিয়ে নিলেন। সম্ভবত রাজনৈতিক মতাদর্শের জটিলতা এবং সে ব্যাপারে কিছু মতভেদই তাঁকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ করে তুলেছিল। কবির আধ্যাত্মিক প্রবণতা লক্ষণীয় ভাবে দেখা গেল, 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থে। এই প্রবণতারই পুষ্পিত পরিণতি দেখা যায় 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) এবং 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে। এগুলির প্রায় সবই গান এবং পরে 'গীতবিতান' গ্রন্থে এই গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবেই বলা যায় এই গানগুলি রবীন্দ্রসংগীত নামেই পরিচিত আপামর বাঙালি এবং অন্যান্য মানুষের কাছে। এগুলি আমাদের পরম সম্পদ। মানুষের সুখে-দুখে, আনন্দে বেদনায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে এই গানগুলি আমাদের নিত্য সঙ্গী। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেক কিছুরই শাশ্বত মূল্য আছে, কিন্তু এই গানগুলির মধ্যেই অমরত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, এমন কথা অনেকেই মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থে। 'গীতাঞ্জলি'(১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) এবং 'গীতালি' প্রায় সবই গান এবং পরে 'গীতবিতান' গ্রন্থে এই গানগুলি সংকলিত হয়েছে। মানুষের সুখে-দুখে, আনন্দে বেদনায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে এই গানগুলি আমাদের নিত্য সঙ্গী। 'গীতাঞ্জলী' গানগুলি মূলে কবিতাই ছিল, তবে মাত্র দুটি ছাড়া আর একশো পঞ্চান্নটি কবিতা গানের মতোই ছোট আকৃতির। 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থে গানের সংখ্যা একশো আট।

'গীতাঞ্জলি' গানগুলি মূলে কবিতাই ছিল, তবে মাত্র দুটি ছাড়া আর একশো পঞ্চান্নটি কবিতা গানের মতোই ছোট আকৃতির, তবে গানের আকারে সাজানো নয় অর্থাৎ স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগী, এইভাবে বিন্যস্ত নয়। বেশির ভাগ গানেই কবির আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে সাবলীল ভাষায়— 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' দেবতা একজন আছেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর কেউ নন, তিনি 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'। কিছু কিছু গানে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে, যেমন—

'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।'

'গীতিমাল্য'-এর গানগুলি বিভিন্ন সময় লেখা। শিলাইদহ থাকাকালীন কিছু গান লিখেছিলেন, সেগুলিও যেমন এখানে আছে, তেমনি ১৯১৩ সালে ইংলন্ড যাবার সময়ে লেখা কিছু গানও সেখানে

রয়েছে। ভক্তিরসের আধিক্য এখানে নেই, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা-ব্যাকুলতার কথাই বেশি করে ধরা পড়েছে।

'গীতালি' কাব্যগ্রন্থে গানের সংখ্যা একশো আট। শেষ দুটি ছাড়া বাকি সব রচনাকেই গান বলা যায়, তবে কবিতা হিসাবে এদের আবেদনও মোটেই তুচ্ছ করবার মতো নয়। বাউল গানের প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, এই কাব্যগ্রন্থ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে বাউল প্রভাবিত গানগুলিও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গানই হয়ে উঠেছে, যেমন —

> 'সহজ হবি, সহজ হবি,
> ওরে মন সহজ হবি।
> কাছের জিনিস দূরে রাখে,
> তার থেকে তুই দূরে র'বি।'

তবে নির্ভেজাল কবিতা বলা যেতে পারে, এমন গানও আছে, যেমন -

> মেঘ বলেছে যাব যাব
> রাত বলেছে যাই;
> সাগর বলে কূল মিলেছে
> আমি তো আর নাই।

প্রশ্ন :

১। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল কত ?
২। 'গীতাঞ্জলি' কত সালে লেখা হয় ?
৩। 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থে গানের সংখ্যা কতগুলি ?

২.৪.১২.২.৩ : বলাকা পর্ব

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে যে একটি স্বতন্ত্র পর্ব ধরা হয় তার কারণ, এই কাব্যগ্রন্থেই কবির রচনার লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সাধারণত কবিরা প্রেমভাবনা এবং সৌন্দর্যপ্রীতির পর্ব পেরিয়ে আধ্যাত্মিক পর্বে এসে পৌঁছন এবং নদী যেমন শেষ পর্যন্ত সাগরে এসে মেশে, কবিদের কাব্য-পরিণতিও আধ্যাত্মিক পর্বেই সমাপ্ত হয়। কাজেই আধ্যাত্মিক পর্বেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শেষ পরিণতি, এরকম ভাবা মোটেই অসম্ভব ছিল না।

'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থে বেশ কয়েক ধরনের কবিতাই আছে, তবে যে কারণে একে পর্বান্তর বলা যায় সেটি হল, কবি যেন আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস পেয়েছেন এবং বিশ্বব্যাপী এক ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা মনে অনুভব করে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম অনুভূতি ও কাব্যসৌন্দর্যের জগৎ ত্যাগ করে এখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস পেয়েছেন এবং বিশ্বব্যাপী এক ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা মনে মনে অনুভব করে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম অনুভূতি ও কাব্য সৌন্দর্যের জগৎ ত্যাগ করে, সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। 'বলাকা'-র প্রথম ধরনের কবিতার মধ্যে 'সবুজের অভিযান', 'সর্বনেশে', 'যৌবন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'বলাকা'-র দ্বিতীয় ধরনের কবিতার মধ্যে 'চঞ্চলা', 'তাজমহল'-এ অবিরাম গতির কথা বলা হয়েছে।

'শঙ্খ' কবিতায় (কাব্যগ্রন্থে অবশ্য কোনো নাম ছিল না, সংখ্যা ছিল - ৪) কবি যেন বিধাতার আহ্বান শঙ্খ শুনতে পেয়েছেন, ব্যক্তিগত সাধের বৃত্ত ছেড়ে কবিকে তাই নেমে আসতে হয়েছে সামাজিক কর্তব্য করতে, পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে —

"আরতি-দীপ এই কি জ্বালা।
এই কি আমার সন্ধ্যা।
গাঁথা রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা'।

প্রশ্ন :

১। 'বলাকা' কাব্যের প্রকাশ কাল কত ?
২। 'বলাকা' কাব্যের মূল কথা কি ?

অবশ্য ঠিক এই ধরনের কবিতা — যাকে বলা হয় একটা আসন্ন সর্বনাশ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে নূতনকে আহ্বান, এছাড়াও আরো কয়েক ধরনের কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান অনন্ত কাল 'অকারণ অবারণ' চলা নিয়ে রচিত বেশ কিছু কবিতা। প্রথম ধরনের কবিতার মধ্যে 'সবুজের অভিযান' (১ সংখ্যক) 'সর্বনেশে' (২-সংখ্যক) 'যৌবন' (৪৪-সংখ্যক) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অসাধারণ সৃষ্টি বোধ হয় ৩৭- সংখ্যক কবিতা 'ঝড়ের খেয়া'। সেখানে কবি দেখেছেন 'বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে' ফুরায় সত্যের যত পুঁজি', সুতরাং এই বিশ্বব্যাপী সর্বনাশ - 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার ও অশ্রুধারা'। কিন্তু পাপের এই প্রায়শ্চিত্তের পর সুদিনের আশাতেই কবিতা শেষ হয়েছে —

'বিশ্বের কাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা?

'বলাকা'-র দ্বিতীয় ধরনের কবিতায় যে অবিরাম গতির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কেউ কেউ ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ-র গতিতত্ত্বের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই 'বলাকা' কাব্যের গতিপথ নিয়েও সমালোচকরা অনেক আলোচনা করেছেন। এই ধরনের কবিতা বেশ কিছু আছে, যথা 'চঞ্চলা' (৮-সংখ্যক), 'তাজমহল' (পরে শাজাহান, ৭ সংখ্যক) প্রভৃতি, কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এই গতির ব্যাপারটা ধরা পড়েছে 'বলাকা' (৩৬ সংখ্যক) কবিতায়। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা, সেখানে হঠাৎ এক ঝাঁক বলাকাকে উড়ে যেতে দেখে যেন —

"বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন খানে।"

এ তো চোখে দেখা জগৎ, চোখে যা দেখা যায় না, সেখানেও কবি এই গতির লীলাই যেন প্রত্যক্ষ করেছেন —

'তৃণদল
মাটির আকাশ পড়ে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছি অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।'

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ছন্দের এক নতুন পরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি 'বলাকার ছন্দ' নামেই পরিচিত হয়েছে।

'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যগ্রন্থকে বলাকার-ই উপসংহার বলা যেতে পারে।

২.৪.১২.২.৪ : প্রেম ও স্মৃতিচারণ পর্ব

এই পর্বের শুরু 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ থেকে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, এই কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম যথার্থ প্রেমের কবিতা লিখেছেন। কাব্যটির দুটি অংশ — পূরবী এবং পথিক। কবির প্রৌঢ়ত্বের হালকা বিষাদ কবিতাগুলিকে স্পর্শ করেছে — 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ'। তবে সেজন্য কবির তৃপ্তি ও আনন্দে কোনো ভাটা পড়েনি —

'আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ - মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,'

প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কাব্য বলা চলে কবির 'মহুয়া' (১৯২৯) কে। সম্ভবত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়ো। এখানে মোট কবিতার সংখ্যা চুরাশি, তবে বেশ কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাস থেকে। যেমন 'বিদায়' কবিতাটি —

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।'

'নাম্নী' নামের সতেরোটি কবিতায় কবি নারীপ্রকৃতির বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'বনবাণী' (১৯৩১) কাব্যগ্রন্থটি 'মহুয়া'-রই পরিপূরক বলা যেতে পারে। এর চারটি অংশ 'বনবাণী' 'নটরাজ - ঋতুরঙ্গশালা', 'বর্ষামঙ্গল' এবং 'নবীন'।

এই পর্বের অন্যান্য কাব্যগুলির নাম - 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'বিচিত্রিতা', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট, 'শ্যামলী', 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি'। 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা যেমন স্মরণ করেছেন তেমনি কিছু কিছু কবিতায় এমনও বলেছেন, লেখা যত শক্তিশালীই হোক তা অমর হয় না। সবাইকেই একদিন না একদিন নতুনের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয় —

'স্ব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে

কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময় -
নবীন তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে হবে। (লেখা)

'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ প্রবর্তন করেছেন। শেষের তিনটি কবিতা ছাড়া সবই গদ্যছন্দে লেখা। একটু নমুনা দেবার জন্য বিখ্যাত কবিতা 'বাঁশি'র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

'হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান -
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদিকালের বিরহবেদনা' -

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যটির দুটি অংশ। পূরবী এবং পথিক। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কাব্য বলা চলে 'মহুয়া' (১৯২৯) কে। এখানে মোট কবিতার সংখ্যা চুরাশি। এই পর্বের অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে - 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' উল্লেখযোগ্য। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ প্রবর্তন করেছেন।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বিচিত্রিতা'য় (১৯৩৩) কিন্তু গদ্যছন্দ বর্জন করেছেন কবি। হালকা চালের বেশ কিছু কবিতা আছে এখানে। কিশোর প্রেমের স্মৃতি নিয়ে লেখা তিনটি কবিতা 'পুষ্প', 'একাকিনী' এবং 'বিদায়' উল্লেখযোগ্য। 'বীথিকা' আসলে ছড়ানো কিছু লেখার সংকলন, কিন্তু 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ সমসময়েই লেখা। শৈশব স্মৃতি এবং কিশোর প্রেম এই কাব্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। মোট কবিতার সংখ্যা ছেচল্লিশ।

'পত্রপুট' (১৯৩৬) তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ, কবিতার সংখ্যা ষোল। মর্ত্যের অমৃত সংগ্রহ করবার জন্য কবি যে এখনও উৎসুক তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিতায় —

'এখনো মেটেনি আশা;
এখনো তোমার স্তন অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি,'

প্রেম এবং কৈশোর স্মৃতির সঞ্চয়ে অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'শ্যামলী' (১৯৩৬)। কাহিনিমূলক কবিতা 'কণি', 'হঠাৎ-দেখা', 'অমৃত' প্রভৃতি জনপ্রিয়। নাম-কবিতার অংশবিশেষ স্মরণ করা যায় —

'ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা 'বাঙালি' মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।'

প্রশ্ন :

১। 'মহুয়া' কাব্যের প্রকাশ কাল কত ?
২। 'পুনশ্চ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কি ছন্দ ব্যবহার করেছেন ?

২.৪.১২.২.৫ : অন্তিম পর্ব

রবীন্দ্রকাব্যের অন্তিম পর্ব বলা চলে 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায় (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪০) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' (১৯৪১) কাব্যগুলিকে।

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ রচনার আগে কবি সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কখনো চেতনা কখনো অবচেতনায় যে অসংলগ্ন চিত্রগুলি তাঁর মনে এসেছিল, তাই নিয়েই সাজানো হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থের আঠারোটি কবিতা। কবিতায় তা ধরাও পড়েছে

'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা।'

'সেঁজুতি' বাইশটি ছোটবড় কবিতার সংকলন। মৃত্যুর ভাবনা কবিকে কিছুটা উদাসীন করে তুললেও আশাহত যে করতে পারেনি সে কথা বোঝা যায় 'জন্মদিনে' নামে তাঁর দু-দুটি কবিতা দেখে। এ জন্মে যা কিছু কবি সৃষ্টি করেছেন, চলে যাবার সময় কোনো কিছুর প্রতিই আর আসক্তি নেই -

'ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু দিয়ে আর্দ্র চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।'

'আকাশপ্রদীপে'ও বাইশটি কবিতা, কিন্তু বড়ো আয়তনের। স্মৃতির মেদুরতায় কবিতাগুলি ব্যক্তিমানুষকে সুখ চিনিয়ে দেয়। তবে তাঁর লেখা নিয়ে কিছু অসহিষ্ণুতা যে জেগে উঠছে সে বিষয়ে কিছু দুঃখও আছে —

'সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই শেয়াল গড়ে।'

'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ইংরেজের শঠতা নিয়ে যেমন কিছু বিক্ষুব্ধ কবিতা আছে, তেমনি আছে জ্যোতিষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু ধারণা ও প্রশ্ন। তুলনামূলক ভাবে 'সানাই' কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘায়তন, কবিতার সংখ্যা ষাট।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ তিনটি কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলির কোনো শীর্ষনাম নেই। মৃত্যুর স্বরূপ চিন্তা, নিজের সৃষ্টির স্থায়িত্ব বিষয়ে নির্বিকার মনোভাব, ছোটখাট স্মৃতিকে গুরুত্ব দান, ইংরেজ জাতির প্রতি বিতৃষ্ণা ইত্যাদি এইসব কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। কবিতার সংখ্যা 'রোগশয্যা'য় চল্লিশ, 'আরোগ্য'তে চৌত্রিশ এবং 'জন্মদিনে' তে ঊনত্রিশ। সম্ভবত কবির লেখা শেষ কবিতাটি দিয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ শেষ করব :

রবীন্দ্রকাব্যের অন্তিম পর্ব হল 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেজুঁতি' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) , 'আরোগ্য' (১৯৪০), 'জন্মদিনে' (১৯৪০) ও 'শেষলেখা' (১৯৪১) কাব্যগুলি। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ইংরেজের শঠতা নিয়ে যেমন বিক্ষুব্ধ কবিতা আছে, তেমনি মৃত্যুর স্বরূপ চিন্তা, নিজের সৃষ্টির স্থায়িত্ব বিষয়ে নির্বিকার মনোভাব এই পর্বে বিশিষ্টতা দান করেছে। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থটিতে পঁয়ত্রিশটি কবিতা লক্ষ করা যায়।

'যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিব দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।'

প্রশ্ন :

১। অন্তিম পর্বের তিনটি কাব্যের নাম লেখ?
২। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা কতগুলি?

১.৫.৩.৩ : রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

যে-কোনো যুগন্ধর কবির আবির্ভাব ঘটলে তাঁকে অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিমান কিছু কবির রচনা আমরা পাই যাঁরা তাঁর কাব্যকৃতিকে আদর্শ অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেন। ইংরেজিতে এদের বলে Minor Poets, বাংলায় আমরা বলি অনুসারী কবিসমাজ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কবির কথা আমরা জেনে রাখবো।

২.৪.১২.৩.১ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মহাপ্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে শোকগাথায় লিখেছিলেন -

"তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা"।

এই 'অপূর্ব তন্ত্র' হচ্ছে ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতি তো যত্নবান ছিলেন বটেই, কিন্তু ছন্দনির্মাণে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল সমধিক। সেইজন্যই তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'ছন্দের যাদুকর'। বেশ কিছু সংস্কৃত ছন্দ তিনি বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন, যেমন—

(ক) গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ : 'জয় কবি! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগণ্য শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয় !' জয়! (শ্রদ্ধা - হোম)

(খ) পঞ্চ চামর ছন্দ : 'মহৎভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনা আমায় শোনাও কেবল।' (সিন্ধু-তাণ্ডব)

(গ) রুচিরা ছন্দ : 'তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল বাতাস লেগে ; (তখন ও এখন)

(ঘ) মন্দাক্রান্তা ছন্দ : 'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নবতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;, (যক্ষের নিবেদন)

(ঙ) মালিনী ছন্দ : 'উড়ে চলে গেছে বুলবুল,
শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।' (রিক্তা)

ইংরাজী Young Lochinvar ছন্দ অনুযায়ী লিখেছেন :

'ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ! (সিংহল)

শেষের ছন্দে তিনি প্রত্যেকটি Syllable ব্যবহার করেছেন রুদ্ধ দলে, এটিও ছন্দের এক পরীক্ষা বলা যায়। কবিতার পংক্তিগুলি নানারকম ভাবে সাজিয়ে তিনি ছবি আঁকার চেষ্টাও করেছেন, যেমন -

'হায়
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্তি ওগো একচক্র - রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্ছি বুঝি পড়ে, — আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্তসাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে, -
পঙ্কিল পল্বলে, পিয়ে শোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস — তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

অবশ্য তাই বলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে তুচ্ছ করা যায় না। অবহেলিত, তুচ্ছ মানুষের জন্য তাঁর মানবিক মহত্ত্ব প্রমাণ করে। 'শূদ্র', 'সেবা-সাম' 'মেথর' প্রভৃতি কবিতা একদিন মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ধর্ম, জাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। তাঁর কথা ছিল—

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানব জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।' (জাতির পাঁতি)

অনুবাদ কবিতার জন্যও সত্যেন্দ্রনাথ বিখ্যাত হয়ে আছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো কালভেদ বা দেশভেদ ছিলনা। তিনি অথর্ববেদ থেকেও অনুবাদ করেছেন (মাঙ্গলিক), আবার চীনের প্রাচীন কবিতারও অনুবাদ করেছেন (বালিকার অনুরাগ)। হুইটম্যান, টেনিসন, শেলি, হাফেজ, তেয়োফিল গতিয়ে, কিট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, লেজৎ দ্যা লিল, পল ভার্লেন, সুইনবার্ণ, ব্রাউনিং - প্রত্যেকের অনুবাদ করেছেন তিনি। ছন্দের প্রতি কিছু বেশি নজর থাকায় গুরু কবিতাতেও কিছুটা তরলতা এনে ফেলেছেন তিনি, একেবারে প্রথম শ্রেণির কবিতাও কিছু রচনা করেছেন, যেমন 'চম্পা' —

'আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষন্ন যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বলে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল - সাগরিকা অপ্সরার মত।'

সত্যেন্দ্রনাথের রচিত কাব্যের সংখ্যা প্রচুর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির নাম করা হল :

'বেণু ও বীণা (১৯০৬), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), 'তুলির লিখন' (১৯১৪) প্রভৃতি। অনুবাদ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'তীর্থমলিন (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০)। 'ছন্দ সরস্বতী' নামে ছোট একটি ছন্দচর্চার বইও তাঁর আছে।

২.৪.১২.৩.২ : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)

রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কবি করুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল : 'ঝরা ফুল' (১৯১১), 'ধানদূর্বা' (১৯১১), 'শান্তিজল' (১৯১৩)। 'শতনরী' (১৯৩০) নামে একটি কাব্যসংকলনও তাঁর ছিল। সৌন্দর্যের কবি এবং স্বপ্নময় বাস্তবের কবি হিসাবে তিনি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। সৌন্দর্যের সন্ধানে তিনি পরিচিত অঞ্চল ছেড়ে পুরী, দার্জিলিং, ওয়ালটেয়ার, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন পুরীর সমুদ্রের বর্ণনা—

'ভো মহার্ণব নীল-ভৈরব গর্জদ্-জলভঙ্গে
দূর অম্বুদ মন্দ্র সমান তুলিতেছ কার বন্দনা গান?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।' (শ্রীক্ষেত্র)

অবশ্য বাংলাদেশের সৌন্দর্যও যে তাঁকে মুগ্ধ করেনি এমন নয়। তাঁর একটি জনপ্রিয় কবিতার কয়েকটি পংক্তি এইরকম —

'শঙ্খধবল আকাশগাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?
....
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার, দাঁড়ালে মোর কুটীর দ্বারে,
জ্যোৎস্নাতরী চেয়ে এসে মুক্তাধবল ধরার পারে? (কোজাগর-লক্ষ্মী)

২.৪.১২.৩.৩ : যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

কবি যতীন্দ্রমোহন আজ পর্যন্ত তাঁর 'কাজলা দিদি' কবিতার জন্য ('বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই') বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কবিসত্তার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি একটি - অনায়াস রচনার সারল্য এবং শিশুমনের অধিগম্য ভঙ্গি। এ ছাড়া ছিল রোমান্টিক বিষাদপ্রিয়তা। পল্লীপ্রকৃতিকে কবি গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। এবং কবির মনোভাবই এই প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

যতীন্দ্রমোহনের তিনটি বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ 'অপরাজিতা' (১৯১৯), 'নাগকেশর' (১৯২৭) এবং 'মহাভারতী' (১৯৩৬)। শেষ কাব্যগ্রন্থে মহাভারতের চরিত্রগুলিকে তিনি দেখেছেন আধুনিক দৃষ্টিতে, ফলে এ যুগের ভাবনায় তাদের মধ্যে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন। যেমন 'কর্ণ' কবিতাটিকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' - এর অবশিষ্টাংশ - কুন্তীর আত্মপরিচয় দানের পর কর্ণের প্রতিক্রিয়া :

'—পাণ্ডুপুত্র সহোদর মোর? - কুন্তী আমার মাতা
কর্ণের ভালে এ কি পরিহাস লিখিয়াছ, হে বিধাতা!
পৌরুষে শুধু সেবি' নিশিদিন
যে কর্ণ চিরসঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা —
সেই শত্রু — সে সহোদর তার? — শত্রুজননী মাতা!'

সাধারণ মানবিক কবিতাও যে তাঁর হাতে অসাধারণ হয়ে উঠত, 'অন্ধ বধূ' কবিতা তার দৃষ্টান্ত —

'পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চল্‌না, ঠাকুর ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা বকুল! নয়?
তাইত বলি, বসে দোরের পাশে,

রাত্তিরে কাল - মধুমদির বাসে -

আকাশ পাতাল - কতই মনে হয়!

জষ্টি আসতে কদিন দেরি ভাই,—

আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

২.৪.১২.৩.৪ : কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)

'ছোটর দাবী' নামক কবিতায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন, 'ছোট যে হায় খনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে' সেই সূত্রেই বলা যায় তিনি তুচ্ছ অবহেলিতের কবি। নিজের গ্রামটিকে ভালোবাসেন, অজয় নদীকে ভালোবাসেন, অত্যন্ত সহজ সরল বৈষ্ণবীয় ভক্তি নিয়ে কবিতা লেখেন এবং জীবনকে অত্যন্ত সহজভাবেই চেনেন। 'ভক্তির যুক্তি' কবিতায় কবি সহজ যুক্তিতে একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন। এই পৃথিবীর স্রষ্টা নারী অথবা পুরুষ, সে বিষয়ে তাঁর মনে হয়েছিল এর স্রষ্টা যদি মা না হন তাহলে সব কিছু এত ভালো করে সাজালো কে — "শিখীকে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে, কদলীকে গরদ দিয়ে যিনি সাজিয়েছেন তিনি মা ছাড়া কেউ হতেই পারেন না। তাঁর মনোভূমিটি কী দিয়ে গঠিত, 'কৃষ্ণা রজনী'-র একটি অংশ উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে—

'বুঝি সেদিনও সজনি, এমনিই রজনী আঁধিয়ার,
এমনই প্রখর ঝটিকামুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃতপতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কথা কথা চলে
দমকে দামিনী বারেবার
বুঝি সেদিনও সজনি, এমনই
রজনী আঁধিয়ার।

বুঝি সেদিনও এমনই গুরুগর্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ টলমল
গাঙ্গুরের নীচে ভাসাইয়া ভেলা, মৃতপতিদেহ আধার বেহুলা
চলে অসহায় একাকিনী বালা, ঝরে অবিরত আঁখিজল,
বুঝি সেদিনও এমনই গুরুগর্জন অবিরল।'

রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের জাদুকর' বলা হয়। ছন্দ নির্মাণে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি অবহেলিত, তুচ্ছ মানুষদের প্রতি মানবিক মহত্বও লক্ষ করা যায় 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) প্রভৃতি কাব্যে। সৌন্দর্যের কবি এবং স্বপ্নময় বাস্তবের কবি হিসাবে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ঝরাফুল' (১৯১১), 'ধানদূর্বা' (১৯১১), 'শান্তিজল' (১৯১৩) উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অপরাজিতা' (১৯১৯), 'নাগকেশর' (১৯২৭) ও 'মহাভারতী' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিক বিষাদপ্রিয়তার সঙ্গে শিশুমনের সারল্য ও পল্লী প্রকৃতির কথা বলেছেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তুচ্ছ অবহেলিতের কবি হলেও তাঁর 'শতদল' (১৯০৬), 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কালিদাস রায়কে সমাজমনস্ক কবিও বলা চলে। শহরে বাস করলেও পল্লী প্রকৃতিকে চিরকাল ভালোবেসেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে 'পর্ণপুট' (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫), 'ব্রজরেণু' (১৯১৬), 'হৈমন্তী' (১৯৩৪), 'বৈকালী' (১৯৪০) উল্লেখযোগ্য।

কুমুদরঞ্জনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'শতদল' (১৯০৬), 'উজালী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা (১৯১৪), 'বীণা' (১৯১৬), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'নূপুর' প্রভৃতি।

প্রশ্ন :

১। রবীন্দ্রানুসারী দু'জন কবির নাম কর?

২। কালিদাস রায়ের দুটি কাব্যের নাম কর?

৩। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দুটি কাব্যের নাম কর।

২.৪.১২.৩.৫ : কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)

কবি ও সমালোচক কালিদাস রায় রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা আধুনিক কবিতার যুগেও বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু কাব্যপ্রকৃতির দিক থেকে তাঁকে রবীন্দ্রানুসারী বলাই ঠিক। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রানুসরণ থাকলেও বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকও সেখানে ধরা পড়েছে, তাছাড়া তাঁকে সমাজমনস্ক কবিও বলা চলে। প্রচুর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা এই কবির প্রথম কাব্য 'কুন্দ' (১৯০৭)। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল — 'কিশলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১৯১৫),'বল্লরী' (১৯১৫), 'ব্রজবেণু' (১৯১৬), 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬) প্রভৃতি। শেষের দিকে তিনি রচনা করেন 'হৈমন্তী' (১৯৩৪), 'বৈকালী' (১৯৪০), 'সন্ধ্যামণি' (১৯৫৮), 'গাথাঞ্জলি' (১৯৫৮), 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮), 'তৃণদল' (১৯৭০) প্রভৃতি।

কবিতার আঙ্গিকের ব্যাপারে কালিদাস রায় যত্নবান ছিলেন, তাঁর বিষয়বৈচিত্র্যও ছিল লক্ষণীয়। পরবর্তী জীবন শহরে অতিবাহিত করলেও পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতিকে তিনি চিরকাল ভালোবেসেছেন। পল্লীর আবহাওয়া যে তাঁর সর্বাঙ্গে, একথা বলেছেন 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' কবিতায় —

> 'রজের মাঝে পেয়ে আমার শিহরে ঐ ব্রজের দেহ,
> প্রতি হৃদয়স্পদে আছি, কেঁদনা ভাই তোমরা কেহ।
> ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে,
> শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।'

এই বৃন্দাবন আসলে কবির পল্লিগ্রাম। রঙ্গব্যঙ্গের কবিতাতেও কালিদাসের প্রসিদ্ধি ছিল। একটু উদাহরণ দিই —

> 'ছাত্রের উকিল-পিতা শিক্ষক বন্ধুরে হেসে কন,
> তুমি ত চরাও গোরু হাতে লয়ে বেতের পাঁচন।
> শিক্ষক কহিল - 'গোরু চরানোর করি না বড়াই,
> গোরু চরে আদালতে তাহাদের বাছুর চরাই।'' (গোরু ও বাছুর)

সাহিত্যতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবপদাবলীর আলোচনা কালিদাস রায়ের অপর কীর্তি।

২.৪.১২.৪ : রবীন্দ্রযুগে স্বকীয় চিন্তার কবি

রবীন্দ্রযুগেও কিছু স্বকীয় চিন্তাভাবনাসম্পন্ন কবির আর্বিভাব ঘটেছিল, তাঁদের কথা পৃথকভাবে আমাদের আলোচনা করা উচিত। যেখানে তাঁদের স্বকীয়তা, সেই দিকটি নিয়ে তাঁদের পৃথক পরিচয়ও গড়ে উঠেছিল। নতুন কোনো কাব্য আন্দোলন এঁরা সংগঠিত করতে না পারলেও এঁদেরও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব আছে।

২.৪.১২.৪.১ : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র স্নেহধন্য হলেও তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে অবলম্বন করে তিনি যে সাহিত্যধারা সৃষ্টি করেছিলেন তাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিবাদী সাহিত্য। প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ, গল্প, রসরচনা ইত্যাদি অনেক কিছুই লিখেছেন, সেই সঙ্গে কবিতাও কিছু লিখেছেন। কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তিই প্রবল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ কিছু নেই। বাংলা সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একটি সনেটে তিনি সনেট সম্বন্ধেই বলেছেন —

'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।'

রবীন্দ্রপটের কবি হয়েও মোহমুক্ত হয়ে তিনি লেখেন —

'প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা।
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা।'

২.৪.১২.৪.২ : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'দুঃখবাদী' কবি হিসাবেই পরিচিত। রবীন্দ্র-পটের কোনো কবিকে যদি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত বলতে হয় তবে এঁকেই বলতে হবে। যদিও জীবনের অন্ত্যপর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রথমদিকে, রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র কথা বলা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথকে পরোক্ষ ব্যঙ্গ করেও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে শুধু আনন্দ আর আশার আলো দেখেছেন, তাই যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমারে কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ!
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানা মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে?'

কবি নিজেই 'দুঃখবাদী' কবিতায় নিজেকে দুঃখবাদী বলেছেন, সেই কারণেই তাঁর এই পরিচয় হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক —

'ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী, বৈরাগী।'

যতীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার খুব বেশি নয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' (১৯২৩), অতঃপর 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম' (১৯৪০) এবং 'ত্রিযামা' (১৯৪৮)। এ ছাড়াও 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬) নামে একটি কাব্যসংকলন তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরেও তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় - 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭)।

প্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, আনন্দময় ঈশ্বর — প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর সংশয় প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত পৃথিবীতে এত সমস্যা যে প্রেম এবং প্রকৃতিপ্রীতির বিশেষ কোনো অবদানই নেই, এই ছিল তাঁর ধারণা, তিনি বলেছেন—

'অভাবের লাগো ফুটো মিথ্যের জাল বুনে
মামুলি প্রেমের নেট মশারিটা টাঙ্গিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল, মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি

ঈশ্বর সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের ধারণা, তিনি আনন্দময় এ কথা ভুল, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ তাঁর নেই। কবির দৃষ্টিতে তিনি কর্মকার —

'ও ভাই কর্মকার,
আমাকে পুড়িয়ে পেটানো ছাড়া কি কর্ম নাই কো আর!

অথবা তিনি নির্বিকার উদাসীন এক জড়পদার্থবিশেষ —

'তুমি শালগ্রাম শিলা,
শোয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ ঘোড়া;
মোদেরি পাকানো প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠানো দড়ি;
তারি সাহায্যে বাসনা — তোমার যজ্ঞ অশ্ব ধরি।'

তাঁর ঈশ্বর কী রকম সে কথা আমরা জানতে পারি তাঁর 'কচি ডাব' কবিতা থেকে। এটি শুধু তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। পুরানো দিনের পল্লিগ্রামের চাষাভুষো লোক শিবকে দেখেছিল নিজেদের অত্যন্ত আপনজন হিসেবে, ঠিক দেবতা হিসেবে নয়। কবিও সেই নীলকণ্ঠ শিবকেই

নিজের আরাধ্য মনে করেন যিনি একদিন কঠিন শীতের রাতে কচি ডাবের পশরা নিয়ে এসেছিলেন কবির কাছে, কবি বলেছেন —

'দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ

কোন রূপে এসেছিলে দ্বারে?

অশ্রুর সাগর মন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ

ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!

২.৪.১২.৪.৩ : মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

একাধারে কবি এবং সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'দেহবাদী' কবি হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহের ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কিছুটা স্পর্শকাতর ছিলেন, মোহিতলালের কবিতায় প্রথম আমরা সেই সংবেদন পেলাম, ইংরেজিতে যাকে বলে sensuousness, বাংলায় বলতে পারি দেহসংরাগ। 'নারীস্তোত্র' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

'দেহই অমৃতঘট - আত্মা তার ফেন অভিমান!

সেই দেহ তুচ্ছ করি আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জর

ফিরিছে প্রলয়পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান-

অঙ্গার নির্বাণ তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান।'

মোহিতলাল এই দুঃসাহস কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন বলা শক্ত, কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর আধুনিক সাহিত্যব্রতীরা তাঁকে গুরুর আসন দান করল। কারণ শুধু দেহবাদ নয়, দুঃখবাদী জীবনদর্শনও পরিত্যাজ্য মনে করিছিলেন তিনি। জীবনকে ভোগ করতে গিয়ে যদি মৃত্যু আসে, তাকেও অভ্যর্থনা করে নিতে চেয়েছেন—

''জীবনের দুঃখ সুখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা-
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহা রবে গাই গান, তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো।'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা -
এই চোখে আরবার না বিঁধিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!''

মোহিতলাল নিজেকে কাব্যসাধনায় অঘোরপন্থী বলেছেন। সম্ভবত সেইজন্য কবিতায় কালাপাহাড়েরও স্তুতি করেছেন, নিজেকে তার সঙ্গেও অন্বিত করতে মোহিতলালের এই ভাবাবেগ কোথাও অসংযত হয়ে পড়েনি।

কাব্য রচনায় যে একটা সুচিন্তিত বুদ্ধিবৃত্তি সক্রিয় ছিল, তার জন্যই মোহিতলালের কবিতার আঙ্গিক উপযুক্ত সৌন্দর্য লাভ করেছে। কোনো কোনো কবিতায় দার্শনিকতা ও তত্ত্বের প্রাধান্য দেখা যায়, বিশেষত, 'পান্থ' 'বুদ্ধ' প্রভৃতি দীর্ঘ কবিতায়। যতীন্দ্রনাথের মতো তিনিও কিন্তু কবিতায় শিবেরই আবাহন করেছেন, কিন্তু এই শিব দুঃখ সম্পৃক্ত কৃষকরাজ শিব নন, শিবের রুদ্র ও ভয়ংকর মূর্তিটি তাঁর পছন্দ —

জাগো মহাকাল! রুদ্রদেবতা! বর্ণবিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ, কর সৃষ্টি লয়!
কেটে যাক নীল নভোবুদবুদ - রঙের হাট!
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক - রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দয়!
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়।'

মোহিতলাল সমালোচনা সাহিত্যেও যশস্বী ছিলেন বলে সেই ধরনের বেশ কিছু গ্রন্থও তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। তবে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও তাঁর নিতান্ত কম নয়। 'স্বপন পশারী' (১৯২২), তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত-গোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৫১) প্রভৃতি।

মোহিতলাল যে ধরনের কবিতার জন্য জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাদের উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু তিনি বেশ কিছু সনেট লিখেছিলেন। এগুলি ভাষার সংযমে ধ্রুপদী দৃঢ়তায় অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন বলে মনে করা চলে।

২.৪.১২.৪.৪ : নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কক্ষচ্যুত উল্কার মতো বাংলা কাব্যসাহিত্যে আবির্ভাব ঘটেছিল নজরুল ইসলামের। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন হাবিলদার হিসেবে, সেই হাবিলদার কবি বাংলার কাব্যে যে বিদ্রোহের ভেরি নিনাদ করে বললেন 'আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস', তারপর বিদ্রোহী কবি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে গেলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সময়েও রবীন্দ্রনাথের মতো জনপ্রিয়তা বোধহয় একমাত্র তাঁর ভাগ্যেই ঘটেনি। নজরুল লিখেছেনও প্রচুর। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের তালিকায় থাকতে পারে — 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৪) 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'পুবের হাওয়া' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'চিত্তনামা' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'প্রলয়শিখা (১৯৩০) প্রভৃতি। বেশির ভাগ কাব্যগ্রন্থই তিনি লিখেছেন ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে, যদিও 'শেষ সওগাত' - এর মতো কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।

নজরুল নিজেও বলেছেন, আমরাও জানি, এমন সমাজ-সচেতন, যে কোনও সামাজিক অসাম্য ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে দৃপ্ত, জাতের নামে বজ্জাতিতে ক্ষিপ্ত এবং এত সামাজিক দায়বদ্ধ কবি বাংলা সাহিত্যে আর আসেননি। নিজেই বলেছেন 'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা/তাই লিখে যাই এ রক্ত লিখা',

বলেছেন 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা কই আসে মুখে'। রবীন্দ্রনাথের পথেই হাঁটেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অসম্মানও করেননি, বলেছেন —

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে অবলম্বন করে সাহিত্য ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দু:খবাদী কবি হিসাবে পরিচিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম' (১৯৪০) এবং 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) প্রভৃতি। প্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, আনন্দময় ঈশ্বর - প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর সংশয় প্রকাশ পেয়েছে। কবি এবং সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'দেহবাদী' কবি হিসাবেই পরিচিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন পশারী' (১৯২২), অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত-গোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৫১) প্রভৃতি। হাবিলদার কবি বাংলা কাব্যে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে— 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'চক্রবাক' (১৯২৯) প্রভৃতি। নজরুল সামাজিক অসাম্য ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে দৃপ্ত ছিলেন। এমনকি ধর্মসম্প্রদায়ের ভেদ এবং মুসলিম ধর্মগুরুদের অমানবিক আস্ফালন ও গরিব মানুষের প্রতি দীন আচরণও তিনি সহ্য করতে পারেননি।

'পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।'

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে, 'রবিহারা' নামে যে অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন এবং স্বরচিত যে গান 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' স্বকণ্ঠে রেকর্ড করেছিলেন তাতে বোঝা যায় এই শ্রদ্ধা কেমন অপরিমেয় ছিল।

বাংলায় যাদের আমরা বলি চারণ কবি, তারই উন্নত সংস্করণ ছিলেন নজরুল। আমাদের তিনি উদ্দীপ্ত করেছেন, সংগঠিত করেছেন, অসাম্যের বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের নির্লজ্জ শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চ কণ্ঠ হয়ে উঠে বলেছেন —

'কারার ওই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।'

স্বরাজ আনার নাম করে ওই রক্তপিপাসু ব্রিটিশকে যারা অনুনয়ের নীতি গ্রহণ করে, যারা দেশের দারিদ্র্য মোচনের একটুও চেষ্টা না করে কেবল স্বরাজের নামে চাঁদা তুলে যায়, কবি তাদের বিরুদ্ধেও বিষোদ্‌গার করতে ছাড়েন নি —

'আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙারিয়া কাড়িয়া গ্রাস।
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ
মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।'

প্রশ্ন :

১। 'সনেট পঞ্চাশৎ' কার লেখা?
২। 'দুঃখবাদী' কবি কাকে বলা হয়?
৩। 'দেহবাদী' কবি কাকে বলা হয় ? তার একটি কাব্যের নাম লেখ।
৪। নজরুল ইসলামের দুটি কাব্যের নাম কর।
৫। বিদ্রোহী কবি কাকে বলা হয় ?

যে কোনো অসাম্যের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন উচ্চকণ্ঠী। বলেছেন—

'গাহি সাম্যের গান —
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

সেই জন্যই সাদা মানুষের প্রতাপ, কালো মানুষের ওপর তাদের নির্বিচার অত্যাচার তিনি সহ্য না করতে পেরে বলেছেন —

'শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি জান ভালো, নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বল নাই শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী দীপে,
সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তা বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।'

ধর্মসম্প্রদায়ের ভেদ এবং মুসলিম ধর্মগুরুদের অমানবিক আস্ফালন ও গরিব মানুষের প্রতি হীন আচরণও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাই কোনো পক্ষকেই সমীহ না করে লিখেছেন —

'তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি!
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!
কোথা চেঙ্গিস্; গজনী মামুদ; কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার!'

নজরুল বিদ্রোহী কবি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি নিজেই বলেছেন - 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ তূর্য'। এই বাঁশের বাঁশরী দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রচুর গান, যেগুলি নজরুলগীতি নামে প্রচলিত এবং একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তুলনীয়। 'বাগিচায় ফুল শাখাতে দিসরে আজি দোল,' কিম্বা 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান,' অথবা 'ভোরের হাওয়া এলে' প্রভৃতি প্রচুর গান ও গজল যিনি সৃষ্টি করেছেন, আজও যা নিয়মিত গাওয়া হয়, তাঁকে শুধু বিদ্রোহী কবি বলা ঠিক হবে না।

২.৪.১২.৫ : রবীন্দ্রোত্তর কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ সৃষ্ট রবীন্দ্রযুগের কবিতার অবসান ঘটিয়ে এক নতুন কাব্যধারার সূচনা করতে চাইছিলেন তরুণতর সাহিত্যিক-সমাজ। কথাসাহিত্যে এই আন্দোলনের সূচনা করেন কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা। কবিতায় এই আন্দোলন সূচিত হয় মূলত 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে। এঁদের আর্দশ ছিলেন ইয়েটস্, এলিয়ট, অডেন, স্পেন্ডার, বোদলেয়ার, মালার্মে, পল ভার্লেন, পল ভালেরি, র‍্যাঁবো, লুই আরাগঁ, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি কবি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা, রাবীন্দ্রিক ঢঙ বর্জন করা এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতকে অস্বীকার করাই ছিল এঁদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথম রবীন্দ্রোত্তর বা আধুনিক কবি কে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রথম রবীন্দ্রোত্তর ধারার প্রথম কবি, কারণ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে নিবারণ চক্রবর্ত্তীই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং বুদ্ধদেব বসু একটি প্রবন্ধে লিখেছেন 'শেষের কবিতা'ই তাঁদের রবীন্দ্র-দ্রোহের সঠিক পথ দেখিয়েছে। আমরা এই কাব্যধারায় প্রধান কবিদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

২.৪.১২.৫.১ : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারায় সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। একেবারে স্বতন্ত্র ভঙ্গি এবং স্বতন্ত্র বিষয় নিয়ে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। আধুনিক জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা এবং অস্তিত্বের অসহায় সংকট এমনভাবে তাঁর কবিতায় ছায়া বিস্তার করে আছে যে সময়ের অনুভূতির সঙ্গে তাঁকে একেবারে ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ মনে হয়। একেবারেই ব্যতিক্রমী কবি বলে সমকালের রবীন্দ্রভক্ত কবি প্রাবন্ধিক সজনীকান্ত দাস তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেব বসু সে সময় তাঁকে আশ্রয় না দিলে তাঁর সারস্বত সাধনার কী দশা হত অনুমান করা শক্ত। তিনি বেশ কিছু গল্প এবং উপন্যাসও রচনা করেছেন, কবিতার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি। সেগুলিও অত্যন্ত ব্যতিক্রমী সাহিত্য। তবে এগুলি সবই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর পর।

জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চিত্ররূপময়', বুদ্ধদেব বসু তাঁকে বলেছেন 'নির্জনতম কবি'। বিভিন্ন ভাবে তাঁর কবিতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলির পরিচয় জেনে রাখবো। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯২৭) এ কিছু রবীন্দ্রপ্রভাব আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) কবির পরিণত শক্তির কাব্য। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আরো তিনটি কাব্যগ্রন্থ — 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) এবং 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। মৃত্যুর পর কবির আরো দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১)।

জীবনানন্দর কবিতায় আমরা যেসব অভিনব মাত্রা পাই তার একটা হল পরিব্যাপ্ত ভৌগোলিক চেতনা এবং কালচেতনা। কবি নিজেকে অনুভব করতে পারেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে — যেখানে মানুষ আছে, মানুষ ছিল, সেখানেই তিনি যেতে পারেন। সময়ও তাঁর কাছে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ — যে কোনো মুহূর্তে এক আশ্চর্য টাইম মেশিনে তিনি পৌঁছে যেতে পারেন সেই জায়গায়, বা বলতে পারেন সেখানে তিনি ছিলেন —

'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; (বনলতা সেন)

ফলে, সমস্ত কিছুই তিনি যেন দেখতে পান, শুনতে পান, আঘ্রাণ করতে পারেন —

'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি
রামধনু রঙের কাচের জানালা।'

একেই সমালোচকরা বলেন কবির ইতিহাস চেতনা। কবির অস্তিত্বের সংকট তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে যেসব কবিতায়, তার মধ্যে 'বোধ' এবং 'আটবছর আগের একদিন' কবিতা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনে যা প্রাপনীয় তা সমস্ত পাওয়ার পরও মানবিক যে সংকটবোধে পীড়িত হয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে তার অনির্দেশ্য ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

'নারীর হৃদয় — প্রেম — শিশু — গৃহ — নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় —
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত — ক্লান্ত করে;

কোনো সন্দেহ নেই জীবনানন্দ দাশ এই কাব্য-আন্দোলনের সেরা প্রাপ্তি এবং এই সময়ের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিপ্রধান কবি।

২.৪.১২.৫.২ : অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

কবি অমিয়কুমার চক্রবর্তী অমিয় চক্রবর্তী নামেই বেশি খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীর্বাদ ও সান্নিধ্য পেলেও প্রকৃতির দিক থেকে তাঁকে আধুনিক কবি হিসাবেই স্বীকার করে নিতে হবে। বিষয়ের দিক থেকে তিনি কোথাও কোথাও যে রাবীন্দ্রিক নন এমন কথা বলা যাবে না। কারণ পৃথিবী ও মানুষকে ভালোবাসাই তাঁর কবিতার প্রধান সুর, কিন্তু কাব্য আঙ্গিকে এবং ভাষা ব্যবহারে তাঁর আধুনিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অমিয় চক্রবর্ত্তীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫), প্রভৃতি। কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল থেকেই বোঝা যাবে তিনি কাব্য সাধনা শুরু করেছেন একটু বেশি বয়সে। তাঁর 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন বা 'চেতন স্যাকরা' এক সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম কবিতা থেকেই কিছু পংক্তি উদ্ধার করি :

'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা —
    বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
    প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল —
    মেলাবেন।'

২.৪.১২.৫.৩ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

সুধীন্দ্রনাথকে ধরে নেওয়া হয় জীবনানন্দ দাশের বিপরীত মেরুর কবি। কারণ সুধীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত শাণিত, ধ্রুপদী রীতির অনুগামী, শব্দচয়নে মাত্রাতিরিক্ত সাবধানী এবং কবি মানসিকতায় বুদ্ধিবৃত্ত; জীবনানন্দ অনেকটা শিথিল, চেষ্টাকৃত ধ্রুপদী বিন্যাস তাঁর নেই, তাঁর ছন্দও তাঁর কবি-স্বভাবের মতোই এলায়িত এবং অনেকাংশেই তিনি অনুভূতি প্রধান। সুধীন্দ্রনাথ এ যুগের সঙ্কটকে অনুভব করেন, এবং হয়তো বেশি করেই করেন, ফলে কোথাও কোনো আশা তিনি দেখতে পান না, বলেন—

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবেনা ওতে জোড়া।'

এ বিষয়ে সচেতন না হলেই যে সর্বনাশ এড়ানো যায় বা কল্পিত আশার বীজ বপন করলেই যে সুফল পাওয়া যায়, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না বলেই বলেছেন — 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' (১৯৩০)। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৪), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬), 'দশমী' (১৯৫৬) প্রভৃতি। সাধারণ পাঠকদের কাছে সুধীন্দ্রনাথ কিছুটা দুরূহ কারণ, শব্দগুলি তিনি ব্যবহার করেন অনেক স্থলেই তার ব্যুৎপত্তির অর্থে, এ ছাড়া দূরান্বয়ী বাক্যগঠনের অভ্যাস তাঁর রচনাকে অনেক স্থলেই যে দুরূহ করে তোলে, তার উদাহরণ —

'অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিনীর ক্লিন্ন অন্তকালে,
তোমার প্রতিভূ সেজে, উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।'

এসব অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ কাব্যপরিণতিতে লাভ করেছেন। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থে এমন কিছু কবিতা আছে, বহুবার আবৃত্তি করলেও যার মাধুর্য কমে না, যেমন —

'সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের মত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মাঝে
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থমিলো কালের চিরচঞ্চল গতি; (শাশ্বতী)

২.৪.১২.৫.৪ : প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

আধুনিক কবিতা আন্দোলনের শরিক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্থান হতে পারে কিনা এ বিষয়ে কারো কারো সন্দেহ থাকলেও, তিনি যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক মানসিকতার উদ্‌গাতা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে 'কল্লোল' পত্রিকা আধুনিক সাহিত্যের দিগ্‌নির্দেশক বলে অনেকে মনে করেন, তিনি ছিলেন তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাস্তবতা কথাসাহিত্যের ও তিনি খাতবদলের সাহিত্যিক। কবিতায় যিনি এমন কথা বলেন —

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
— আমি কবি যত ইতরের!

তাঁকে রাবীন্দ্রিক মনে করা অর্থহীন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ - 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৫০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় সাধারণ মানুষের, তুচ্ছ মানুষের হতাশ এবং নীরক্ত জীবনের ছবি অনেক আছে। 'হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই/সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভিড়' — সেই বেনামী বন্দরের কথা কবি বলেন, এমনকি মন্বন্তরের সেই সব নিরন্ন কংকালসার মানুষের কথাও নিবিড় মমতায় বলেন —

'নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ চিত্র বিদ্রূপ বিকৃত।
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে বসে বসে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়। (ফ্যান)

তবু হতাশাই জীবনের শেষ কথা, কবি তা মানেন না, তাঁর কথা হল - 'হৃদয়ে কি জং ধরে। পুরোনো খাপে!' সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্র যথেষ্ট আধুনিক কিনা এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে, অবক্ষয়কেই সর্বোচ্চ মূল্য দেন কিনা এ সম্বন্ধেও আমরা নিঃসংশয় হতে পারি না, কিন্তু এমন কবিতা যিনি লেখেন তিনি যে প্রথম শ্রেণির কবি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই —

'সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরেই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে পুঁজি যা আছে ভাণ্ডায়।

তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।' (মুখ)

২.৪.১২.৫.৫ : অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯)

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কবি অজিত দত্ত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে, কিন্তু কবিতায় প্রকাশিত তাঁর মানসিকতা সঠিক ভাবে বিচার করলে তাঁকে রাবীন্দ্রিক না বলে উপায় নেই। লেখার ভঙ্গি অবশ্যই কিছু আলাদা, যিনি এমন আধুনিক ভঙ্গিতে কবিতা লেখেন —

'প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে-
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।' (নইলে)

তাঁকে অনাধুনিক বলে রায় দেওয়াও শক্ত।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা; রাবীন্দ্রিক ঢঙ বর্জন করা এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতকে অস্বীকার করাই ছিল এঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন — জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারায় সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চিত্ররূপময়', বুদ্ধদেব বসু বলেছেন - 'নির্জনতম কবি'। জীবনানন্দের কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'ঝরাপালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) ও 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) উল্লেখযোগ্য। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার প্রধান সুর পৃথিবী ও মানুষকে ভালোবাসা, কিন্তু কাব্যআঙ্গিক, ভাষা ব্যবহারে আধুনিকতার প্রমাণ আছে। উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ হল 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫) প্রভৃতি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ যুগের সঙ্কটকে অনুভব করেন, কিন্তু কোথাও কোনো আশা তিনি দেখতে পান না। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' (১৯৩০)। তারপর 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৪), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬), 'দশমী' (১৯৫৬) রচনা করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণ মানুষের, তুচ্ছ মানুষের হতাশ এবং নীরক্ত জীবনের ছবি আঁকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৫০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬) প্রভৃতি। অজিত দত্তের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্টচাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৯৪৭), প্রভৃতি। আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সব্যসাচী বলা যায় বুদ্ধদেব বসুকে। কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে 'মর্মবাণী' (১৯২৫), 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) প্রভৃতি। বিষ্ণু দের কবিতায় দেশী ও বিদেশী পুরাণের সঙ্গে মার্কসীয় চেতনা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। সেইজন্য আধুনিক কবিতার অন্যতম স্থপতি কবি বিষ্ণু দে। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ — 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০) প্রভৃতি।

অজিত দত্তের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম - 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্ট চাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৯৪৭), 'ছায়ার আলপনা (১৯৫১)। শেষ পর্যন্ত আস্তিক্য বিশ্বাসেই স্থিত এই কবি, সে কথা বলতেই হবে, কারণ তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন -

'ধরণীর কোণে কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত পদ্মের ভয়ে কেঁপে ওঠে তাহার মৃণাল (সনেট)

প্রশ্ন :

১। রবীন্দ্রোত্তর তিনজন কবির নাম কর ?

২। রবীন্দ্রোত্তর কবিতার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩। 'ঝরাপালক' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ কাল কত ? কবির নাম কি ?

৪। অমিয় চক্রবর্তীর দুটি কাব্যের প্রকাশ কাল সহ নাম লেখ।

৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি কাব্যের নাম কর।

৬। 'কুসুমের মাস' কার লেখা।

৭। 'বন্দীর বন্দনা'র প্রকাশ কাল কত ? কবির নাম কি ?

৮। 'চোরাবালি' কার লেখা ? প্রকাশ কাল কত ?

১.৫.৩.৫.৬ : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সব্যসাচী বলা যায় বুদ্ধদেব বসুকে। একদিকে যেমন তিনি নিজে আধুনিকতার লক্ষণ নির্দিষ্ট করার মতো সচেতন কাব্য প্রয়াস চালিয়েছেন, অন্যদিকে, 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি আধুনিক এই আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, আধুনিক কবিদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং সযত্নে তাঁদের কবিতা ছেপেছেন।

আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে বুদ্ধদেবকে যত বড়ো মনে হয়, কবিতা সৃষ্টি থেকে ঠিক সেই মাপের সর্বদা মনে হয় না। তার অর্থ এই নয়, যে তিনি বড়ো মাপের কবি ছিলেন না, কিন্তু সচেতন ভাবে একটি আন্দোলনের শরিক হতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক কাব্যরচনাকে তিনি অনেক সময়ই চাপের মধ্যে রেখেছেন। 'কঙ্কাবতী' কবিতায় যখন কঙ্কাবতীর 'নতুন ননীর মতো তনু'র মধ্যেও 'কুৎসিতকঙ্কাল' দেখতে পান তখন দৃষ্টিশক্তির এই রঞ্জনরশ্মিকে আমাদের অধিকন্তু মনে হয়। তিনি যখন লেখেন —

'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি; —

তখন আমরা যেন অনতিকাল পূর্বে শোনা মোহিতলালের কবিতাই স্মরণ করতে পারি। অথচ কবি যখন 'জোনাকি'র মতো আশ্চর্য সুন্দর কবিতা শোনান, কিংবা 'অনাম্নী অঙ্গনা' অথবা 'প্রথম পার্থের' মতো কাব্যনাট্য লেখেন, আমরা বিস্মিত হই কবির নিজের প্রতি বিশ্বাস দেখে। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে কাব্যনাট্য লিখেছেন সেই একই বিষয় নিয়ে তিনি নিজে লেখেন এবং তার স্বতন্ত্র স্বাদে আমরা অভিভূত হই।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন প্রচুর। কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধও সমানে লিখে গিয়েছেন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মর্মবাণী' (১৯২৫), 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) প্রভৃতি। বুদ্ধদেব যখন আন্দোলনের কথা কিছুটা ভুলে সম্পূর্ণ নিজের মতো কবিতা লিখেছেন তা কত আধুনিক, স্বতন্ত্র এবং সুন্দর এই কবিতা থেকে বোঝা যাবে :

'ভুলিবো না' - এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা! তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণ-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে — তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।' (কোনো মৃতার প্রতি)

২.৪.১২.৫.৭ : বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

আধুনিক কবিতার অন্যতম স্থপতি কবি বিষ্ণু দে। আধুনিক কবিদের কারো কারো কবিতায় পাণ্ডিত্য ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছে, বিষ্ণু দে-র কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা যায়। দেশি ও বিদেশী পুরাণ — প্রধানত গ্রিক পুরাণের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় কিছুটা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাঁর কবিতার সঠিক অনুধাবনে পুরাণের জ্ঞান বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে। রোমান্টিকতার অভাব কবি বিষ্ণু-দের কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর সমাজ-সচেতনতা। কবিতায় মার্কসীয় চেতনা, সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাস শোষক সমাজের প্রতি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর কোনো কোনো পর্বের কবিতায় অত্যন্ত প্রবল। প্রথম পর্ব অপেক্ষা উত্তরপর্বের কবিতায় তিনি অপেক্ষাকৃত সরল, ফলে বোধগম্যতাও অনেক বেশি।

বিষ্ণু দের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম - 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) প্রভৃতি।

শব্দপ্রয়োগের জটিলতা বিষ্ণু দের কবিতাকে কোথাও কোথাও জটিল করে, যেমন —

'স্বসমুখ সে কোন দেবতার দ্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল!
আমারই শেফালী জেবলী কেবল ঝরে জবাসংকাশে!

পুরাণ ও মিথের ব্যবহার কবিতার পৃথক অঙ্গের উদাহরণ —

'শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি, ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎ-মাধুরী লুট করে ফিরি, জয় জয় ট্রয়লাস।
উল্লাসে গায় পালে পালে কৃতদাস।'

বিষ্ণু দে-র অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'-এর বিভিন্ন অর্থ একসময় পাঠকসমাজকে আলোড়িত রেখেছিল। এর প্রথম চারপংক্তি এইরকম —

'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি —
কোথায় ঘোড়সওয়ার।'

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু পংক্তি বিষ্ণু দে ভিন্ন অর্থে ভিন্ন প্রেক্ষিতে সুন্দর ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ কবিতা 'টপ্পা টুংরি' থেকে কয়েকটি অংশ সংগ্রহ করা যায় —

'সূর্যদেব, এখানে নামলো সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়াঁর সন্ধ্যা।
....
বাসের একী শিংভাঙা গোঁ।
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট-
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
....
পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়।'

২.৪.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী
২. আধুনিক বাংলা কবিতা : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়
৩. একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু
৪. কবিতার চিত্রমালা : সুমিতা চক্রবর্তী

২.৪.১২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর্বগুলির পরিচয় দাও।

২. রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. জীবনানন্দের কাব্যব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেন, আলোচনা করো।

৪. সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু'র কাব্য প্রতিভা আলোচনা করো।

৫. যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল রবীন্দ্র-বিরোধী না রবীন্দ্র অনুগত — আলোচনা করো।

৬. কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

২.৪.১৩.১ : ভূমিকা

২.৪.১৩.২ : রবীন্দ্র-প্রবন্ধ

২.৪.১৩.৩ : রামেন্দ্রসুন্দর

২.৪.১৩.৪ : সবুজপত্র যুগ

২.৪.১৩.৫ : সবুজপত্র-উত্তর

২.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৪.১৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৩.১ : ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশেই প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। বাংলা প্রবন্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বাংলার প্রথম প্রাবন্ধিক বলেছিলেন সেই অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধের সূচনা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'তত্ত্ববোধিনীর' পর 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের নেতৃত্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি। বস্তুত 'বঙ্গদর্শন'-এর মাধ্যমেই প্রবন্ধে যুক্তির ভাষা ও তথ্যের ভাষা মিশে গেল। প্রবন্ধ সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠল বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করেই।

২.৪.১৩.২ : রবীন্দ্র-প্রবন্ধ

এসব উনবিংশ শতাব্দীর কথা। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা। বস্তুত স্বদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধগুলিই বাংলায় যথার্থ রাজনৈতিক প্রবন্ধের সূচনা করে। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকায় একের পর এক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হতে লাগল। 'স্বদেশ' (ভাদ্র

১৩১১), 'সফলতার সদুপায়' (চৈত্র ১৩১১), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (বৈশাখ ১৩১২), 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (আশ্বিন ১৩১২) প্রভৃতি প্রবন্ধ বিষয় ও গদ্যভাষার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য মহাকবির হাতের গদ্য, কিন্তু তা মোটেই পদ্য গন্ধী নয়। তাছাড়া তাঁর প্রবন্ধই সর্বপ্রথম বাঙালি পাঠককে জাতীয়তার স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করে দেয়।

বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা। বিষয় ও রচনা বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' (ভাদ্র ১৩১১), 'সফলতার সদুপায়' (চৈত্র ১৩১১), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (বৈশাখ ১৩১২) গদ্যভাষার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে সাহিত্যভাবনা সুস্পষ্ট। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'পঞ্চভূত' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শেষজীবনে 'কালান্তর' (১৯৩৭) ও 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব পেয়েছে।

বিষয় ও রচনা বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁর বিষয়ের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি তো বটেই শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। 'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যের পথে'-র মতো গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তাঁর সাহিত্যভাবনার পরিচয় সুস্পষ্ট। আবার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' যা 'পঞ্চভূত'-এর মতো গ্রন্থে তিনিই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম Personal Essay বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' রচনার সূত্রপাত করেন। শেষ জীবনে 'কালান্তর' বা 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্ব পায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটই তাঁকে বিচলিত করে সবচেয়ে বেশি। বস্তুত এই সব প্রবন্ধে তাঁর যে সমস্ত মতামত প্রকাশিত হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। মহাকবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রবন্ধের ভাষায় কোথাও কাজের এলানো ভাষা নেই, তা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অথচ কোথাও তাঁর ভাষা নীরস বা আকর্ষণহীন হয়ে পড়েনি।

প্রশ্ন :

১। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের লেখক কে?

২। রবীন্দ্রনাথের দুটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নাম কর।

৩। 'কালান্তর' প্রবন্ধের প্রকাশ কাল কত? এর মূল বিষয় কি?

২.৪.১৩.৩ : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথের পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমস্ত প্রাবন্ধিকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) নাম প্রথমেই মনে পড়বে। নিজে বিজ্ঞানের কৃতি অধ্যাপক ছিলেন, নিয়মিত দর্শন চর্চা ছিল তাঁর সাধনা। তাই তাঁর প্রবন্ধ *গ্রন্থগুলি* প্রধানত বিজ্ঞান ও দর্শনের সহায়ক। অথচ, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সরস ও সাহিত্যগুণ সমন্বিত। 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), অথবা 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) প্রভৃতি গ্রন্থে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছে। আবার 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) প্রভৃতি গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক মনকে খুঁজে পাওয়া যায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরেই এই পর্বের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। বস্তুত তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাতেই প্রথম বাংলা চলিত ভাষার গুরুত্ব স্বীকৃত হল। চলিত গদ্যে কিছুটা শ্লেষাত্মক

ভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধগুলি প্রমথ চৌধুরীর প্রখর পাণ্ডিত্য, মার্জিত রুচি ও সাহিত্যবোধের নিদর্শন। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি সরস ভঙ্গিতে যে সমস্ত রচনা লিখেছিলেন তার মধ্যে কিন্তু বিদ্বেষ বা ঈর্ষার জ্বালা নেই, আছে মার্জিত কৌতুক। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল, 'তেল-নুন-লকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯) প্রভৃতি। 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি। অন্নদাশঙ্কর কথাসাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও প্রচুর। প্রমথ চৌধুরীর বাকচাতুর্য ছিল তাঁর অনায়াস আয়ত্ত, আবার তাঁর সঙ্গে মিশেছিল মননশীলতা ও রসবোধ। তবে প্রমথ চৌধুরীর পরেই সবুজপত্র গোষ্ঠীর সেরা প্রাবন্ধিক বোধ হয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি একেবারেই বেশি লেখেন নি। কিন্তু যাকে প্রসাদগুণ বলে তাঁর গদ্যে তা পুরোপুরি আছে। তথ্য আছে, তত্ত্ব আছে আবার সাহিত্যও আছে পুরোমাত্রায়। এই কারণেই তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-র মতো গ্রন্থ সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিজে বিজ্ঞানের কৃতি অধ্যাপক ছিলেন, ও নিয়মিত দর্শন চর্চা ছিল তার সাধনা। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০) 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় ঘটেছে। 'চরিতকথা' (১৯১৩) ও 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) গ্রন্থে লেখকের সাহিত্যিক মনকে খুঁজে পাওয়া যায়। বীরবল ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে প্রখর পাণ্ডিত্য, মার্জিত রুচি ও সাহিত্যবোধের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'তেল-নুন-লকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯) প্রভৃতি। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকাতেই প্রথম বাংলা চলিত ভাষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।

প্রশ্ন :

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দুটি প্রবন্ধের নাম কর।

২। প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি ছিল? তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন?

৩। প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধের নাম লেখ।

২.৪.১৩.৪ : সবুজপত্র যুগ

'সবুজপত্রে'র পর যে পত্রিকাটি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বাংলাপ্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটা হ'ল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত অভিজাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' (১৯৩১)। এই পত্রিকায় একদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের দার্শনিক প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল। এই পত্রিকার প্রাবন্ধিকেরা উচ্চশিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী। তাই এদের প্রবন্ধের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য ঘেঁষা। আবার এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় সমালোচিত হচ্ছিল বলে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার একটা আন্তর্জাতিক মান 'পরিচয়' তৈরি করে দিয়েছিল। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতারা হলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার প্রভৃতি। বস্তুত, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক সঙ্কটকে একদিকে যেমন এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি শিল্প সাহিত্যের জগতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ বিষয়ক প্রবন্ধের সূচনাও এখান থেকেই।

'পরিচয়' এর দ্বিতীয় পর্যায়ে (অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্ব থেকে) এতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকতর রাজনৈতিক মাত্রা পায়। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, বামপন্থী শিল্পসাহিত্য প্রচার — প্রবন্ধের এগুলিই মূল উপজীব্য হয়ে হয়ে ওঠে। গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের শিল্পগত উৎকর্ষ তেমন বৃদ্ধি না পেলেও এর বিষয়ের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে না। সিনেমা, থিয়েটার, বিভিন্ন খেলাধূলো সব কিছুই এখন প্রবন্ধের বিষয়। তবে এগুলির বেশির ভাগই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য রচিত। তাই এদের দায়িত্ব নেই। কিন্তু সম্প্রতি অর্থনীতি, বিজ্ঞান বা ইতিহাস নিয়ে অতি উৎকর্ষ মানের প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। ভবতোষ দত্ত, অম্লান দত্ত, অমলেশ ত্রিপাঠী বা তপন রায়চৌধুরীদের বিষয়গৌরবের পাশাপাশি রয়েছে রচনা রস সম্ভোগের উপাদান। বিজ্ঞানের দুটি বিষয়কে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বা জগদীশচন্দ্র বসু যে শিল্পগুণসম্পন্ন প্রবন্ধ রচনার ধারার সূচনা করেছিলেন সেই উদাহরণ উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখা গেছে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিদের রচনায় এই ধারাটি ক্রমশই সমৃদ্ধ হচ্ছে। বিজ্ঞানের জটিলতর বিষয়গুলিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করাটা এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।

> *বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত অভিজাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' (১৯৩১)। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতারা হলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার প্রভৃতি। এইসব লেখকদের প্রবন্ধের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য ঘেঁষা। 'পরিচয়' এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, বামপন্থী শিল্পসাহিত্য প্রচার মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে। গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যেকোন বিষয় নিয়েই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ভবতোষ দত্ত, অম্লান দত্ত, অমলেশ ত্রিপাঠী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম করতেই হয়।*

প্রশ্ন :

১। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকের নাম কি?

২। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এমন দুজন প্রাবন্ধিকের নাম কর।

২.৪.১৩.৫ : সবুজপত্র-উত্তর

বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনাও বিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে চোখে পড়ছে। শচীন্দ্রনাথ তো বটেই পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল ও রমেশচন্দ্র সেনগুপ্তরাও এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ব্যাপারে মোহিতলাল মজুমদারের কথা উল্লেখ করতেই হয়। কোনো পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ না করে তিনি একটি নিজস্ব সমালোচনা সূত্রের প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের মূল্যায়নে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল'-এর মতো গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতা মূল্যায়নের একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বাগত' প্রবন্ধগ্রন্থের রচনাগুলি বা 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটি

আধুনিক দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমালোচক তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে পাশ্চাত্য সমালোচনার মানদণ্ডে বাংলা উপন্যাসকে বিচারের প্রয়াস করেছেন। উপন্যাস সমালোচনায় এই সামগ্রিক প্রয়াস এর আগে লক্ষ করা যায়নি। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' অথবা দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন। রাজশেখর বসুর প্রবন্ধগুলি তাঁর বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ ভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন। হিউমারিষ্ট-পরশুরামকে এখানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখকেরা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ পঞ্চাশের দশক থেকেই কোনো প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন সংযোজন ঘটিয়েছেন। তাদের প্রবন্ধগুলি প্রধানত দেশ বিদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি অবলম্বনে রচিত। এই প্রবন্ধ লেখকেরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। তাই এই প্রাবন্ধিকেরা স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী। এদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, মুজফফর আহমেদ, মুহম্মদ শাহীদুল্লা, অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ শতক পার হয়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বর্তমানে একুশ শতকে পা দিয়েছে। এই নতুন শতকে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন ধারার সংযোজন ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই।

> *মোহিতলাল মজুমদার পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ না করে একটি নিজস্ব সমালোচনা সূত্রের প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার মূল্যায়নের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বাগত' প্রবন্ধগ্রন্থ বা 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধ আধুনিক দৃষ্টিতে রচিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে পাশ্চাত্য সমালোচনার মানদণ্ডে বাংলা উপন্যাসকে বিচার করেছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর বসুর প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ ভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন। মার্কসবাদ বিশ্বাসী লেখকরা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ - পঞ্চাশের দশক থেকেই নতুন সংযোজন ঘটিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, মুজফফর আহমেদ প্রমুখের নাম করতেই হয়।*

প্রশ্ন :

১। 'কালের পুতুল' গ্রন্থের লেখক কে?

২। 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের লেখক কে?

৩। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ - পঞ্চাশের দশকের দুজন মার্কসবাদী লেখকের নাম কর।

২.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা — ড. অধীর দে

২. সাহিত্য সম্পুট — প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয় খণ্ড

৩. বাংলা সমালোচনা সাহিত্য — ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৪. কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২.৪.১৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২. ‘সবুজপত্রে’র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩. ‘সবুজপত্র’কে কেন্দ্র করে যে তরুণ প্রাবন্ধিকদের উত্থান হয়েছিল তা আলোচনা করো।

৪. প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরিচয় দাও।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার পরিচিতি

বিন্যাস ক্রম

২.৪.১৪.১ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)
লেখক পরিচিতি
দেবী

২.৪.১৪.২ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)
লেখক পরিচিতি
তারিণী মাঝি : গল্প পরিচিতি

২.৪.১৪.৩ : সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)
লেখক পরিচিতি
পাদটীকা : গল্প পরিচিতি

২.৪.১৪.৪ : সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)
লেখক পরিচিতি
পরশুরামের কুঠার : গল্প পরিচিতি

২.৪.১৪.৫ : সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)
লেখক পরিচিতি
একটি রাত : গল্প পরিচিতি

২.৪.১৪.৬ : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৫-১৯৭৯)
লেখক পরিচিতি
জটায়ু : গল্প পরিচিতি

২.৪.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৪.১৪.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৪.১ : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

লেখক পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠার পর সেই ধারা সম্যক্‌ভাবে অব্যাহত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ঔৎকর্ষে তথা জনপ্রিয়তায় যে স্থান অধিকার করেছিলেন তা শুধু বাঙালি পাঠকের মধ্যে সীমিত থাকেনি। সেই খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন পটভূমিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প সংকলন প্রকাশ করে সাধারণ পাঠকের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁকে সেকালের পাঠক ফরাসী গল্পকার 'মোঁপাসা' বলে সম্মানিত করলেও প্রভাতকুমারের গল্পে ততখানি মুন্সিয়ানা বা গভীরতা ছিল না। সহজ সরল আবেদনে ঘরোয়া ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর শতাধিক গল্প। নবকথা (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯) গহনার বাক্স (১৯২১) ইত্যাদি সংকলন গ্রন্থে প্রভাতকুমারের গল্পগুলি স্থান পেয়েছে।

দেবী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সরস ও হার্দিক গল্পগুলির মধ্যে 'দেবী' গল্পটি কিছুটা ব্যতিক্রমী। এই গল্পে প্লট, বক্তব্য, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বগত এমন বিশিষ্ট ভাবনা সাবলীলভাবে বিধৃত হয়েছে যে পাঠকের মনে তা চিরস্থায়ী আবেদন রেখে দিতে সক্ষম।

গল্পের প্রথমেই লেখক বলেছেন "সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা"। অর্থাৎ উনিশ শতকের শুরুতে একদিকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানব্রতী নবীন দৃষ্টি-ভঙ্গির উদ্ভাসন, অন্যদিকে বহু যুগবাহিত অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাংলা এই দুইয়ের মধ্যে যে অসহায় দূরত্ব এবং অপ্রতিরোধ্য অন্যায় তারই একটি বিশ্বাস্য দলিল 'দেবী' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ফরাসী গল্পকার 'মোঁপাসা' বলে সম্মানিত করা হয়। সহজ সরল আবেদন, ঘরোয়া ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর শতাধিক গল্প। 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গহনার বাক্স' (১৯২১) উল্লেখযোগ্য গল্প। প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পে প্লট, বক্তব্য, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বগত বিশিষ্ট ভাবনা সাবলীলভাবে বিধৃত হয়েছে যা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী আবেদন রেখে দিতে সক্ষম।

বিশ বছরের যুবা উমাপ্রসাদ তার ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী দয়াময়ীকে সাংসারিক বিধিনিয়ম ও চৌহদ্দীর বাইরে নিজের কর্মস্থানে নিয়ে গিয়ে একান্তে পেতে চায়। সেই পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন হতে না হতেই উমাপ্রসাদের কালীসাধক বিপত্নীক পিতার স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত উমা ও দয়ার সুখস্বপ্নকল্পনার ওপরে আছড়ে পড়ে। কালীকিঙ্কর তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূর মধ্যে জগন্মাতা কালীকে প্রত্যক্ষ করেছেন স্বপ্নে। তাই তিনি দয়াময়ীর ঐশী শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার করতে থাকেন। "দয়াময়ী ছিল মানবী — সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।"

দয়াময়ী প্রণম্যা - তার শ্বশুর, গ্রামের মানুষ, এমনকি স্বামীরও। গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখক দেখিয়েছেন এই অল্পবয়সী, সরল মেয়েটির মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য। প্রথমে সে নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি, বিড়ম্বিত বোধ করেছে ও কষ্ট পেয়েছে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে যাবার সম্ভাবনায়। কিন্তু ভক্তদের সমবেত উচ্ছ্বাসে, কিছু কাকতালীয় ঘটনায় ক্রমে সে নিজেকে দেবী বলে ভাবতে শুরু করেছে। স্বামীর আহ্বান ফিরিয়ে দিয়ে দেবীত্বেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে। উমাপ্রসাদ নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে ভাঙা মন নিয়ে ফিরে গেছে। গল্পের ট্র্যাজেডি এরপর ভয়ানক রূপ নিয়ে কালীকিঙ্করের গৃহে প্রবেশ করেছে। উমার দাদা

তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান সকলের স্নেহের কেন্দ্রবিন্দু খোকা অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার-বৈদ্যের চিকিৎসার বদলে দয়াময়ীর দয়া ও চরণামৃতের ভরসায় পরম বিশ্বাসে সমর্পণ করা হয়েছে। শিশুটি বাঁচেনি। বিভ্রান্ত, আত্মভ্রষ্ট, সর্বোপরি আত্মগ্লানিতেও অপরাধবোধে দয়াময়ী আত্মহত্যা করেছে।

গল্পটিতে মূঢ় সমাজশক্তি যে কতো নিষ্করুণভাবে মানুষের জীবনে অভিশম্পাত ঘনিয়ে আনে, তারই রূপায়ণ ঘটেছে। একটি পরিবারের ওপরে এমন বিপর্যয়, দুটি অকালমৃত্যুর নিষ্ঠুরতার কারণ — অযৌক্তিক অন্ধ বিশ্বাস। যে প্রেমমধুর দাম্পত্য চিত্রটি দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছিল, তার অভাবিত বৈপরীত্যসূচক পরিণাম পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়। লেখকের কোনও উক্তি বা নির্দেশ নয় — একটি সুবলয়িত প্লটে বাস্তবধর্মী চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে তাঁর এক করুণ প্রশ্নই যেন তিনি গল্পপাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেন।

প্রশ্ন :

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে কোন ফরাসী গল্পকারের সঙ্গে সম্মানিত করা হয়?

২। প্রভাতকুমারের দুটি গল্প সংকলন গ্রন্থের নাম কর।

২.৪.১৪.২ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

লেখক পরিচিতি

রাঢ় বঙ্গের উচ্চ অভিজাত বংশে জন্ম নিয়েও তারাশঙ্কর পরিপার্শ্বের অধস্তন সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দেশ সম্বন্ধে সংবেদনশীল মানুষটি কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে এসে আই.এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে অন্তরীণ হবার, পরে কারাবরণের অভিজ্ঞতা তারাশঙ্করের জীবনে ঘটেছিল। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ অর্থনৈতিক বিভেদের ভয়ানক রূপ, দেশব্যাপী শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের অস্থিরতা ও বিদ্রোহ প্রবণতা - সবই তিনি নিরাসক্ত শিল্পীদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জীবনশিল্পীর তুলিতে বিচিত্র ভাঙনের ছবি এঁকেছেন নানা রঙে। 'গণদেবতা' বা 'জলসাঘর', 'আরোগ্য নিকেতন' কিম্বা 'রসকলি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কি 'বেদেনী'র মতো উপন্যাস ও ছোটগল্পে বাংলার মাটি এবং প্রাণ অনাস্বাদিতপূর্বভাবে রূপ পেয়েছে। গবেষকের তথ্যে তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০।

তারিণী মাঝি : গল্প পরিচিতি

বহু পঠিত তারিণী মাঝি গল্পটির শিরোনাম চরিত্র নামানুসারে। দীর্ঘ গল্পের প্রথমাংশে ময়ূরাক্ষীর বুকে খেয়া পারাপারের কাণ্ডারী সহৃদয় রসিক তারিণী মানুষটি পাঠকের চিত্তে স্থান করে নেয়। যান্ত্রিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করে না তারিণী। গ্রামের সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রার মধ্যে পরিচিত লোকগুলিকে অত্যন্ত যত্নে - দায়িত্বে অভিভাবকের মতো নিরাপদে নদী পার করিয়ে দেয়। তারিণী নিঃসন্তান। কিন্তু তার গৃহিনী সুখীকে নিয়ে তার সংসারজীবনে কোনও অসুখই ঠাঁই পায়নি। ভরাট-প্রসন্ন গলায় একথা কবুল করে সে যথার্থ পুরুষোচিতভাবে।

গল্পের দ্বিতীয়াংশে ময়ূরাক্ষীর বুক শুকিয়ে ওঠে অনাবৃষ্টিতে। তার প্রভাব তারিণী ও সুখীর জীবনেও পড়ে - পার করবার প্রয়োজনই না থাকলে পারানি থেকে উপার্জন হবে কিভাবে! কিন্তু সেই সঙ্কটও এই দম্পতি পার হয়ে যায়। তারপর আচমকা আসে বন্যা। কাণ্ডারী তারিণী তার স্ত্রীকে নিয়ে কুটোর মত জলে ভেসে যেতে থাকে। ময়ূরাক্ষী ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে গজরায়, তার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে বাতাসের অট্টহাসি আর অবিরাম বর্ষণের শব্দ। কখনো ডুবে, কখনো ভেসে দুজনে একসাথে চলতে চলতে ঘূর্ণীর টানে পড়ে যায় সুখী বিপজ্জনকভাবে, প্রাণপণে স্বামীকে সর্বশক্তি দিয়ে সে আঁকড়ে ধরে। তারিণীও এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে প্রাণরক্ষার আদিম তাড়নায় প্রবলভাবে লড়াই করে। একটু বাতাসের একতম লক্ষ্যে কখনো জল খামচে ধরে, পরক্ষণেই স্ত্রীর গলা পেষণ করে নিজেকে ছাড়িয়ে ডুবন্ত মানুষের প্রাণরক্ষার উপায়মাত্র খুঁজে পায় অবচেতনেই। কুটিল ও নিষ্ঠুর ময়ূরাক্ষীর আদিম ভয়াল ক্রূরতা — তারিণীর আদিম প্রাণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে যায়। সেই তাগিদ থেকে তারিণী, যে কিনা অক্লেশে এবং কখনো জীবন বিপন্ন করেও অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে, সেই আত্মরক্ষার জন্য মরীয়া হয়ে সোহাগিনী স্ত্রীর শ্বাসরোধ করেছে। উৎপাটিত করেছে তার শ্বাসবায়ুর প্রতিবন্ধককে। মানুষের প্রথম ও আদি প্রেরণার এমন অর্ব্যথ সত্যকে 'তারিণী মাঝি'র প্লট ও থীম হিসেবে সার্থক শিল্পে উত্তীর্ণ করেছেন তারাশঙ্কর।

> *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ অর্থনৈতিক বিভেদের ভয়ানক রূপ, দেশব্যাপী শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের অস্থিরতা ও বিদ্রোহ প্রবণতা - সবই তিনি নিরাসক্ত শিল্পীদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'গণদেবতা', 'জলসাঘর', 'আরোগ্য নিকেতন' কিম্বা 'রসকলি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কি 'বেদেনী'-র মতো উপন্যাস ও ছোটগল্পে বাংলার মাটি এবং প্রাণ ফুটে উঠেছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি এক উল্লেখযোগ্য নাটক। মানুষের প্রথম ও আদি প্রেরণার এমন অব্যর্থ সত্যকে 'তারিণী মাঝি'র প্লট ও থীম হিসেবে সার্থক শিল্পে উত্তীর্ণ করেছেন তারাশঙ্কর।*

প্রশ্ন :

১। 'জলসাঘর' কার লেখা?

২। 'গণদেবতা' ও 'হাঁসুলীবাকের উপকথা'র প্রকাশ কাল কত ?

৩। 'তারিণী মাঝি' গল্পের নায়ক নায়িকার নাম কি ?

২.৪.১৪.৩ : সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

লেখক পরিচিতি

একটি সাহিত্য-রসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন মুজতবা আলী। তারপর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মাতৃভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা (ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'বাঙ্গালীর সাধনা' ও 'আকাঙ্ক্ষা' বক্তৃতাদ্বয়) শোনার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠির জবাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি চলে যান শান্তিনিকেতনে। শুরু হয় জীবনের নব অধ্যায়। অসাধারণ

> *সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে ও বিদেশে', 'পঞ্চ তন্ত্র', 'চাচাকাহিনি' প্রমুখ উপন্যাস শ্রেষ্ঠ। 'শ্রেষ্ঠগল্প', সংকলনে ও অন্যত্র প্রকাশিত কিছু গল্প, 'শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা', 'বড়বাবু' ইত্যাদি রচনায় তাঁর রসস্নিগ্ধ আন্তর্জাতিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার 'পাদটীকা' উল্লেখযোগ্য গল্প।*

মেধাবী, বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত, মনস্বী, সুরসিক এই মানুষটির মানসিক ঋদ্ধি এবং বাক্‌পটুতা তাঁকে করে তুলেছে সাহিত্যজগতে ব্যতিক্রমী নক্ষত্রস্বরূপ। মনস্বিতা এবং মজ্‌লিশী এই দুই আপাতবিরোধী গুণের সমন্বয়ে দুর্মূল্য মণিখচিত অলঙ্কারের মতো মুজতবা আলীর কথাসাহিত্য 'দেশে ও বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনি' প্রমুখ উপন্যাস, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' - সংকলনে ও অন্যত্র প্রকাশিত কিছু গল্প, 'শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা', 'বড়বাবু' ইত্যাদি রচনায় তাঁর বৈচিত্র্য দীপিত মনন আর রসস্নিগ্ধ আন্তর্জাতিক মনের পরিচয় আছে।

প্রশ্ন :

১। সৈয়দ মুজতবা আলীর দুটি উপন্যাসের নাম কর?

পাদটীকা : গল্প পরিচিতি

উত্তম পুরুষে লেখা স্মৃতিচারণমূলক গল্পটিতে ইংরেজ রাজত্বের আগে আমাদের দেশীয় টোল-চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত-শিক্ষক পণ্ডিতসমাজ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন লেখক। আসলে নতুন ইংরেজি আমলে যখন ইংরেজি ও মাতৃভাষাসমেত বিদ্যাশিক্ষার নীতি নতুনভাবে প্রবর্তিত হলো, তখন টোলের পণ্ডিতেরা শিক্ষায়তনে নিজেদের সম্ভ্রম খোয়ালেন তো বটেই, সর্বৈব অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে পড়লেন। তাঁদের বঞ্চনা, হতাশা, অসহায় ক্ষোভ হয় ছাত্রদের প্রতি বিষোদগারে, নয়তো সর্বশোকতাপহর নিদ্রাচ্ছন্নতায় পর্যবসিত হতো। স্কুলছাত্রের বাল্যস্মৃতিতে পণ্ডিত মশায়ের ভাবটি এইরূপ নিখুঁতভাবে ধরা ছিল; লেখক তারই একটি সরস কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু একটি স্মৃতিমূলক চিত্রমাত্র হলে রচনাটির মান ছোটগল্প-শিল্পরূপ হিসেবে স্বীকৃতি পেতো না। পণ্ডিতমশায়কে নিয়ে একটি চরিত্রমুখ্য আখ্যানমাত্র হয়ে থাকেনি গল্পটি। সাধারণভাবে পন্ডিতের বাক্‌তীক্ষ্নতা, বিদ্রূপপ্রবণতা, শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে গালিগালাজ, আচরণে ও কথায় এমনকি হেডমাষ্টারকে পর্যন্ত ছোট করে দেখাবার প্রবণতা — এই সবই ভিন্ন দিকে ঘুরে যায় একটি ঘটনায়। ঘটনাটি হল ইংরেজ লাটসাহেবের স্কুল পরিদর্শনে আগমন। চিরকালের চেনা ধুতিচাদর সম্বলিত পণ্ডিতমশায় সাহেবের তথা স্কুলের সম্মান রাখতে সেদিন ঊর্ধ্বাঙ্গে গেঞ্জি চাপিয়ে আসেন। অনভ্যস্ত আবরণে বিজাতীয় অসহ্য কন্ডূয়নের শিকার হন। তাঁর এই হেনস্থায় সহকর্মী ও ছাত্রেরা মজা পেলেও পণ্ডিতমশায়ের জন্য হাসি আর বিদ্রূপই বরাদ্দ করেননি লেখক। তিনদিন স্কুলছুটির পর আবার ক্লাস। পন্ডিত সেই ক্লাসে ছাত্রদের কাছে বসিয়ে একটি তথ্য দিলেন। লাট সাহেবের সঙ্গী তাঁর তিন-ঠ্যাং ওয়ালা (পোষ্য) কুকুরটির বাবদ মাসে খরচ পঁচাত্তর টাকা — অন্য দিকে পণ্ডিতমশায় — 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসী, দাসী একুনে আটজনা'-র সংসার প্রতিপালিত হয় তাঁর পঁচিশ টাকা মাইনেয়। অর্থাৎ লাট সাহেবের (ত্রিপদ) কুকুরের একটি পায়ের সমান পণ্ডিতের সম্পূর্ণ সংসার। এই হলো 'পাদটীকা'। সারমেয়ের পাদ-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ আসলে সমাজ বিশ্লেষণও। ছোটগল্পের ছোট পরিসরে হাস্যরসোদ্রেককারী একটি চরিত্রের অন্তরে লুকানো গভীর ব্যঞ্জনাবোধ ও অপমানিতের গ্লানি পাঠককে করুণ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। রচনাটির অনবদ্য পরিবেশন-নৈপুণ্য গল্পের বিশেষ সম্পদস্বরূপ।

২.৪.১৪.৪ : সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)

লেখক পরিচিতি

সুবোধ ঘোষ বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী লেখক একথা সকলেই স্বীকার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে সুবোধ ঘোষের উজ্জ্বল প্রবেশ। এরপর তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে অনবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনায় কল্লোলের উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। আপন জীবনবোধ ও বৈচিত্র্যদীপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকসম্পাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিলাঞ্জলি (১৯৪৪), ত্রিযামা (১৯৫৭), শতকিয়া (১৯৫৮), সুজাতা (১৯৫৭), শুন বরনারী (১৯৫৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি। সুবোধ ঘোষের অধিকতর সাফল্য ছোটগল্প রচনায়। অনেকগুলি গল্প সংকলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে ফসিল (১৯৪০), পরশুরামের কুঠার (১৯৪০), জতুগৃহ (১৯৫০), কুসুমেষু (১৯৫৬) প্রভৃতি। এছাড়া সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৯৪৩), কালপুরুষের কথা (১৯৬০) ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ, পুরাণ থেকে আখ্যান নিয়ে স্বকীয়তাসমৃদ্ধ রচনা 'ভারত প্রেমকথা' লেখক হিসাবে তাঁর আরও ব্যাপ্তির সাক্ষ্য দেয়।

> *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে সুবোধ ঘোষের উজ্জ্বল প্রবেশ। আপন জীবনবোধ ও বৈচিত্র্যদীপ্ত অভিজ্ঞতার আলোক সম্পাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 'ত্রিযামা' (১৯৫৭), 'শতকিয়া' (১৯৫৮), 'সুজাতা' (১৯৫৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি। অনেকগুলি গল্প সংকলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে 'ফসিল' (১৯৪০), 'পরশুরামের কুঠার' (১৯৪০), 'জতুগৃহ' (১৯৫০), 'কুসুমেষু' (১৯৫৬) প্রভৃতি। সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্পসংকলন 'পরশুরামের কুঠার' উল্লেখযোগ্য রচনা।*

প্রশ্ন :

১। 'ত্রিযামা' উপন্যাসটি কার রচনা ?

২। সুবোধ ঘোষের দুটি গল্প-সংকলন এর নাম কর।

পরশুরামের কুঠার : গল্প পরিচিতি

সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্প সংকলনের নাম 'পরশুরামের কুঠার'। আলোচ্য অন্তর্ভুক্ত গল্পটির নামেই লেখক সংকলনের নামকরণ করেন। এই গল্পটিকে একাধারে সমাজবিশ্লেষণমূলক চরিত্রমুখ্য গল্প বলা যায়। ধনিয়া নামে এক দরিদ্র আমড়াতলার মেটেঘরবাসী নারীর জীবনদর্পণে সমাজবীক্ষা করেছেন সুবোধ ঘোষ। ধনিয়া নিয়মিত কালান্তরে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের জন্ম দেয় মিশন জেনানা বেডের হাসপাতালে। তারপর মা একদিন বেপাত্তা হয়ে যায়। সন্তানগুলি বেড়ে ওঠে খ্রিস্টান অনাথালয়ে। ধনিয়ার জীবনধারণ নির্ভর করে দুই ধরণের পেশার ওপরে — রাত্রে তার ঘরে আগন্তুক হয় বহু পুরুষ। দিনে যেসব ধনীগৃহের প্রসূতিদের মাতৃরস শুকিয়ে গেছে, সেখানে ধনিয়া কথামৃত দান করে অর্থ উপার্জন করে। মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী' গল্পে 'দুধ-মা' ছিল সতী-সাধ্বী তার পরিণতি হয়েছে একরকম। আর সুবোধ ঘোষের 'দুধ-মা' ধনিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত হলেও তার দুধ যারা কিনেছে, দায়ে পড়ে তারা ধনিয়াকে প্রশ্রয়ও দিয়েছে। অথচ ধনিয়ার সন্তানদের ঠাঁই হয়নি সামাজিক আবহে।

ক্রমে ধনিয়ার বয়স পৌঁছেছে চল্লিশের কোঠায়। দেশে এসে গেছে কৌটো ভরা কৃত্রিম শিশুখাদ্য। ধনীবাড়ীতে ধনিয়ার ডাক তো পড়েই না — সেখানে গেলে সামান্য ভিক্ষার অতিরিক্ত কিছু পায় না সে।

গল্পের পরিণতিতে তাই দেখি ধনিয়া স্বচ্ছবস্ত্রে নিজের দেহ সাজিয়ে পসারিণী হয়ে দাঁড়িয়েছে তথাকথিত ভদ্রসমাজের লোলুপ পুত্রসন্তানদের প্রলুব্ধ করতে। মা-ধনিয়া তারই স্নেহক্ষীরধারায় লালিত পরশুরামদের কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়েছে।

পুরাণের পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। মূল্যবোধহীন ভোগসর্বস্ব সমাজে আধুনিক কৃত্রিম যান্ত্রিক সম্পর্ক কোনও মূল্যই দেয়নি 'মা'কে। পক্ষান্তরে মা'ও তার অসহায়তাকে শাপ দিয়ে প্রতিবাদে ধারালো কুঠার হয়ে উঠেছে। সমাজমনস্ক এবং গভীর বিশ্লেষক সুবোধ ঘোষের নিরীক্ষা এইভাবেই অসাধারণ একটি প্লটের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

২.৪.১৪.৫ : সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীরূপে সমাজবিপ্লবের পথে মানুষের সুষ্ঠু সুন্দর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চান যাঁরা সেই অসাধারণ মানুষের মধ্যে একজন সোমেন চন্দ। সোমেন একাধারে মার্কসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন, আবার ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী হিসেবেও নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এই সঙ্ঘের পক্ষ থেকে 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের প্রকাশনা করেন। 'ক্রান্তি'র পাতায় তাঁর 'বনস্পতি', গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল। মাত্র বাইশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে সোমেন চন্দের রচিত একটি উপন্যাস, দুটি নাটিকা, একটি কবিতা এবং 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর লেখক-রচিত উপন্যাস বাদে বাকি রচনাসমূহ পূর্বোক্ত সংকলনে চয়িত। সোমেন চন্দের বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর' স্বদেশে-বিদেশে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এমন সম্ভাবনাময় প্রকৃত মানবপ্রেমী আদর্শ তরুণ শ্রমিকনেতা একটি ফ্যাসীবিরোধী সম্মেলনে মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে বিরোধী শক্তির আঘাতে করুণ মৃত্যুবরণ করেন। বাংলার মানুষ হারায় এক মহৎ প্রাণ তথা সম্ভাবনাময় সাহিত্যিককে।

একটি রাত

গল্পটির নামকরণে আপাততভাবে রোমান্স বা রোমাঞ্চের আভাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার পরতে পরতে কোন্ সংকট, বেদনা, ভালোবাসা, মমত্ব, হতাশা, ও উজ্জীবনকে ধরে রেখেছে তারই সুনিপুণ এবং সাংকেতিক প্রকাশ আলোচ্য গল্পে।

প্রধান চরিত্র হয়তো সুকুমার। সুকুমারকে গল্পে খুব সক্রিয়ভাবে উপস্থিত করেননি লেখক। কিন্তু মা, বীণা, তার কাজের সঙ্গী সামসুর বা সুরেন, অনুগত কুকুর ভোলা এবং বিচিত্র মানুষের আবাস সেই বাড়ি, যেখানে আবাসিক সুকুমারের মা-ছেলের সংসার — এইসব মিলে সুকুমারের পূর্ণতা। রাতের শেষে যে দিন আসে, দারোগা সুকুমারদের বাড়ি সার্চ করে তেমন কিছু আপত্তিজনক দলিল না পেলেও সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে যায়, সেইখানে সুকুমারের বিস্তীর্ণ কর্মজগতের ইঙ্গিত।

'একটি রাত' গল্পে গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের ছায়া আছে বললে ভুল হবে না। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সাহিত্যশাখায় সোমেন কীভাবে 'মা'র নির্যাসটুকু গ্রহণ করলেন তাও বিস্ময়বোধক। দীনদরিদ্র ঘরের শিক্ষাদীক্ষাহীন রোগজর্জর এক মায়ের মমত্ব কেমন করে তাঁকে সংগ্রামী ছেলের পাশে নিয়ে যেতে পারে, শুধু তাই নয় — কীভাবে তার আদর্শকে আপন করে নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে পারেন তার বাস্তবসম্মত চিত্র এঁকেছেন সোমেন ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

সোমেন চন্দ রাজনৈতিক কর্মীরূপে সমাজবিপ্লবের পথে মানুষের সুষ্ঠু সুন্দর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সোমেন চন্দ 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের প্রকাশনা করেন। সেখানে তাঁর 'বনস্পতি' গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল। সোমেন চন্দের বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর' স্বদেশে- বিদেশে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সোমেন চন্দের 'একটি রাত' গল্পে অন্ধকার পরতে পরতে কোন সংকট, বেদনা, ভালোবাসা, মমত্ব, হতাশা ও উজ্জীবনকে ধরে রেখেছে তারই সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে।

গল্পশেষে সোমেন দেখিয়েছেন সুকুমার ও তারই মতো ছেলেদের ধরপাকড় করার বিরুদ্ধে শহর জুড়ে প্রতিবাদী মানুষ মিলিত হয়ে মিছিলের আকার নিয়েছে। বাইরে রাস্তায় মিছিল আর সুকুমারের অন্ধকার ঝুপসি ঘরে মা ও বীণার উৎসাহিত হয়ে পরস্পরের কাছে মনে আগল খুলে বেরিয়ে আসা — গল্পের রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে মানবিক চিরায়তে যেন মুক্তি লাভ ঘটেছে।

প্রশ্ন :

১। 'ইঁদুর' গল্পের লেখক কে ?

২। সোমেন চন্দ ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কি নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন ?

২.৪.১৪.৬ : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৫-১৯৭৯)

লেখক পরিচিতি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে সামনের সারিতে রাখবার যোগ্য, সেকথা অনেকে জানেন না। কিন্তু যাঁরা ঘনিষ্ঠ ও তন্বিষ্ঠভাবে সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁদের কাছে দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য বহুমাত্রাবিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম। প্রায় জন্মাবধি দুরারোগ্য ব্যাধিকবলিত একজন মানুষ কীভাবে এমন হৃদয়বান সামাজিক তথা রাজনৈতিক কর্মী হতে পারেন, রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পূর্ণ সততায় আত্মনিয়োগ করলেও পারিবারিক প্রতিটি সম্পর্কে সংবেদনশীল দায়িত্বশীল হতে পারেন, কিম্বা শিল্পকলা-সংগীত-নাট্যবিষয়ে এত গভীর অনুধ্যায়ীর ভূমিকা পালন করেন — দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। কম্যুনিষ্ট পার্টির নিষ্ঠিত কর্মী, পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক, ছাত্র-আন্দোলনের এই নেতার কাছে আমরা পেয়েছি বিষয়ে ও আঙ্গিকে অভিনব সাহিত্যসৃষ্টি। বিশেষ বিশেষ পটভূমিতে লেখা

দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য বহুমাত্রাবিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'শোকমিছিল', 'তৃতীয়ভুবন' বা 'বিবাহবার্ষিকী' বঙ্গভূমির রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের পটে চিরন্তন মানবতার দলিল। গল্পের মধ্যে 'চর্যাপদের হরিণী', 'হওয়া না হওয়া' ও 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই তিনটি গল্প সংকলনের গল্পগুলি বাঙালি পাঠককে আলোড়িত করেছিল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পটি 'উত্তরণ' নামে একটি পূর্ববঙ্গের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। পরিবেশ, সমাজ আর মানুষের প্রবল চাপে, জটায়ু ছিন্ন ডানা নিয়ে সৎ ও সত্যরক্ষার সংগ্রাম করেছিল।

তাঁর উপন্যাস 'শোকমিছিল', 'তৃতীয় ভুবন' বা 'বিবাহবার্ষিকী' বঙ্গভূমির রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের পটে চিরন্তন মানবতার দলিল। গল্পের শাখাটি দীপেন্দ্রের হাতে সমধিক সিদ্ধ। অসম্ভব কলমের জোরে 'চর্যাপদের হরিণী', 'হওয়া না হওয়া' ও 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই তিনটি গল্প সংকলনের গল্পগুলি দিয়েই মূলত তিনি বাঙালি পাঠককে আলোড়িত করেছিলেন — প্রমাণ করেছিলেন নিজেকে 'মুক্তিকামী মানুষের সহযোদ্ধা' লেখকরূপে। 'ঘোড়েওয়ালা' নামে রিপোর্টাজ দীপেন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের আর একটি ধারা।

জটায়ু : গল্প পরিচিতি

জটায়ু গল্পটি 'উত্তরণ' নামে একটি পূর্ববঙ্গের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। 'জটায়ু' নামে পৌরাণিক স্মৃতি উঠে আসে। কিন্তু অনুষঙ্গটুকু নিয়ে এক দুর্বিপাকের দিনের ঘর-সত্তা-মূল্যবোধ পুড়ে যাওয়া ভগ্ন আবহের কর্তিতডানা মানুষের ছবি আঁকেন। উঠে আসে দুর্গা-সন্তাপহারিণী রূপে পুরাণে যাঁর স্থান, তাঁর নামের নারীমূর্তি দীপেন্দ্রমানসে হয়েছে অন্যরকম। তার পেছনে চালচিত্র নয়, দেশভাগের আগেকার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা। আগুনে পুড়ে মারা গেছিল তার কথকতার শিল্পী গায়ক বাবা, তার মা আর দুর্গা দুজনেই নারীমাংসলোলুপতার অসহায় শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে এপার বাংলায়। নিত্যচরণের ঘরণী হবার পরও দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফিরেছে। ট্রেনের চাকার তলায় কাটা গেছে নিত্যচরণের কনুই পর্যন্ত দুহাত। দুর্গা হোটেলে চাকরী করে। তাতেই সংসার চলে। কিন্তু মনে মনে দুর্গা আতঙ্ক ও অপরাধবোধের তাড়া খেয়ে সর্বদাই ভীষণ চাপের মধ্যে থাকে, নিত্যচরণ স্ত্রীকে সন্দেহের অন্ধকার থেকে আড়াল করতে পারে না। এই পটভূমিকে হাতহীন নিত্যচরণের নৃত্যকলা রচনা করেছেন লেখক রূপকের আশ্রয় নিয়ে। উলঙ্গ ভয়াল কালীর সামনে বলির জন্য যূপযোজিত ছাগলের সামনে নৃত্যচরণের উদ্দাম নৃত্য আগুনের বেড়ার ঘেরাটোপে। সামনে অনেক দর্শকের সামনে নিত্যর স্ত্রী দুর্গা এই দৃশ্যের মধ্যে তার আতঙ্ক ও অপরাধবোধের আচ্ছন্নতায় মিলিয়ে নেয় — তার নিয়তি ও নৃত্যচরণ একই সত্তা। বাঁচার আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা নিয়েও তারা বাঁচতে পারবে না। পরিবেশ, সমাজ আর মানুষের প্রবল চাপ তাদের শত আকাঙ্ক্ষার শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে তাদের সংগ্রামকে। জটায়ু ছিন্ন ডানা নিয়ে সৎ ও সত্যরক্ষার সংগ্রাম করেছিল। নিজে মৃত্যুবরণ ক'রেও সে অশুভ ঘটনাকে রুখতে পারেনি। দুর্গা আর নিত্যচরণের সংগ্রামও একই ব্যর্থতাদ্যোতক।

২.৪.১৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সাহিত্যে ছোটগল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২. ছোটগল্পের কথা — রথীন্দ্রনাথ রায়

৩. বাংলা ছোটগল্প — ভূদেব চৌধুরী

৪. বাংলা ছোটগল্প — শিশিরকুমার দাস

২.৪.১৪.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'দেবী' গল্পে সমাজ ও মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

২. গল্পকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩. গল্পকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৪. গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫. গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৬. গল্পকার সমরেশ বসুর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৭. গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৮. গল্পকার পরশুরামের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৯. গল্পকার সুবোধ ঘোষের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১০. তারাশঙ্করের 'তারিণীমাঝি' গল্পে আদিম প্রবৃত্তি কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা বিশদ আলোচনা করো।

১১. সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' গল্পটির শিল্পরূপ আলোচনা করো।

১২. সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটি মুখ্যত সমাজ বিশ্লেষণমূলক — বিশ্লেষণ করো।

১৩. 'একটি রাত' গল্পটির বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

১৪. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' একটি সংবেদনশীল ছোটগল্প — আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

প্রাক্-বঙ্কিম নকশা ও বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস

বিন্যাসক্রম :

২.৪.১৫.০ : উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

২.৪.১৫.১ : প্রাক্-বঙ্কিম নকশা

২.৪.১৫.২ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৩ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৩.১ : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশিত উপন্যাস

২.৪.১৫.৩.২ : বঙ্কিম-পরবর্তী অপ্রধান ঔপন্যাসিক

২.৪.১৫.৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.৪.১৫.৫ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৬ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৭ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৮ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৪.১৫.৯ : বিশ শতকের ঔপন্যাসিক

২.৪.১৫.১০ : সহায়ক গ্রন্থ

২.৪.১৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৫.০ : উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যের দুই বাহু। উপন্যাস ও ছোটগল্প । উপন্যাস বিকাশের যুগেই বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব। এটা ঠিকই, উপন্যাস দীর্ঘ সময় ধরে পাঠকদের ক্ষুধানিবৃত্তির উপাদান। ছোটগল্প একাঙ্ক নাটকের শিল্প সমধর্মী, প্রায় তাৎক্ষণিক পাঠকের সুখ দেয়। কিন্তু দুটি ধারারই যোগ আছে। এখানে মূলত উপন্যাসেরই আলোচনা করা হল।

বাংলা কথাসাহিত্যের দুই বাহু, উপন্যাস ও ছোটগল্প। উপন্যাস দীর্ঘ সময় ধরে, ছোটগল্প তাৎক্ষনিক পাঠককে সুখ দিলেও দুটি ধারারই যোগ আছে।

প্রশ্ন :

১। উপন্যাসের উপাদান কি কি?

২। ছোট গল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ?

৩। উপন্যাস ও ছোটগল্পের দুটি পার্থক্য লেখ?

২.৪.১৫.১ : প্রাক্-বঙ্কিম নকশা

বাংলা উপন্যাসের বিকাশপথে প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস (১৮৩১) প্রভৃতি সামাজিক নকশা। 'নববাবুবিলাস' ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি। ঘটনা বা চরিত্রের বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু 'নববিবিবিলাস' সামাজিক ব্যঙ্গ নকশা মাত্র নয়। কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক চিত্রাঙ্কনেও সার্থক। হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) এ এই সময়ের প্রথম পারিবারিক উপন্যাসের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৬) নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এতে খ্রিস্টান ধর্মের জয়গান করা হয়েছে। হায়দার আলির সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ ও সিন্ধিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর পটভূমিতে লেখা 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' (১৮৫৬)। লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যে 'Original novel' এর দাবি নিয়ে আসে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। এখানে উপন্যাসোচিত গুণ থাকলেও নকশাধর্মী রচনারীতির প্রকাশই প্রকট। এককথায় আটপৌরে মুখের ভাষায় সামাজিক কাহিনি রচনার দুঃসাহসিক অভিনবত্ব প্রদর্শন। ১৮৬২ খ্রিঃ প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অদ্বিতীয় সামাজিক নকশা। এই প্রসঙ্গে তাঁর দ্ব্যর্থহীন

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), নববাবু বিলাস (১৮২৫) সামাজিক নকশাগুলিতে ঘটনা বা চরিত্রের বৈচিত্র্য নেই। সেখানে ধনী ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' 'Original Novel' এর দাবি নিয়ে আসে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নকশা জাতীয় রচনা হলেও সমাজ, সচেতনার কথা আছে। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' খ্রিস্টান ধর্মের জয়গান করা হয়েছে।

প্রশ্ন :

১। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার রচনা? গ্রন্থটির প্রকাশকাল কত?

২। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-য় কোথাকার সমাজের বর্ণনা পাওয়া যায়?

স্বীকারোক্তি – "এই নক্সায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার হয় নাই"। হুতোমে সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত। তবে 'হঠাৎবাবু' গোষ্ঠীর চিত্রাঙ্কনে বীরকৃষ্ণ দাঁ আর পদ্মলোচন দত্তজার দল তার সার্থক প্রতিনিধি। সমাজসচেতন সাহিত্য হিসাবে নকসাটির মৌলিকতা সর্বজনস্বীকৃত।

২.৪.১৫.২ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ইতিহাসনির্ভর উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান স্থান আছে। সেটি 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুটি কাহিনিযুক্ত গ্রন্থ। 'সফল স্বপ্নের' উৎস কন্টারের 'The Traveller's Dream' অঙ্গুরীয় বিনিময়ের উৎস 'The Marhatta Chief'. এ উপন্যাসে শিবাজীর কাহিনি ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৬৩) ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫)।

> *ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'অঙ্গুরী বিনিময়ে' শিবাজীর কাহিনি ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে।*

প্রশ্ন :

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসের নাম কি? প্রকাশকাল কত?

২। লেখকের 'সফলস্বপ্ন' গ্রন্থটির উৎস কোথায়?

২.৪.১৫.৩ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের সূচিপত্রে এক অনন্য সাধারণ ঔপন্যাসিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। মাত্র বাইশ বছরে তিনি লিখেছিলেন চোদ্দটি বিচিত্র ও ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। প্রকাশকাল অনুসারে উপন্যাসগুলি হল : 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪), ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র উপন্যাস 'রাধারাণী' (১৮৮৬) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনার প্রারম্ভে কয়েকটি তথ্য আমাদের সামনে উঠে আসে। সেগুলি হল :

(ক) বঙ্কিমের উপন্যাসে 'স্কট' ডিকেন্সের প্রভাব থাকলেও তা বহিরঙ্গ অতিক্রম করেনি।

(খ) বঙ্কিম রচিত অধিকাংশ উপন্যাসই 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(গ) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিম।

(ঘ) বঙ্কিমের হাতেই আমরা প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সন্ধান পাই।

(ঙ) রাজনৈতিক উপন্যাসের স্রষ্টাও বঙ্কিম।

বঙ্কিমের লেখা প্রথম তিনটি উপন্যাস হল — 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। ষোড়শ শতকের শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকারকে কেন্দ্র করে মুঘল ও পাঠানের সংগ্রাম; 'দুর্গেশনন্দিনী'র পটভূমি। জগৎসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, কতলু খাঁ চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলেও পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক নয়। বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা চরিত্রগুলি লেখকের কল্পনাপ্রসূত। এ উপন্যাসের বহিরঙ্গে স্কটের প্রভাব আছে। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' চারটি খণ্ডে বিভক্ত। এ উপন্যাসের জিজ্ঞাসা — প্রকৃতিপালিতা কোনও নারীকে কি সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব? নবকুমার-কপালকুণ্ডলার মূল ঘটনা ছাড়া আছে শ্যামা ও মতিবিবির প্রসঙ্গ। সাগরসঙ্গমে অরণ্যভূমি থেকে সুদূর মুঘলশাসিত দিল্লী পর্যন্ত এর কাহিনি বিস্তৃত। পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী' একাদশ শতকে মুসলমান বঙ্গবিজয়ের কাহিনি। ক্রূরবুদ্ধি পশুপতি চরিত্র এর প্রধান গৌরব। এই পটভূমিকায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কথা গুরুত্ব পেয়েছে। বঙ্কিমের স্বাদেশিকতার প্রথম প্রকাশও এই উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের শিল্প সমৃদ্ধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মৌলিক কল্পনা ও রচনাগুণের দ্বারা তিনি চোদ্দটি বিচিত্র উপন্যাস লিখেছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' মুঘল ও পাঠানের সংগ্রামের বর্ণনা থাকলেও বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা চরিত্রগুলি লেখকের কল্পনাপ্রসূত। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের কাহিনি সাগর সঙ্গমের অরণ্যভূমি থেকে সুদূর দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে প্রকৃতি পালিতা নারীর সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব কিনা তাও উল্লেখযোগ্য। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মুসলমান বঙ্গবিজয়ের কাহিনি থাকলেও মৃণালিনীর প্রণয়কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রশ্ন :

১। বাংলায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম কি? প্রকাশকাল কত?

২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে? তিনি কতগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন?

২.৪.১৫.৩.১ : বঙ্গদর্শনে (১৮৭২) প্রকাশিত উপন্যাস

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের আকারলাভ হয় ১৮৭৩ এ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এই কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে যেমন সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ- কুন্দনন্দিনী ত্রিকোণপ্রেমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তেমনি তৎকালীন বিধবাবিবাহ (কুন্দনন্দিনী) সমস্যারও বাস্তব রূপায়ণ রয়েছে। পাশাপাশি 'চন্দ্রশেখর' সম্ভবত বাংলা উপন্যাসে প্রথম নারীর অবৈধ প্রেমের কাহিনি। এ উপন্যাসের একদিকে আছে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, অন্যদিকে মীরকাশিম দলনীবেগমের ইতিহাস। বাল্যপ্রণয়ের অভিশাপের বিষয়টিকে বঙ্কিম খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) লঘু রসাত্মক কমেডি। ঘটনাবিন্যাসে রোমান্সের রং আছে। পরবর্তী উপন্যাস 'যুগলাঙ্গুরীয়'ও কাহিনির দিক থেকে অগভীর। লিটনের 'Last days of pompey' নাটকের নিদিয়ার অনুসরণে অন্ধ ফুলওয়ালী রজনীর জীবনচিত্র বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সূচনা করে। অমরনাথের

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি ও তৎকালীন বিধবাবিবাহ সমস্যার বাস্তব রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নারীর অবৈধ প্রেমের কাহিনি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- 'বিধবার প্রেমে পূর্ণতা ঘটাননি বঙ্কিম'। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস হলেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। সেখানে দেশাত্মবোধ লক্ষ্য করা যায়। আর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণ ঘটিত তত্ত্বকথা প্রকাশিত।

বিষণ্ণ দার্শনিকতা ও লবঙ্গলতার অর্থময় কথা পাঠকের মনে দীপ জ্বেলে দেয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হয়। ১২৮২·বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনের চৈত্র সংখ্যায়। এ উপন্যাসে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের সুখী দাম্পত্যজীবনে বিধবা রোহিণীর প্রবেশ বাল্যবিধবার সমস্যাকে প্রতিফলিত করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন- 'বিধবার প্রেমে পূর্ণতা ঘটাননি বঙ্কিম'।

ইতিহাস ও মানবচরিত্রের সার্থক সম্মেলন 'রাজসিংহ' উপন্যাস। এ উপন্যাসের গীতিময়তা লক্ষণীয়। নারী চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশে জেবউন্নিসা চরিত্র আদর্শ। রাজসিংহ ঔরংজেব, জেব-উন্নিসা চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। বাকি চরিত্রগুলি কাল্পনিক। উপন্যাসের শেষে তথ্য পরিবেশন করতে-করতে তত্ত্বে চলে গেছেন বঙ্কিম। 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) বঙ্কিমের লেখা প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে রচিত। এ উপন্যাসটি স্বদেশীদের জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করত। 'আনন্দমঠ' তাদের কাছে গীতার মত সমাদৃত ছিল। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে জনহিতকর কাজ করার নীতি পরবর্তীকালে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরাও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে অনুশীলন তত্ত্ব ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ বিধৃত। বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' (১৮৮৭)। জমিদার সীতারাম স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করে কিন্তু নারীমোহে সব হারায়। পুরুষসিংহ সীতারামের মত পুরুষ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মৃত্যুর (১৮৯৪) সাত বছর আগে (১৮৮৭) আর কোন উপন্যাস লেখেননি তিনি। কারণ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তার যা বলার ছিল তা আগেই বলা হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন :

১। বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস কোনগুলি।

২। চঞ্চল কুমারী, জেবউন্নিসা চরিত্রগুলি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়।

৩। দুটি সামাজিক উন্যাসের প্রকাশ কাল সহ নাম উল্লেখ কর।

২.৪.১৫.৩.২ : বঙ্কিম-পরবর্তী অপ্রধান ঔপন্যাসিক

বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন। রমেশচন্দ্রের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস – 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯)। এ ছাড়া 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭) হল ইতিহাসমূলক রোমান্স। রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাসের কাহিনিতে লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রসার আবিষ্কৃত। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যের সর্বপথেই

স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫) ও 'কাহাকে' (১৮৯৮)। 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসে পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ। 'কাহাকে' গার্হস্থ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসে নায়িকার সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম অবদান। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'real ordinary life' এর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খণ্ড, ১৮৬৯, ২য় খণ্ড ১৮৮৪) নামে একটি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনি এর বিষয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এদের মধ্যে 'যুগান্তর' সামাজিক উপন্যাস ও বাকি দুটি পারিবারিক।

বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিকরা বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজপুত ও মারাঠা জাতির কাহিনি বিস্তৃত হলেও লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রসার আবিষ্কৃত। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসে পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'কাহাকে' একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম-উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে বিবেচিত হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' সামাজিক উপন্যাসরূপে খ্যাতিলাভ করেছিল।

প্রশ্ন :

১। রমেশ চন্দ্রের চারটি উপন্যাসের নাম কর? যেখানে মুঘল আমলের একশ বছরের চিত্র আছে।

২। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি? কতসালে প্রকাশিত হয়েছিল?

৩। শিবনাথ শাস্ত্রীর দুটি পারিবারিক উপন্যাসের নাম কর?

২.৪.১৫.৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বরী দেবীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন 'করুণা'। পরবর্তীকালে ইতিহাস নির্ভর, সামাজিক, স্বদেশচেতনামূলক ও রোমান্টিক উপন্যাসের ধারায় তাঁর অবাধ যাতায়াত। বিষয় বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে —

(ক) ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস : 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)

(খ) সামজিক উপন্যাস : 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯)

(গ) স্বদেশচেতনামূলক উপন্যাস— 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায় (১৯৩৪)

(ঘ) রোমান্টিক উপন্যাস — 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) 'দুই বোন' (১৯৩৩) 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)।

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে ইতিহাসের অংশটি হল রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি। প্রস্তুতিকালীন অপরিণতির চিহ্ন এতে আছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনির উৎস ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস পটভূমিও

ত্রিপুরা। কেন্দ্রীয় চরিত্র গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলিদান বন্ধ করে দেওয়ায় রাজা ও পুরোহিত রঘুপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। শেষে রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মদানে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। প্রথা ও সংস্কারের চেয়ে প্রেম-ভালোবাসার প্রভাব যে কত গভীর তা রঘুপতির হাহাকারে বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি প্রথম উপন্যাস ঊনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাস ধারার অন্তর্ভুক্ত।

ইতিহাস নির্ভর, সামাজিক, স্বদেশ চেতনামূলক ও রোমান্টিক উপন্যাস ধারার সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা'। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনি থাকলেও রাজা গোবিন্দমানিক্য ও পুরোহিত রঘুপতির প্রথা ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব বাধে। শেষে প্রেম-ভালোবাসা জয়লাভ করে। 'চোখেরবালি'তে বিনোদিনী, মহেন্দ্র, বিহারী ও আশার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানে 'আঁতের কথা' গড়ে উঠেছে। 'নৌকাডুবি' প্রথমে 'তিনপুরুষ' পরে 'যোগাযোগ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বদেশ চেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'গোরা' উপন্যাসে। গোরা নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও জন্মরহস্য জেনে সে পৌঁছেছে জাতিভেদমুক্ত স্বদেশ চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ জিজ্ঞাসার ভিন্নতর রূপ মূর্ত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' এবং 'চারঅধ্যায়ে'। 'চতুরঙ্গ' অখণ্ড জীবনরূপের চারটি অঙ্গের কাহিনি হলেও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছল, জীবনরসে উদ্দীপ্ত, বুদ্ধিবাদের উজ্জ্বলতায় অনন্য।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভার বিশেষত্ব ধরা পড়েছে 'চোখের বালি'তে। বিনোদিনী মহেন্দ্র-বিহারী-আশার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানে 'আঁতের কথা' গড়ে উঠেছে। বিনোদিনীর তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা উপন্যাসকে বিংশ শতকের আধুনিকতার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল। 'চোখের বালি'র পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' প্লটের আকর্ষণই প্রধান। নায়ক রমেশ চরিত্রটি বিবর্ণ। একটা বিমূঢ় অসহায়তা তার চরিত্র বড় হয়ে উঠেছে। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমে 'তিনপুরুষ' নামে পরে 'যোগাযোগ' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়। বনেদি অভিজাত সুশিক্ষায় মার্জিত দাদা বিপ্রদাসের স্নেহলালিত কুমুদিনী। বিয়ে হল স্থূল রুচিসর্বস্ব বিত্তবান মধুসূদনের সঙ্গে। পটভূমির বিশালতা ও শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে 'যোগাযোগ' বাংলা উপন্যাসে এক নতুন সংযোজন।

স্বদেশচেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'গোরা' উপন্যাসে। উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা মহানগরী। স্বদেশের স্বরূপ জানবার জন্য গোরা আগ্রহী ছিল। প্রথমে সে ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু। পরে সে জানতে পারে, সে জাত আইরিশ। কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর পালিত পুত্র। জন্মরহস্য জেনে 'গোরা' পৌঁছেছে জাতিভেদমুক্ত স্বদেশচেতনায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ জিজ্ঞাসার ভিন্নতর রূপ মূর্ত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে'। আন্দোলনের নামে জাতীয় উন্মাদনার মত্ততার চিত্ররূপ 'ঘরে বাইরে'। সন্দীপ চরিত্র গোটা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিস্ময়কর সৃষ্টি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদে অনাস্থা, মনুষ্যত্বকে বেশি মূল্য দেওয়া ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধতা লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসই কবির কলমে লেখা। তবু 'চতুরঙ্গ' ও 'শেষের কবিতা' এ ব্যাপারে অনন্য। 'চতুরঙ্গ' অখণ্ড জীবনরূপের চারটি অঙ্গের কাহিনি'। এই চারটি অঙ্গ – জ্যাঠামশায়-- শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাস। এরা প্রত্যেকে অন্তর্মগ্ন ভাষায় নিজের মনোবিশ্লেষণ করেছে। এ উপন্যাসে চরিত্রগুলির জীবনসত্য অন্বেষণের প্রচেষ্টা এক নতুন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল, জীবনরসে উদীপ্ত, বুদ্ধিবাদের উজ্জ্বলতায় অনন্য। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত যেন এক অনর্গল বেজে চলা জীবনসঙ্গীত। অমিত-কেতকী, লাবণ্য-শোভনলালের চতুর্ভুজ সম্পর্ক প্রেমমূলক উপন্যাস রচনায় তাঁর অদ্বিতীয় ক্ষমতার প্রমাণ। 'দুই

বোন' উপন্যাসের দুই প্রান্তে রয়েছে—শর্মিলা ও ঊর্মিমালা। শশাঙ্কের জীবনকে কেন্দ্র করে তার ছায়াবিস্তার। নারীর শ্রেয়সী রূপ প্রেয়সী রূপের তুলনায় প্রধান এরূপ একটি বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আছে। এ উপন্যাসের সমস্যাকে উল্টোভাবে দেখানো হয়েছে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে। এখানে নায়ক আদিত্যকে কেন্দ্র করে নীরজা ও সরলার প্রণয়-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কাহিনির শেষে নীরজার বেদনা প্রেমের মালঞ্চে ট্র্যাজেডির দীর্ঘশ্বাসকে ঘনীভূত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি আলোচনার শেষে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেগুলি তার ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিচায়ক—

(ক) রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমের ইতিহাসনিষ্ঠ স্বদেশীয়ানার আবেগ থেকে সরে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন ভাব বা তত্ত্ব। যেমন রাজা গোবিন্দমাণিক্য প্রেমধর্মের বা মানবিক আদর্শের প্রবক্তা।

(খ) রোমান্স ও রূপকথার রাজ্য ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় যে জগতে নেমে এসেছেন, তা কিন্তু ধূসর নয়। অনেক পরিমাণে সহজ, সাধারণ ও বাস্তব।

(গ) আখ্যান নির্ভর ঘটনার ঘনঘটা থেকে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সরে এলেন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

(ঘ) হিন্দুয়ানীর উৎপাত থেকেও রবীন্দ্র উপন্যাসজগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রশ্ন :

১। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের নাম কি?

২। বৃহত্তর সমাজ-সমস্যা মূলক উপন্যাস কোনগুলি?

৩। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাস রচনা করেছিলেন?

৪। গোরা কি ধরনের উপন্যাস? উপন্যাসের পটভূমি কোন শহরের?

২.৪.১৫.৫ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতাই শরৎ উপন্যাসের মূলভিত্তি। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশকাল অনুসারে নিম্নলিখিত :

'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪) 'মেজদিদি' (১৯১৫) 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের 'উইল' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬) 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) 'শ্রীকান্ত' (১ম ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯৩৩) 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) 'দত্তা' (১৯১৮), 'গৃহদাহ' (১৯২০) 'দেনাপাওনা' (১৯১৩), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'নববিধান' (১৯২৪) 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ও 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রথম পর্বের বিস্তার ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত। প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রেমমূলক। 'বড়দিদি', 'পণ্ডিতমশাই' 'পরিণীতা' 'বিরাজ বৌ' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের প্রকাশ কুণ্ঠিত, কিন্তু তেমন সমস্যাজটিল নয়। এই পর্বে 'পল্লীসমাজে' উপন্যাসের পূর্ণ লক্ষণ আছে। এই পর্বের উপন্যাসের পুরুষরা আত্মভোলা উদাসীন। নারী চরিত্র এই সময় থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রে আসন পেতে বসেছে ।

শরৎচন্দ্র বাঙালি উপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। আবেগের বাড়াবাড়ি, পল্লীজীবনের দু:খ-বেদনার, সমস্যা-সংকট তাঁর উপন্যাসের মূল ভিত্তি। প্রথম দিকের বড়দিদি (১৯১৩), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), 'পরিণীতা (১৯১৪) প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের প্রকাশ কুণ্ঠিত। 'পল্লীসমাজে' সমাজবিরোধী প্রেমের প্রসঙ্গ আছে। দ্বিতীয় পর্বের চারখণ্ডে বিভক্ত 'শ্রীকান্ত' ভ্রমন কাহিনি রীতিতে রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'দত্তা' রোমান্টিক কমেডি হলেও তাঁর পরিণত প্রতিভার প্রথম দীপ্তি 'দেবদাস'। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের 'শেষপ্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসগুলি বির্তকমূলক। যেখানে হৃদয়ধর্মের পরিবর্তে মননবৃত্তি বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত লেখা উপন্যাসগুলি দ্বিতীয় পর্বের। তবে ১৯২৬ সালে লেখা 'পথের দাবী' কোনও পর্বের মধ্যেই পড়ে না। রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা ব্যতিক্রমী উপন্যাস। এই পর্বে শরৎচন্দ্র মানবজীবনের গভীর ও জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। চার খণ্ডে বিভক্ত 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নতুন আঙ্গিকে ভ্রমণ কাহিনির রীতিতে রচিত। 'দত্তা' উপন্যাসটি রোমান্টিক কমেডি। তবে শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার প্রথম দীপ্তি 'দেবদাস'। এর মধ্যে প্রেমের আধারে সমাজ - সমালোচনার সুর শোনা যায়। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। বিধবা সাবিত্রীর প্রেম, কিরণময়ীর জ্বালা সার্থকভাবে চিত্রিত হলেও উপেন্দ্রের আদর্শবাদ শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে নায়িকা অচলার দ্বিধাদীর্ণ হৃদয়ের ট্রাজেডি স্থিতধী মহিম ও প্রাণচঞ্চল সুরেশের মধ্যে অন্তহীনভাবে দুলেছে।

শরৎচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের রচনাগুলি বিতর্কমূলক। হৃদয়ধর্মের পরিবর্তে মননবৃত্তি বিশেষভাবে চোখে পড়ে 'শেষ প্রশ্ন' 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে। উল্লিখিত দুটি উপন্যাস ও 'বিপ্রদাস' শরৎচন্দ্র বিবাহের চেয়ে স্বতন্ত্র, বিবাহের চেয়ে বড় কোনও সম্বন্ধ খুঁজে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

প্রশ্ন :

১। শরৎচন্দ্রের দুটি জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম কর?

২। রাজনৈতিক বর্ণনা শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাস পাওয়া যায় ?

৩। 'শ্রীকান্ত' কি ধরনের উপন্যাস?

৪। সমাজ বিরোধী প্রেমের কথা কোন কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

২.৪.১৫.৬ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিকে রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র - কল্লোলগোষ্ঠী অন্যদিকে বাংলার অস্থির সমাজ পরিবেশ। এর মধ্যে রূপকথাসুলভ 'পথের পাঁচালী'র জীবনের সন্ধান নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈচিত্র্যে ও সংখ্যাধিক্যে বিভূতিভূষণের রচনাসমূহ বিস্ময় জাগায় — 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২),

'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুই বাড়ী' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদাররাজা' (১৯৪৫), 'অথৈ জল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২) ও 'অশনি-সঙ্কেত' (১৯৫৯)।

বিভূতিভূষণ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হয়েও বাংলার অস্থির সমাজ পরিবেশে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। বৈচিত্র্যে ও সংখ্যাধিক্যে বিভূতিভূষণের রচনাসমূহ বিস্ময় জাগায়। তিনি ছিলেন জীবনের উপভোক্তা। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে অপু-দুর্গার শৈশব- কৈশোরের কাহিনি গড়ে উঠেছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর কলকাতাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাপন, অপর্ণার সঙ্গে বিবাহ ও স্ত্রীর মৃত্যু। শেষে পুত্র কাজলকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসা। 'আরণ্যক' উপন্যাসে নায়ক সত্যচরণ বাংলা ও বিহারের সীমানায় জমি বিলির কাজ নেয় ও অরণ্যের সৌন্দর্যের স্মৃতিচারণা করে। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে রাধুনি বামুন হাজারী ঠাকুরকে নিয়ে রচিত। 'ইছামতী' উপন্যাসে ইছামতী নদীর দুই তীরের মানুষজন ও নীলকুঠি সংক্রান্ত নানা ঘটনা।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে আশ্রয় করে অপু-দুর্গার শৈশব-কৈশোরের রূপকথা। পথের পাঁচালীর পরবর্তী অংশ 'অপরাজিতা' অপুর কলকাতাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাপন, অপর্ণার সঙ্গে বিবাহ ও স্ত্রীর মৃত্যু শেষে পুত্র কাজলকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার ঘটনা বিবৃত। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে নায়ক জিতু ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বপ্নাবিষ্টভাবে অতীতের বা ভবিষ্যতের নানারকম দৃশ্য দেখে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে কোন কাহিনি বা উপকাহিনি নেই। সত্যচরণ স্কুল মাস্টারি ছেড়ে বাংলা ও বিহারের সীমানায় জমি বিলি-বন্দোবস্ত করার কাজ নেয়। নায়ক সত্যচরণ অরণ্যমেধ অনুষ্ঠানের যন্ত্রণায় বিগত সৌন্দর্যের স্মৃতিচারণা করে। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' রাঁধুনী বামুন হাজারী ঠাকুরকে নিয়ে রচিত। রানাঘাট ও আশপাশের অঞ্চল এর পটভূমি। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে আছে পৈত্রিক পেশা নায়েবের চাকরি ছেড়ে দিয়ে যুবক বিপিনের ডাক্তারি করা ও রুগীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের কাহিনি। 'দুই বাড়ী'তে দেখা যায় রামনগর শহরের নিধিরাম মোক্তারের সুশিক্ষিতা তরুণী মঞ্জুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসার বিষাদান্তক কাহিনি। তবে 'দেবযান' বইটি বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনার মধ্যে দলছাড়া, গোত্রছাড়া। কলকাতার মডার্ন ইনস্টিটিউশন নামে একটি স্কুল ও তার শিক্ষকদের প্রাত্যহিক জীবন 'অনুবর্তনের' বিষয়। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'ইছামতী' উপন্যাসটি ইছামতী নদীর দুই তীরের মানুষজন ও নীলকুঠি সংক্রান্ত নানা ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার ঐতিহাসিক চিত্র 'অশনি-সংঙ্কেত'।

প্রশ্ন :

১। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল?
২। বিভূতিভূষণের কোন উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ রূপে কাজ করেছে?
৩। রাণাঘাট ও আশপাশের অঞ্চলের ঘটনা কোন উপন্যাসে আছে?
৪। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বিখ্যাত কেন?

২.৪.১৫.৭ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাপ্তি ও সূচনার যুগসন্ধিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল ১৯২৬-১৯৭১ খ্রি: পর্যন্ত বিস্তৃত। তারাশঙ্করের উপন্যাসের তিনটি লক্ষণীয় ধারা দেখা যায়— (ক) ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের

আভিজাত্যের সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ী পরিবারের মর্যাদা লাভের দ্বন্দ্ব। (খ) রাঢ় অঞ্চলের অপরিচিত অন্ত্যজ মানুষের জীবনচিত্র। (গ) গান্ধীবাদ ও বিপ্লববাদের আদর্শে পরিচালিত দেশসেবার পথনির্দেশ।

রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষের জীবনকাহিনির সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবার ও উঠতি ব্যবসায়ী পরিবারের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের, উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে বিপ্লববাদের আদর্শ, দেশ সেবার পথ নির্দেশ ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্কর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি চৈতালী ঘূর্ণি উপন্যাস লেখেন। ১৯২৭-১৯৩৯ পর্বের উপন্যাসগুলিতে গোষ্ঠীর চিত্রাঙ্কনে শিল্পী প্রাণ জেগে উঠেছে। ১৯৩৯-১৯৫০ পর্বে 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা'-য় সমাজ রূপান্তরের ভাবনা সুস্পষ্ট। 'গণদেবতা' উপন্যাসে আছে ভাঙনের চিত্র, 'পঞ্চগ্রামে' আছে আইন-অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনা। নায়ক দেবু ঘোষের কারাবাস ও শেষে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন। তৃতীয় পর্বের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' রাঢ় অঞ্চলের আদিম জৈব চেতনাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'সপ্তপদী' উপন্যাসে আছে প্রেম ও সত্য সন্ধানের সমন্বয়।

প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯২৮) ১৯২৮-৩১ পর্যন্ত কারাবাস করেছেন আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরূপে। এটাই তাঁর প্রস্তুতির সময়।

১৯২৭-১৯৩৯। এই পর্বে রচিত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), 'রাইকমল' (১৩৪২), 'আগুন' (১৯৩৭)। একটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের চিত্রাঙ্কনে তাঁর শিল্পীপ্রাণের উল্লাস 'রাইকমল' উপন্যাসের প্রস্তুতিতে তার স্পর্শ লেগেছে।

এর পরেই ১৯৩৯-১৯৫০। এই পর্বে রচিত 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) এখানে সমাজ রূপান্তরের ভাবনা সুস্পষ্ট। ধাত্রীদেবতার নায়ক শিবনাথ জমিদার সন্তান হলেও মায়ের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী নেতার উপদেশে ব্রাত্যজনের উন্নয়নের ব্রত নেয়। অন্যদিকে 'গণদেবতা'য় ভাঙনের চিত্র, পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে আছে আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনা। নায়ক দেবু ঘোষের কারাবাস ও শেষে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন। 'কালিন্দী' তে দেখা যায় জমিদার সন্তান 'অহীন্দ্র' মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই পর্বে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কবি' (১৯৪২), 'সন্দীপনের পাঠশালা' (১৯৪৬) ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনি' (১৯৫১)।

১৯৫০ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারাশঙ্করের উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে আছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১) 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩), 'উত্তরায়ণ' (১৯৫০), 'সপ্তপদী' (১৩৬৪), 'মহাশ্বেতা (১৯৬০), 'যোগভ্রষ্ট' (১৩৬৭ বঃ), 'মঞ্জরী অপেরা' (১৩৭১ বঃ), 'মহানগরী' (১৯৭৫)। রাঢ় অঞ্চলের বন্য প্রকৃতি আর জীবনোল্লাস মূর্ত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মধ্যে। 'সপ্তপদী'তে আছে প্রেম ও সত্যসন্ধানের সমন্বয়। তারাশঙ্করের মৃত্যু দর্শনের এক আশ্চর্য পরিচয় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি। অনেকের মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

প্রশ্ন :

১। তারাশঙ্কর কোন অঞ্চলের কথাকার ছিলেন?
২। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আছে কি?

২.৪.১৫.৮ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। বিশ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি লিখেছিলেন পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস ও নানা গল্পগ্রন্থ। মানিকের উপন্যাস অবয়বে আছে বিজ্ঞানচেতনা, অন্তর্মনের জটিলতা অনুসন্ধান, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের চেতন-অচেতনের প্রভাব ও মার্কসীয় ভাবনার অনুসন্ধান।

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। সাহিত্য জীবনে উপন্যাসের ও গল্পের মধ্যে আছে বিজ্ঞান চেতনা, অন্তর্মনের জটিলতা অনুসন্ধান ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের চেতন-অবচেতন ও মার্কসীয় প্রভাব। পদ্মার নিকটবর্তী অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র দেখা যায় 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' গাওদিয়ার গ্রাম্য পরিবেশ ও শশী-কুসুম-কুমু-গোপাল প্রমুখ মানুষের মনোরূপের প্রতিফলন। 'অহিংসা' উপন্যাসে সদানন্দ-মহেশ-বিপিনের বিরোধের কারণ মাধবীলতা। 'চিহ্ন' উপন্যাসে রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে ছাত্র যুবকদের বিক্ষোভ। আর 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সর্বোত্তম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মানিকের প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)। এখানে শ্যামা নামের এক নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীর জননীরূপ আত্মপ্রকাশের চিত্রটি মূর্ত। 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) উপন্যাসটির গঠনশৈলী অভিনব। এখানে 'দিনের কবিতা', 'রাতের কবিতা' ও দিবা 'রাত্রির কাব্য' এই তিনটি অধ্যায়ে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) ও 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) একই সময়পর্বে লেখা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় গাওদিয়ার গ্রাম্য পরিবেশ বহুবিধ দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে ডাক্তার শশী-কুসুম-কুমু, গোপাল প্রমুখ মানুষের মনোরূপের প্রতিফলন। পদ্মার নিকটবর্তী অঞ্চলের পটে দরিদ্র-লাঞ্ছিত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনচিত্র দেখা যায় 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। মধ্যবিত্ত এক বেকার যুবকের যন্ত্রণাময় চিত্র 'জীবনের জটিলতা' (১৯৩৬)য়। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির লাভ স্বার্থ ও আদর্শচ্যুতির নিষ্ঠুর ব্যঙ্গাত্মক চিত্র 'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৩৮), নৈরাশ্যময় নেতিবাচক মনোভঙ্গি থেকে উত্তরণ দেখা যায় 'সহরতলী' (১ম ১৯৪০, ২য় ১৯৪১) উপন্যাসে পুঁজিপতি ও মেহনতী মানুষের দ্বন্দ্ব রূপায়ণে। 'অহিংসা' (১৯৪১) উপন্যাসে সদানন্দ-মহেশ চৌধুরী বিপিনের বিরোধের কারণ মাধবীলতা। 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩) উপন্যাসে তারকের পার্টিকর্মী হওয়ার সদিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষক-মজুরদের সঙ্গে অনৈক্যের পরিচয় প্রতিফলিত। 'সহরবাসের ইতিকথা'য় (১৯৪৬) শহর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, শহর ও গ্রামের পারস্পরিক চিত্র প্রতিফলিত। ১৯৪৬ সালের কলকাতায় রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র যুবকদের বিক্ষোভ নিয়ে লেখা 'চিহ্ন' (১৯৪৭)। মানিকের উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সর্বোত্তম প্রকাশ 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) উপন্যাসে। 'চিহ্ন' উপন্যাসের পটভূমি আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'আরোগ্য' (১৯৫৩) উপন্যাসে কেশব ড্রাইভার নিজের পরিবারে ও অন্যত্র তার মানসিক রোগের কারণ ও চিকিৎসার পথ খুঁজে হয়রান হয়। শরতোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন :

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কি?

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি, কতসালে প্রকাশিত হয়?

২.৪.১৫.৯ : বিশ শতকের ঔপন্যাসিক

বিশ শতকে যাঁদের-যাঁদের উপন্যাস প্রায় সমকক্ষ তাঁদের সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি থাকা ভাল : যেমন —

মণীন্দ্রলাল বসু	: 'রমলা' (রোমান্টিক উপন্যাসের প্রথম চর্চা)
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	: 'প্রিয়বান্ধবী' (মধ্যবিত্তের প্রেম সংরাগ)
বুদ্ধদেব বসু	: 'তিথিডোর' (পুরুষানুক্রমিক সহজ ভাষানির্ভর গার্হস্থ্য জীবন)
সতীনাথ ভাদুড়ী	: 'জাগরী' (গঠনশৈলী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে)
গোপাল হালদার	: 'একদা' (চেতনা প্রবাহরীতি)
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	: 'অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনা' (নতুন আঙ্গিক)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	: 'উপনিবেশ' (পর্তুগীজ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস)
সুবোধ ঘোষ	: 'শুন বরনারী' (উনিশ-বিশ শতকের পাঠকদের প্রেম চাহিদা-সন্তুষ্টি)
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	: 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'ঝিন্দের বন্দী' (প্রবাসীর ইতিহাসচর্চা)
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	: 'বারো ঘর এক উঠোন' (দেশ বিভাজন)
প্রথমনাথ বিশী	: 'কেরী সাহেবের মুন্সী' (সংস্কৃতি-ইতিহাস)
অবধূত	: 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (উপন্যাসে তন্ত্র)
জরাসন্ধ	: 'লৌহকপাট' (কারা উপন্যাস)
প্রতিভা বসু	: 'অতলান্ত' (পরিবারের সঙ্গে নিসর্গের যোগ)
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	: 'চেনামহল' (মধ্যবিত্তের স্নিগ্ধ প্রেম)
মহাশ্বেতা দেবী	: 'অরণ্যের অধিকার' (আদিবাসী ব্রাত্য জীবন)
সমরেশ বসু	: 'গঙ্গা' (নদীনির্ভর উপন্যাস) : 'বিবর' - 'প্রজাপতি' (উপন্যাসে যৌনজীবন)
কমলকুমার মজুমদার	: 'অন্তর্জলী যাত্রা' (উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় নব্যরীতি)
অমিয়ভূষণ মজুমদার	: 'নীল ভুঁইয়ার দেশে' (উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ)
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	: 'তিতাস একটি নদীর নাম' (আত্মজৈবনিক নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস)
প্রফুল্ল রায়	: 'পূর্বপার্বতী' (আরণ্যক উপন্যাস)
মনোজ বসু	: 'ভুলি নাই' (উপন্যাসে দেশপ্রেম)
বনফুল	: 'অগ্নিশ্বর' (উপন্যাসে ডাক্তার লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা)
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	: 'মহাস্থবির জাতক' (ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	: 'সেই সময়' (উনবিংশ শতকের সমাজ)
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	: 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (সামাজিক প্রেম)

বিমল কর	:	‘খড়কুটো’ ‘যদুবংশ’ (ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি)
বিমল মিত্র	:	‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ (দীর্ঘ বিস্তারি বাঙালির মহাকাব্যিক উপন্যাসের নিদর্শন)
কবিতা সিংহ	:	‘পৌরুষ’ (পুরুষের কলমে সাবলীল শক্তি)
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	:	‘মানবজমিন’ (সামাজিক জনজীবন)
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	:	‘অলীকমানুষ’ (মুর্শিদাবাদের জনজীবন)

২.৪.১৫.১০ : সহায়ক গ্রন্থ

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
৪. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ — রামেশ্বর শ
৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন
৬. বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস (১ম - ৭ম খণ্ড) — ক্ষেত্র গুপ্ত
৭. কালের পুতুল — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

২.৪.১৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

(১) বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

(২) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

(৩) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করো।

(৪) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক) প্রভাব নিয়ে আলোচনা করো।

(৫) ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

(৬) কল্লোলের সঙ্গে যুক্ত ঔপন্যাসিকদের পরিচয় দাও।

(৭) বঙ্কিম সমকালীন ঔপন্যাসিকদের পরিচয় দাও।

(৮) জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক — আলোচনা করো।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-103

বাংলা ভাষাতত্ত্ব

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি

২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য

৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০২১

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) **Manas Kumar Sanyal**,Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান- ১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস), এম.এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-103

শিরোনাম : বাংলা ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় ৫ ঘণ্টা)

একক - ১ : ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
একক - ২ : বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা
একক - ৩ : বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস
একক - ৪ : বাংলা ভাষার যুগবিভাজন ও বৈশিষ্ট্য (প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)
একক - ৫ : বাগ্‌যন্ত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ৬ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব,বাক্যতত্ত্ব,শব্দার্থতত্ত্ব)
একক - ৭ : ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
একক - ৮ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব
একক - ৯ : বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ১০ : বাংলা রূপতত্ত্ব (নামশব্দ,অনুসর্গ, বিভক্তি, অব্যয় ও প্রত্যয়)
একক - ১১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)
একক - ১২ : বেতার, টিভি, সংবাদপত্রের ভাষা ও বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা
একক - ১৩ : রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় ৩ ঘণ্টা)

একক - ১৪ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার
একক - ১৫ : সুকুমার সেনের বাংলাভাষা চর্চা
একক - ১৬ : আই. পি. এ

সূচিপত্র

B-CORE-103

শিরোনাম : বাংলা ভাষাতত্ত্ব

প্রথম পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	১-৩
	২	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা	৪-৬
	৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস	৭-১০
	৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস ও ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাংলা ভাষার যুগ বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য (প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)	১১-২৫
	৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাগ্‌যন্ত্র	২৬-২৯
পর্যায় গ্রন্থ-২	৬	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব)	৩০-৩২
	৭	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৩৩-৩৫
	৮	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব	৩৬-৩৮
	৯	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব	৩৯-৪৩
পর্যায় গ্রন্থ-৩	১০	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাংলা রূপতত্ত্ব (নামশব্দ,অনুসর্গ, বিভক্তি, অব্যয় ও প্রত্যয়)	৪৪-৬০
	১১	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)	৬১-৬৩
	১২	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বেতার, টিভি, সংবাদপত্রের ভাষা ও বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা	৬৪-৬৭
	১৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা	৬৮-৭১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার	৭২-৭৫
	১৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	সুকুমার সেনের বাংলা ভাষা চর্চা	৭৬-৭৮
	১৬	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	আই. পি. এ	৭৯-৮৪

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম ঃ

৩.১.১.১ : ভূমিকা

৩.১.১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.১.১ : ভূমিকা

'মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা এবং তার আত্মাই হল তার ভাষা' — আধুনিক জার্মান মনীষী হুমবোল্টের এই উক্তির মধ্যে দার্শনিকতা আছে সত্য। সেই সঙ্গে এও সত্য যে ভাষার সঙ্গে মানুষের আত্মার সর্ম্পক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের আত্মার গভীরতম প্রদেশে ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তি কবে থেকে সে বিষয়ে আজও কোনও স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা গড়ে ওঠেনি। অনুমান ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নানা মতামত গড়ে উঠেছে। ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্টি এমন একটা মতামত সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের নয়। সমাজ যখন তৈরী হল কাজের ভিত্তিতে কাজের সূত্র ধরে তখন মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের তাগিদেই ভাষা সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়েই মার্কস মন্তব্য করেন — "Language like conciousness, only arises from the need, the necessity of intercourse of other man."

আধুনিক জার্মান মনীষী হুমবোল্ট বলেছেন — 'মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা এবং তার আত্মাই হল তার ভাষা'। আধুনিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন ভাষা মানুষের সৃষ্টি, ঈশ্বরের নয়। ভাষা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন — "মানুষের উচ্চারিত বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।"

বিবর্তনশীল মানুষ এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যেখানে They had something to say each other, তখন তাদের বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি বাগেন্দ্রীয় হিসাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। অতএব বলাই যায় সামাজিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনেই

ভাষার সৃষ্টি। একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজন বা জৈব বৃত্তি-ই ভাষা সৃষ্টির কারণ নয়। যদি তা হতো, তবে সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যেই ভাষার উন্মেষ হতো। আসলে ব্যবহারিক প্রয়োজন তো আছেই সেই সঙ্গে উন্নত জীব মানুষ তার উন্নত ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করতেই ভাষাসৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ভাষা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু। আচার্য সুকুমার সেনের বক্তব্যেও এ কথার সমর্থন মেলে - "মানুষের উচ্চারিত বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা" (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ-২)। ড. সেন আরও বলেছেন একজন মানুষের স্পৃহা বা উত্তেজনা আর একজন মানুষের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করিয়ে সেইরূপ স্পৃহা বা উত্তেজনার অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ভাষার প্রথম ও প্রধান কাজ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ-২)।

ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগৃহীত সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন — "A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact." (An Introduction to Lingiustic Science)

অতএব বলা যেতে পারে ভাষা হল মানুষের উচ্চারিত প্রণালীবদ্ধ ধ্বনি-সংকেত যা দিয়ে এক একটি বিশিষ্ট সমাজ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে। যেমন, বাংলা ভাষায় রাম মাকে বললো, 'মা খিদে পেয়েছে।' মা বললেন, 'চল দিচ্ছি।' রামের কথায় মা তার মনের ভাব জানতে পারলেন। এবং যথাযথ উত্তর দিয়ে তার নিজের মনের ভাব জানালেন। এখানে রাম ও মা দুটি পৃথক মানুষ। তারা কতকগুলি ধ্বনি বা শব্দ যথাযথ ব্যবহার করে তার সাহায্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় করলো, একে বলা হয় ভাষা।

ভাষার সংজ্ঞা থেকে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। প্রথমত ভাষা হল কতগুলি ধ্বনির সমষ্টি। এই ধ্বনিগুলি অবশ্য মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হতে হবে। মানুষ হাততালি দিয়ে অথবা অন্য কোনও উপায়ে অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে, তাকে ভাষা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এগুলি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি নয়। দ্বিতীয়ত, ভাষার ধ্বনিগুলি কেবলমাত্র বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেই চলবে না, ধ্বনিগুলিকে কোনও বিশেষ বস্তু বা প্রাণী অথবা ভাবের প্রতীক হতে হবে। তৃতীয়ত, ধ্বনি কখনোই কার্যকারণসূত্রে কোন বস্তু বা প্রাণীর অথবা ভাবের প্রতীক নয়। মানুষ তার নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো তাদের ব্যবহার করে। যেমন 'জল' দ্বারা বাংলায় যে তরল বস্তুকে নির্দেশায়িত করা হয়, ইংরেজি ভাষায় তাকে বলা হয় 'water', হিন্দিতে 'পানি', লাতিনে 'আকোয়া'। চতুর্থত, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগত প্রতীকগুলি প্রথমে খেয়াল খুশি মতো নির্বাচন করা হলেও সমাজে তা স্বীকৃত হয়ে গেলে শব্দমধ্যে বা বাক্যমধ্যে এদের আর খেয়াল মত ব্যবহার করা চলে না। তখন এদের ব্যবহারে একটা প্রণালীবদ্ধ নিয়ম থাকে। এর ব্যত্যয় হলে ভাষা তার নিজস্ব অর্থ হারিয়ে ফেলে।

৩.১.১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। সুকুমার সেন ভাষা সম্পর্কে কি বলেছেন ?

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-২

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা, অত্যাধুনিক বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.২.১ : ভূমিকা

৩.১.২.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.২.১ : ভূমিকা

অনেকে বলেন খ্রি: পূ: যুগেও বাঙালির অস্তিত্ব ছিল। শুধু ভারতে নয়, এখনকার পাকিস্তান, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশেও। তাই যদি হয়, তবে বলা যাবে বাঙালিরা একবিংশ শতকেও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। পৃথিবীর সব প্রান্তেই এখন বাঙালির জয়জয়কার। সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবকিছুতেই বাঙালি চলে এসেছে প্রথম সারিতে। এমনকী লোকসংখ্যার বিচারেও। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে তো পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে এই বাংলা ভাষা।

বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। এই ভারতে তথা বাংলায় আর্য আসার পরেই তারা তাদের মৌলিকতা হারিয়েছে। আমরা তো সবাই জানি আর্যরা আসার আগে এই ভারতের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বসবাস করত অনার্যরা। অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় ইত্যাদি বংশের মানুষজন। এই আর্যরা বঙ্গভূমিতে এসে সবাই যে একেবারেই বাঙালি হয়ে গেল তা হতে পারে না। বরঞ্চ হতে পারে বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী অনার্যরা, আর্যদের সংমিশ্রণে বাঙালি হয়ে গিয়েছিল। এই মিশ্রণ কিন্তু একদিনে হয়নি, অনেকদিন ধরে চলেছিল। বিবাহসূত্রে রক্ত মিশ্রণের পাশাপাশি সংস্কৃতির মিশ্রণও হয়েছিল এইরকম অনুমান করা হয়।

'বঙ্গ' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে সেই কবেকার বেদের যুগে। মূলত ঐতরেয় আরণ্যকে। এই বঙ্গে যারা বসবাস করত তারাই বঙ্গবাসী বা বাঙালি। বঙ্গদেশের যে প্রধান নদী গঙ্গা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগে বিদেশি লেখকদের লেখা 'আরগনটিকা', 'জর্জিকাস' প্রভৃতি গ্রন্থে 'গঙ্গা-রাঢ়' দেশের নাম আছে। আছে এখানে বসবাসকারী মানুষদের বীরত্বের কথা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব যুগেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাদের ভাষা বাংলা কি না তা কোথাও লেখা নেই। সিন্ধু সভ্যতার বিবরণে যে সব সিলমোহর পাওয়া গেছে তাতেও আছে বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন। অর্থাৎ বাঘ সিংহের ছবিই বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া ওখানকার মানুষদের সর্ষের তেলের ব্যবহার বাঙালি মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সভ্যতার মানুষদের রেশমবস্ত্র, চাল, মাছ ইত্যাদির ব্যবহার দেখে অনুমান করা হয়, এখানেও বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গ মগধ ইত্যাদির কথা আছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গকে দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যাসদেব তাঁর মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম-এর কথা বলেছেন। এখানে বঙ্গ কোনও দেশের নাম নয়। বঙ্গ হল রানি সুদেষ্ণার পুত্র। কালিদাসের রচনায় তো দক্ষিণ রাঢ়ের কথা আছেই, চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙও তাঁর রচনায় বঙ্গদেশ, বাঙালি ইত্যাদির উল্লেখ করে গেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় এই বিশাল ভূখণ্ডে বাঙালি যেমন ছিল, তাদের ভাষাও নিশ্চয় একটা ছিল। কিন্তু সেটা কোন ভাষা সেটাই প্রশ্ন।

বিশেষজ্ঞদের অনুমানে সেইসময়ের বাঙালিরা নিশ্চিতরূপেই ছিল বীরত্বের বাঙালি। তাদের জীবিকা হিসেবে নীহাররঞ্জন জানিয়েছেন, কৃষিকাজই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে কৃষিকাজকেই তারা বেছে নিয়েছিল। তবে এর পিছনে ছিল আর্যরা। এরাই যেহেতু অনার্য (অস্ট্রিক) বঙ্গবাসীদের আর্যে রূপান্তরিত করেছিল, তেমনই কৃষিকাজেও হাত মিলিয়েছিল। অনার্য অস্ট্রিকরা আর্য হয়ে গেলেও কিন্তু অস্ট্রিকদের পুজো-আচ্চা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ছাড়তে পারেনি। 'আর্য-বাঙালি' উৎসের পিছনে অনেকে আবার অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র সংস্কৃতির স্রোতও দেখতে পেয়েছেন। যাই হোক আর্য হয়েও এই বাঙালিরা কিন্তু অনার্য সংস্কৃতির গাছ, পাথর ইত্যাদি পুজোর ব্যাপারটা ছাড়তে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে-অন্নপ্রাশন বিভিন্ন উৎসবের আচার-আচরণ তো অনার্যভাবনা থেকেই প্রসূত। তাই অনেকে বলেছেন অনার্যদের না পালটে আর্যরাই অনার্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে নিজের করে নিয়েছিল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এখানকার বাঙালি জাতির উদ্ভব হিসেবে সেই অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী বা অস্ট্রিকভাষী মানুষদেরই দায়ি করেছেন। এখানকার বাঙালিরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ রীতিনীতি সচল রাখলেও ভাষাটা কিন্তু তারা পেয়েছিল আর্যদের। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার স্পষ্টই বলেছেন—

> "... অনার্য্যের ধর্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না;
> ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা বাদে, পৌরাণিক
> পূজা দিতে, যোগচর্য্যার তান্ত্রিক মতবাদ ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের
> বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও
> পড়িয়ান মিলিইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল। উত্তর ভারতের
> গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতার আর্য্য
> অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশি, কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল।"

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাও বেঁচে আছে মানুষের মুখে, লেখকের লেখায়। বিভিন্ন উপভাষাকে টপকে বাংলা বেঁচে আছে আদর্শ কথ্য বাংলায়। শিষ্টজনের মুখে, পত্র পত্রিকায়, লেখকের রচনায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলা ভাষার মূলে আছে আর্যরা। অনুমান করা হয় খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে। সেই সময় ভারতে বসবাস করত অনার্যরা। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া খুব উন্নত ছিল না। বুদ্ধিও সেইরকম ছিল না। এই সুযোগটাই নিয়েছিল আর্যরা। আস্তে আস্তে তাই তারা দখল নিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। আর্যদের বৃত্তি ছিল পশুপালন করা। যাযাবরী কায়দায় তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ালেও, তাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল খুবই শক্তিশালী। ফলে অনার্যদের উপর প্রভাব ফেলতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তারা আস্তে আস্তে পুরো ভারতবর্ষের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে।

বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাষাগত অনেক পার্থক্য ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে মিলটাই ছিল বেশি। অনুমান করা হয় তারা কথা বলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। তারা প্রথম দিকে রচনা করেছিল বিভিন্ন ধরনের দেব গীতামূলক কাব্য। যেমন— ঋগ্বেদ সংহিতা, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি। যাই হোক এই বৈদিক দেবগীতিমূলক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর হঠাৎ করে হয়নি। এর জন্যে অনেক সময় লেগেছিল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা প্রায় আড়াই হাজার বছর।

৩.১.২.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করো।

২. অধ্যাধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৩

বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৩.১ : ভূমিকা
৩.১.৩.২ : প্রাচীন বাংলা
৩.১.৩.৩ : মধ্য বাংলা
৩.১.৩.৪ : আধুনিক বাংলা
৩.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.১.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৩.১ : ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারেই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলি, ব্যাস-বাল্মীকির রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, হোমারের ইলিয়াদ-অদিসি ইত্যাদি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। তা ছাড়া আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয় তো আছেই। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষা কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। জানা গেছে, মূল আর্য ভাষাভাষী মানুষ আনুমানিক খ্রি:পূ: ২৫০০ অব্দে রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। দশটি শাখার অন্যতম একটি হল ইন্দো-ইরানীয়। তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ইরানীয় আর্য, দরদীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ

প্রচলিত ছিল - কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। বেদ লেখা হয়েছিল সাহিত্যিক ভাষায়। আর কথ্য রূপের ছিল চারটি আঞ্চলিক উপভাষা। প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই সূচনা ঘটল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার। প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃতের জন্ম হল। তারপর প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্যা থেকে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হল। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জন্ম হল অপভ্রংশের এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পাওয়া গেল অবহট্ঠ। এর পরে ভারতীয় আর্য ভাষা তৃতীয় যুগে (আ: ৯০০ খ্রী:) পদার্পণ করে। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে পাওয়া গেল দুটি শাখা পশ্চিমা ও পূর্বী। তারপর পূর্বী শাখা থেকে জন্ম হল 'বঙ্গ-অসমিয়া' ও 'ওড়িয়া' ভাষার। অবশেষে বঙ্গ-অসমিয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। ভৌগলিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। অবশেষে বঙ্গ অসমীয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার জন্ম চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

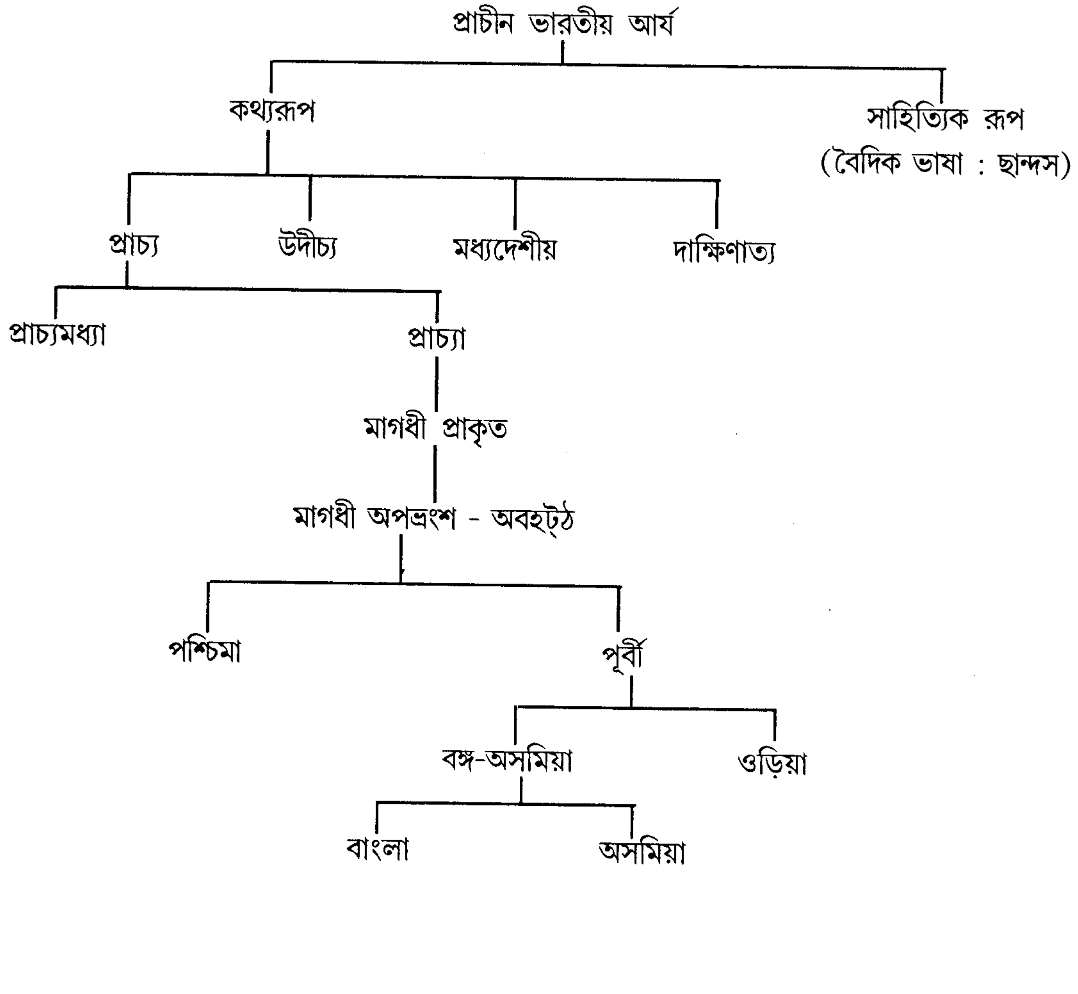

মাগধী প্রাকৃত বা মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ড. পরেশ চন্দ্র মজুমদার সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, বাংলা ভাষা আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই মতটিই অধিক প্রচলিত। আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার জন্ম।

জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাভাষার বিকাশকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) প্রাচীন বাংলা ভাষা (Old Bengali = OB)

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali = MB)

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali = NB)

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষা কোন ভাষা বংশেরই একটি ভাষা ?

২। অবশেষে বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় ?

৩.১.৩.২ : প্রাচীন বাংলা

এই পর্বের সময়সীমা আনু: ৯৫০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ। তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে (১২০২ খ্রি:) পরবর্তী নিদর্শনহীন অংশকে ধরা হয় না। ৯৫০-১২০০ খ্রি: পর্যন্ত ধরা হয়। এই পর্বে প্রাপ্ত নিদর্শন - 'চর্যাপদে', সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষের' টীকায় চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডলে', 'শেকশুভদয়ার' গানে-ছড়ায়।

বৈশিষ্ট্য :

(১) পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি - ভণতি > ভণই

(২) ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন - ধর্ম > ধম্ম > ধাম

(৩) বিভক্তির স্থানে অনুসর্গের ব্যবহার - তোহোর অন্তরে = তোর তরে।

(৪) -এর/-অর/-র' বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদ - **রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

৩.১.৩.৩ : মধ্য বাংলা

সময়সীমা — ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। এর নিদর্শন মেলে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, শাক্তসাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) আ-কারের পরবর্তী 'ই/উ' ধ্বনির ক্ষীণতা - বড়াঞি > বড়াই।

(২) সর্বনামের বহুবচনে কর্তৃকারকে 'রা' বিভক্তি - আহ্মারা > আমরা

(৩) অপিনিহিতির ব্যবহার - করিয়া > কইরা

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল - 'র, এর' ইত্যাদি। যথা, '**রূপের** পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল'।

৩.১.৩.৪ : আধুনিকবাংলা

সময়কাল ১৭৬০ থেকে বর্তমানকাল। মানুষের মুখের ভাষাই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ থেকে আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখের বিশাল রচনা সম্ভার এই ভাষার নিদর্শন। এর পাঁচটি উপভাষা রয়েছে — রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী। উল্লেখ্য ভাগীরথী তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষের 'রাঢ়ী' উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'আদর্শ কথ্য বাংলা' (Standard Colloquial Bengali).

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) ব্যাপকভাবে 'অভিশ্রুতি' প্রক্রিয়ার ব্যবহার, যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে

(২) স্বরসঙ্গতি লক্ষণীয় - দেশী > দিশি

(৩) বহুপদী ক্রিয়ারূপ দেখা যায় - গান করা, খেলা করা

(৪) ইংরেজি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বহু বিদেশি শব্দের ব্যবহার - চেয়ার, টেবিল, আলপিন, হাকিম, কুপন ইত্যাদি।

(৫) নতুন নতুন ছন্দোরীতি এবং গদ্যছন্দের ব্যবহার সম্প্রতি ঘটেছে।

৩.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। সুকুমার সেন ভাষা সম্পর্কে কি বলেছেন ?

পর্যায় গ্রন্থ -১

একক -৪

বাংলা ভাষার যুগ বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য
(প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৪.১	:	প্রাচীন বাংলা
৩.১.৪.১.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.১.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.১.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২	:	আদি-মধ্য বাংলা
৩.১.৪.২.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩	:	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
৩.১.৪.৩.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪	:	আধুনিক বাংলা
৩.১.৪.৪.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৩	:	বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৪	:	শব্দগ্রহণগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৫	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫	:	আধুনিক বাংলা
৩.১.৪.৫.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫.৩	:	ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৬	:	সহায়ক গ্রন্থ
৩.১.৪.৭ .	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৪.১ : প্রাচীন বাংলা (Old Bengali)

বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এই হাজার বছরে বাংলা ভাষার বহু পরিবর্তন হয়েছে। অনেক বৈচিত্র এসেছে। ওই পরিবর্তন ও বৈচিত্রকে সামনে রেখে বাংলা ভাষাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা, আধুনিক বাংলা ও অত্যাধুনিক বাংলা। বাংলা ভাষার এই হাজার বছরের পথ পরিক্রমাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

যথা—

প্রাচীন বাংলা : (৯০০-১২০০, মতান্তরে ১৩৫০ খ্রি: পর্যন্ত)

মধ্য বাংলা : (১৩৫০-১৭৬০ বা ১৮০০ খ্রি: পর্যন্ত)

আধুনিক বাংলা : (১৮০০-বর্তমান কাল পর্যন্ত)

এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত চর্যাপদ থেকে। এ ছাড়া আর যে সব রচনা থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার পরিচয় মেলে, সেগুলি হল—

ক. বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের --'বিদগ্ধমুখমণ্ডল'

খ. বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের - 'অমরকোষের টীকাসর্বস্ব'

গ. সেকশুভোদয়ার - কিছু গান ও ছড়া।

৩.১.৪.১.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পদের শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনি বজায় ছিল।

যেমন — ভণতি > ভণই, উত্থিত > উটঠিঅ > উঠি ইত্যাদি।

২. এই পর্বে যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ ঘটেছে প্রাকৃতের স্তরেই। এ ছাড়া পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়েছে। উদাহরণ — জন্ম > জাম, কম্ম > কাম ইত্যাদি।

তবে সর্বত্র এই নিয়ম রক্ষিত হয়নি। যেমন — মধ্যেন > মঝেঁ (এখানে 'মাঝেঁ', হয়নি)

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও সমীভবনের ধারা দেখা যায়। কিন্তু তা খুব অল্প দু'একটি শব্দে।

স্বরসঙ্গতি : দৃঢ় > দিঢ়ি

সমীভবন : নিশ্চল > নিচ্চল

('শ' 'চ' অর্থাৎ বিষম ব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে 'চ্চ' পরিণত হয়েছে।)

৪. এই পর্বে নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়েছে। তার ফলে স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন — শব্দেন > সাঁদে ইত্যাদি। তবে স্বতোনাসিক্যীভবনের পরিচয় প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। উদাহরণ — করহু = কর + হু > করহুঁ (হুঁ - স্বতোনাসিক্যীভবন)।

৫. প্রাচীন বাংলায় একাধিক স্বরধ্বনি একটি স্বরে পরিণত হয়নি। পাশাপাশি দুটি স্বর বা যৌগিক স্বরের উপস্থিতি বজায় ছিল। যেমন — উদাস > উআস।

৬. এই পর্বে ভাষায় শ্রুতিধ্বনি হিসেবে শব্দের মধ্যে 'য়' ও 'ব'-এর আগম দেখা গেছে।

যেমন— নিকট > নিঅডি > নিয়ড্ডি ('য়'-এর আগম), ত্রিভুবন > তিহুঅন > তিহুবন ('ব' আগম) প্রভৃতি।

৭. এই পর্বে 'ন' অ 'ণ' এর মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। আবার 'শ', 'স', 'ষ' এর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাব-ণাবী, এখানে 'ন' ও 'ণ' দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই শব্দের বানানে কোথাও 'শ', কোথাও 'স' বা 'ষ' ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন — শূন > সূণ, সহজে > ষহজে, শবরী > সরবী ইত্যাদি।

৩.১.৪.১.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. এই পর্বে তিনরকম ভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত। যেমন— 'ল', 'ইলে' ও 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করে।

উদাহরণ — ল-দেখিল, ইলে-চড়িলে, অন্তে-বুড় + অন্তে = বুড়ন্তে ইত্যাদি।

২. যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারও এই পর্বে দেখা যায়। যেমন—

দুহিল দুধু (দোয়া দুধ) প্রভৃতি।

৩. অনুসর্গ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়। উদাহরণ—

ক. শব্দদ্বৈত - উঁচা উঁচা পাবত।

জে জে আইলা।

খ. অনুসর্গ - তোহোরে অন্তরে মোত্র খলিলি হাড়েরী মালা।

৪. ক্রিয়ারূপে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ এই পর্বের বাংলা ভাষায় দেখা যায়। অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল মি, হুঁ ইত্যাদি। যেমন—

ক. জানমি - আমি জানি।

খ. জানহুঁ - আমরা জানি।

অতীতকালে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি ছিল 'স' ও প্রথম পুরুষে 'ই'।

৫. প্রাচীন বাংলায় নাম ধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

উভিল = ইল প্রভৃতি।

৬. বিভিন্ন ভাবের প্রয়োগে নানা অব্যয়ের ব্যবহারও এই পর্বে দেখা যায়। যেমন—

ক. নঞর্থক অব্যয় — দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। (ন সংযোজক অব্যয়)

খ. সংযোজক অব্যয় — জো সে বুধী সো নিবুধী। (ই, ঈ, বি সংযোজক অব্যয়)

গ. সম্বোধনসূচক অব্যয় — ডোম্বী বাহলো ডোম্বী। ('লো' সম্বোধনসূচক অব্যয়)

৭. 'ইল' প্রত্যয় যোগে অতীত কালের রূপ গঠন বহুক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় দেখা গেছে। আর 'ইব' প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠিত হয়েছে। উদাহরণ—

ক. অতীত কালের রূপ : বেঢ়ল (বেঢ় + ইল) ইত্যাদি।

খ. ভবিষ্যৎ কালের রূপ : করিব, যাইব প্রভৃতি।

৩.১.৪.১.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলার প্রধান ছন্দ ষোলো মাত্রার পাদাকুলক। মূলত এই ছন্দ থেকেই পরবর্তীকালে পয়ার, ত্রিপদী, মহাপয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ জন্মলাভ করেছিল বলে মনে করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চৌদ্দ মাত্রার এই ছন্দের কথা—

২	২	১১১১	১২১	২	
কা	আ	তরুবর,	পঞ্চবি	ডাল।	৪+৪+৪+২ =১৪
২১১	২২	২২	২		
চঞ্চল	চীএ	পইঠো	কাল।।		৪+৪+৪+২=১৪

এ ছাড়া চর্যাপদে দেখা যায় নানা অলংকার, ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার।

৩.১.৪.২ : আদি-মধ্য বাংলা (Early Middle Bengali)

আদি-মধ্য বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য। আর অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলী, সমকালীন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে। চৈতন্য জীবনীকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত ও ভগবতের অনুবাদ, লোককাব্য, শাক্ত পদাবলী, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি।

৩.১.৪.২.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি মধ্য বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ' ধ্বনি থাকলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল।

যেমন — কতহো > কথো ইত্যাদি।

২. এই পর্বে বাংলায় 'আ' কারের পরে অবস্থিত 'ই' ও 'উ' ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায়।

যেমন — বড়াই > বড়াই প্রভৃতি।

৩. আদি মধ্য বাংলায় প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত বর্তমান। যার ফলে, হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়েছিল।

যেমন — আতিশয় (অতিশয়), আন্ধারী (অন্ধকার) ইত্যাদি।

৪. নাসিক্যের সঙ্গে যুক্ত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন আদি মধ্য বাংলায় লুপ্ত হল।

যেমন— কাহ্নু > কানু, আহ্মি > আমি ইত্যাদি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাহ্নের প্রচলনই বেশি।

৫. স্বরভক্তির ব্যবহার আদি মধ্য বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।

যেমন — বর্ষা > বরিষা, ব্যাকুল > বেআকুল, শক্তি > শকতি ইত্যাদি।

৬. প্রাচীন বাংলার থেকে মধ্য বাংলা স্বরসংগতির ব্যবহার অনেক বেশি।

উদাহরণ - এখনী > এখুনী, ভেড়ি > ভিড়ি প্রভৃতি।

৭. অপিনিহিতির ব্যবহারও এখানে বেশি।

যেমন— আসিহ > আইস ইত্যাদি।

৩.১.৪.২.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি মধ্য বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ছিল—

ক. কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি। উদাহরণ — কাক কাঢ়ে রাত্র।

খ. গৌণ্যকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—

তাক না করিহ দয়া।

কংসকে বুলিল কন্যা।

সাপেরে করিআঁ বিষদানে।

গ. করণ কারকে বিভক্তি ছিল ত, এ, এঁ ইত্যাদি। উদাহরণ—

নিজ মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।

হাথত ধরি আঁ মোর দগধপরাণে

মিছাই মাত্রাএ পাড়এ সান।

ঘ. অধিকরণ কারকের বিভক্তি ছিল ত, তে, এ ইত্যাদি।

বাটত সুজিআঁদা সিসতে সিন্দুর।

বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।

ঙ. কর্মে বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। উদাহরণ — কাহ্নু নাব ছোড়ী।

চ. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত না হয়ে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল।

যেমন — আজি 'হৈতে' আহ্মারা হৈলাহোঁ' একমতী।

ছ. সম্বন্ধ পদে বিভক্তি ছিল — র, এর, ক, কের ইত্যাদি। যেমন—

ভাঁগিল সোনার ঘট।

যমুনাক ভিতে।

নদীকের বাণে।

২. এখান থেকেই সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

৩. এই পর্বের ভাষায় তির্যক কারক অর্থে আন্তর, মাঝেঁ, সমে, পানে, ঠাঁই ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়।

৪. প্রাচীন বাংলায় ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার উচ্চারণ নেই। কিন্তু আদি মধ্য বাংলায় 'আছ' ধাতুযুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

৫. আদি মধ্য বাংলায় বচন দু'ভাবে হয়েছে। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন, রা ইত্যাদি যোগ করে এবং অপ্রাণিবাচক শব্দে শুধু গণ যোগ করে। উদাহরণ—

প্রাণিবাচক শব্দ দেবগণ, তোহ্মারা ইত্যাদি।

৬. আদি মধ্য বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ হয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।

যেমন—ফুটিলছে > ফুটিল + আছে।

৭. বচনের ব্যবহার খুব বেশি এখানে নেই। শুধু সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে 'রা' বিভক্তি যোগে বহুবচন করা হত। যেমন— আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি।

৮. এই পর্বে লিঙ্গভেদ কেবল প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল।

যেমন —কোঁঅলী, পাতলী, বালী প্রভৃতি।

৯. অসমাপিকা ক্রিয়াপদে অনুসর্গ হিসেবে 'গিয়া' সিয়া' ব্যবহৃত হয়।

যেমন— দেখ গিয়া ইত্যাদি।

১০. আদি মধ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষে অজ্ঞাতকালে 'লোঁ, 'ইল', বর্তমানকালে ও', ই এবং ভবিষ্যৎ কালে 'ইব' যোগ করা হয়েছে।

যেমন—আনিলোঁ, ছাড়িলাঁ, আরতিল ইত্যাদি। (অতীত কাল)

নিশিবোঁ, ছাড়িবোঁ প্রভৃতি। (ভবিষ্যৎ কাল)

১১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় অপভ্রংশের ক্রিয়াবিভক্তি লুপ্ত বা বিবর্তনের ফলে পালটে গেলেও আদি মধ্য বাংলায় এর রূপগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে। যেমন—

প্রাচীন বাংলা— 'ই' (প্রথম পুরুষ) > আদি মধ্য বাংলা — 'ই', 'এ'

১২. নামধাতুর ব্যবহারও আদি মধ্য বাংলায় আছে।

৩.১.৪.২.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

পয়ার ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আদি মধ্য-বাংলাতেই হয়েছিল। ষোলো মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ থেকে চৌদ্দো মাত্রার অক্ষর বিশিষ্ট পয়ার ছন্দের উৎপত্তি ও পরিণতি এই পর্বেই ঘটেছিল। এ ছাড়া নানারকম ত্রিপদী, চৌপদী একাবলী

ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহারও আদি মধ্য বাংলায় দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এই দুটি লাইনে—

২	১১	১১	১১	১১	১১১১	
তোর	রতি	আশো	আঁশে/	গেলা	অভিসারে।	(৮+৬)
১২	১২	২	১১	১১১১		
সকল	শরীর	বেশ/করী	মনোহরে।			(৮+৬)

৩.১.৪.৩ : অন্ত্য-মধ্য বাংলা (Late Middle Bengali)

এই যুগের বাংলা ভাষার বহু নিদর্শন রয়েছে। সে কথা আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার সূচনায় তা লেখা হয়েছে। তবে বলা যায় এই যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শনগুলিই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে সুবর্ণযুগের সূচনা করেছিল।

৩.১.৪.৩.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অভিশ্রুতির ব্যবহারও অন্ত্য-মধ্য বাংলায় পাওয়া যায়।

যেমন— খাইয়া > খায়া > খায়্যা, খেয়ে, বানিয়া > বাইন্যা > বেনে প্রভৃতি।

২. আধুনিক বাংলা ভাষায় 'অ' কার 'ও' কারে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্ত্য মধ্য বাংলায়ও তা দেখা যায়। যেমন— ভালো, বারোমাস্যা ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলায় নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়েছিল। তবে অনুনাসিক ধ্বনি লুপ্ত না হয়ে বর্তমান ছিল।

উদাহরণ—কাহ্নু > কানু (নাসিক্য ধ্বনি)

শিশু কান্দে ওদনের তরে। (অনুনাসিক ধ্বনি)

৪. উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরের সংকোচ ও আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে মধ্যস্বর লোপের দৃষ্টান্তও অন্ত্য-মধ্য বাংলায় দেখা যায়।

যেমন —স্বর সংকোচন : আইনু > আনু ('ই' স্বর সংকোচন)

মধ্য স্বরলোপ : রান্ধিবে মুসরি ডাল।

মুসুরি > মুসরি (মধ্যস্বর 'উ' লোপ)

৫. বর্ণবিপর্যয় ও বিষমীভবনের উপস্থিতিও এই পর্বে দেখা যায়। উদাহরণ—

বর্ণবিপর্যয় : মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গা বুড়ে

এখানে 'ডুবে' বর্ণবিপর্যয়ের ফলে 'বুড়ে' হয়েছে।

বিষমীভবন : নয়ন > নঅন > নঞান

৬. 'অ্যা' ধ্বনির উদ্ভব হয়েছে এই পর্বে।

যেমন — গোধিক্যা রাখ্যাছি বান্ধি।

৭. এখানে অর্ধ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন — ক্ষমা > খেমে ইত্যাদি।

৩.১.৪.৩.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়, বহুত্ববোধক শব্দ ও পদ যোগে বহুবচনের রূপ গঠন করা হত। যেমন—

সংখ্যাবাচক শব্দ : সপ্ত, অষ্ট ইত্যাদি।

বহুত্ববাচক শব্দ : ব্যাস আদি যত কবি।

বহুত্ববাচক শব্দ : বহু পশুগণ ইত্যাদি।

২. এই পর্বের বাংলায় 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত।

যেমন—

আন্যাছি = আন্ + আছ্ + ই

করয়াছ = কর + আছ্

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষের পাঁও, রাঁও, জাঁও ইত্যাদির রূপ ছিল। যেমন—

ক. তোর যদি লাগ পাঁও।।

খ. পাঁও আমি পাই।

৪. এই পর্বে অতীত কাল বোঝাতে 'ইল' ও ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে 'ইব' ব্যবহৃত হত। যেমন—

ক. করিল = কর + ইল

খ. না থাকিব তোমার ঘরে।

থাকিব = থাক + ইব প্রভৃতি

৫. এই পর্বের বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির জন্য অনেক অর্থহীন শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন—

বনমধ্যে একেশ্বরী সঙ্গে কেহ নাই।

একেশ্বর = (এক + ঈশ্বর)

এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি অর্থহীন। কারণ এটি শব্দালংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. বিশেষ্যকে জোর দেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ্যের আগে 'অ' উপসর্গের ব্যবহার এখানে দেখা যায়। যেমন—

অকুমারী = অ + কুমারী

৩.১.৪.৩.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

সর্বত্রই পয়ার ছন্দের ব্যবহার এই পর্বের বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

১১ ১১ ১১১১ ১১১ ১১১

দেখ দ্বিজ মনসিজ। জিনিয়া মূরতি। ৮ + ৬ = ১৪

১১১১ ১১১১ ১১১১ ১১

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র। পরশয়ে শ্রুতি। ৮ + ৬ =১৪

এ ছাড়া বিভিন্ন রকম ত্রিপদী, মাত্রাবৃত্ত ও শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের ব্যবহারও বেড়ে গেল। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় একটি নতুন ছন্দেরও আবির্ভাব হয়। সেটি হল বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ব্যবহার।

৩.১.৪.৪ : আধুনিক বাংলা (Modern Bengali)

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সালটিকে মধ্য বাংলার সমাপ্তি হিসেবে ধরা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় আধুনিক যুগ। কেউ কেউ আবার ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে মনে করেন। সেই হিসেবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ধরা হয়।

আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের লেখা গদ্যসাহিত্য, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখর কাব্য-কবিতা, বিভিন্ন লেখকের নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে। বলা যায় বর্তমান সময়ের সব রচনার মধ্যেই আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলার জীবন্ত নিদর্শন মানুষের মুখের ভাষা। এখানে আধুনিক বাংলা ভাষার কয়েকটি বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন — পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতো আধুনিক বাংলা ভাষারও দুটি রূপ দেখা যায়। যথা-লেখ্যরূপ ও কথ্যরূপ। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গদ্যভাষা আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত হতে লাগলো। অর্থাৎ গদ্য সাহিত্যের সূচনা হল আধুনিক বাংলাতেই। তবে এই গদ্য মূলত সাধু গদ্য। অবশ্য বর্তমানে শিষ্ট চলিত গদ্যই ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.১.৪.৪.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির বহুল ব্যবহারের পাশাপাশি অভিশ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—

   রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে

   মরিয়া > মইর‍্যা > মরে ইত্যাদি।

২. এই পর্বের বাংলায় বর্ণদ্বিতের ব্যবহার দেখা গেছে। যেমন—

   ছোট > ছোট্ট

   সকলে > সক্কলে প্রভৃতি।

৩. আধুনিক বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে পদের মধ্যে অবস্থিত ঢ় > ড় হল এবং পদের শেষে অবস্থিত 'হ' কারের লোপ ঘটল। উদাহরণ—

বঢ়াই > বাঢ়ে > বাড়ে (ঢ় > ড় হল)

তাহার > তার (হ কার লোপ)

৪. এই পর্বের বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও সমীকরণের বাহুল্য দেখা গেল। উদাহরণ—

স্বরসঙ্গতি : কুড়াল > কুডুল, রূপা > রূপো, জন্য > জন্যে প্রভৃতি।

সমীভবন : পদ্ম > পদ্দ, ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।

৫. ধ্বনির আগম ও ধ্বনিলোপ দুই-ই আধুনিক বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ধ্বনির আগম : স্কুল > ইস্কুল প্রভৃতি।

ধ্বনিলোক : ভগিনী > ভগ্নি ইত্যাদি।

৬. আধুনিক বাংলায় সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দ্বিস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—

আইল > এলো, গাইল > গেলো ইত্যাদি।

৭. বর্ণ বিপর্যয়ের উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিক বাংলা ভাষায়। উদাহরণ—

বারাণসী > বেণারসী

বাক্স > বাস্ক ইত্যাদি।

৮. শব্দার্থের নানা পরিবর্তন যেমন — অর্থের অবনতি, অর্থের উন্নতি, অর্থের সংকোচ, অর্থের বিস্তার ও অর্থের সংশ্লেষ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়। যেমন—

মূল শব্দ	আদি অর্থ	সংকুচিত অর্থ
ক. নাগর	নগরের বিদগ্ধ ব্যক্তি	অবৈধ প্রণয়ী
	আদি অর্থ	প্রসারিত অর্থ
খ. গাঙ	গঙ্গা নদী	যে কোনও নদী।

৯. আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সাধুভাষার ক্ষেত্রে ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের ব্যবহার দেখা গেলেও চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

		সাধু		চলিত
ক্রিয়া	:	করিব	>	করব
বিশেষ্য	:	জলিয়া	>	জেলে
বিশেষণ	:	তাহা	>	তার
অনুসর্গ	:	হইতে	>	হতে, থেকে

১০. আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সাধুভাষায় অনুনাসিকের সঠিক প্রয়োগ দেখা যায়।

উদাহরণ — বংশী > বাঁশি, পঞ্চ > পাঁচ ইত্যাদি।

১১. দ্বিমাত্রিকতার প্রভাব এই পর্বে লক্ষণীয়।

যেমন — জানালা > জানলা, গামোছা > গামছা প্রভৃতি।

৩.১.৪.৪.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় নামধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

২. এই পর্বের ভাষায় বিভিন্ন কারকের ক্ষেত্রে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

ক. কর্তৃকারক : পাখিতে ফল খেয়েছে।

খ. করণকারক : এ তুলিতে আঁকা যায় না।

গ. অপাদান কারক : বিনা মেঘে বজ্রপাত।

ঘ. অধিকরণ কারক : জলে থাকে মাছ।

৩. আধুনিক বাংলায় সংযোগক অব্যয় হিসেবে 'এবং', 'ও'-এর বহুল ব্যবহার দেখা গেল।

যেমন— ক. সমরবাবু মতিগঞ্জের বাড়িতে গেলেন এবং তিনি খেতে বসলেন।

(এখানে 'এবং' সংযোজক অব্যয় দুটি বাক্যকে জুড়ে দিয়েছে।)

খ. অনুরিমা ও দেবাংশী ভাইয়াদার বাড়িতে গেল।

(এখানে 'ও' সংযোজক অব্যয় দুটি নামবাচক শব্দ অনুরিমা ও দেবাংশীকে জুড়ে দিয়েছে।)

বর্তমানে 'ও', 'এবং'-এর জায়গায় 'আর' সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— শাঁওলি ও শুভশ্রী ভুবনেশ্বরে গেল।

৪. এই পর্বে সংযোজক অব্যয় ছাড়াও বাক্যালঙ্কার অব্যয়েরও ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ —

ক. অনুপমের কথা তো আমি বলতে পারব না।

খ. আমি তো আজ পেয়ারা খাইনি।

৫. আধুনিক বাংলার সাধু ভাষার ক্ষেত্রে যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন — ধ্যান করা, পান করা, খেলা করা ইত্যাদি।

৬. এই পর্বে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে 'না' বাচক শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ—

সমাপিকা ক্রিয়া : যেও না।

অসমাপিকা ক্রিয়া : না বুঝে, না জেনে প্রভৃতি।

৭. আধুনিক বাংলায় ক্রিয়ার কাল তিনটি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ক্রিয়ার ভাব দুটি — নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। তবে কাল ও ভাব বৈচিত্র্যময়। আধুনিক বাংলা ভাষাতেই 'ইয়া' যুক্ত অসমাপিকার জায়গায় 'পূর্বক' শব্দটি ব্যবহার করে অসমাপিকার ভাব বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন —

দর্শন ক্রিয়া > দর্শন পূর্বক

অনুগ্রহ করিয়া > অনুগ্রহ পূর্বক ইত্যাদি।

৩.১.৪.৪.৩ : বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যে পরিণত করার রীতি প্রচলিত। যেমন—

ক. সে খেল না। সে চলে গেল। (সমাপিকা ক্রিয়া)

খ. সে না খেয়ে চলে গেল। (অসমাপিকা ক্রিয়া)

২. মধ্য বাংলা ভাষার নঞর্থক বাক্য বোঝাতে 'না' শব্দটি ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় 'না' শব্দটি ক্রিয়াপদের পরে বসতে শুরু করেছে।

যেমন — সে এল না। রাম বসল না।

৩. আধুনিক বাংলা ভাষার বাক্যে অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার রূপটি বেশিরভাগ সময়ে উহ্য থাকে। যেমন—

ক. সত্যজিৎ ভারতের মহান চলচ্চিত্র পরিচালক।

খ. বাংলা কাব্য সাহিত্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

উপরের দুটি বাক্যে (হওয়া) অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার রূপটি উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ সত্যজিৎ হন/হলেন অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় হন/হলেন।

৪. ইংরাজির মতো বাংলা বাক্যে বিশেষ্যর আগে বিশেষণ বসে।

যেমন — দারুন বাড়ি, অসাধারণ ছেলে, ভালো মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ ভাব প্রকাশের সময় বিশেষ্যর পরে বিশেষণ বসে।

যেমন— মেয়ে ভালো, ছেলে অসাধারণ ইত্যাদি।

৫. আধুনিক বাংলায় বাক্যস্থিত পদের ক্রম, কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া। কিন্তু ভাব প্রকাশের নিরিখে এই ক্রম সবসময় থাকে না। আধুনিক বাংলায় ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার হচ্ছে। ক্রিয়াকে যথাসম্ভব তুলে দিয়ে বাক্য সপ্রতিভ করা এখনকার লেখকদের উদ্দেশ্য। আর বাক্যে কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি কমিয়ে দাঁড়ির ব্যবহার বেশি হয়েছে।

৩.১.৪.৪.৪ : শব্দগ্রহণগত বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় ইংরেজি, পর্তুগিজ ইত্যাদির শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এ ছাড়া বহু বিদেশি উপসর্গও আধুনিক বাংলায় এসেছে। যেমন—

ক. ইংরেজি শব্দ : চেয়ার, ব্যাঙ্ক, স্কুল ইত্যাদি।

খ. পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, আনারস, সাবান, কেরোসিন প্রভতি।

গ. ফারসি শব্দ : বাজার, খরচ, বাগান ইত্যাদি।

ঘ. বিদেশি উপসর্গ শব্দ : ফি-বছর ('ফি' উপসর্গ) ফুলমোজা ('ফুল' উপসর্গ) প্রভৃতি।

ঙ. অনেক ইংরেজি শব্দ দেশজ রীতিতে নতুন রূপ পেয়েছে। যেমন— Lord > লাট, Lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। অনেক শব্দের পরিভাষা করা হয়েছে। যেমন College > মহাবিদ্যালয়, Wrist watch > হাতঘড়ি ইত্যাদি।

৩.১.৪.৪.৫ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

পয়ার, ত্রিপদী, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে এসেছে। এই বাংলায় আধুনিক বাংলায় গদ্যছন্দের সূচনা বিস্ময়কর। পুরনো পয়ার, ত্রিপদী ভেঙে গৈরিশ ছন্দের উদ্ভব তো হলই, পাশাপাশি দেখা গেল গদ্যছন্দের বহুল ব্যবহার। 'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

১	১১	১১১	১১	১২	১২	১	১২	
এ	কথা	জানিতে	তুমি/	ভারত	ঈশ্বর	শা-	জাহান	৮ + ১০

১১১১১১২ ১২১২১১২

কালস্রোতে ভেসে যায়/জীবন যৌবন ধনমান ৮ + ১০

৩. ১. ৪. ৫ : অত্যাধুনিক বাংলা (Ultra Modern Bengali) :

মানুষ নিজের অজান্তে ভাষার পরিবর্তন করে ফেলে। পরিবর্তন কিন্তু একদিনে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন গত বিশ বছরে এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক ভাবে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে আমরা একটা নাম দিতে পারি এই পর্বের। সেটা হল অত্যাধুনিক বাংলা। এই বাংলা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগঠনগত ও ছন্দোগত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হল।

৩. ১. ৪. ৫. ১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. এই বাংলায় স্বরসঙ্গতি ছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনির কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়।
যেমন — বাড়িওয়ালা > বাড়িঅলা, ফেরিওয়ালা > ফেরিঅলা ইত্যাদি।

২. শব্দদ্বৈতের মাধ্যমে নিত্য নতুন শব্দ তৈরি করে তা বাক্যে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। যেমন—

ক. দিন দিন যা শুরু হয়েছে।

খ. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

৩. কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট রূপ, কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি স্বচ্ছ হয়েছে।

৪. তৎসম শব্দ ছাড়া প্রায় সব শব্দেই 'ঈ'-কারের বদলে 'ই'কার, মূর্ধন্য (ণ)-এর পরিবর্তে দন্তন্য (ন), 'ষ'-এর পরিবর্তে 'শ' বা 'স' -এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

যেমন — ট্রেণ > ট্রেন, বাড়ী > বাড়ি, মাষ্টার > মাস্টার ইত্যাদি।

৫. খণ্ড-ৎ-এর ব্যবহারও একদম তলানিতে ঠেকেছে। যেমন—

কদাচিৎ > কদাচিত, উচিৎ > উচিত প্রভৃতি।

৬. অসমীভবন প্রক্রিয়ায় সমব্যঞ্জনার লোপ এই পর্বে ঘটে চলেছে। যেমন—

অভিভাবক > অবিভাবক, পৌঁছেছে > পৌঁচেছে ইত্যাদি।

৩. ১. ৪. ৫ . ২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. খণ্ডিত শব্দের ব্যবহার এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন— মাইক্রোফোন > মাইক, ইউনিভারশিটি > ভারসিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন > অ্যাডমিন > অ্যাডাম ইত্যাদি।

২. এই পর্বে ইংরাজি-বাংলা শব্দ দিয়ে যৌগিক পদ তৈরি করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে এগুলি কিন্তু যৌগিক ক্রিয়াপদ নয়। যেমন— তদন্ত কমিশন, প্যাকেজ নাটক, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি।

৩. ইংরাজি সহ বিভিন্ন ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ তো এই ভাষাতে আসছেই, তবুও নিত্যনতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

বিন্দাস, ফান্ডা, মালটিন্যাশনাল, ওয়ান স্টপ প্রভৃতি।

৪. বিশেষ্যের সংক্ষিপ্তকরণ করা এই পর্বের বাংলার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেমন—

আনন্দবাজার পত্রিকা > এবিপি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় > ক.বি, ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি > ইগনু ইত্যাদি।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কিছু বিদেশি শব্দ যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— চেক করা, ট্যাকস দেওয়া, বুক করা প্রভৃতি।

৩. ১. ৪. ৫. ৩ : ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অত্যাধুনিক বাংলা ভাষার ছন্দ আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে। সব ছন্দকে বাইরে ফেলে গদ্য ছন্দ একচ্ছত্র রূপ নিয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যাবার পর জয় গোস্বামী লিখেছেন—

'বিরোধিতা করলাম অনেক।
তোমার সুস্পষ্ট বিরোধিতা
আজও, তোমার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে

মনে হয় ভুল-ই করেছি। ....

(২৫ অক্টোবর, ২০১২ : জয় গোস্বামী)

অত্যাধুনিক বাংলার ছন্দ যে কথা বলে তা সুনীল কবিতাতেও স্পষ্ট।

নির্ভেজাল বাংলা গদ্য ছন্দের কবিতা—

‘ হে প্রথম লাইন, এসো, খাতা ও কলম নিয়ে
বসে আছি, এসো
আকাশে রঙিন মেঘ, বজ্রগর্ভ, বিদ্যুতের এক
ঝটিকার মতন, এসো’,

(হে প্রথম লাইন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৩. ১.২. ২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : ‘বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।’

৩. ১.২. ৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২. আদি-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩. অন্ত্য-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৪. আধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৫

বাগযন্ত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৫.১ : বাগযন্ত্র

৩.১.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৫.১ : বাগযন্ত্র

ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি। মানব শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বনি উচ্চারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলিকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল - ঠোঁট, দাঁত, জিভ প্রভৃতি। অনেকে ফুসফুসকে বাগযন্ত্রের মধ্যে ধরেন না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী নোয়েল আর্মফিল্ড ফুসফুসকে বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যেই ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণত দেখা যায় বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত ধ্বনিতে স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে এবং নাসিকা, দন্ত, তালু প্রভৃতি নিষ্ক্রিয়ভাবে সহায়তা করে।

নিশ্বাস-বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়ে শ্বাসনালী দিয়ে কণ্ঠের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে ও নাসাগহ্বরে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীর ঠিক মধ্যে আছে স্বরযন্ত্র। ওই স্বরযন্ত্রেই সর্বপ্রথম নিশ্বাস বায়ু বাধার সম্মুখীন হতে পারে। এখানে আছে একজোড়া স্বরতন্ত্রী। স্বরতন্ত্রীতে থাকে দুটি পাতলা অথচ মজবুত স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি। যার সামনের দিকটা বাক্সের ডালার মতো জোড়া লাগানো। পিছনের দিকটা খোলা ফলে শ্বাসবায়ু বিনা বাধায় বাইরে আসতে পারে। কিন্তু কোনও ধ্বনি উচ্চারণের চেষ্টা হলেই বায়ুর সংঘর্ষে তন্ত্রীতে দেখা যায় কম্পন — আর ওই কম্পন তরঙ্গের মাধ্যমেই বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন ধ্বনিতে ঘোষ বা নাদ যুক্ত হলে হয় সঘোষ ধ্বনি এবং ঘোষ বা নাদ যুক্ত না হলে হয় অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং কম্পন ক্ষমতার তারতম্যের উপর 'স্বরের গ্রাম' নির্ভর করে। নারীর তুলনায় সাবালক পুরুষের স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেশি, তাই পুরুষের কণ্ঠস্বর মোটা। স্বরতন্ত্রের উপরে একটি মাংস খণ্ড আছে, যাকে বলা হয় উপজিহ্বা। শ্বাসনালীর পাশেই খাদ্যনালী। খাবার সময় উপজিহ্বা

> *ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি। মানব শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি উচ্চারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে বাগ্‌যন্ত্র বলে। বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল — ঠোঁট, দাঁত, জিভ প্রভৃতি।*

শ্বাসনালীর পথ রুদ্ধ করে দেয়, না হলে খাবার ওখানে ঢুকে পড়ে বিষম লাগাত। ওদিকে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরের প্রবেশ পথে উপরের দিকে ঝোলে আলজিভ। এটা নাসা গহবরে যাবার পথ আটকে দিলে বায়ু শুধুই মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। মুখগহ্বরের মধ্যে নীচের বাগযন্ত্র হল জিহ্বা। কণ্ঠনালীর স্থান থেকে জিহ্বার মূল শুরু। জিহ্বা কয়েকটি অংশে বিভক্ত - জিহ্বাপ্রান্ত, জিহ্বাফলক, সম্মুখ জিহ্বা, পশ্চাৎ জিহ্বা, জিহ্বামূল। আলজিহ্বার সামনেই থাকে নরম তালু, তার সামনে যথাক্রমে মূর্ধা, শক্ত তালু এবং দন্তমূল। এর পরেই থাকে দন্ত, যার পিছনে জিহ্বাগ্র ধ্বনি সৃষ্টি করে। মুখগহ্বরের বাইরে বাগ্‌যন্ত্রের যে অংশ দুটি আছে তার নাম অধর ও ওষ্ঠ। স্বরতন্ত্রীতে কম্পন জাগিয়ে শ্বাসবায়ু বাইরে আসবার দুটি পথ পায়। একটি মুখবিবর এবং অপরটি নাসাবিবর। নাসাগহ্বরের মধ্যে বায়ু অনুরণিত হয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে গেলে অনুনাসিক (Nasal) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মুখগহ্বর দিয়ে নির্গত ধ্বনি হল অননুনাসিক (Non-Nasal) ধ্বনি।

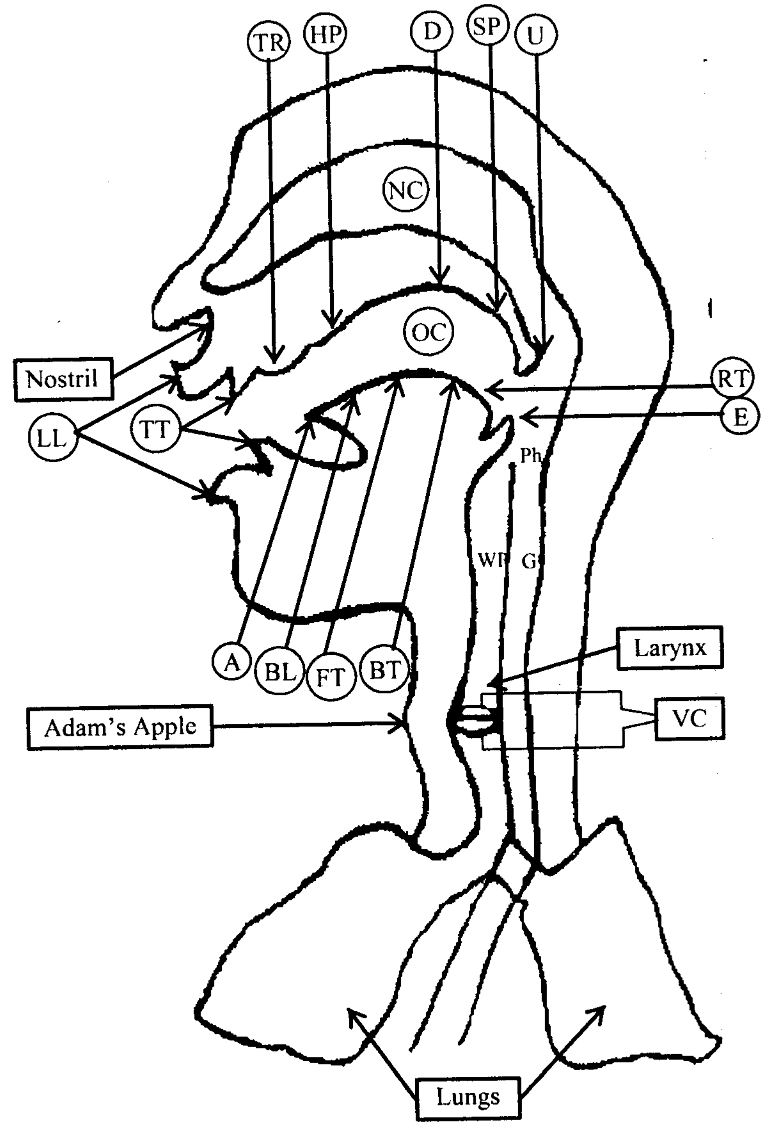

বাগযন্ত্রের চিত্রের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি :

NC = Nasal Cavity = নাসিকা গহ্বর

OC = Oral Cavity = মুখগহ্বর

LL = Lips = ওষ্ঠ ও অধর

TT = Teeth = দন্ত

TR = Teeth Ridge = Alveolar দন্তমূল

HP = Hard Palate = শক্ত তালু

D = Dome = সবোদ তালু বা মূর্ধা

SP = Soft Palate = নরম তালু

U = Uvola = আলজিভ

A = Apex = Tip of the Tongue = জিহ্বাপ্রান্ত

BL = Blade of the Tongue = Lamina = জিহ্বামূল

FT = Front of the Tongue = জিহ্বার সামনের ভাগ

BT = Back of the Tongue = জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ

Ph = Pharynx = কণ্ঠনালী, গলবিল

WP = Wind Pipe = শ্বাসনালী

Larynx = স্বরযন্ত্র

Nastril = নাসারন্ধ্র

Adams Apple = আদমের আপেল (?)

Lungs = ফুসফুস

E = Epiglottis = উপজিহ্বা

VC = Vocal Chords = স্বরতন্ত্রী

RT = Root of the Tongue = জিহ্বামূল

৩.১.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। বাগ্‌যন্ত্র কাকে বলে ? বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ কোনগুলি ? রেখাচিত্রসহ সেগুলির বিবরণ দাও।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৬
ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ
(ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব)

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৬.১ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

৩.২.৬.১.১ : ধ্বনিতত্ত্ব

৩.২.৬.১.২ : রূপতত্ত্ব

৩.২.৬.১.৩ : কাব্যতত্ত্ব

৩.২.৬.১.৪ : শব্দথতত্ত্ব

৩.২.৬.২ : সয়াহক গ্রন্থাবলী

৩.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৬.১ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

ভাষাশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে বর্তমানে অনেকগুলি শাখা উপশাখাতে বিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিভাগগুলি হল ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব।

৩.২.৬.১.১ : ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

শব্দের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় ধ্বনি। ধ্বনি নিয়ে আলোচনা হয় ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে, মোটামুটিভাবে তাকেই বলে ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনি বা Sound বলতে আমরা যা বুঝি ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনি বলতে ঠিক ঠিক তা বোঝায় না। পাখির ডাক থেকে শুরু করে ইট-কাঠের শব্দ সবকিছুকেই আমরা ব্যাপক অর্থে ধ্বনি বলি। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Sound. কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র মানুষের বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি। ইংরেজিতে যাকে বলে Phone. তাই এই বাগধ্বনি বা Phone কে নিয়ে গড়ে ওঠা ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিভাগ হল ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology. ধ্বনিতত্ত্বের আবার দুটি আলোচ্য বিষয় হল— (ক) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) এবং (খ) ধ্বনিবিচার (Phonemics)। মানুষের বাগযন্ত্রের গঠন ও ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় ধ্বনিবিজ্ঞান অংশের মধ্যে পড়ে। উচ্চারিত ধ্বনি বায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছায় ও বোধের সৃষ্টি করে। এই সংক্রান্ত আলোচনাও ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্গত। আর ভাষায় ব্যবহৃত মূলধ্বনিগুলির নানা উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও যথাযথ ব্যবহারিক বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত আলোচনায় ধ্বনিবিচারের অন্তর্গত।

৩.২.৬.১.২ : রূপতত্ত্ব (Morphology)

শব্দ বা পদ নিয়ে গঠিত হয় বাক্য। আবার শব্দও গঠিত হয় মূলরূপ বা রূপিম নিয়ে, যেটা এক বা একাধিক ধ্বনি সমবায়ে গঠিত। কোনও শব্দ বা ধাতু কোনও কোনও রূপিম বা মূলরূপ দিয়ে কীভাবে গঠিত হয়েছে তা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। শব্দ বা ধাতুর মূল অংশের সঙ্গে শব্দ বিভক্তি, ধাতু বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি যোগ হয় এবং এগুলি যুক্ত হওয়ার পরে তার কেমন রূপ দাঁড়ায়— এগুলি রূপতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে পড়ে।

৩.২.৬.১.৩ : বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

একাধিক ধ্বনি নিয়ে গঠিত হয় শব্দ। আবার একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয় বাক্য। যে কোনও ভাষার সবচেয়ে বড় একক বাক্য। যে কোনও ভাষার মূল ভিত্তি বাক্য। সামাজিক মানুষ বাক্যের মাধ্যমে মনে ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু বাক্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের পদ। যেমন— বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদি। কীভাবে পদগুলি সাজালে বাক্যটি অর্থবোধক হবে, কীভাবেই বা তা সহজ সরলভাবে শ্রোতার কাছে ধরা পড়বে এর নিয়মনীতি বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে (পদবিন্যাস) কিছু সূত্রের অবতারণা করেছেন। যা বাংলা বাক্যে 'পদক্রম রীতি' নামে পরিচিত। পদবিন্যাসকে যথাযথভাবে না মেনে কথা বললে তার অর্থ বোঝা যায় না। বাক্যতত্ত্বে সাধারণত উদ্দেশ্য-বিধেয়, বিষয়, উক্তিভেদ, পদক্রম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যতত্ত্বের তিনটি ধারা। প্রথাগত, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক।

ক. প্রথাগত : এই ধরনের ব্যাকরণে গতানুগতিক ধারা আলোচিত হয়।

খ. গঠনমূলক : এই পর্বে রূপিমের পারস্পরিক সন্নিবেশজনিত গঠনগত বাক্যের স্বরূপ আলোচনা করা হয়।

গ. রূপান্তরমূলক : এই পর্বে গণিত, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্যগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়। চমস্কিই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাক্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

৩.২.৬.১.৪ : শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়, তার প্রতিক্রিয়াকে বলে শব্দার্থতত্ত্ব। এর আলোচনার পিছনে আছে কোনও শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস। শব্দের অর্থ কেন কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এর দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম, কোন কোন ধারায় শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে এই পর্বে সেইসব আলোচনা করা হয়। দার্শনিকরা মনে করেন অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে শব্দার্থের রহস্য। শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মের মতোই নির্গুণ। শব্দমাত্রই অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি। অভিধার মাধ্যমে কোনও শব্দের মুখ্য অর্থ এবং লক্ষণার মাধ্যমে কোনও শব্দের গৌণ অর্থ ধরা পড়ে। এই দুটি শক্তি ছাড়াও আছে ব্যঞ্জনা। এর মাধ্যমেই শব্দার্থের চির নতুন অর্থ পাঠকের কাছে ধরা পড়ে।

প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। পঞ্চমুখী ধারার সাহায্যে সেইসব শব্দের অর্থ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা চলে। সেগুলি— অর্থের উৎকর্ষ, অর্থের অপকর্ষ, অর্থ সংকোচ, অর্থপ্রসার ও অর্থ সংশ্লেষ। শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের আত্মিক দিক বিশ্লেষিত হয়। দেখা গেছে একই শব্দ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করছে। যেমন—মাটি, হাত, পাকা ইত্যাদি শব্দ আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করলেও এটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থতত্ত্বে এইসবও আলোচনা করা যায়।

ক. শব্দার্থ পরিবর্তন : এই পর্বে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই তিন শক্তিকে সামনে রেখে শব্দার্থ পরিবর্তনের দিক চিহ্নিত করা হয়।

খ. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ : বিভিন্ন কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিবেশগত, মনস্তাত্ত্বিক, আরামপ্রিয়তা ও শৈথিল্য, আলঙ্কারিক। এই পর্বে সেগুলি বিশ্লেষণ করা হয়।

গ. শব্দার্থ পরিবর্তের ধারা: মূলত পাঁচটি ধারায় শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন — অর্থের উৎকর্ষ, অর্থের অপকর্ষ, অর্থের সংকোচন, অর্থের প্রসারণ ও অর্থের সংশ্লেষ। এই পর্বে এইসব আলোচনা করা হয়।

৩.২.৬.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? ভাষা বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, ও শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৭
ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৭.১	:	ভূমিকা
৩.২.৭.২	:	বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৩	:	ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৪	:	তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৫	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.২.৭.৬	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৭.১ : ভূমিকা

ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে মুখ্যত দুরকমভাবে হতে পারে। (১) এককালিক বা বর্ণনামূলক (Synchronic/Descriptive) (২) কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক (Diachronic/Historical) (৩) তুলনামূলক (Comparative)

৩.২.৭.২ : বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও একটি ভাষার অর্থ, রূপ, গঠন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকেই বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। এইপ্রকার ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণত ভাষার একটি কালের রূপ ধরে আলোচনা করা হয়। তাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আর এক নাম এককালিক 'ভাষাবিজ্ঞান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Synchronic Linguistics. Syn মানে 'সঙ্গে', Chronic মানে 'কাল'। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে কোনও একটি ভাষার যে রূপ, গঠন, অর্থ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা হয় তা মূলত ভাষার ব্যবহারিক রীতির দিক থেকে। কোনও একটি কালে ভাষার ব্যবহারিক গঠনরীতি অনুযায়ীই এই ভাষার বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন— বলিতে, চলিতে— এই শব্দ দুটিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— বলি + তে = বলিতে, চলি + তে = চলিতে, রূপ অনুযায়ী এটি ক্রিয়ার রূপ। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দুটি ভাগ (১) রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও এককালিক ভাষাবিজ্ঞান একই বিষয় হলেও চার্লস এফ, হকেট-এর মতো ভাষাবিজ্ঞানী এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখানোরও চেষ্টা করেছেন।

ভাষার রূপ, গঠন, অর্থ ইত্যাদির মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সীমায়িত বলে পরবর্তীকালে এই ধারা গঠনসর্বস্বতা বা অবয়ববাদী মতবাদ গড়ে ওঠে। এই অবয়ববাদ বা Structuralism -এর মূল বক্তব্য হল ভাষা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একসঙ্গে কাজ করে, একে অন্যকে প্রভাবিত করে (ভাষায় তেমনি বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)। সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure) -ই প্রথম এই মতবাদ দেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতি দান করেন ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি (Abraham Noam Chomsky) তাঁর রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণে (Transformation Generative Grammar)।

৩.২.৭.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান

সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিকাশ আলোচনা বা পর্যালোচনা করা হয় তাকে বলে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা Historical Linguistics. ভাষার উৎস — ইতিহাস জানতে গেলে যেহেতু কাল ধরে আলোচনা করতে হয়— তাই এর আর এক নাম কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান বা Diachronic Linguistics. কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের আবার দুটি ধারা— (ক) ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব বা ব্যক্তিগত ভাষার বিবর্তনতত্ত্ব (Linguistics Ontogeny) এবং (খ) জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব বা সামগ্রিক ভাষার বিবর্তন তত্ত্ব (Linguistics Phylogency)।

একজন মানুষের জন্মের পর অর্থাৎ শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাষাবোধ ও ব্যবহার পালটে পালটে যায়। এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয় ভাষাবিজ্ঞানের ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান অংশে। অপরপক্ষে জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয় ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা গঠিত একটি ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাবোধ ও ব্যবহারের ক্রম পরিবর্তন প্রয়োজনের তাগিদেই। কোনও জনগোষ্ঠী যাযাবর জীবনে যে ভাষাবোধের পরিচয় দিয়েছিল, আধুনিক জীবনে পদার্পণ করে সেই ভাষাবোধ ও ভাষাসামর্থ্যের অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোনও ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাবোধ ও ভাষা সামর্থ্যের কালক্রমিক ইতিহাসের দুটি পর্ব—

(১) ঐতিহাসিক পর্ব। যেখানে কোনও ভাষার উৎস, জন্ম-ইতিহাসের আলোচনা করা হয় লিখিত পুস্তক বা পুঁথি অথবা কোনও পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

(২) প্রাগৈতিহাসিক পর্ব। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ না পেলেও কল্পনার সাহায্যে অনেক সময় ঐতিহাসিক যুগেরও আগেকার মানব ভাষার বিবর্তনজনিত আলোচনা করা হয় কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাগৈতিহাসিক পর্বে।

৩.২.৭.৪ : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

ইংরেজিতে 'Comparative Linguistics' এর বাংলা পরিভাষা 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের আলোচনায় একাধিক ভাষার প্রয়োজন হয়। কারণ তুলনা কখনও একটি ভাষা দিয়ে সম্ভব হয় না। শুধু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেই নয়, সাহিত্য চর্চার দিক থেকেও তুলনামূলক ভাবনার গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা যায়— "ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তার উৎস, অতীত রূপ, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কন করা যায়, তাকে 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান' বা Comparative Linguistics' বলে।

আগে অবশ্য তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করা হত। এখন প্রাচীন ভাষার আলোচনাতে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ নেই। একাধিক আধুনিক ভাষার মধ্যে তুলনা করেও তাঁর অতীত রূপ, ইতিহাস, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা নির্ণয় করা হয়। আগে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে বলা হত 'Philology' বা 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব'। কারণ এর দ্বারা কোনও ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করা হত। তার সঙ্গে থাকত প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার থেকে ব্যাখ্যা সবই। অর্থাৎ প্রাচীন ভাষার সাংস্কৃতিক দিক উদ্ধার করা 'Philology'-এর একটা বড় কাজ ছিল। যে ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই সেই ভাষা এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তীকালে Philology শব্দটি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজি 'Comparative' শব্দটি। ফলে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনার অবকাশ চলে আলে। নাম হয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা 'Comparative Philology' -অবশ্য বর্তমান কালে তা রূপ পেয়েছে 'Comparative Linguistics'-এ।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভালো, Philology- এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষা, সাহিত্যিক ঐতিহ্য, উপাদান ইত্যাদি।

৩.২.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৮
বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৮.১ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব

৩.২.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৮.১ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব :

একথা ঠিক আর্যরা আসার আগে অনার্যরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে। এই সমস্ত এলাকার নামগুলি বিশ্লেষণ করলেই ওখানকার মানুষের ভাষা, উচ্চারণরীতি, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদিতে অনার্যের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাবকে মূলত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. অস্ট্রিক প্রভাব

খ. দ্রাবিড় প্রভাব

গ. ভোট চিনীয় প্রভাব

অস্ট্রিক প্রভাব : অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে অনেক উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদির ব্যবহারিক পরিভাষা, শব্দ, ব্যাকরণের নিয়ম বাংলা ভাষায় এসেছে। সেগুলি নিম্নরূপ—

১. এক সময় গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের মধ্যে কোনও কিছু গোনার ক্ষেত্রে কুড়ি বা গণ্ডা দ্বারা বোঝানো হত। এটিও অস্ট্রিক প্রভাবের ফলে হয়েছে। যেমন—

এক গণ্ডা পান।

এক কুড়ি বয়স।

২. আধুনিক কালে বাংলায় স্বরসঙ্গতির ব্যাপারটা অস্ট্রিক ভাষাতে লক্ষণীয়। যেমন—

তুলা > তুলো

মূলা > মুলো,

সুতা > সুতো ইত্যাদি।

৩. বাংলা ক্রিয়াপদে লিঙ্গহীনতার ব্যাপারটা অস্ট্রিক প্রভাবজাত। যেমন— সন্তান, ছেলেবেলা ইত্যাদি।

৪. বাংলা ভাষায় কিছু শব্দকে তৎসম বলা হয়, সেগুলির অনেক শব্দই আবার অস্ট্রিক থেকে সংস্কৃতে এসেছে। যেমন— 'তাম্বুল' শব্দটি আর্য ভাষার কোনও শাখাতেই নেই। এই রকম— মরিচ, বাণ, কম্বল ইত্যাদি শব্দও অস্ট্রিক থেকে সংস্কৃত হয়ে বাংলায় এসেছে।

৫. বাংলায় ধ্বনাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দটির মূলে রয়েছেন অনার্যপ্রভাব। যেমন— শনশন, বনবন, পতপত, টনটন, টাপুর-টুপুর ইত্যাদি। উল্লেখ্য 'বঙ্গ' শব্দটাও অস্ট্রিক প্রভাবজাত বলে অনেকে মনে করেন।

দ্রাবিড় প্রভাব : বাংলায় অনেক স্থান নাম, উচ্চারণ রীতি, ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি দ্রাবিড় থেকে এসেছে। যেমন—

১. অনেক ধ্বনাত্মক শব্দ দ্রাবিড় থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন— ধবধবে, ঝমঝম ইত্যাদি।

২. শব্দের আদিতে বাংলা ভাষায় যে শ্বাসাঘাত পড়ে, সেটিও দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যেমন—

আখ > আক

দুধ > দুদ্।

মাছ > মাচ্ ইত্যাদি

উল্লেখ্য এর ফলে পরবর্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হওয়ার রীতি এখনও বাংলা ভাষায় স্পষ্ট।

৩. বাংলা ভাষার উপভাষা বঙ্গালীতে যে 'হ' কারলোপের প্রবণতা দেখা যায়, তা দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যেমন—

ভাই > বাই

ধান > দান প্রভৃতি।

৪. বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রভাব দ্রাবিড়জাত। যেমন— স্নান করা, শয়ন করা, গমন করা প্রভৃতি।

৫. আদিতে 'চ' বর্গের উচ্চারণ ছিল পৃষ্ঠ কিন্তু দ্রাবিড় প্রভাবে প্রাকৃত পর্ব থেকেই তা ঘৃষ্ট হয়ে যায়। বাংলা ভাষায়ও সেই রীতি বর্তমান।

৬. শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতীয় বর্ণমালার মূর্ধন্য ধ্বনি দ্রাবিড় প্রভাবেই এসেছে। উল্লেখ্য সুইডিস ভাষা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও ভাষাতেই মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার নেই।

ভোট চিনীয় প্রভাব : এই ভাষা বংশের প্রভাবগুলি নিম্নরূপ—

১. এই ভাষা বংশ থেকে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন — লুঙ্গি, ফুঙ্গি, চা, লিচু, চিনি প্রভৃতি।

২. বাংলা ভাষার বঙ্গালী উপভাষায় 'অ্যা' ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। এটিও ভোট-চিনীয় প্রভাবজাত। যেমন—

বেশ > ব্যাশ

দেশ > দ্যাশ

তেল > ত্যাল ইত্যাদি।

৩. শিষ ধ্বনিগুলির মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্যহীনতা ভোট-চিনী প্রভাবজাত। যেমন—

আশ > আস

মাষ্টার > মাস্টার

ষ্টেশন > স্টেশন প্রভতি।

৪. উত্তর বা পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা বংশের প্রভাব কম। বেশি ভোট-চিনী ভাষা বংশের প্রভাব। যেমন—

(ক) ভ, ধ, ঘ, ড় প্রভৃতি বর্ণ ব, দ, গ, র, রূপে উচ্চারিত।

(খ) চ বর্গের সমস্ত বর্ণ দন্ত্য তালব্য ঘৃষ্ট রূপে উচ্চারিত।

(গ) এইসব অঞ্চলের কিছু প্রাদেশিক শব্দ 'গম', 'বেরয়া',

'তাম্বু' ইত্যাদি শব্দ গৃহীত। আদর্শ বাংলায় এইসব শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'ভাল', 'মন্দ', 'সূর্য' ইত্যাদি।

৩.২.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৯
বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৯.১	:	বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব
৩.২.৯.২	:	পর্তুগীজ প্রভাব
৩.২.৯.৩	:	ওলন্দাজ প্রভাব
৩.২.৯.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.২.৯.৫	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৯.১ : বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি প্রভাবে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রভাবটা ছিল মূলত উচ্চারণগত, ব্যাকরণগত ও শব্দগ্রহণগত।

ফরাসি প্রভাব : বাংলা ভাষায় ফরাসি প্রভাব বেশ অনেকটাই। মুসলমানদের দীর্ঘকালীন রাজত্বের ফলে বহু ফরাসি শব্দ বা ফরাসিপ্রভাব জাত তুর্কি বা আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় থেকেই যায়। ফরাসি শব্দ আইন-আদালত সংক্রান্ত, রাজস্ব সংক্রান্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইসলামধর্ম সংক্রান্ত, শিখা-সাহিত্য সংক্রান্ত বা সাধারাণ দ্রব্য সংক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে বাংলা ভাষায় এখনও বিরাজ করছে। যেমন—

প্রশাসন সংক্রান্ত শব্দ : আইন, আদালত, আসামি, খাজনা, হাকিম, উকিল, মোকদ্দমা, মহকুমা, দপ্তর, সালিস, জরিমানা, কয়েদ, জবানবন্দী, গোমস্তা, খারিজ, তামিল, দলিল, মুনসেফ ইত্যাদি।

রাজদরবার বা যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্দ : মালিক, আমির, তপ, দরবার, সেপাই, সওয়ার, হুজুর, তাঁবু, ওমরাহ, উজির প্রভৃতি।

শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত শব্দ : আদম, কাগজ, কেতাব, খাতা, নকল, তরজমা, কলম, সেতার, শাগরেদ, হরফ, মাদ্রাসা, কেচ্ছা, মুনশি, বয়েৎ, গজল ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ : আল্লা, ঈদ, কাফের, কাবা, খোদা, গাজি, জবাই, দরগা, দোয়া, নামাজ, ফেরেস্তা, মুরিদ, মসজিদ, মহারম, মোল্লা, হালাল, শরিদ, শিয়া, ফকির, হজ, দীন, দরবেশ, কোরবানি প্রভৃতি।

জাতিবাচক বা ব্যবসাবাচক শব্দ : হিন্দু, ফিরিঙ্গি, দোকানদার, কসাই, চাকর, যাদুকর, কারিগর, বাজিকর ইত্যাদি।

শুধু শব্দভাণ্ডারের দিক থেকেই নয়, বাংলা ব্যাকরণেও ফরাসি প্রভাব বিদ্যমান। যেমন—

১. বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্দেশ ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

মর্দ্দাকুকুর > মাদীকুকুর

গাওনর (ষাঁড়) > গাওমাদা (গাভী) ইত্যাদি।

২. বহুবচন প্রত্যয় হিসেবে 'ত' এর ব্যবহার ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

দলিলাত, কাগজাত প্রভৃতি।

৩. ফারসি শব্দের সংস্কৃতায়ন করা হয়েছে এবং যেগুলি পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় এসেছে।

যেমন — baqi > বক্রি ইত্যাদি।

আরবি প্রভাব : বাংলা শব্দে ফারসির মতোই আরবি শব্দের বিরাট প্রভাব আছে। বহু আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত। শুধু তাই নয়, বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও আরবি প্রভাব বিদ্যমান। যেমন —

প্রশাসনসংক্রান্ত শব্দ : আমিন, উকিল, এজলাস, ওকালতি, কৈফিয়ৎ, জালিয়াতি, তলব, তারিখ, নায়েব, মাতব্বর, সাকেব, হাজির, হুকুম, হেফাজত, মালিক ইত্যাদি।

নিত্য ব্যবহার্য ও নানাবিধ শব্দ : আজব, আক্কেল, ইজ্জত, ইমান, ইমারত, আতর, আফিম, আসবাব, খেলাপ, কায়দা, ইস্তফা, ওজন, এলেম, জিনিস, খাতির, মশলা, বদল, হালুয়া, সরবতি, সাহেব, তামাশা, তবলা, দোয়াত, কায়দা, কাগজ, জিম্মা, খারাপ, মালুম, মিছিল, ইশারা প্রভৃতি।

বাংলা ব্যাকরণের অনেক পরিবর্তন আরবি প্রভাব জাত। যেমন—

১. ফারসির মতো 'বে' উপসর্গের ব্যবহার আরবি প্রভাবের ফলে এসেছে।

উদাহরণ — বে-আক্কেল, বেইমান, বেইজ্জত, বেকায়দা ইত্যাদি।

২. বাংলা ব্যাকরণে সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'ও' এর ব্যবহার আরবি প্রভাবজাত। যেমন—

আদিত্যবাবু ও প্রবীরবাবু একসঙ্গে ডিপার্টমেন্ট গেলেন।

আরবি-ফারসি মিশ্রণজাত শব্দ : বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি মিশ্রণজাত শব্দের ব্যবহার প্রচুর। উন্মেষ পর্বের গদ্যে আরবি— ফারসি মিশ্রণজাত বহুল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষায় এমন শব্দের ব্যবহার খুবই বেশি। যেমন— আদমশুমার, কোহিনূর ইত্যাদি আরবি-ফারসি। মিশ্রণজাত শব্দ মূলত বাংলা ব্যাকরণের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। যেমন —

১. বহুবচনের 'হা' 'ন' ও 'ত' ইত্যাদির ব্যবহার আরবি-ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

দলিল > দলিলাত

গ্রাম > গ্রামহা

জমিন > জমিনহা

মহাজন > মহাজননা প্রভৃতি।

২. বাংলা ব্যাকরণে গিরি, দার, দারি ইত্যাদি প্রত্যয় আরবি-ফারসি প্রভাবেই এসেছে। উদাহরণ—

মোক্তার > মোক্তার + গিরি = মোক্তারগিরি

খাতির > খাতির + দারি = খাতিরদারি

৩. বাংলা ব্যাকরণে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাবহার আরবি-ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

তলপ করিয়া

খালাস করিয়া ইত্যাদি।

তুর্কিপ্রভাব : আরবি ফারসির মতো তুর্কি শব্দও বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন— বিবি, বেগম, দারগা, কুলি, চাকু, গালিচা, আলখাল্লা, চকমকি ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৩.২.৯.২ : পর্তুগিজ প্রভাব

ভারতবর্ষে এসে পর্তুগিজ নাবিকরা পশ্চিম উপকূলে বসবাস করতে থাকে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে আসেন। ইনিই প্রথম পর্তুগিজ নাবিক। এরপর একে একে পর্তুগিজ শাসনকর্তারা ভারতবর্ষের অনেক অংশ শাসন করতে থাকে। এদের প্রভাব বাংলায় এত বেশি পড়েছিল যে ইংরেজরা এদেশে আসার আগে অনেকেই পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলতে থাকে। ফলে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত অনেক পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় মিশেছে। যেমন— সাবান, তামাক, আলমারি, ইস্পাত, আলকাতরা, কামরা, কপি, কেদারা, গুদাম, মিস্ত্রি, পিস্তল, পেরেক, ফিতা, বালতি, বেহালা, নিলাম, জালা, বোমা ইত্যাদি শব্দ।

৩.২.৯.৩ : ওলন্দাজ প্রভাব

পর্তুগিজের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ বণিকরাও ভারতবর্ষে এসেছিল। এদের প্রভাবেও বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ এসেছে। বিশেষত তাস খেলার অনেক শব্দ ওলন্দাজ ভাষা থেকে আগত। যেমন— হরতন, রুইতন, তুরুপ, ইস্কাবন, কর্ক, পিমপাস প্রভৃতি।

ইংরেজি প্রভাব : বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন— টেবিল, চেয়ার, পিয়ন, টেলিফোন, পুলিশ, বাস, লরি, বোনাস, ট্রেন, ট্যাক্সি, টিকিট, স্কুল, কলেজ, স্টেশন, ব্যাগ, পেনসিল, পেন, মাস্টার, মাইল, ম্যানেজার, পেনশন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাব শুধু বাংলা শব্দভাণ্ডারে নয়, বাংলা ব্যাকরণেও নানাবিধ পরিবর্তন এনেছে। যেমন—

১. বাংলা ব্যাকরণে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে কর্মকারক বসানোর রীতিটি মূলত পর্তুগিজ ও ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবজাত। উদাহরণ — এখন আমাদের খেতে দাও ভাত।

২. প্রথমে প্রধান বাক্য তার পরে আশ্রিত বাক্যের প্রয়োগটি ও পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাব জাত। যেমন—

'অনেক কাল আগে এই বনের মধ্যে রাজারা বাস করতো,
তাই সেখান থেকে কৃষ্ণদয়ালের মোহর পাওয়া হল।'

৩. বাংলা ব্যাকরণে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিধেয় প্রয়োগ ও ব্যাকরণের নিয়ম-রীতির নির্দিষ্ট প্রয়োগও পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাবজাত।

৪. ইংরেজির মতো বাংলা বিশেষ্যের আগে বিশেষণ বসে। যেমন— ভালো ছেলে (Good boy), সুন্দর ফুল (Beautiful flower) ইত্যাদি।

৫. বাংলা কবিতায় প্রতিনিয়ত যে নিত্য নতুন গদ্য ছন্দ ব্যবহার হচ্ছে তাও ইংরেজি প্রভাবজাত। এইসব বিদেশি প্রভাব ছাড়াও বাংলা ভাষায় ফরাসি, স্প্যানিস, পর্তুগাল, ইতালীয়, চিনা, জাপানি, ব্রহ্মদেশীয়, মালয়দেশীয় ও তিব্বতীয় ভাষার প্রভাবও বিদ্যমান। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ইতালি, স্পেন বা পর্তুগালের বাণিজ্যিক যোগ ছিল। জাপান, চিন বা ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। সেই হিসাবে বিদেশি এই ভাষাগুলির নানা শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে, বাংলা ভাষা হিসেবে আমাদের মুখে মুখে আজও চলে আসছে। যেমন—

ইতালিয় প্রভাব : কোম্পানি, ম্যালেরিয়া, ফ্রেস্কো, পার্ক ইত্যাদি।

স্প্যানিশ প্রভাব : গেরিলা, নিগ্রো, কর্ক প্রভৃতি।

মালয়দেশীয় প্রভাব : সাগু, গুদাম ইত্যাদি।

ব্রহ্মদেশীয় প্রভাব : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, প্যাগোডা প্রভৃতি।

জাপানি প্রভাব : রিক্সা, হাসুনহানা ইত্যাদি।

চিনা প্রভাব : লিচু, চা প্রভৃতি।

তিব্বতী প্রভাব : লামাই ইত্যাদি।

দক্ষিণী প্রভাব : জেব্রা প্রভৃতি।

৩.২.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

বাংলা রূপতত্ত্ব (বিশেষ্য, অব্যয়, প্রত্যয়, অনুসর্গ, বিভক্তি)

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১০.১ : বিশেষ্য

৩.৩.১০.২ : অব্যয়

৩.৩.১০.৩ : প্রত্যয়

৩.৩.১০.৪ : অনুসর্গ

৩.৩.১০.৫ : বিভক্তি

৩.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৩.১০.৭ : আদর্শ প্রশ্নমালা

৩.৩.১০.১ : বিশেষ্য

বিশেষ্য পদটি ইংরেজিতে 'Noun' আরবি-ফারসিতে 'ইসম'। অর্থাৎ 'ইসম' শব্দটির অর্থ নাম। বিশেষ্যকে অনেকে বলেছেন নামশব্দ বা নামপদ। যাই হোক, 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সুনীতিকুমার বিশেষ্য পদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"যে শব্দ, দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট, চক্ষু-কর্ণ-মন আদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অনুভূতিসাপেক্ষ কোনও পদার্থর নাম, এবং যাহাকে বাক্য মধ্যে অবস্থিত অথবা উহ্য বা ধর্মবাচক অন্য কোনও শব্দ বা শব্দাবলী দ্বারা জাতি বা শ্রেণী হইতে পৃথক বা বিশিষ্ট করা যায়, সেই রূপ শব্দকে নাম বা সংজ্ঞা অথবা বিশেষ্য বলে।"

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্যর এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ হয় না। বাংলায় বিশেষ্যকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু সুনীতিকুমার বলেছেন সাতটির কথা। যাইহোক এবারে বিশেষ্যর শ্রেণীবিভাগ করা হল।

১. সংজ্ঞাবাচক (Proper) বিশেষ্য।

২. জাতিবাচক (Common) বিশেষ্য।

৩. বস্তুবাচক (Material) বিশেষ্য।

৪. সমষ্টিবাচক (Collective) বিশেষ্য।

৫. সংখ্যাবাচক (Cardinals) বিশেষ্য।

৬. গুণবাচক (Abstract) বিশেষ্য।

৭. অবস্থাবাচক (Abstract-Concrete) বিশেষ্য।

৮. ভাববাচক (Abstract) বিশেষ্য।

৯. ক্রিয়াবাচক (Verbal) বিশেষ্য।

এরই মধ্যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গুণবাচক, অবস্থাবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্যকে একত্রে ভাব/গুণবাচক বলেছেন। কিন্তু দেখা গেছে গুণ, অবস্থা ও ভাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন—মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি এগুলি মানুষের এক-একটি গুণ। আবার কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এগুলি মানুষের জীবনের এক-একটি ভাব। অনেকে আবার ক্রিয়াবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য রেখা টানেন নি কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে এগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যে মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না ইত্যাদি। আবার আহার-নিদ্রা, বাঁচন-মরণের মধ্যে মূলত ক্রিয়াই প্রধান। যাই হোক, এবারে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু, দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির নাম বোঝানো হয় তাকে বলে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. **স্বামী বিবেকানন্দ** ভারতের দার্শনিক।

খ. **হিমালয়** ভারতের উত্তরে অবস্থিত।

গ. আমাদের দেশের নাম **ভারতবর্ষ**।

ঘ. **দামোদর** নদী সাঁতরে **বিদ্যাসাগর** মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যের দ্বারা কোনও জাতি বা একই ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণিকে বোঝানো হয়ে থাকে তাকে বলে জাতিবাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. **গোরু** মাঠে চরে।

খ. **পাখিরা** গান গায়।

গ. **মানুষ** মরণশীল প্রাণী।

ঘ. **পশুরা** বনে থাকে।

বস্তুবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও বস্তু বা জিনিসের নাম বোঝায়। যেমন—

ক. **দুধের** কোনও বিকল্প নেই।

খ. **সন্দেশ** খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

গ. **আকাশে** চাঁদ উঠেছে।

ঘ. **সোনার** দাম দিনদিন বাড়ছে।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে জাতিবাচক বিশেষ্যের সমষ্টি বোঝা যায়।

ক. **ভীড়** বাসে চলাফেরা খুব কষ্টকর।

খ. **সমিতির** নির্বাচনে অপূর্ব এবারে দাঁড়াবে।

গ. আকাশে এক **ঝাঁক** পায়রা উড়ছে।

ঘ. বিকালে সুনীলবাবুর স্মরণ **সভা** বসবে।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য : কখনও গাণিতিক সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে সংখ্যাবাচক বিশেষ্য হয়ে থাকে। যেমন—

ক. **দশে** মিলি করি কাজ।

খ. আমি তোমার **সাতে** নেই **পাঁচে** নেই।

গ. **উনিশ-বিশে** কোনও তফাৎ নেই।

ঘ. **শতশত** মানুষ সেখানে গিয়েছিল।

গুণবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণি বা বস্তুর দোষগুণ ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন—

ক. **প্রতিভা** থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায়।

খ. মানুষের পতনের মূলে রয়েছে **অহংকার**।

গ. অপরাধীকে **ক্ষমা** করো।

ঘ. **সাহসী** মানুষ অনেক দেখেছি।

অবস্থাবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণি বা বস্তুর অবস্থা অনুধাবন করা হয়। যেমন—

ক. **যৌবনে** সকলের মনেই উন্মাদনা আসে।

খ. **দারিদ্র্য** মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে।

গ. **জন্মালে** মৃত্যু হবেই।

ঘ. **শৈশবে** খেলা করো।

ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণির মনের ভাব প্রকাশিত হয় তাকে বলে ভাববাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. মধুরিমা বিয়ের **আনন্দে** আত্মহারা হয়েছে।

খ. **হিংসা** নিজেরই ক্ষতি করে।

গ. **সুখ-দুখ** দুই ভাই, সবার জীবন ঘিরে রয়।

ঘ. পিকনিকে গিয়ে ছেলেরা **উল্লাস** করছে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও কাজের নাম বোঝা যায়। যেমন—

ক. রাতে সকলেরই **ঘুমানো** উচিত।

খ. বাঁচতে হলে পুষ্টিকর খাবার **খেতে** হবে।

গ. আমি তো **লিখেই** চলেছি, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না।

ঘ. গরিবের **কান্নার** কোনও দাম নেই।

এতো গেল সাধারণ ভাবে বিশেষ্যর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা। এবার এই ন' প্রকার বিশেষ্যকে রূপের দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা হল। যেমন—

রূপাত্মক (Concrete) : এই ধরনের বিশেষ্য পদরূপ গ্রাহ্য। অর্থাৎ চোখে দেখে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সাধারণত সংজ্ঞাবাচক, জাতিবাচক, বস্তুবাচক, সমষ্টিবাচক—এই চার ধরনের বিশেষ্য হইল রূপাত্মক বিশেষ্য।

অরূপাত্মক (Abstract) : এই শ্রেণীর বিশেষ্য পদকে চোখে দেখা যায় না। সাধারণত গুণবাচক, ভাববাচক, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অর্ধরূপাত্মক (Abstract Concrete) : এই ধরনের বিশেষ্য পদকে চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু এদের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মূলত অবস্থাবাচক ও সংখ্যাবাচক বিশেষ্য এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অনেক সময় আবার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যও যেমন—শিশু-কিশোর, দিন-রাত, জন্ম-মৃত্যু, সাত-পাঁচ, হাসি-কান্না ইত্যাদি।

৩.৩.১০.২ অব্যয়

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

'বাক্য-গত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রকার বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে অব্যয় বলে।"

অব্যয়কে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি এইরকম—

১. পদান্বয়ী অব্যয়

২. সমুচ্চয়ী অব্যয়

৩. অনন্বয়ী অব্যয়

৪. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

পদান্বয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ে বাক্য মধ্যে একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সম্বন্ধ বা যোগ সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের অব্যয়ের পূর্ব পদে বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োগ থাকে। প্রয়োগের দিক থেকে এই ধরনের অব্যয় পাঁচভাগে পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে। যেমন—

অবস্থানবাচক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়গুলি হল সঙ্গে, সহিত, পিছনে, ভিতরে, পাশে, নীচে, উপরে ইত্যাদি।

উপমাবাচক অব্যয় : মতো, ন্যায়, সব, তুল্য, যেন, প্রায় এইসব অব্যয় এই পর্বের উদাহরণ।

সীমাবাচক অব্যয় : এই পর্বে থেকে, পেরিয়ে, পর্যন্ত, অবধি ইত্যাদি শব্দের উদাহরণ পাওয়া যায়।

ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় : ব্যতীত, বিনা, ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতিরেকে ইত্যাদি অব্যয় এই পর্বের উদাহরণ।

অনুসর্গাত্মক অব্যয় : এই পর্বে প্রতি, উদ্দেশ্য, বোধ, নিমিত্ত, দরুন ইত্যাদি অব্যয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়।

সমুচ্চয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে কখনও সংযোগ, কখনও বা বিয়োগ সাধন করে। অর্থাৎ যোগ বিয়োগের মধ্যেই সমুচ্চয়ী অব্যয়ের সার্থকতা। এই ধরনের অব্যয়ের আটটি শ্রেণী আছে।

সংযোজক : এই ধরনের অব্যয়ে দুই বা তার বেশি বাক্য বা পদকে যুক্ত করে। যেমন—রাম **ও** শ্যাম, তিনি বাড়িতে গেলেন **এবং** খেতে বসলেন।

বিয়োজক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় দুই বা তার বেশি বাক্য বা পদকে আলাদা কর। যেমন—তুমি নিজে যাও, না হয় ভাইকে পাঠাও। আবার বলা যায়—

অমল **বা** কমলকে ডেকে আনো।

ব্যতিরেকাত্মক : এই শ্রেণীর অব্যয়ে অভাব বা ভেদ অর্থের প্রকাশ ঘটায়। যেমন—সত্যি কথা বল **নয়তো** তোমার নির্বাসন অনিবার্য। আবার বলা যায়—

মন দিয়ে পড়াশোনা কর **নচেৎ** ফেল করবে।

সঙ্কোচক : এই ধরনের অব্যয় স্বাভাবিক ফল না বুঝিয়ে বিপরীত ফলটা বুঝিয়ে থাকে। যেমন—আমাকে জেলে দিন **তবুও** স্বদেশী গান গাইবই। আবার বলা যায়—

জীবনে দুঃখ পাব **তবুও** অসৎ হব না।

হেতুবাচক : এই ধরনের অব্যয় হেতুকে সামনে রেখে দুটি বাক্যকে যোগ করে। যেমন—তার ছেলে অসুস্থ **বলে** তিনি অফিসে এলেন না। আবার বলা যায়—

আমি আজ কলেজে যাইব **কেননা** আজ আমার পরীক্ষা।

সিদ্ধান্তবাচক : মীমাংসার জন্যে সিদ্ধান্ত করে দুটো বাক্যকে যুক্ত করে এই ধরনের অব্যয়। যেমন—

এটা আমার গুরুর আদেশ, **কাজেই** আমাকে যেতে হইবে। আবার বলা যায়—সকলেই ভাত খেলেন **সুতরাং** আমাকেও খেতে হল।

সংশয়সূচক : এই ধরনের অব্যয় বাক্যের মধ্যে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করে। যেমন—

ছেলেটা **বুঝি** পাগল। আবার বলা যায়—পড়া শেষ না করলে **যদি** তিনি রেগে যান।

নিত্যসম্বন্ধী : নিত্য সম্বন্ধযুক্ত দুটি অব্যয় এখানে দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। যেমন—

তিনি অশিক্ষিত **বটে, কিন্তু** অসভ্য নন। আবার বলা যায়—**হয়** পড়াশোনা কর, **নতুবা** হস্টেল ছাড়ো।

অনন্বয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ের সঙ্গে বাক্যের অন্য কোনও পদের ব্যাকরণগত কোনও সম্বন্ধ বা যোগ থাকে না। এই ধরনের অব্যয়ের চারটি শ্রেণী। যেমন—

ভাবপ্রকাশক : এই ধরনের অব্যয় দ্বারা মনের বিবিধ ভাব যেমন—আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করা সম্ভব। এই ধরনের অব্যয়ের আবার ছটি শ্রেণী আছে। যেমন—

ক. অনুমোদন-প্রশংসা-হর্ষজ্ঞাপন : মরি মরি!, বেশ!, শাবাশ শাবাশ ইত্যাদি।

খ. বিস্ময়ব্যঞ্জক : বটে!, ওবাবা!, ওমা! প্রভৃতি।

গ. ভয়-দুঃখ-যন্ত্রণাজ্ঞাপক : ওরে বাবা!, হায় হায়!, মাগো! ইত্যাদি।

ঘ. ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক : দূর দূর!, আমলো!, কি বিপদ! প্রভৃতি।

ঙ. শোকসূচক : আহা!, মরি মরি! ওই যা! ইত্যাদি।

চ. সম্মতি বা অসম্মতিজ্ঞাপক : আচ্ছা!, উঁহু! প্রভৃতি।

সম্বোধনসূচক : এই ধরনের অব্যয়ের মাধ্যমে কাউকে সম্বোধন করা হয়। সম্বোধনেই এই অব্যয়ের সার্থকতা। যেমন—**ওগো** তোমরা সবাই এখানে এসো। আবার বলা যায়—**হে** বন্ধু, আজ বিদায় নিচ্ছি।

প্রশ্নবোধক : এই শ্রেণীর অব্যয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—তোরা **কি** আজই চলে যাচ্ছিস? আবার বলা যায়—কেমন, ভালো **তো**?

বাক্যালঙ্কার : সাধারণত এই ধরনের অব্যয় যেকোন বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য এই সব অব্যয়ের নিজস্ব কোনও অর্থ প্রকাশ পায় না ঠিকই কিন্তু বাক্যটির অর্থে একটা বৈচিত্র্য আসে। যেমন—বোঝাবার ত্রুটি তো করিনি, কিন্তু বোঝে না **যে**। আবার বলা যায়—আপনি যে কাল **বড়ো** এলেন না।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ের আর একটি নাম অনুকার অব্যয়। এই অব্যয়ের সংজ্ঞায় বলা যায়, এইসব অব্যয় বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জন দিয়ে এক অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম ভাবের দ্যোতনা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ছলছল, টনটন, কনকন, সনসন, ঝনঝন ইত্যাদি। এই ধরনের দুটি শ্রেণী যেমন—অনুকার ধ্বন্যাত্মক ও ভাবপ্রকাশ ধ্বন্যাত্মক।

অনুকার ধ্বন্যাত্মক : এই ধরনের অব্যয় কখনও এককে বসে কখনও বা দ্বিত্বে প্রয়োগ হয়। যেমন—হিহি, ধেইধেই, খকখক, ঝমঝম, ঢকঢক, দরদর, টুংটাং ইত্যাদি। ভাষার ধ্বন্যাত্মক অব্যয়গুলির নাম বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ হয়।

ভাবপ্রকাশ ধ্বন্যাত্মক : এই ধরনের অব্যয় বাস্তব ধ্বনির প্রকাশ না করে ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। যেমন—

ক. শূন্যতা বা পূর্ণতা জ্ঞাপক : থইথই, খাঁখাঁ, ধুধু ইত্যাদি।

খ. নাম বিশ্লেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ রূপে—গনগনে, টিমটিমে, লিকলিকে, দগদগে, ঘুটঘুটে প্রভৃতি।

গ. অনুভূতি প্রকাশক : ছমছম, দুরুদুরু, ঝিমঝিম, ছলছল ইত্যাদি।

ঘ. বর্ণবৈচিত্রজ্ঞাপক : কুচকুচে, ধবধবে, টুকটুকে প্রভৃতি।

৩.৩.১০.৩ প্রত্যয়

প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয় যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে প্রত্যয়। এক বর্ণের প্রত্যয়গুলি হল—অ, আ, ই, ঈ, উ ইত্যাদি। আর একাধিক বর্ণের প্রত্যয়গুলি হল—ক্তি, ঘঞ, আন্ত, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা ভাষায় নিজস্ব প্রত্যয় তো আছেই। তা ছাড়াও আছে সংস্কৃত প্রত্যয় ও বিদেশি প্রত্যয়। আমরা এখানে বাংলা প্রত্যয় নিয়েই আলোচনা করব। যাই হোক প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. কৃৎ প্রত্যয় (Primary Affixex)

২. তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Affixes)

কৃৎ প্রত্যয় :

ধাতু প্রকৃতি বা ধাতুর সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন—

√চল + অন্ত (প্রত্যয়) = চলন্ত

√গম + অন (প্রত্যয়) = গমন

এখানে√

চল ও √ গম ধাতু। আর অন্ত হল প্রত্যয়। নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে চলন্ত ও গমন। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিই হইল কৃদন্ত শব্দ। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হলে তাকে বলা হয় কৃদন্ত বিশেষণ। দেখ গেছে সংস্কৃত ভাষার কৃৎ প্রত্যয়গুলি সংক্ষিপ্ত, কখনও পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত প্রত্যয় হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। তবে ব্যবহারগত দিক থেকে বাংলায় কৃৎ প্রত্যয়ের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের সংখ্যা ২৩। এবার সেগুলি আলোচনা করা হল—

১. অ—(উচ্চারণের অলোপ পায় এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়।)

√ ঝুল্ + অ = ঝুল

√ ঘির্ + অ = ঘের ইত্যাদি।

২. আ—(বিশেষ্য, বিশেষণ দু'ধরনের শব্দই গঠন করে।)

√ চল্ + আ = চলা

√ খাঁ + আ = খাওয়া প্রভৃতি।

৩. আই—(বিশেষ্য পদে এই প্রত্যয় থাকে।)

√ বাঁধ্ + আই = বাঁধাই

√ খা + আ = খাওয়া প্রভৃতি।

৪. আও—(বিশেষ্য পদে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।)

√ ফল্ + আও = ফলাও

√ ঘির্ + আও = ঘেরাও প্রভৃতি।

৫. ই—(প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।)

√ হাঁচ্ + ই = হাঁচি

√ ফির্ + ই = ফিরি প্রভৃতি।

৬. ইয়ে—(দক্ষ অর্থে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়।)

√ নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে

√ বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে প্রভৃতি।

৭. আরী—(দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ ডুব্ + আরী = ডুবারী (ডুবুরি)

√ পূজা + আরী = পূজারী ইত্যাদি।

৮. ইয়া—(ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ খেল্ + ইয়া = খেলিয়া

√ দেখ্ + ইয়া = দেখিয়া প্রভৃতি।

৯. এন—(দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ গান্ + এন = গায়েন

√ বায়্ + এন = বায়েই ইত্যাদি।

১০. অন—(ভাব ও করণবাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ কাঁদ্ + অন = কাঁদন

√ বাঁচ্ + অন = বাঁচন প্রভৃতি।

১১. অনা—('অ' লোপ পেয়ে 'না' থাকে)

√ রাধ্ + অনা = রাঁধন

√ ঝর্ + অনা = ঝরনা ইত্যাদি।

১২. আনি—(সব বাচ্যেই এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।)

√ ঝাঁক্ + আনি = ঝাঁকানি

√ পার্ + আনি = পারানি প্রভৃতি।

১৩. আন (আনো)—(বিভিন্ন বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ জানা + আন = জাজান (জানানো)

√ হাতা + আন = হাতান (হাতানো) ইত্যাদি।

১৪. অন্ত—(ঘটমান বর্তমান কালে ব্যবহৃত হয়।)

√ জীব্ + অন্ত = জীবন্ত

√ পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত প্রভৃতি।

১৫. অনি (উনি)—(ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

√ গাঁথ্ + উনি = গাঁথুনি

√ কাঁদ্ + উনি = কাঁদুনি ইত্যাদি।

১৬. অত—(ঘটমান অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ ফির্ + অতি = ফিরতি

√ জান্ + অতি = জানতি প্রভৃতি।

১৭. উক—(কর্তৃ বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ বুঝ্ + উক = বুঝুক

√ দেখ্ + উক = দেখুক ইত্যাদি।

১৮. ইব—(ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ দেখ্ + ইব = দেখিব

√ চল্ + ইব = চলিব প্রভৃতি।

১৯. উয়া—(অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।)

√ পড়্ + উয়া = পড়ুয়া

√ উড়্ + উয়া = উড়ুয়া (উড়ো) ইত্যাদি।

২০. তি—(এই প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।)

√ চল্ + তি = চলতি

√ ঘাট্ + তি = ঘাটতি প্রভৃতি।

২১. তা—(বিভিন্ন বাচ্যে এই প্রত্যয় হয়।)

√ ধর্ + তা = ধরতা

√ পড়্ + তা = পড়তা ইত্যাদি।

২২. ইবা—(ক্রিয়া বা ভাববাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ পর্ + ইবা = পরবা

√ ধর্ + ইবা = ধরবা প্রভৃতি।

২৩. ই—(ভাব বাচ্যে প্রয়োগ করা হয়।)

√ দেখ্ + ই = দেখি

√ চল্ + ই = চলি ইত্যাদি।

২৪. উ—(বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ হাঁট্ + উ = হাঁটু

√ ঘেট্ + উ = ঘেটু ইত্যাদি।

২৫. অক—('ক' থাকে 'অ' লোপ পায়।)

√ চড়্ + অক = চড়ক

√ চট্ + অক = চটক ইত্যাদি।

২৬. ইয়ে—(কর্তৃ বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ কর্ + ইয়ে = করিয়ে

√ খেল্ + ইয়ে = খেলিয়ে ইত্যাদি।

২৭. ইলে—(বিশিষ্টার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়।)

√ নাচ্ + ইলে = নাচলে

√ কর্ + ইলে = করিলে ইত্যাদি।

২৮. ইতে—(অভিপ্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ চল্ + ইতে = চলিতে

√ বল্ + ইতে = বলিতে প্রভৃতি।

তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দ প্রকৃতি বা শব্দের সঙ্গে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন—

মোগল্ + আই = মোগলাই

বসন্ত্ + ঈ = বাসন্তী

এখানে মোগল আর বসন্ত হল দুটি শব্দ। এর সঙ্গে 'আই' এবং 'ঈ' প্রত্যয় দুটি যুক্ত হয়ে হয়েছে মোগলাই বা বাসন্তী। এবারে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে শব্দগুলি লেখা হল।

১. আ—(অস্তিত্ব, জাত, স্বভাব, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে গৃহীত।)

চাল্ + আ = চালা

হাত্ + তা = হাতা ইত্যাদি।

২. আই—(ভাবার্থে, আদরে ব্যবহৃত হয়।)

চিকন্ + আই = চিকনাই

কান্ + আই = কানাই প্রভৃতি।

৩. আরী আর—(বৃত্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

ভিখ্ + আরী = ভিখারী

কর্ম্ + আর = কামার ইত্যাদি।

৪. ই—(বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।)

ঢাক্ + ই = ঢাকাই

শয়তান্ + ই = শয়তান প্রভৃতি।

৫. ঈ—(বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

ঢাক্ + ঈ = ঢাকী

ধ্রুপদ + ঈ = ধ্রুপদী প্রভৃতি।

৬. ইয়া—(বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

পাথর্ + ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে

আদর্ + ইয়া = আদরিয়া > আদুরে ইত্যাদি।

৭. উয়া—(বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

মাছ্ + উয়া = মাছুয়া > মেছে

ভাত্ + উয়া = ভাতুয়া > ভেতে প্রভৃতি।

৮. আমি, আম—(ভাব, অনুকরণ অর্থে)

বোকা + আমি = বোকামি

পাগল্ + আম (আমো) = পাগলামো ইত্যাদি।

৯. আল, আলো, আলি—(বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

দাঁত্ + আল = দাঁতাল

শাঁস্ + আলো = শাঁসালো প্রভৃতি।

১০. উক—(স্বভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

নিন্দা + উক = নিন্দুক

লাজ্ + উক = লাজুক ইত্যাদি।

১১. উ—(আদরে, স্বার্থে ব্যবহৃত।)

খুক + উ = খুকি

ভীত্ + উ = ভীতু প্রভৃতি।

১২. ওয়ালা—(বৃত্তি বা ব্যবসা অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

রিকশা + ওয়ালা = রিকশাওয়ালা

কাবুল + ওয়ালা = কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি।

১৩. ওয়ান—(বৃত্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়।)

গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান

দার্ + ওয়ান = দারোয়ান প্রভৃতি।

১৪. লা, লি, ল—(আছে বা সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

আধ্ + লা = আধলা

হাঁস + লি = হাঁসলি (হাঁসুলি) ইত্যাদি।

১৫. ড়া, ড়ি, ড়ে—(স্বার্থ বা সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

গাছ্ + ড়া = গাছড়া

আঁক + ড়ি = আঁকাড়ি প্রভৃতি।

১৬. সা—(সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

ঝাপ্ + সা = ঝাপসা

ভাপ্ + সা = ভাপসা ইত্যাদি।

১৭. আরু—(সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহার হয়।)

বোমা + আরু = বোমারু

দিশ্ + আরু = দিশারু প্রভৃতি।

১৮. টিয়া (টে)—(স্বভাব বা আছে অর্থে ব্যবহার হয়।)

তামা + টিয়া = তামাটিয়া > তামাটে

ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে ইত্যাদি।

১৯. মন্ত, বন্ত—(আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

পয়্ + মন্ত = পয়মন্ত

শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত প্রভৃতি।

২০. পনা—(আচরণ বা ভাব বোঝাতে ব্যবহার হয়।)

গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা

দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা ইত্যাদি।

২১. ট—(স্বার্থ বা স্বভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

জমা + ট = জমাট

ভরা + ট = ভরাট প্রভৃতি।

২২. উড়িয়া (উড়ে)—(স্বভাব, সম্বন্ধ, ব্যবসা অর্থে ব্যবহার হয়।)

সাপ্ + উড়িয়া = সাপড়িয়া > সাপুড়ে

ভুত্ + উড়িয়া = ভূতুরিয়া > ভূতুড়ে ইত্যাদি

২৩. চী—(ধরে যে অর্থে ব্যবহার হয়।)

তবল্ + চী = তবলচী

কমল্ + চী = কমলচী প্রভৃতি।

২৪. ত, তি—(পাত্র জাতীয় বস্তু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

বাল্ + তি = বালতি

চাক্ + তি = চাকতি ইত্যাদি।

২৫. পানা, পারা—(সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহার হয়।)

পাগল্ + পারা = পাগলপারা

রোগা + পানা = রোগাপানা ইত্যাদি।

৩.৩.১০.৪ অনুসর্গ

ভাব প্রকাশের বিকল্প হিসেবে অনুসর্গ ব্যবহৃত হতে থাকে। এক সময় শুধু নামবাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হত, এখন নামবাচক অনুসর্গের পাশাপাশি ভাববাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনুসর্গকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

নামবাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ বিবর্তিত হয়ে প্রত্যয় অনুসর্গের রূপ পেয়েছে। বৈদিক স্তরে এই ধরনের অনুসর্গ ব্যাপক ভাবে প্রচার পেয়েছিল এবং ভাষায়ও খুবই ব্যবহৃত হত। এখনও অবশ্য নাম অনুসর্গের ব্যাপক ব্যবহার আছে। যেমন—নিমিত্ত, তরে, মিনা, প্রতি, সহিত, বদলে। বরাবর ইত্যাদি এই অনুসর্গের উদাহরণ। নাম অনুসর্গকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—তৎসম অনুসর্গ, তদ্ভব অনুসর্গ, অর্ধ-তৎসম অনুসর্গ ও বিদেশি অনুসর্গ। এবারে এই অনুসর্গগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

তৎসম অনুসর্গ : সংস্কৃত থেকে অনেক অনুসর্গ বাংলা ভাষায় এসে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—অন্তরে, উপর, দিশে, সহিত, প্রতি ইত্যাদি।

ক. তার **প্রতি** আমার কোনও রাগ নেই।

খ. রাস্তার **উপর** দাঁড়িয়ে থেকো না।

গ. সে কোন **দিশে** যে গেল তা আমার জানা নেই।

তদ্ভব অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ সংস্কৃত থেকে এসে বাংলায় নিজ স্বরূপ নিয়েছে। সাধারণত পানে (ভিতর), অভিমুখ (কাছে বা সম্মুখে), ব্যতীত (বই), অগ্র (আগ) ইত্যাদি এখানে ব্যবহৃত হয়।

ক. এই অবস্থার পরে তার পানে আর চাইতে পারলুম না।

খ. পঙ্কজের অভিমুখ কী জানা আছে?

গ. সে ব্যতীত আমার কোনও মূল্যই নেই।

অর্ধ-তৎসম অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গে কিছুটা দেশি প্রভাব আছে, কিছুটা সংস্কৃত প্রভাব আছে। যেমন—আন্তর (জন্য), পর (উপর), বিনা (সমীপে) ইত্যাদি বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

ক. তুমি **বিনা** আমি মূল্যহীন।

খ. ভগবানের **পর** আস্থা হারানো পাপ।

গ. তোমার **আন্তর** লাগি আমার হৃদয় কাঁদছে।

বিদেশি অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে অনেক শব্দ এসেছে। তার মধ্যে কিছু অনুসর্গও আছে। মূলত আরবি, ফারসি থেকেই এইসব অনুসর্গ বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন—বাধ, বরাবর, হুজুর, তরে, বাবদ, বদল ইত্যাদি অনুসর্গ।

ক. কিসের **তরে** এই ক্রন্দন জানতে পারি কি?

খ. বাড়ি কেনা **বাবদ** অমলবাবুর এগরো লক্ষ খরচ হল।

গ. এই রাস্তা ধরে **বরাবর** এগিয়ে যাও।

ভাববাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গে সাধারণত ব্যবহৃত হয়—থাক, ধর, বল, ভর, হতে লহ, লাগ ইত্যাদি শব্দ।

ক. তুমি **থাক** এখানে, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

খ. আজি **থেকে** আমি হলাম তোর সাথী।

গ. আমি আর তুমি এক হলাম **বলেই** তো ঝগড়া মিটল।

আশ্রিত অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ অনুসর্গ সুলভ প্রত্যয়। নাম শব্দের রূপ, গুণ, প্রকৃতি ও তাদের অর্থ বুঝিয়ে দেয়। অনেকে এই ধরনের অনুসর্গকে নির্দেশক অনুসর্গ বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। টি, টা, খানা, খানি, টুকু, গাছি ইত্যাদি হল এই ধরনের অনুসর্গের উদাহরণ। এই ধরনের অনুসর্গ শব্দের আশ্রিত থাকে বলে একে আশ্রিত অনুসর্গ বলা হয়।

ক. এই **গাছটা** থেকে ফলগুলো পাড়।

খ. **সরবতটুকু** খেয়ে নাও সোনা।

গ. **একগাছি** চুড়ি পরিয়ে দিলাম বন্ধুকে।

কারকবাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ সাধারণত বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হয়। যেমন—অপাদানে হইতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি। নিমিত্ততে অন্তরে, জন্যে, লাগিয়া ইত্যাদি, আবার কারণে দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার বাংলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এইসব অনুসর্গ কারকের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই এগুলিকে বলা হয় কারকবাচক অনুসর্গ।

ক. আমার **দ্বারা** এ কাজ হবে না।

খ. তোমার **জন্য** আমি চাকরিও ছাড়তে পারি।

গ. আজ **থেকে** আবার নতুন করে কাজ শুরু করব।

সংখ্যাবাচক অনুসর্গ : অনেকে এই ধরনের অনুসর্গকে নামবাচক অনুসর্গ রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন এটি প্রত্যয় অনুসর্গ। যাই হোক, এই ধরনের অনুসর্গের সঙ্গে সংখ্যা শব্দের একটি যোগ আছে তাই একে বলা হয় সংখ্যাবাচক অনুসর্গ। যেমন—সুধীজন, পাঁচজনে, এক সঙ্গে ইত্যাদি।

ক. উত্তরপাড়ার উন্নতিতে সুধীজনের একটা ভূমিকা আছে।

খ. পাঁচজনে ধরে নিয়ে গেল চোরটাকে।

গ. সবাই একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই ঠিক।

৩.৩.১০.৫ বিভক্তি

বিভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—বাক্যস্থিত বিশেষ্যের বিশেষ বিশেষ কারক নির্দিষ্ট যে পদাংশ বা পদযোগ তাকেই বলে বিভক্তি। সাধারণ ভাবে বিভক্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। তাহল—

১. শব্দ বিভক্তি (Declension Inflexions) :

২. ক্রিয়া-বিভক্তি (Verbal Inflexions) :

দেখা গেছে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারকের রূপ প্রকাশিত হয় শব্দ বিভক্তি যোগে। অর্থাৎ এই বিভক্তি বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে এই বিভক্তি বাংলায় এসেছে। এই বিভক্তির একটি নাম হল সুপ। তাই এই বিভক্তি দ্বারা গঠিত সর্বনাম বা বিশেষ্য পদকে বলা হয় সুবন্ত (সুপ + অন্ত) পদ। যেমন—সূর্যের, ঘরে, মামারা ইত্যাদি। এইসব বিশেষ্য বা সর্বনামে এর, রা, এ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

ক্রিয়াপদের রূপ প্রকাশিত হয় ক্রিয়া বিভক্তি যোগে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয় যে বিভক্তি তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে এই বিভক্তির একটি নাম ছিল তিঙ্। এই বিভক্তি দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদকে বলা হয় তিঙন্ত (তিন + অন্ত) পদ। যেমন—বলে, করিয়া, করেই ইত্যাদি।

উৎসগত দিক থেকে বাংলা ভাষার বিভক্তিকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—'ক', 'ত', 'র'। এছাড়াও বাংলা ভাষায় আর একটি বিভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাকে বলে 'শূন্য' বিভক্তি। সুতরাং বাংলা ভাষায় মোট বিভক্তির সংখ্যা পাঁচটি। যেমন—এ, ক, ত, র, শূন্য। সম্বন্ধ পদসহ বাংলা কারকে এই পাঁচটি বিভক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এবারে এই পাঁচটি বিভক্তি আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হল—

শূন্য বিভক্তি বিশেষ্যে বিভক্তি না থাকলে তাকে বলে শূন্য বিভক্তি। এক কথায় বিভক্তি না থাকলে তাকে বলা হয় শূন্য বিভক্তি। শুধু কর্তৃকারকেই নয়, সব কারকেই শূন্য বিভক্তি হয়। কর্ম, করণ, অধিকরণ, অপাদান, সম্প্রদান যে কারকই হোক না কেন, শূন্য বিভক্তি যে কোনও কারকেই হতে পারে। বাংলা ভাষায় সব স্তরেই শূন্য বিভক্তির পরিচয় আছে। যেমন—

ক. **বংশীবাবু** বাঁশি বাজায়।

খ. **মৌমিতা** কল্যাণীতে পিএইচ.ডি করছে।

এখানে 'বংশীবাবু', 'মৌমিতা' এই দুটি বিশেষ্য পদে কোনও পদাণু বা বিভক্তি যুক্ত হয়নি। সাধারণত এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক বোঝাতে কোনও পদাণুর দরকার পড়েনি। তাই এখানে শূন্য বিভক্তি হয়েছে। কর্তৃকারক ছাড়াও কর্মকারক, অধিকরণকারকে শূন্য বিভক্তি হয়। এছাড়া করণকারক, অপাদানকারকেও বিভক্তিহীন দেখা যায়।

'র' বিভক্তি : এই বিভক্তি অনুসর্গ থেকে জাত। উল্লেখ্য 'ক', 'ত' বিভক্তি ও অনুসর্গ জাত বিভক্তি। অনেকে বলেছেন 'ক' থেকে 'র' বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে, রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ—

কার্য > কাইরকের > এর > র

বাংলা ভাষার ক্রম বিবর্তনে অর্থাৎ প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, বাংলাতে 'র' বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে চলেছে। যেমন আধুনিক বাংলায়—

ক. **প্রসূনের** বাড়ি আজ যাব না।

খ. **বাঘের** কামড়ে দিলু বাবু মারা গেছেন।

এখানে 'প্রসূনের', 'বাঘের' এই দুটি পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত রয়েছে। এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক গড়ের 'র' বা 'এর' বিভক্তি। সম্বন্ধ পদে সাধারণত এই বিভক্তি যুক্ত হয়।

'ত' বিভক্তি : এই বিভক্তিটিও অনুসর্গ থেকে জাত। এই বিভক্তির উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন—

অন্তঃ > তঁ > ত

আবার সুকুমার সেন এর উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

ত্র > ত্ত > ত অর্থাৎ 'ত্র' থেকেই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে 'ত' বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে 'ত' বিভক্তির বৈচিত্র হয়েছে 'তে' 'এতে'। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—

ক. সুলেখা অর্থনীতিতে ফেল করেছে।

খ. আমরা ভারতে বসবাস করি।

এখানে 'অর্থনীতিতে' ও 'ভারতে' পদে 'ত' (তে) বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এই বিভক্তি মূলত অধিকরণ কারকের। তা ছাড়াও কর্তৃকারক, করণকারক ইত্যাদিতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

'ক' বিভক্তি : 'র' বা 'ত' বিভক্তির মতো 'ক' বিভক্তিও অনুসর্গজাত। এই বিভক্তির উৎস সম্পর্কে বলা যায়—

কৃতঃ > কএ > এই > কি > ক

আবার সুকুমার সেন এর উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

আদি প্রাকৃত ক্য > ক্ক > নব্যভারতীয়তে 'ক'

যাই হোক এই বিভক্তি সম্প্রসারিত রূপ 'কার', 'কের' ইত্যাদি। এর উদাহরণ—

ক. **তোমাকে** এখনই বাড়ি যেতে হবে।

খ. **আমাকে** বলতে দাও এসব কথা।

উপরের বাক্যে 'তোমাকে' ও 'আমাকে' পদে ক (ক) বিভক্তি যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই বিভক্তি সাধারণ কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকে হয়ে থাকে।

'এ' বিভক্তি : 'এ' বিভক্তিকে বলা হয় বিভক্তিজাত বিভক্তি। 'এ' বিভক্তি দ্বারা সাধারণত ক্রিয়াপদের রূপ প্রকাশিত হয়। অনেকে আবার এই বিভক্তিকে বলেছেন তির্যক বিভক্তি। এই বিভক্তিই অন্যান্য বিভক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ সব কারকেই এই বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। শুধু আধুনিক বাংলা নয়, প্রাচীন বা মধ্য বাংলাতে 'এ' বিভক্তির জয়জয়কার ছিল। যেমন—

ক. **ছাগলে** ঘাস খায়।

খ. **লোকমুখে** আমি এইসব শুনেছি।

এখানে 'ছাগলে' ও 'লোকমুখে' পদে 'এ' বিভক্তি যুক্ত রয়েছে। কর্তৃকারক, কর্মকারক এই রকম সব কারকেই 'এ' বিভক্তির জয়জয়কার।

৩.৩.১০.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.৩.১০.৭ আদর্শ প্রশ্নমালা

বিশেষ্য বলকে কী বোঝ? শ্রেণীবিভাগ করে বিশেষ্যের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক -১১
চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১১.১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)

৩.৩.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১১.১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা) :

ভাষা বিজ্ঞান চর্চার সবচেয়ে আধুনিকতম ধারা। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীজুড়ে গঠন বাদী ব্যাকরণের ধারা চলছিল। এইমতের বিরোধিতা করেছিলেন স্যার আব্রাহামন নোর্যাম চমস্কি। এই হিসেবে তার 'Syntactic Structures' (1957) গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বলেছেন ভাষার সৃজনী ক্ষমতার কথা। সাংগঠনিক ব্যাকরণের যান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা করে ভাষার সৃজনীদিক নিয়ে আলোচনা তাঁর বইয়েই প্রথম দেখা গেল। আগে অবশ্য হুমবোল্ট বলেছিলেন যে, ভাষা নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদানের মাধ্যমে অজস্র বাক্যগঠন করতে পারে। অর্থাৎ তিনিও ভাষার সৃজনীদিকের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু চমস্কি এই তত্ত্বটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে চমস্কি আবিষ্কৃত ভাষার সৃজনী দিক নিয়েই আলোচনা চলছে।

এই ধরনের ব্যাকরণে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষার সক্রিয়তা। ফলে এই ব্যাকরণে অনেকটা নক্সার মতো অনুক্রম তৈরি করে। সেটা অবশ্যই বিশুদ্ধ, বাস্তব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ব্যাকরণ কোনও বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আরোহী প্রথার সাহায্যে। ভাষার সংজ্ঞায় চমস্কি বলেছেন—

> "A language to be a set (Finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements."

চমস্কির এই সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও দর্শন,

পরিসংখ্যান ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর ব্যাকরণ বলতে বুঝিয়েছেন—

> "It must generate (i,e specify how to form, interprete and pronounce) all and only well fromed sentences of longuage."

চমস্কির ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি নিভাষার ব্যাকরণ গত কাঠামো ও সেই ভাষার উপাদান নির্মিতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যাবলী :

১. এই ব্যাকরণে সৃষ্ট বাক্য, শুদ্ধ বাক্যরূপে পরিচিত। কারণ ভাষার সমস্ত নিয়ম আবিষ্কারের দিকেই এই ব্যাকরণের গতিশীলতা। চার্লস এফ.হকেট এই ব্যাকরণকে বলেছেন "Items and Process Grammar" 'A Grammar of Rules'।

২. চমস্কির এই ব্যাকরণে 'Generative' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি ব্যাবহার করেছেন 'Trans formational' শব্দটিও। যার অর্থ রূপান্তরমূলক এবং প্রথমটির অর্থ সৃজনমূলক। অর্থাৎ তিনি যেমন ভাষার রূপান্তরে বিশ্বাসী তেমনি সৃজনশীলতায়ও। এর মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ব্যাকরণের ভবিষ্যদ্বাণীর সক্ষমতা। এবং তার সঙ্গে থাকবে ব্যাকরণের সুস্পষ্টতা।

৩. এই ব্যাকরণের সূত্রাবলী নির্ভুল বাক্য গঠন করতে সাহায্য করে, তবে উৎপাদন (Produce) নয়। অর্থাৎ বাক্য সৃজনকে তিনি Creativity -এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৪. রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের আগে সাংগঠনিক ব্যাকরণের ধারাটা ভীষণ ভাবে প্রাচলিত ছিল মার্কিনদেশে। চমস্কির ব্যাকরণ বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনাদিতেও সক্ষম।

৫. এই ধরনের ব্যাকরণ অল্প সূত্রের মাধ্যমে অসংখ্য বাক্যসৃষ্টি করতে সক্ষম। এখানে জেনেরা খাভালো যদি ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা অসংখ্য হত তাহলে অজস্র বাক্য তৈরি করা যেত না।

৬. এটি পৃথিবীর সকল শ্রেণির মানুষের বা ভাষার ব্যাকরণ। বক্তা শ্রোতা উভয়ই এই ব্যাকরণের সূত্র প্রয়োগ করে পরস্পরের কথা বুঝতে পারে। যান্ত্রিকতাকে কে এই ব্যাকরণ মুক্ত বলেই এটি মানুষের বোধির উপর নির্ভর শীল।

সঞ্জননীতত্ত্বের মূলকথা সৃজনে। বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বলা যায় নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করা। মানুষ প্রতিনিয়তই ভাষা শিখছে, তা ব্যবহারও করছে। কখনওই কিন্তু একই বাক্য আমরা বার বার বলি না। প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন বাক্য বলি বা লিখে থাকি। চমস্কির ভাষায় এটি বাক্যসঞ্জনন (Sentences Generation)। চমস্কির মতে সৃষ্ট বাক্যের গঠনগত শ্রেণি দুই রকমের, তা আদর্শ গঠন ও প্রকৃত গঠন। ভাষার আন্বয়িক কাঠামো ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের কাঠামোর উপর নির্মিত, একথা তিনি বলেছেন। অন্তর্নিহিত কাঠামো তাঁর মতে অধোগঠন আর উচ্চারিত বাক্যগুলি অধিগঠন। অর্থাৎ অধোগঠন থেকে অধিগঠনের যাওয়ার সময় যে সবপরিবর্তন ঘটে তাকেই-বলেছেন সংবর্তন বা রূপান্তর (Transformational) ।বাক্য বা ভাষার এই রূপান্তর ও সৃজন মিলেই তার ব্যাকরণ রূপান্তর ও সৃজনমূলক ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar) ।

এই ব্যাকরণে চমস্কি বলেছেন ভাষা কোনও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি সৃজন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রথমেই তিনি সাংগঠনিক ব্যাকরণের বিরোধিতা করেছেন। 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> 'One of the qualities that all languages have in common is their creative aspest. The grammar of a particular language, then is to be supplements by a universal grmmar that accommodates the creative aspect of language use."

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার 'কথোপকথন' গ্রন্থে শব্দের সঙ্গে প্রকাশিত ভাব বা অর্থের সম্পর্কে স্বীকার করেছিলেন। চমস্কিও Creativity ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষার সঙ্গে মনের অবধারিত সম্পর্কেও গুরুত্ব দিলেন। তাই চমস্কি তত্ত্বকে অনেকেই বলে থাকেন মনস্তত্ত্ব প্রধানতত্ত্ব (Mentalist Theory)।

আমার জানি মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। বেঁচে থাকা ও পথ চলার তাগিদে মানুষকে নিত্য নতুন বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। সব বাক্যই কিন্তু তার মা, বাবা বা প্রতিবেশীর কাছে শেখা নয়। তা ছাড়া ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি জেনেও কখনও আগাম বাক্য প্রস্তুত করে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের মনও টেপরেকর্ডারের মতো নয়, যা রেকর্ড করা থাকবে বা তাকেই বলতে হবে। অন্য দিক থেকে বলা যায় মানুষের মনটাও কম্পিউটার নয় যে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কম্পিউটার থেকে ফলাফল বেরিয়ে আসবে। মানুষ প্রথমে ভাষার মূল নীতি নিজের বোধ বা জ্ঞানের সাহায্যে আয়ত্ত করে, তার পরে ভাষা ক্ষমতা দিয়ে নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করে। ভাষা সৃষ্টি কাজটি হল হয় সূত্রের মাধ্যমে বা রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। চমস্কি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব বই লিখেছেন, তাঁর কয়েকটি হল—

১. Syntactic Structures (1957)

২. Current issues in Linguistics Theory (1964)

৩. Aspects of the Theory of Syntax (1965)

৪. Topic in the Theory of Generative Grammar (1966)

৫. Language and Mind (1976)

৬. Reflection on Language (1976)

সব বইতে তিনি রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষা নয়, পৃথিবীর সব ভাষার বিশ্লেষণ চমস্কির রচিত ব্যাকরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

৩.৩.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. স্যার আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির রূপান্তরমূকল সৃজনমূলক ব্যাকরণ বলতেকী বোঝ? এই ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক -১২

বেতার-টিভি, সংবাদপত্রের ও বাংলা বিজ্ঞাপনেব ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১২.১	:	বেতারের ভাষা
৩.৩.১২.২	:	টিভির ভাষা
৩.৩.১২.৩	:	সংবাদপত্রের ভাষা
৩.৩.১২.৪	:	বাংল বিজ্ঞাপনের ভাষা
৩.৩.১২.৫	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.৩.১২.৬	:	আদর্শ প্রশ্নবলী

৩.৩.১২.১ : বেতারের ভাষা :

এই ভাষা শুধু মাত্রশ্রুতি গ্রাহ্য। এই ভাষা পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপনী ভাষার মতো হয়েও অনেকটাই আলাদা। কারণ বিষয়টাকে শ্রুতিমধুর না করলে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হবে না। তাই শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আরও সাবলীল ও বোধগম্য করা হয়। পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন পাঠক একাধিক বার অনেক সময় ধরে দেখে এবং বুঝতে পারে কিন্তু বেতারে তার অবকাশ একদমই নেই। তাই অল্প সময়ে ছন্দের দোলায় ভাষাকে শ্রুতিমধুর করা হয়।

৩.৩.১২.২ : টিভির ভাষা :

সংবাদপত্র বা বেতার থেকে ও এই গণমাধ্যমটির আবেদন বেশি। কারণ একই সঙ্গে এটি শ্রুতিগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য। এর ভাষা কোলাজধর্মী। দর্শক, শ্রোতা একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিষয় শোনে, দেখে। তাই 'সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট'—এ এই ভাষাকে নাটকীয় করা হয়। কখনও সুর, কখনও কাব্যিকতা এই ভাষায় শোভা পায়। তাই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দূরদর্শনের পর্দায় আকর্ষীণয়।

৩.৩.১২.৩ : সংবাদপত্রের ভাষা :

সংবাদপত্রেও শিল্পসৃজন হয়। কারণ ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি এখানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গল্প বা উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন সংবাদপত্রের ভাষা অনেকটাই আলাদা। বিখ্যাত বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সংবাদ উপস্থাপন আলাদা হলেও সব সংবাদপত্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভাষা আছে। সেটার সঙ্গে কথ্য বা মৌখিক ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রের ভাষাকে সাধারণত ফিচারধর্মী ভাষাও বলা হয়।

সংবাদপত্রের ভাষা আসলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর, জ্ঞানী-মূর্খ সকলের উপযোগী ভাষা। এখানে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কথোপকথনের মৌখিক রূপই তুলে ধরা হয়।

সংবাদপত্রের সাংবাদিক বা লেখকেরা সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সংবাদ বা বিষয়কে উপস্থাপন করেন। এখানে শব্দ ব্যবহারের একটা সুচিন্তিত নির্দেশ আছে। জটিল বা কঠিন শব্দ এখানে একদম ব্যবহার করা হয় না। সমাসবদ্ধ পদ বা কঠিন তৎসম শব্দের ব্যবহার একদমই নিষিদ্ধ। পরিবর্তে লৌকিক আটপৌরে শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়।

কাবিকতা বা নাটকীয় ভাষার কোনও স্থান নেই এখানে। একটি শব্দের একটিই অর্থ আছে এইরকম শব্দের ব্যবহারই সংবাদপত্রে বেশি হয়। পাঠকদের কথা ভেবেই সাধারণত সাংবাদিকরা এই বিষয়টি করে থাকেন।

যে ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা হয় সেই ভাষাভাষী মানুষের আবেগ, উদ্দীপনা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি, রীতি নীতি ইত্যাদি স্থান পায়। সাংবাদিক বা লেখকরা এক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার নাড়ির যোগ বুঝে সংবাদ পরিবেশন করেন।

সংবাদপত্রের ভাষা খুবই সপ্রতিভ। এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুবই কম। বিশেষ করে সংবাদের শিরোনামে কোনও ক্রিয়াপদ থাকেই না।

সংবাদপত্রের ভাষায় কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি যতি চিহ্নের ব্যবহার দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের তুলনায় খুবই কম। বাক্যও খুব ছোটছোট। অনেক সময় একটি শব্দ দিয়েই একটি বাক্য তৈরি করা হয়।

এই ভাষায় অনুপ্রাসের ঝনঝনানি, অলঙ্কারের তীব্রতা এক দম নেই। ভাষার শরীর থেকে মেদ ঝরিয়ে এই ভাষাকে করা হয়েছে নির্মেদ, ঝরঝরে। তাই ৭ই পৌষ বা ১৫ জানুয়ারির বদলে লেখা হয় ৭ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি। 'দুর্ঘটনায় ১০ জন মানুষের মৃত্যু' এই বাক্যের বদলে লেখা হয় 'দুর্ঘটনায় মৃত ১০'।

ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের ভাষায় আবেগ উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নেই। যা ঘটছে, ঘটছে বা ঘটতে পারে এমন বিষয়কে সরাসরি উপস্থাপন করার রীতি এখানে লক্ষণীয়।

সংবাদপত্রের ভাষায় গাম্ভীর্যের বদলে ভাবমাধুর্য আছে। বেশরি ভাগ ক্ষেত্রেই হালকা চালে সকলের বোধগম্য করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। তাই লৌকিক শব্দ ছাড়াও বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার এখানে অনেকটাই বেশি। সাহিত্যের ভাষায় ভাবগাম্ভীর্য থাকার ফলে একটি বই পড়তে যতটা সময় বা পরিশ্রম লাগে তার অনেক কম সময়েই এই বইয়ের সম পৃষ্ঠার কোনও ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র শেষ করা যায়।

এর ভাষা মানুষের মুখের ভাষা বলেই অত্যন্ত সাবলীল ও বোধগম্য। লেখক, সাহিত্যিকদের মতো এখানে সাংবাদিকরাও প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন। সেটা অবশ্যই হালকা চালে, তা ছাড়া বড় বা গুণিদের নাম ধরে (যেমন সনিয়া বললেন, রবিশঙ্কর এসছিলেন, ধোনি আপনি ইত্যাদি) ডাকার প্রবণতা দেখা যায়। তা ছাড়া সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই কোনও একটি বিষয়কে নতুন রূপে উপস্থাপন করার বিষয়টি লক্ষণীয়। যেমন—বইসংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই ভাবে হেডলাইন থাকে—'বই-তরণী', 'বই-পার্বণ', 'বইপাড়া' ইত্যাদি।

আধুনিক কালে অবশ্য সংবাদ পত্রের জেলা ভিত্তিক সংস্করণ হওয়ার ফলে জেলার পাতাগুলি আঞ্চলিক হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট সংস্কৃতি অনুযায়ী ভাষা গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও সব জেলার পাতাতেই মানুষের বোধগম্য কথ্যরূপটি স্থান পাচ্ছে।

৩.৩.১২.৪ : বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা

বিজ্ঞাপন বলতে বোঝায় বিশেষভাবে জ্ঞাপন বা জানানো। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার যোগ অঙ্গাঙ্গী। বিজ্ঞাপন আধুনিক যুগেরই একটি বড় মাধ্যম। বিজ্ঞাপন এখন শিল্পের স্তরে উন্নীত। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা গেজেট' (২৫ মার্চ ১৭৮৪) পত্রিকায়।

সেদিন থেকে আজও বিজ্ঞাপন সৃজনের ধারা অব্যাহত। বিজ্ঞাপনের ভাষা সাহিত্য বা সংবাদপত্রের ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। যদিও বিজ্ঞাপন, বই বা সংবাদপত্রের পাতাতেই ছাপানো হয়। বর্তমান কালে অবশ্য পত্র-পত্রিকা ছাড়া বেতার, দূরদর্শনেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষারূপ এই রকম—

বিজ্ঞাপনী ভাষার প্রথম লক্ষ্য পাঠক বা দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করা। এই জন্য চটকদারী বা চমকদারী বা চমক সৃষ্টি কারী শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সেই ভাষায় সাহিত্য গুণ কতটা আছে তা দেখার প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দাতারা মনে করে না। মানুষকে আকর্ষণ করানোর বিষয়টাই এখানে গুরুত্ব পায়।

ক্রিয়াপদহীনতা বিজ্ঞাপনী ভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কারণ ক্রিয়াপদ বাক্যের গতিকে বেশির ভাগ সময় দুর্বল করে দেয়। এইজন্যই ক্রিয়াপদ তুলে দিয়ে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শব্দগুলি পর পর বসানো হয়। তবে সব বিজ্ঞাপনই সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াপদহীনতা ঠিক নয়।

বাংলা বিজ্ঞাপনের শুরুর দিকের ভাষা ছিল বর্ণনামূলক। সংক্ষিপ্ততা ছিল না। শব্দ গঠন, বানান সবই ছিল গতানুগতিক। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞাপনী ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত। এটি এককথায় বাণিজ্যিক ভাষা। তাই এটি ব্যাকরণের নিয়মনীতি মেনে চলে না। দাঁড়ি, কমাহীন ছোট ছোট বাক্যের সাহায্য অনেক অর্থ বুঝিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করাই এই ভাষার লক্ষ্য। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনী ভাষায় অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, যার অর্থ অভিধানে নেই। শব্দের রকমারিতে এই ভাষা সমৃদ্ধ। বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি বা হিন্দি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে চমক সৃষ্টিতে এই ভাষা অদ্বিতীয়। অনেক সময় বড় বড় বাংলা বাক্যের বদলে একটি ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করা যায়।

বিজ্ঞাপনী ভাষায় সাধু, চলিত শব্দ একই সঙ্গে একই বাক্যে ব্যবহার করা হয়। গতানুগতিক সাহিত্য ভাষা থেকে এটি আলাদা।

কিছু বিজ্ঞাপনের ভাষা তথ্য বহুল তার পাশাপাশি বেশ শ্রুতিমধুর। সেগুলি সংবাদ পত্রের পাতা, বেতার বা দূরদর্শনের পর্দাতেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় যেমন—'সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন'বেতার বা দূর দর্শনে এই বাক্যে সুরসংযোজনায় তা হয়েছে নান্দনিক। ভাষায় কারুকার্যে এটি বহুল পরিচিত।

বিজ্ঞাপনী ভাষা মানেই অল্পেতে অন্যকে আকৃষ্ট করানো। যেহেতু বাণিজ্যের সঙ্গে এই ভাষার গভীর যোগ আছে, তাই অর্থ সাশ্রয় করে নিজের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছানো যায়। মোটকথা অল্পকথায় বেশি বলা। ফলে আবেদনটা হয় শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তীক্ষ্ণ, তির্যকভাবে।

এই ভাষা ক্রিয়াহীন, বিরতিহীন, উপমাহীন, অলঙ্কারহীন। এই ভাষায় গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষণ। অর্থাৎ বিশেষ্যের গুণবাচক বিশেষণ তুলে ধরতেই এই ভাষার সার্বিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সেটা বিয়ের বিজ্ঞাপনের কোনও উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

বিজ্ঞাপনের হাত ধরেই বাংলা ভাষার একটি দিক ক্রমশই সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাহিত্য ভাষা সংবাদপত্রের ভাষা বুঝতে ও যেখানে মানুষ হিমসিম খায়, সেখানে অনায়াসেই বিজ্ঞাপনী ভাষাকে তারা আত্মস্থকরতে পারে। তাই বলা যায় সংবাদপত্রের ভাষার থেকেও বিজ্ঞাপনী ভাষা অনেকেটাই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

বিজ্ঞাপনী ভাষার মূল কথা অন্যের মনে কৌতূহল জাগানো। তাই এই ভাষা একদিকে যেমন 'ইনফরমেটিভ'

অন্যদিকে তেমনই 'কমার্শিয়াল'। বাজারি অর্থনীতির সঙ্গে এই ভাষার যোগ লক্ষণীয়। বিশেষ করে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে এই ভাষা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে মানুষের শিক্ষা, রুচি, স্বভাব, আদর্শের কোনও মূল্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অন্যান্য জিনিসের মতো পাত্রপাত্রীরা এই ভাষার রূপ পেয়েছে ভোগ্যপণ্যে। যা বর্তমান সমাজে অস্বস্তিকরও বটে।

বাণিজ্যের পাশাপাশি এই ভাষায় বিজ্ঞাপিত আবেদন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে একে টেলিগ্রাফিক ভাষাও বলা হয়। নতুন শব্দ, নতুন বাক্য, নতুন উপস্থাপন রীতি সবই ভাষার কারুকার্যতায় গড়া যা সাহিত্য সংবাদপত্রের ভাষা থেকে কয়েক যোজন দূরে।

৩.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১২.৬ : আদশ প্রশ্নাবলী

১. গণমাধ্যমের ভাষা বলতে কী বোঝ? সংবাদপত্র, বেতার ও টিভির ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

২. 'বিজ্ঞাপন' বলতে কী বোঝ? বাংলা বিজ্ঞাপনী ভাষার বৈষিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

পর্যার গ্রন্থ — ৩

একক -১৩
বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১৩.১ : বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৩.১৩.২ : বাংলা উচ্চারণ

৩.৩.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৩.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১৩.১ : বাংলা ভাষচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। অনেক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র প্রতিভা কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা বা লেখকসত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা কিন্তু যথার্থ নয়। কারণ তিনি এসবের পাশাপাশি নিরুচ্চার ভঙ্গিতে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিকও চর্চা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ ও রচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ—

১. বাংলা শব্দতত্ত্ব (শেষ সংস্করণ ১৩৯১)

২. শিক্ষা (১৯০৮)

৩. ছন্দ (১৯৩৬)

৪. বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)

উল্লেখ্য 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ দুটি ভাষার বিভিন্ন দিকও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। 'ছন্দ' গ্রন্থটি কাব্য ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে মৌখিক বা কথ্যভাষা আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। আর 'শিক্ষা' গ্রন্থটি মাতৃভাষা ও বিভিন্ন বিদেশি ভাষার আলোচনা বা বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ শেষের গ্রন্থদুটি তে লক্ষণীয় ভাষার সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গের যোগসূত্র। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ছন্দতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব সবদিকই আলোচিত হয়েছে।

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে তিনি উচ্চারণ, বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণের স্বরূপ, রীতি সবই আলোচনা করছেন। বাংলা শব্দতত্ত্বের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন—

'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণঅ', 'বাংলা ভাষার উচ্চারণ' নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন তিনটি স (শ, ষ, স)-এর উচ্চারণ। বাংলায় সব দন্ত 'স' তালব্য 'শ'-এর মতোই উচ্চারিত হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—কষ্ট, ব্যস্ত শব্দ দুটি। এখানে প্রথমটির উচ্চারণ তালব্য 'শ' ও দ্বিতীয়টির দন্তন্য 'স'। আবার 'আসতে

হবে' ও 'আশ্চর্য' শব্দে প্রথমটির উচ্চারণ দন্তন্য 'স' ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ তালব্য 'শ' এর মতো। আধুনিক কালে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী যেমন চমস্কি, হালি প্রমুখ ধ্বনির স্বলক্ষণ সম্পর্কে যে-ধরনের কথা বলেছেন সেগুলি তো একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্যের গাণিতিক রূপ। বাংলা 'শব্দদ্বৈত' 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'ভাষার ইঙ্গিত' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন।

বিষয়টি এবারে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিতত্ত্বের উপরে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি—'বাংলা উচ্চারণ', 'একটি প্রশ্ন', 'স্বরবর্ণ অ, এ', 'টা টো টে', 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ', 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'বাংলা কথ্য ভাষা', 'বাংলা বানান', 'বানানবিধি', ইত্যাদি। এ ছাড়াও 'বাংলা ভাষা পরিচয়'—

এর দুটি পরিচ্ছেদ তো ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। যেমন একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ।

৩.৩.১৩.২ : 'বাংলা উচ্চারণ'

প্রবন্ধে তিনি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করার বিভিন্ন নীতির কথা বলেছেন। উচ্চারণে যে বিশৃঙ্খলা আছে সেটা তিনি খতিয়ে দেখেছেন। এবং কিছু নিয়মাবলীও তিনি লিখেছেন। 'একটি প্রশ্ন' প্রবন্ধটিতে ইংরেজি অক্ষরের বাংলা স্বরান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। 'স্বরবর্ণ অ' এবং 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধদ্বয় যথাক্রমে 'অ' স্বরের বিকৃতিও 'এ' স্বরের উচ্চারণ প্রসঙ্গে আলোচ্য। এখানে 'এ' কে অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারণ করা হয় সে কথাও বলা হয়েছে। 'টা টো টে' প্রবন্ধে সংস্কৃত প্রত্যয়ের তিনটি ভিন্নরূপ বাংলা ভাষায় বহু দিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এই সম্পর্কে তিনি কিছু নিয়ম নীতির সন্ধান করেছেন। এগুলি যে স্বরবিকারের নিয়ম তা তিনি বলেছেন। 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটিতে তিনি অনেক ভুল ধরেছেন। অর্থাৎ বীমস বাংলা ভাষার শব্দাবলীর উচ্চারণ বিধি নিয়ে যেসব কথা বলেছেন সেগুলির কথা তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে তিনি তো ওই সব শব্দের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। 'বাংলা কথ্য ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার কথ্য রূপের উপর রচিত। এখানে পুরুষ বচন, বাচ্য, কাল অনুযায়ী কথ্যরূপের সঙ্গে শিষ্টরূপের প্রয়োগগত পার্থক্যের দিক বোঝানো হয়েছে। 'বাংলা বানান' ও 'বানান বিধি' দুটি প্রবন্ধই বানান সম্পর্কিত। 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে বাংলা বানানের যে বিভ্রাট দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সেই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আর 'বানানবিধি' প্রবন্ধে বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিগত দোষ—ত্রুটিকে সহজেই অনুধাবন করেছেন। এবং এই অনুযায়ী অনেক সূত্রের মাধ্যমে নয়মাবলীর মাধ্যমে তাঁর ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা পরিপুষ্ট হয়েছে।

রূপতত্ত্বের আলোচনায় স্থান পেয়েছে বচন, প্রত্যয়, ধাতু, বিভক্তি, লিঙ্গ, ক্রিয়ার রূপ, শব্দমূল ইত্যাদি। রূপতত্ত্বের আলোচনা মূলত 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'শব্দতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা বিশেষ্য পদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই।'

তাঁর মতে ভাষার ব্যাকরণ বিশেষ্য পদও তাঁর রূপান্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের বেশির ভাগ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে'। তিনি বিশেষ পদের প্রয়োগ চাতুর্যের কথাও বলেছেন। সর্বনামকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, তেমনি লিঙ্গ ও পুরুষের সঙ্গে সর্বনামের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে তাঁর কলমে। অব্যয়ের আলোচনায় তিনি তো 'ও', 'আর', 'এবং'-এর কথা বলেছেন। বাংলা ক্রিয়াপদের

তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে এসেছে মৌলিক ক্রিয়াপদ, যৌগিক ক্রিয়াপদ ইত্যাদির কথা। এবং ক্রিয়াপদের মূল হিসেবে তিনি সংস্কৃত ধাতুকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে কিছু ক্রিয়াপদ নাম ধাতু থেকে; কিছু ধ্বন্যাত্মক ধাতু থেকে সৃষ্ট। এগুলির তিনি উদাহরণ দিয়েছেন।

'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' প্রবন্ধে তিনি 'গাইব' এর বদলে 'গাব', 'রইবে', এর বদলে 'রবে', 'সবই' এর বদলে 'সবে', 'চাইব' এর বদলে 'চাব' ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'ক্রিয়াপদের তালিকা প্রবন্ধে তিনি 'হাওয়া', 'থাকা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের বিশেষ ভঙ্গিগত প্রকৃতি উন্মোচন করেছেন। এর সঙ্গেই অবশ্য এসেছে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ মূলত বিশেষ্য ও ক্রিয়াযোগে যৌগিক পদ গঠিত হয় এরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ক. বিশেষ্য + ক্রিয়া = মার খাওয়া

খ. ক্রিয়া + ক্রিয়া = করে ফেলা।

অনুজ্ঞার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। যথা—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নঞর্থক ধাতুর বিশ্লেষণে 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ কতটা বৈশিষ্ট্যসম্মত তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—'তুমি নেই', 'সে নেই', 'আমি নেই' ইত্যাদি। ক্রিয়াবিশেষণের আলোচনায় তিনি দুটি ক্রিয়াপদ এক সঙ্গে জুড়ে তা তৈরির কথা বলেছেন। যেমন—'হেসে খেলে', 'উঠে পড়ে' ইত্যাদি। বাংলা বহুবচনের রূপ তৈরি তে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। যেমন—গুলা, গুলি, রা,গণ ইত্যাদি-র যোগ তো আছেই, তা ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন ঝাক, গোছা, আঁটি, গ্রাস পত্র ইত্যাদি যোগেও বহুবচন গঠিত হয়। বাংলা শব্দদ্বৈতের আলোচনায় তিনি বলেছেন বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াকে দু'বার উচ্চারণ করলে শব্দদ্বৈতের সৃষ্টি হয় যেমন—'গরমগরম' (বিশেষণ), 'দুয়ারে দুয়ারে' (বিশেষ্য) 'খেয়ে খেয়ে' (ক্রিয়া) ইত্যাদি। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে তিনি তো দ্বিরুক্তিয় মূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দের বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগগতদিক, দার্শনিক তত্ত্বসবই বিশ্লেষণ করেছেন। আবার 'স্ত্রী লিঙ্গ' প্রবন্ধে কীভাবে স্ত্রী লিঙ্গ গঠন করা হয়, স্ত্রীবাচক প্রত্যয় সহযোগিতার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আছে। 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' (কারক-বিভক্তি) প্রবন্ধটি বাংলা শব্দের তির্যক রূপের সঙ্গে ক্রিয়া পদের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এটি মূলত শব্দ ও কারক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কারক বিভক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে বিভিন্ন কারকের শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ সহ প্রত্যয়ের রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হয়েছে। 'বিশেষ বিশেষ্য' ও 'বাংলা নির্দেশক' প্রবন্ধদ্বয়ে বিষয়টি বোঝাতে তিনি মূলত 'সামান্য বিশেষ্য' ও 'Article'-এর কথা বলেছেন।

'উপসর্গ সমালোচনা' প্রবন্ধটি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি উপসর্গের বিশ্লেষণ করেছেন।

ভাষাতত্ত্বের অন্যতম দিক যে ছন্দতত্ত্বগত সেকথার রবীন্দ্রনাথ কখনও ভোলেননি। তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে অনেক গবেষণামূলক কাজ করেছেন। এ বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছন্দ' (১৩৪৩)। এ ছাড়াও 'সাহিত্যেরপথে', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থেও ছন্দ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা আছে। তাছাড়া ছন্দ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন। যেমন—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', 'ছন্দ ও উচ্চারণরীতি', 'গদ্যছন্দ' ইত্যাদি।

পয়ার ছন্দকে তিনি সবচেয়ে পুরনো বলে মেনেছেন। তাঁর মতে ছন্দ যে কোনও ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিকে অনুসরণ করে। এই হিসেবে তিনি বৈদিক ভাষার অক্ষরমাত্রিকতার কথা বলেছেন। বাংলা কাব্যে সাধু ও চলিতরূপে ছন্দ ভাবনায় দুই ধরনের ছন্দে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তা ছাড়া বাংলা ছন্দে হসন্ত সাধনা ছিল তাঁর ভাবনার একটা বড় দিক। তিনি মূল বাংলা ভাষার উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে ছন্দের বৈচিত্র ঘটাতে চেয়েছিলেন।

৩.৩.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

পর্যায় গ্রন্থ—৪

একক -১৪

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায়

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৪.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.৪.১৪.২ : সাংস্কৃতিকী

৩.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৪.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় :

সুনীতি কুমারের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৯০-এ। তবে তাঁকে বিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে ধরা হয়। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। সবকিছুকে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে বিচার করেছেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি শুধু বাংলা, ইংরেজি বা সংস্কৃত নয় গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। শুধু ভাষা বা সাহিত্য নয়— ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, দর্শন, ভূগোল ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর আগ্রাহ জন্মায়। তবে ভাষার প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীনই তিনি মাতৃভাষা নিয়ে গভীর চিন্তা করেন। ফলে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ লিখেছেন। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—

১. The Origin and Development of the Bengal Language (1926)

২. A Brief Sketch of Bengali Phonetics (1921)

৩. Bengali SelfTaught (1927)

৪. A Bengali Phonetic Reader (1928)

৫. Indo-Aryan and Hindi (1942)

৬. Languages and Linguistics Problems (1943)

৭. Languages and Literature of Modern India (1945)

৮. Scientific and Technocal Term in Modern Indian Language (1953)

৯. Dravidian (1965)

১০. The people Language and Culture of Orissa (1966)

১১. Phonetics in the study of classical Languages in the East (1967)

১২. Balts andAryan (1967)

১৩. The People Languages and Culture of Orissa (1985).

আবার বাংলা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২১)

২। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪৫)

৩। সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৫৫)

৪। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৯৪৪)

৫। সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)

৬। বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গ (১৯৭৫)

The Origin and Development of the Bengali Language : ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে চর্যাপদকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে প্রকাশ করেন। ফলে চর্যার ভাষা বাংলা কিনা তা প্রামাণ করার কাজ শুরু হয়। O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতি বাবু চর্যার ভাষা যে বাংলা তা প্রমাণ করেন।

O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতি কুমার ইন্দো— ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে কেন্তুম ও সতম ভাষা গুচ্ছে ভাগ করেছেন। কেন্তুমকে তিনি বলেছেন পশ্চিমী গুচ্ছ, আর সতমকে পূর্বী গুচ্ছ। এইগ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "There is again, on proof that primitive Indo Europeans, were a pure and unmixed race."

এর পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। বাঙালি জাতির মূল জাতিগত উপাদান বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন চারটি জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত।

যেমন—

> "Four tribdes, Pundra, Vanga, Radha and Sumha, were the important ones, who gave their names to the various tracts they inhabited."

A Brief Sketch of Bengali Phonetics : বর্ণনামূলকভাষা বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে তিনি

আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে এককালিক বা বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যে সোস্যুরও ব্রুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার উপর ভিত্তি করে সুনীতি বাবুর এই গ্রন্থটি রচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা এই গ্রন্থে অনেক স্থানে দেখা গেছে। ১৯১৮ সালে 'Bengali Phonetics' নামে একটি রচনা 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে এটি 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' নামে প্রকাশ পায়।

'Bengali Self Taught' ও 'A Bengali Phonetics' : গ্রন্থদুটি ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। এখানে বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ, বর্ণ ও ধ্বনির সম্পর্ক, ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত ও সুরতরঙ্গ ইত্যাদির আলোচনা আছে।

Bengali Phonetic Reader : এখানে সুনীতি কুমার ড্যানিয়েল জোনসের পদ্ধতিতে ধ্বনিমূল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। রচনাটির অংশ বিশেষে তিনি ধ্বনিমূল ধারণা প্রয়োগ করে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন।

Language and Literature of Modern India : নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তৃত আলোচনা এখানে আছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাও এখানে বিশ্লেষিত। শুধু ভারতীয় আর্যভাষা নয়, অন্য আর্যেতর ভাষার বর্ণনাও এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে একাধিক তথ্য এখানে আছে।

Dravidian : এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্যজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে অনার্য দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্বগত দিকের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

The People Language and Culture of Orissa : এখানে সুনীতিবাবু শুধু ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেননি। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ওড়িয়া ভাষার ক্রম বিস্তারিত রূপে বর্ণনা দিয়েছেন।

ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ : একটি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ বিষয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির বর্ণনা এখানে আছে। ব্যাকরণ বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে সুনীতি কুমার সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু সংস্কৃত পরিভাষা নয় তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছেন। সংস্কৃতের মতোই বাক্যে ক্রিয়াপদের ভিত্তিতে বিভিন্ন কারককে মেনে নিয়েছেন। তবে বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়ার বাকি সম্বন্ধ ছাড়া কারকের আর কোনও পরিচয় তিনি দেননি। কারকের বিভক্তিও তিনি সংস্কৃতের রীতিতেই বিচার করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ছন্দ ইত্যাদির বিভিন্ন দিক এখানে বিশ্লেষিত।

ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা ঃ ভারতের আধুনিক আর্যভাষাসমুহের বিবরণ তো আছেই। তা ছাড়া ও দ্রাবিড়, কিরাত, নিষাদ ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনার পটভূমিকায় হিন্দি, হিন্দুস্তানি, খড়ি, কেলি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার অবস্থান, মান, সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও এখানে আছে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে ও বিবরণ লক্ষণীয়। বৈদিক ভাষা ও অন্যান্য উপভাষার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুনীতিবাবু দিয়েছেন গ্রন্থটিতে।

৩.৪.১৪.২ : সাংস্কৃতিকী

এই গ্রন্থে সুনীতি কুমার বেদের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি বেদের রচনাকালকে খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে বলেছেন। মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই তিনি বেদতথা 'ঋকসংহিতা'র রচনাকালকে খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে ফেলেছেন।

ভাষার বিশ্লেষণ শুধু নয় সুনীতি কুমার ভারতীয় জাতি, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থও লিখেছেন। যেমন—

Kirata-Jana-Kriti: এখানে তিনি ভারতে আগন্তুক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

The Indo Mongolods : এখানে ভোটচিনীয় ভাষা বা মোঙ্গলয়েড ভাষার উৎস ব্যাখ্যা আছে। ভারতের জাতীয় ঐক্য ও হিন্দু সংস্কৃতি, মণিপুরি ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তিনি করেছেন।

বৈদেশিকী : দেশ-বিদেশের প্রচলিত ইতিকথা এ গ্রন্থে আছে। বিশ্বমানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক নানা তথ্য এখানে পাওয়া যায়। আয়ারল্যান্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কাহিনি 'দেরদিউ' ও জার্মানজাতির প্রচলিত উপাখ্যান 'ব্রুনহিল্ড' এবং চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া ভ্রমণ বিষয়ক দুটি রচনাও তিনি লিখেছেন। যথা—'দ্বীপময় ভারত' ও 'রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

বাংলা ভাষার অভিধান সম্পর্কেও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বকে তিনি প্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বলেছেন। আর অভিধান হিসেবে 'চলন্তিকা'র কথা তিনি বলেছেন। এটি চলিত ও সাধুভাষার অভিধান। অভিধানটির পরিশিষ্ট অংশে যে বাংলা ব্যাকরণের রূপটি রাজশেখর বসু দিয়েছেন, তা সুনীতিবাবু প্রশংসা করেছেন।

সুনীতি কুমার সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পাণিনির মতো সুনীতিবাবুও স্বীকার করেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে অনার্য উপাদান আছে।

৩.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবদান বুঝিয়ে দাও।

পর্যার গ্রন্থ — ৪

একক -১৫
সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৫.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

৩.৪.১৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৫.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা :

১৯০১ সালে সুকুমার সেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য সুনীতি কুমাররের যোগ্য ছাত্র রূপে ১৯২১ সালে সম্মানিক সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হন। এবং ১৯২৩ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম বিভাগে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যায় তিনি ছাত্রজীবনেই প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত ও মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ভাষার অনুশীলন ও গবেষণাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। আচার্য সুনীতি কুমারের যোগ্য উত্তরাধিকার তিনি সর্বাথেই বহন করেছেন।

সুকুমার সেন 'Syntax of Old and Middle Indo Aryan Language' বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল— 'Historical Syntax of Middle and New Indo Aryan'। এ ছাড়া ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হল—

১. The Use of cases in tVedic Prose (1929)

২. বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪)

৩. ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯)

৪. An Outline Syntax of Middle InAoyan (1940)

৫. Old Persian Indciption (1941)

৬. A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan (1950)

৭. History and Pre-history of Sanskrit (1950)

৮. An Etymological Dictonary of Bengali (1969)

সুকুমার সেনের প্রথম জীবনের রচনা— 'The use of cases in the Vedic Prose' প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষার পদগুলিতে কারকের ব্যবহার কেমন ছিল তা নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত। প্রাচীন বৈদিক যুগের বাক্যতত্ত্বও

আলোচনা করেছেন তিনি। তাই এখান থেকেই তাঁর ভাষা জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তিপরিলক্ষিত হয়। এছাড়াবৈদিক ভাষার বাক্যগঠন বিষয়েও গবেষণাকরেন।

ভাষা বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপিরের মনোলোকে ভাষা ও সাহিত্য ছিল অবিচ্ছন্ন সম্পর্কে যুক্ত। ড. সুকুমার সেন ও সাহিত্যকে দেখেছেন ভাষার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত করে। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে তিনি ভাষা বিশ্লেষণের আলোকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে আজ অবধি বিস্তৃত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করেছেন। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের ধারাও তাঁর আলোচনায় আছে। এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট মননশীল।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengal Language' গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্ত'। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ভারতীয় ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সম্পর্কে তীক্ষক্ষ্ম, সংযত, বাহুল্যবর্জিত আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অদ্বিতীয়।

প্রাচীন পারসিক ও প্রত্নলিপি শিলা লেখাগুলির আধুনিক সংস্করণ বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেন পারসি ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন 'Old Persian Inscription' গ্রন্থে। এই আলোচনা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'Histor and Pre-history of Sankrit' : গ্রন্থে তিনি মূল ইন্দোইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার জন্মকাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তারই পাশাপাশি অনুমানের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষার প্রাগৈতিহাসিক রূপের পুনর্গঠন করেছেন। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস জানতে এই গ্রন্থটি অসাধারণ

A Comparative of Middle Indo Aryan : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার পালিও প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরেররূপ বৈচিত্র্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে তাঁর A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan : গ্রন্থে। গ্রন্থটি তাঁকে বিশেষজ্ঞদের সামনের সারিতে অধিষ্ঠিত করেছে।

'An Etymological Dictonary of Bengali' : গ্রন্থটি বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধান। এই গ্রন্থটিতে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ, কোন নাম থেকে কোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ও পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে তা কী রূপ লাভ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করলেও আচার্য সুকুমার সেনের একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই গ্রন্থটি হল বহু খণ্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। তথ্য ও তত্ত্বে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের নারী সমাজে ব্যবহৃত উপভাষাগুলির ধ্বনিগত, রূপতত্ত্ব ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আচার্য সুকুমার সেন আলোচনা করেছেন তাঁর 'Women's Dialect of Bengali' গ্রন্থে।

এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন—'সেকশুভোদয়া' (১৯২৮), 'চর্যাগীতি পদাবলী' (১৯৫৬), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ১৯৬৩), 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৯৭৫), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলি ভাষা চর্চার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুকুমার সেন সম্পর্কে বলা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তাঁর গভীরতা ও অবদানে বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তিনি কেরি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক মানুষ, এমনকি উপজাতিদের ভাষাতত্ত্ব

বিচার করেছেন বিভিন্ন রচনায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে অভিধান রচনা করেছেন। একদিকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশীয় ভাষার ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ চর্চায় তিনি অদ্বিতীয়। উল্লেখ্য বঙ্গ দেশে ভাষা বিজ্ঞানচর্চায় এই ধারার সূত্রপাত ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মধ্যে এমন পরিপুষ্ট আচার্য সুকুমার সেনের হাতে।

সবশেষে বলতে হয় সুকুমার সেনের স্বক্ষেত্র ছিল ভাষা ও সাহিত্য। তাই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসা বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশের ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সূক্ষ্মভাবে পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত ঘটান ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই ধারার পূর্ণতা দিয়াছেন ড. সুকুমার সেন। ভাষা সম্পর্কে ড. সেনের ছিল অগাধ দখল। তিনি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের ভাষা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য, ইসলামীয় গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে যেমন মাতামাতি করেছেন, তেমনি বর্ধমানের মুচিদের ভাষার দেশেও তাঁর আসা যাওয়া ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে বেদ থেকে বটতলা পর্যন্ত তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাঁর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আক্ষ্ম লোচনায় কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ যেমন আছেন, তেমনি আছেন প্রিয়নাথ মুখুজ্জেরা। তবে সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কারও কাছে 'তথ্য ভারাক্রান্ত বা 'পাণ্ডিত্য কণ্টকিত' বা 'সাহিত্যে রসহীন' মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রসাস্বদন ক্ষমতার পরিচয় অসংখ্য প্রবন্ধে যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও। অমলেন্দু বসু সুকুমারের ইংরেজি ও বাংলা ভাষাশৈলীর প্রশংসা করেছেন 'জ্ঞানপথিক সুকুমার সেন' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন— 'সুকুমার সেন চমৎকার বাংলা লেখেন, চমৎকার ইংরেজিও লেখেন। পণ্ডিতেরা সব সময়েই ভাষা মাধুরীর অধিকারী হন না। কিন্তু সুকুমার সেনের ইংরেজি যে কতটা সাবলীল বহুধা শক্তিসম্পন্ন সে কথা বুঝতে পারি তাঁর রচিত 'History of Bengali Literature' পড়লে এবং আমার বিশ্বাস যে জওহরলাল নেহরু যে ঐ গ্রন্থ পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন তার অন্যতম একটি কারণ সুন্দরশৈলী সম্পন্ন এক ব্যক্তি সুন্দরশৈলী সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তির রচনায় অচিরেই আকৃষ্ট হন। ঐ শৈলীগুণ সুকুমার সেনের প্রতিটি বাংলা রচনায় বিদ্যমান এমনকী ভারত কোষ অন্তর্গত utility stanted উপযোগিতা ব্যঞ্জক গদ্যেও। ভাষার সঙ্গে রচনা শক্তির এমন পণ্ডিত জনমহলে বিরল।"

৩.৪.১৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুকুমার সেনের অবদান আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

আই.পি.এ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৬.১ : বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক ধ্বনিমালার লিপ্যন্তরকরণ (IPA)

৩.৪.১৬.২ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরীকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

৩.৪.১৬.৩ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরের কিছু দৃষ্টান্ত

৩.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৬.১ : বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক ধ্বনিমালার লিপ্যন্তরকরণ (IPA)

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই একটি বা দুটি ভাষা জানেন। কেউ বা তার চেয়েও কিছু বেশি সংখ্যক ভাষা জানেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই জানেন। কেন না পৃথিবীর এই বিপুল সংখ্যক ভাষার সবগুলি কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। অথচ পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছনোর। অন্য মানুষের ভাষা জানার, বোঝার। এই কারণেই বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছে সর্বজনবোধ্য কৃত্রিম বিশ্বভাষা। এই রকমই আর একটি পদক্ষেপ হল আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। (Internaitonal Phonetic Alphabet) । আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কোনও বিশেষ ভাষার জন্য ব্যবহৃত বর্ণমালা নয়। অধিকাংশ ভাষার বর্ণমালাতেই বক্তব্য পরিবেশনে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, বাংলাতে একটি শব্দ 'অ্যামন' - কিন্তু লিখতে গেলে লিখতে হয় 'এমন'। 'অ্যা' এই ধ্বনিটি বাংলা বর্ণমালায় গৃহীত হয়নি। 'এ' ধ্বনি দিয়ে সেই কাজ চালানো হয়। কিন্তু এই 'অ্যা' ধ্বনিটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় স্থান পেয়েছে।

> *আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কোন বিশেষ ভাষার জন্য ব্যবহৃত বর্ণমালা নয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্য মানুষের কাছে পৌছানোর। অন্য মানুষের ভাষা জানার, বোঝার। এই কারণেই বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছে সর্বজনবোধ্য কৃত্রিম বিশ্বভাষা। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় ধ্বনিবিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা The International Phonetic Association নামে ফ্রান্স থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস এর প্রধান সংগঠক নিযুক্ত হন।*

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় ধ্বনিবিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা 'The International Phonetic Association' নামে ফ্রান্স থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস এর প্রধান সংগঠক নিযুক্ত হন। বারবার এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বারবার পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এই বর্ণমালা বর্তমানের রূপ লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা যেহেতু রোমীয় বর্ণমালার কাঠামোর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে. তাই বাংলা বর্ণমালা রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার বর্ণগুলি পাশাপাশি লিখে দেখানো হল —

বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণমালার চিহ্ন	বাংলা স্বনিম	IPA চিহ্ন
অ	a	/অ/	/ɔ/
আ	ã	/আ/	/a/
ই	i	/ই/	/i/
ঈ	i		
উ	u	/উ/	/u/
ঊ	ū		
ঋ	ṛ	/রি/	/ rⁱ / = r⁺
এ	e	/এ/	/e/
ঐ	oi/ai	/ঐ/	/o̯i/
ও	o	/ও/	/o/
ঔ	ou/au	/ঔ/	/o̯u/
এ	e	/অ্যা/	/æ/
ক্	k	/ক্/	/k/
খ্	kh	/খ্/	/kʰ/
গ্	g	/গ্/	/g/
ঘ্	gh	/ঘ্/	/gʰ/
ঙ্	ŋ	/ঙ্/	/y/
চ্	c	/চ্/	/c/
ছ্	ch	/ছ্/	/cʰ/
জ্	j	/জ/	/ɟ/
ঝ্	jh	/ঝ/	/ɟʰ /
ঞ	ñ	/ন/	/n/
ট্	t	/ট/	/ t /

ঠ্	th	/ঠ/	/ tʰ /
ড্	d	/ড/	/ d /
ঢ্	dh	/ঢ/	/ dʰ /
ণ্	n	/ন/	/ n /
ত্	t	/ত/	/ t /
থ্	th	/থ/	/ tʰ /
দ্	d	/দ/	/ d /
ধ্	dh	/ধ/	/ dʰ /
ন্	n	/ন/	/ n /
প্	p	/প/	/ p /
ফ্	ph	/ফ্/	/ pʰ /
ব্	b	/ব্/	/b/
ভ্	bh	/ভ্/	/ bʰ /
ম্	m	/ম্/	/ m /
য্	y/j	/জ্/	/ɟ /
র্	r	/র্/	/ r /
ল্	i	/ল্/	/ l /
ব্	w/v	/ব্/	/ b /
শ্	ś	/শ/	/ ʃ /
ষ্	s	/শ্/	/ ʃ /
স্	s	/শ্/	/ ʃ /
হ্	h	/হ্/	/ h /
ং	n/m	/ঙ/	/ ŋ /
ঃ	ḥ	/হ্/	/ h /
	n/~		~
ড়	ṛ / ḍ / ɣ	/ড়/	/ +r /
ঢ়	ṛh / ḍh / γh	/ঢ়/	/ r /
য়	y	/য়/	/j/ /é/
ওয়	w	ওয়	/w//óe/

৩.৪.১৬.২ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরীকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

১। প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি বোঝাতে একটি মাত্র চিহ্নই ব্যবহৃত হবে।

২। কোনও ধ্বনির জন্যই একের বেশি চিহ্ন ব্যবহৃত হবে না।

৩। বাস্তব বা প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে কোনও ভাষার শব্দকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে লিপ্যন্তর করা হবে। কোনও ভাষার লিখিত রূপ যাই হোক না কেন, তার উচ্চারণ অনুযায়ী লিপ্যন্তর করাটাই নিয়ম।

৪। ধ্বনির দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য 'কোলন' (:) চিহ্নের ব্যবহার। যেমন, ই = i, ঈ = i :

৫। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় বড় হাতের অক্ষর (Capital Letter)-এর ব্যবহার নেই।

৬। ধ্বনির সানুনাসিকতা বোঝাতে স্বরবর্ণের মাথার উপরে '~' চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন - পাঁক / pãk /

৭। 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপি' সব সময় দুটি তির্যক রেখা (//) -র ভিতরে থাকে।

৮। যৌগিক স্বর বোঝাতে দুটি স্বরের নিচে ' _ ' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করা হয়। যেমন ঐ (ওই) = o͜i।

৯। নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) পদের আগে একটা তারকা চিহ্ন দিতে হয়। যেমন - দিল্লি =*/ dilli /।

৩.৪.১৬.৩ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরের কিছু দৃষ্টান্ত

বাংলা শব্দ	রোমীয় বর্ণান্তর	IPA তে বর্ণান্তর
পদ্মলোচন	প্ + অ্ + দ্ + ম্ + অ ল্ + ও + চ্ + অ + ন্ = Padmalocan	পদ্দোলোচোন্ = প্ + অ + দ্ + দ্ + ও + ল্ + ও + চ্ + ও + ন্ = / $p_e$ddolocon /
রাজকন্যা	র + আ + জ্ + ক্ + অ ন্ + য + আ্ = Rājkanyā	রাজ্‌কোন্না = র্ + আ + জ্ + ক্ + ও + ন্ + ন্ + আ = Kriʃnoc∂ndro/rajkonna/
কৃষ্ণচন্দ্র	ক্ + ঋ + ষ্ + ণ্ + অ + চ্ অ + ন্ + দ্ + র + অ = Kriṣnachandra	কৃশনোচন্দ্রো = ক্ + ঋ + শ্ + ন্ + ও + চ্ + অ + ন্ + দ্ + র্ + ও = / Kriʃnoc∂ndro /

৩.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কি? সংক্ষেপে এর নাম কি?

২। কোনও ভাষাকে IPA-তে রূপান্তরিত করার শর্তগুলো বিশ্লেষণ করো।

NOTE